প্রেম ও পূর্ণিমা

শফীউদ্দীন সরদার

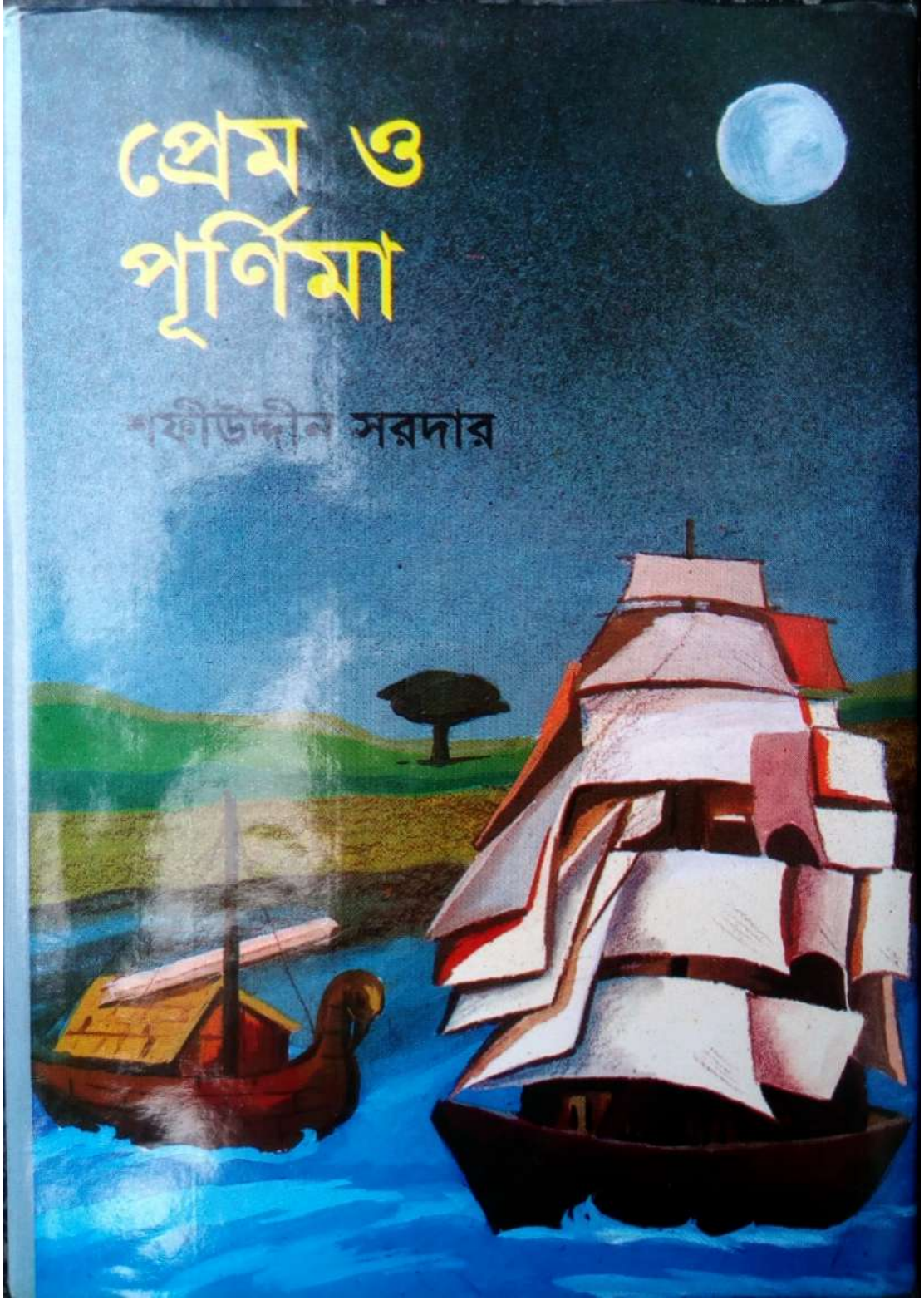

প্রেম ও পূর্ণিমা

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২১৪

২য় প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪২৯
চৈত্র	১৪১৪
মার্চ	২০০৮

বিনিময় মূল্য ঃ ১৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

PRAM-O-PURNIMA by Shafiuddin Sarder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 165.00 Only.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞ আমি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক এ.এম.এম. বাহাউদ্দীন সাহেবের কাছে যাঁর মেহেরবানীতে আমার তিন তিনটে উপন্যাস পর পর তাঁর বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাওয়ায় আমি সাহিত্যাঙ্গনে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ার খোশ-কিস্‌মতি অর্জন করেছি। তাঁর এ মেহেরবানী অনন্য।

কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর হাসিবুল হাসান, অনুজপ্রতিম কথা শিল্পী ইউসুফ শরীফ, অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক অধ্যাপক আবদুল গফুর, কবি রুহুল আমীন খান এবং 'দৈনিক ইনকিলাব' চত্বরের আমার শুভাকাঙ্খীবৃন্দসহ অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে যাঁরা লেখার ব্যাপারে আমাকে বিভিন্নভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমি 'আধুনিক প্রকাশনী'র সুহৃদদের কাছে যাঁরা সদয় হয়ে আমার এই উপন্যাসটি সহ তিন তিনটি উপন্যাস পুস্তক আকারে প্রকাশ করলেন।

কৃতজ্ঞ আমি ভ্রাতৃপ্রতিম মওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের কাছেও যিনি পয়লা উদ্যোগ নিয়ে আমার উপন্যাস "বখতিয়ারের তলোয়ার" পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি সকলের সার্বিক ভালাই কামনা করি। আমিন।

শফীউদ্দীন সরদার।

Scan & Edit : Abu Sufian
Beanibazar. Sylhet.
E-mail : asufian752@gmail.com
Cell : +8801703992396
+8801838871915

Follow us on ---

Facebook : www.facebook.com/asufian752
Twitter : www.twitter.com/asufian752
Instagram : www.instagram.com/msufian771

23/03/19

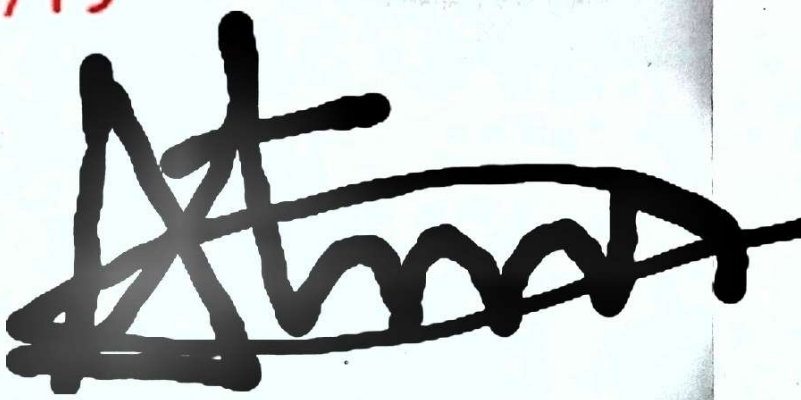

"মোর গোহালে গাই থাকবে,
ঘাস খাওয়াবো, দুধ দোহাবো, দুধের মালিক ভাই থাকবে"—

রাজমহলের যুদ্ধ থেকে তাজমহলের যুগতক্ দিল্লী-বাংলার সম্পর্ক এই কিসিমের ইসলাম বিরোধী মালিকানা ও ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক। ঈমানদারদের কাছে এ সম্পর্ক অস্বস্তিকর বৈকি ?

ঈসায়ী ১৫৭৬ সনে সংঘটিত হলো রাজমহলের যুদ্ধ। বাংলার স্বাধীন সালতানাতের 'শেষ প্রহরী' দাউদ খান কাররানী পরাজিত ও নিহত হলেন। অপরিসীম বেঈমানীর শিকার হয়ে স্বাধীন সালতানাতের শেষ সূর্য অস্তমিত হলো। ঈমানদার দাউদ খানের বাংলা মুলুক ফাসেক আকবর শাহর দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। এই হলো ইতিহাস।

কিন্তু এই কথাই চরম কথা নয়। ইতিহাসের অন্তরালে আসল কথা হলো, সেদিন শুধু বাংলা মুলুকের ভৌগলিক এলাকাটাই দিল্লী মুলুকের অন্তর্ভুক্ত হয় মানুষগুলো হয় না। ভৌগলিক এলাকাটাও দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ তৎক্ষণাৎ পুরোটাই আয়ত্বে আনতে পারেন না। সুলতান দাউদ খানের মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ তিরিশ বছর বা ততোধিক কাল পর্যন্ত "বার ভূইয়া" নামের বাংলার কিছু বাহাদুর দিল্লীর আগ্রাসন প্রতিরোধ করে আসতে থাকেন। যদিও হালে 'শ্রেষ্ঠবাঙ্গালী' আখ্যা প্রাপ্ত দু'একজন ভূঁইয়ার ভূমিকা এখানে তলিয়ে দেখার অবকাশ আছে এবং কিছু কাল্পনিক ভূঁইয়ার নাম এই "বার ভূঁইয়ার" তালিকাটি দূষিত করে রেখেছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খানের কুটকৌশলে বাংলার এই প্রতিরোধ অবশেষে ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু বাইরের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লেও বাংলার মানুষের বিশেষ করে ঈমানদার ও পরহেজগার মুসলমানদের অন্তরের প্রতিরোধ তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে পড়েনি। তাঁরা দিল্লীর বেদাত ও নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলমান সম্রাটদের প্রভুত্ব আন্তরিকভাবে কবুল করতে পারেননি। এ শাসনকে তাঁরা বাইরের শাসন বলেই গণ্য করতে থাকেন। ইসলাম খানের পর কাশিম খান, ইব্রাহিম খান, শাহজাদা সুজা, এমনকি সুবাদার মীর জুমলার কাল পর্যন্ত এই অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে না। কোন কোন সুবাদার নিজের আচরণ ... কর্মদক্ষতার দ্বারা কিছু লোকের প্রীতি হাসিলে সফলকাম হলেও, ব্যাপক কোন পরিবর্তন তাঁরা আনতে পারেন না। অধিকাংশ সুবাদারই বাদশাহর হুকুমে নকরী করতে এসেছেন, নকরী করে চলে গেছেন। বাংলাকে তাঁরা

কর্মস্থলের অতিরিক্ত নিজের ভূমি বা নিজের ওয়াতন ভাবেননি। ফলে, তাঁরা যে দামে কিনেছেন সেই দামেই বেচে গেছেন। বাংলার মানুষও তাঁদেরকে বা দিল্লী মুলুককে নিজের মানুষ বা নিজের মুলুক ভাবেনি।

এই হালেই কেটে গেল প্রায় গোটা একটা শতাব্দী। অতপর পালটে গেল পরিবেশ আর তাতে করে বদলে গেল সম্পর্ক। দিল্লীর তখ্‌তে আসীন হলেন ন্যায় ও সত্য-সুন্দরের প্রতিক শাহানশাহ আওরঙ্গ জেব। বাংলা মুলুকের দায়িত্বে এলেন সুবাদার শায়েস্তা খান। মণির সাথে যোগ হলো কাঞ্চনের। পরিবর্তন সূচিত হলো দিল্লী বাংলার সম্পর্কের। সুবাদার শায়েস্তা খানও ছিলেন সহি একজন মুসলমান। তদুপরি, তাঁর সুদীর্ঘ বাইশ-তেইশ বছর কাল সুবাদারীর আমলে শায়েস্তা খান বাংলা মুলুকের স্বার্থের সাথে নিজেকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলেন এবং বাংলার মানুষের অন্তরের এত গভীরে প্রবেশ করেন যে, বাংলার মানুষ আর তাঁকে স্বদেশী ছাড়া বিদেশী বা আপন ছাড়া পর ভাবতে পারে না। তারা তাঁকে নিজের দেশের নিজেদেরই শাসক হিসেবে ভাবতে থাকে এবং বাংলা মুলুকের নবাব বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। কালক্রমে বাংলার নবাব রূপেই পরিচিতি লাভ করেন শায়েস্তা খান সাহেব।

পাশাপাশি ইসলামের অনড় স্তম্ভ জিন্দাপীর আওরঙ্গজেব দিল্লীর তখতে আসীন থাকায় বিদ্যমান বাধা-অন্তরায় তামামই উঠে যায় এবং বাংলা ও দিল্লীর মুসলমান জনসমাজ আত্মপরিচয়ে সজীব হয়ে দীর্ঘকাল অন্তর আবার একে অন্যের কওমী ভাইয়ের অবস্থানে ফিরে আসে। আওরঙ্গজেব ছাড়া সমগ্র হিন্দুস্তানের মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোন যোগ্যতা আকবর শাহ ও তৎপরের কোন মুঘল বাদশাহর ছিল না। ফাসেক আকবর শাহর ছিল না, জাহাঙ্গীরের ছিল না, ছিল না এমন কি তাজহলের সম্রাট শাহজাহানেরও। এ নিয়ে সুলতান দাউদ খান কাররানী অনেক আফসোস করে গেছেন। আকবর শাহর মধ্যে এ যোগ্যতার নিদারুণ অভাব থাকায় দাউদ খান দিল্লীর সাথে একাত্ম হতে পারেননি।

সেই দুর্লভ যোগ্যতা ও আদর্শ শাহান শাহ আওরঙ্গজেবের মধ্যে কল্পনাতীতভাবে অধিক পরিমাণে থাকায় তাঁর নেতৃত্ব লুফে নেন তামাম হিন্দুস্তানের ও বাংলা মুলুকের ঈমানদারগণ। অর্ধশতাব্দী কাল ধরে তৌহিদের এই অক্লান্ত সৈনিক দিল্লীর তখতে আসীন থেকে ঈমানদারদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা ও অভাব আশাতীতভাবে পূরণ করলেন। ফলশ্রুতিতে দিল্লী বাংলার সীমারেখা অলক্ষ্যেই উঠে গেল এবং উভয় মুলুকের মুসলমানেরা পরস্পরের সাথে নিজের অজ্ঞাতেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। দ্বীন ইসলামের অন্যতম পতাকাবাহী নবাব শায়েস্তা খান হলেন দিল্লী বাংলার এই পুণময় মহামিলনের যোগসূত্র। দিল্লী বাংলার মুসলমানেরা গভীর প্রেমে আবদ্ধ হলো।

অমুসলমানদেরও অতৃপ্তির কিছু রইলো না। দীর্ঘদিন যাবত অভাব-অনটন ও নিরাপত্তাহীনতায় জর্জরিত মুসলমান অমুসলমান সমস্ত মানুষই এ আমলে নয়া জিন্দেগী লাভ করলো। শায়েস্তা খানের কঠোর শাসনে দুর্বৃত্তদের নাম-নিশানা মুছে গেল। খামুশ হলো ভেতর-বাইরের সকল অশুভ শক্তি। ঝাপির মধ্যে মুখ লুকালো বেনিয়ারূপী কাল সাপ। দ্বীন ইসলামের পবিত্র বিধান সুচারুরূপে চালু হওয়ায় নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো অমুসলমানদের জানমালের। সখ্যতা মজবুত হলো জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তামাম ইনসানের।

পেটের ক্ষুধাত রইলো না। দুর্ভিক্ষের বিষাক্ত ছোবলে দুদিন আগেও যেখানে জানের চেয়ে রুটির মূল্য শতগুণে অধিক ছিল, শায়েস্তা খান এসেই সেই জানের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে রুটির মূল্য কমিয়ে দিলেন হাজারগুণে। রাজস্ব সংস্কার সহ জমি বন্টন, কৃষি উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুঁজি-বিনিয়োগ—প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরলস শ্রম দিলেন শায়েস্তা খান। তাঁর পরিশ্রম ও পারদর্শিতায় ধনধান্যে পূর্ণ হলো বাংলা মুলুক। টাকায় আট মণ চাল পাওয়ার মতো এক অবিস্মরণীয় ঘটনা এ বিশ্বে এই একবারই নবাব শায়েস্তা খানের শাসনাধীনে সংঘটিত হলো। ফলাফল পুণ্যময়। মুসলমান অমুসলমান—বাংলার তামাম মানবগোষ্ঠী মুক্তি পেলো অভাবের পীড়ন থেকে, সচ্ছলতা নেমে এলো সকলেরই সংসারে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মুখে ফুটে উঠলো হাসি, সকল গৃহ পূর্ণ হলো ধনে-জনে-উল্লাসে। সুবাদার শায়েস্তা খানের আমলে সুবে বাংলার সমৃদ্ধি ষোলকলায় পূর্ণ হলো পূর্ণিমার আকারে।

১

মুখ টিপে হেসে শিরিবানু বললো—ওরে বাবা ! আজ যে ছোট সাহেব খুব বেশী বেশী মুনিব হতে লাগলেন আমার। আমার অসুবিধাটা দেখবেন না ?

আবদুল আজিজ বললেন—অসুবিধে !

ঃ খাওয়ার হাত পুড়ে গেছে। খাবো আমি কি করে ?

ঃ বাম হাতে চামচ দিয়ে খাবে।

শিরিবানু দুষ্টমী করে বললো—তাহলে তো কানাও হয়ে যেতে পারি আমি। বাম হাতের চামচ মুখে না গিয়ে চোখের মধ্যেও যেতে পারে তো !

ঃ যাবে না। যেতে লাগলে আমি তোমাকে তুলে খাওয়াবো।

ঃ আপনি ?

ঃ আমার কথায় সালুন রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছো তুমি। আমাকেই তো খাওয়াতে হবে তোমাকে এখন।

ঃ ছিঃ !

ঃ ছিঃ কেন ?

ঃ মনিব কখনোও খেদমত করে খাদেমের ?

ঃ করে—করে। যে খাদেম সব হুকুম পালন করে। মনিব তার খেদমতই শুধু করে না, তাকে জিয়াদা পেয়ারও করে।

ঃ ছোট সাহেব !

ঃ ভালবাসে। সোহাগ করে।

ঃ ধ্যাৎ !

বাজমহলের লড়াইয়ের একশো বছর পরে ঈসায়ী ১৬৭৬ সন। সুবাদার শায়েস্তা খানের সমৃদ্ধির আমলেরই এক নিশাবসান। বাংলার সমৃদ্ধির মতো বাংলার আকাশেও সে রাতে ছিল পূর্ণিমা। রাত খানা শেষ হয়ে এসেছে। পূর্ণিমার চাঁদখানা পশ্চিমা দিগন্তে নিদ্রায় ঢুলু ঢুলু। ফিকে হয়ে গেছে তার প্রাণ মাতানো প্রভা। রাতভর একটানা খল খল হাসি হেসে সে এখন ক্লান্ত। এবার সে ঘুমুবে। তার দুই চোখে ঘুম ছড়াচ্ছে মাশরেকী আসমানের মায়াবিনী কিরণবালা। বর্ণাঢ্য আঁচলের বিচ্ছুরিত আভা দিয়ে উদীয়মানা রূপসী তার চোখের পাতায় ঘুমের আবির ছড়াচ্ছে। ঘুমপাড়ানী গান শুনাচ্ছে ঘুমভাঙ্গা পক্ষীকুলের 'সা-রে-গা-মা' মহড়া।

ঘুমিয়ে পড়ছে চাঁদ। সুবহে সাদিকের মিনার থেকে ভেসে আসছে আহবান—"আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম"—ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম চাঁদের উদ্দেশ্যে নয়, যাদের দিয়ে করুণাময় এই ধরাধামে চাঁদের হাট বসিয়েছেন, ঘুমাচ্ছন্ন তাঁর সেই বান্দাবান্দির উদ্দেশ্যে।

স্তব্ধ-নীরব হুগলী নদী সরব হয়ে উঠলো। শুরু হলো মাঝি মাল্লার নোঙ্গর তোলার পালা। মুর্দাদেহে প্রাণ সঞ্চারের মতো তীরে বাঁধা সারি সারি নীরব-নিথর নৌবহর নড়ে উঠলো আবার। ফুটে উঠলো মাঝির মুখে "বদর-বদর" আওয়াজ। তীর ছেড়ে নৌযানগুলো মাঝ দরিয়ায় চললো। ধীরে-সুস্থে-আস্তে-আরামে ধাবিত হলো নৌকাগুলো। হরেক রকমের কিস্তি। ছোট বড় নানা জাতের তরণী। দেশী ও বিদেশী। বেশীর ভাগই মাল বোঝাই ব্যবসায়ী নৌবহর। নৌভ্রমণের পানসী, যাত্রিবাহী বজরা আর মাছধরা জেলে ডিঙ্গিও এখন মাঝ দরিয়ায় নামছে। দাঁড়-বৈঠার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ আর মৃদুমন্দ গুঞ্জরণের মাঝে অনেক যানে অনেকে মিঠাকণ্ঠে কুরআনে তেলাওয়াত করছেন। এর মাঝে ক্ষণে ক্ষণে দূর থেকে ভেসে আসছে সুফী-সাধক প্রেমিক জনের মুক্ত দীলের সুর লহরী—"ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) হাবিবে খালেকে একতা তুয়ী—"

তরুণ ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ একজন প্রতিশ্রুতিশীল কর্মচারী। সুদর্শন নওজোয়ান। তাঁর বাসভবন এই নদীর তীরে। সরকারী বাসভবন। নয়াপদে উন্নীত হয়ে তিনি সদ্য এসে এই মকানে উঠেছেন। ফজরের নামাজ আদায় করে তাঁর ছোটখাটো দ্বিতল কক্ষের খোলা বারান্দায় বসে তিনি

কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করলেন। এরপর চেয়ে চেয়ে নদীর দৃশ্য দেখতে লাগলেন। দেখতে লাগলেন অপর পাড়ে সূর্যোদয়ের সমারোহ।

হুগলী নদী ব্যস্ত নদী। রাতটুকুর বিরাম অন্তে এ নদীর বুকের উপর থৈ মাতম কাণ্ড চলে সারাদিন। এ বিরামটুকুও এ নদীর ছিল না। বিদেশী বেনিয়ার সাথে কিছু জলদস্যুর আর্বিভাব ঘটায় রাতের এই বিরতি। ভোর হলেই ফের ব্যস্ততা। আবদুল আজিজ বসে বসে নদীর ও দিনমণির প্রতিযোগিতা দেখছেন।

অন্ধকারের শেষ বিন্দুও শুষে নিলো দিনকর। বসন্তের বাঁধভাঙ্গা রবি রশ্মির প্লাবণে দশদিক দেখতে দেখতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। উঠি উঠি করতেই আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে দেখলেন, মাঝদরিয়ায় নৌযানগুলো পুনরায় দ্রুতবেগে তীরের দিকে ফিরে আসছে। ব্যস্তভাবে ঠাঁই নিচ্ছে নৌঘাটে, পোতাশ্রয়ে ও জনবসতির আশেপাশে। ব্যাপারটা কি ভাবতেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উপর তলায় উঠে এলো শিরিবানু। এসেই সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—ছোট সাহেব—ছোট সাহেব, নদীতে গোলমাল শুরু হয়েছে। আপনি কি এক্ষুণি বেরুবেন ?

জবাবে আবদুল আজিজ বললেন—কেন, সে খবরে তোমার কি কাজ ?

স্খলিত মস্তকাবরণ ঠিক করতে করতে শিরিবানু বললো—নাস্তা তৈয়ার হয়নি তো তাই আম্মাজান বলছিলেন—

ঃ কেন, তৈয়ার হয়নি কেন ? ফজরের ওয়াক্ত তো অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে !

ঃ জি সাহেব। আম্মাজানের তবিয়তটা ভাল নেইতো তাই—

ঃ ভাল নেই ?

ঃ জি না। রাতে খুব জ্বর গেছে।

ঃ ও ! তা আজব আলী কোথায় ? আমিন গাজী ?

ঃ গাজী চাচা হৈ চৈ শুনে ঘাটের দিকে গেছেন। আজব ভাই বাজারে গেছে সওদা আনতে।

ঃ আতরজান ? ও বেটিও তো ঠেকা কাজ চালাতে পারতো।

ঃ আতরজান কাল বাড়িতে গেছে, আজ এখনও আসেনি।

ঃ ব্যস্ ! বিস্তি কাবার !

ঃ জি !

ঃ তুমি করলে কি ? আর নাহোক দু'খানা রুটি তুমিও শেঁকতে পারতে ?

ঃ জি, তাতো পারতাম। কিন্তু সালুন—

ঃ তুমিই পাকাতে।

শিরিবানুর মাথা একটু নুয়ে পড়লো। সে ইতস্ততঃ করে বললো—আমি যে সালুন পাকাতে শিখিনি—মানে—ভাল পারিনে।

ঃ পারবে কি করে, শেখার কোশেশ করেছো কোনদিন ?

ঃ জি হ্যাঁ। কোন কোন দিন করেছি।

ঃ তাহলে আজও করতে পারতে। খাদ্য না হোক, অখাদ্য তো একটা কিছু বানাতে পারতে নির্ঘাত ? করলে কি এতক্ষণ ?

ঃ জি ?

ঃ কোথায় ছিলে ?

জবাব না দিয়ে শিরিবানু তার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী অবিরাম মেঝের সাথে ঘষতে লাগলো। আবদুল আজিজ পুনরায় জোর দিয়ে বললেন—জরুর তাহলে তুমি আমার কুতুবখানায় ঢুকেছিলে ! দুয়ার খোলা রেখে আমি উপরে উঠে এসেছি, এই ফাঁকে নিশ্চয়ই তুমি ঐ কম্মটি করেছো !

শিরিবানু তবুও নীরব। আবদুল আজিজ ধমকের সুরে বললেন—কি, ঠিক কি না ?

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শিরিবানু স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—অত কিতাব কিসের ছোট সাহেব ? অত কিতাব কোত্থেকে এনেছেন ?

ঃ কি বললে ?

ঃ কি মোটা মোটা ফারসী কবিতার কিতাব ! অত কিতাব পড়বেন কখন ?

ঃ তবেরে ! যা ভেবেছি, ঠিক তাই ! এই, এই নাদান লেড়কী, কাজ ফেলে কেন তুমি কুতুবখানায় ঢুকেছিলে ?

ঃ আমি তো কোন কিতাব পড়িনি ছোট সাহেব ! কসুর কি হলো ?

ঃ বটে ! পড়োনি বলেই আর কসুর কিছু হলো না ? এক্ষণি আমাকে বেরুতে হবে। আমার নাস্তা কৈ ? নাস্তা ?

ইতিমধ্যে আমিন গাজী ফিরে এলো। তাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখে শিরিবানু একপাশে সরে দাঁড়ালো। আমিন গাজী এসে খোশদীলে বললো—পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই হুজুর। একদম মামুলী ব্যাপার।

আবদুল আজিজ প্রশ্ন করলেন—কি রকম ?

আমিন গাজী বললো—আমি ঐ দরিয়ার কথা বলছি। কোন কিছুই ঘটেনি দরিয়ায়। কাজিয়া-ফ্যাসাদ হুড়-হাঙ্গামা—কিছুই হয়নি। ঐ ভাটির দিকে কোথায় যেন কি এক গোলমাল হয়েছে গতরাতে। ঐ খবর শুনেই ভয় পেয়েছে কিস্তিগুলো।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি হুজুর, জি। ভাটির ঐ গোলমালটাও গতরাতেই থেমে গেছে। সে খবরও এসে পড়েছে। এখনই আবার রওনা হবে কিস্তিগুলো।

আবদুল আজিজ আশ্বস্ত হয়ে বললেন—ও, তাই বলো। আমি তো ভাবলাম, জরুর কোন দাঙ্গা বেধেছে নদীতে। এক্ষুণি আমাকে বেরুতে হবে।

ঃ তা বাধলেই বা আপনি বেরুবেন কেন হুজুর ? আপনি তো ছুটিতে আছেন।

ম্লান হাসি হেসে আবদুল আজিজ বললেন—ফৌজীলোকের আবার ছুটি। লড়াই নেই, ছুটি। লড়াই বাধলে ফৌজি লোকের মরার ফুরসুত কোথায় গাজী মিয়া ?

আমিন গাজী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়েছিল। শিরিবানু নেমে যাওয়ার পথ না পেয়ে কিছুক্ষণ উসখুস করলো এবং অবশেষে আবদুল আজিজকে উদ্দেশ করে বললো—তাহলে আমিই গিয়ে যা হোক কিছু পাক করবো ?

খেয়াল হতেই আবদুল আজিজ সংগে সংগে বললেন—থাক-থাক। মেহেরবানী করে ও কাজটি আর করো না। বাইরে বেরুনোর তাড়া যখন নেই, তখন তোমার হাতের শাহীখানা খেয়ে আমি মউতের হাতে সোপর্দ হতে চাইনে।

শিরিবানুর হাসি এলো। দাঁতে আঙ্গুল দিয়ে ফিক্ করে হেসে সে মাথা নীচু করলো। আমিন গাজীকে লক্ষ্য করে আবদুল আজিজ বললেন—গাজী মিয়া, চাচী আম্মার শরীর নাকি ভাল নেই। যাওতো, একটু নাস্তার ব্যবস্থা দেখোতো। আজব আলী ফিরে থাকলে তাকেই লাগিয়ে দাও—

আমিন গাজী বিস্মিত হয়ে বললেন—এ্যাঁ ! সেকি ? নাস্তার ব্যবস্থা এখনও হয়নি ?

ঃ হবে কি করে ! চাচী আম্মার বিমার, আর ইনি তো ফুলবিবি। সালুন পাকাতে পারেন না !

আবদুল আজিজ শিরিবানুর দিকে তিরসা নজরে তাকালেন। আমিন গাজী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আহা, না জানলে পারবে কি করে ? যখন শিখবে, তখন ঠিকই পারবে।

ঃ ও কোনদিনই শিখবে না।

ঃ তা শেখার দরকারটাই বা কি হুজুর ? সবাইকে যে সবকিছুই শিখতে হবে, এর কোন মানে নেই।

ঃ ওহ্, তবেই হয়েছে ! চেহারায় পেত্নী, লেখাপড়ায় ব'কলম, কাজে কামে আমড়ার ঢেঁকি। কোন্ নবাব-বাদশাহর ঘরে ওর ঠাঁই হবে যে, ওকে রেঁধে খেতে হবে না !

আমিন গাজী ঈষৎ হেসে বললো—তা নবাব-বাদশাহর ঘরে না হোক, হুজুর এই রকম আদর থাকলে, মানে ওর এলেম হাসিলের এই মওকাটা ঠিক থাকলে, ওর যা চেহারা আর আদব-আখলাক, তাতে কোন ভাল ঘরে ওর ঠাঁই হওয়া তো কঠিন কিছু ব্যাপার নয় হুজুর !

ঃ ব্যস-ব্যস। তোমাকে আর সে ওকালতি করতে হবে না গাজী মিয়া।

ওর দিকটা রেখে এখন আমার দিকটা দেখো। আর কতক্ষণ ভূখা থাকতে হবে আমাকে ?

সম্বিতে ফিরে এসেই আমিন গাজী ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, আচ্ছা হুজুর আচ্ছা। আমি এক্ষুণি দেখছি—

আমিন গাজী তৎক্ষণাৎ দ্রুত পদে নেমে গেল। পথ পেয়ে শিরিবানুও চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই আবদুল আজিজ তারিক্কী কণ্ঠে বললেন—দাঁড়াও। কাজ ফেলে কেন তুমি আমার কুতুবখানায় ঢুকলে, তার ঠিক ঠিক কৈফিয়ৎ দিয়ে তবে তুমি যাবে।

দাঁড়িয়ে গিয়ে শিরিবানু নত মস্তকে বললো—কাজ ফেলেতো ঢুকিনি। সব কাজই শেষ করেছি।

ঃ সব কাজ !

ঃ জি। উঠোন-আঙ্গিনা ঝাঁট দিলাম, মেঝে-বারান্দা মুছলাম, বাটি-বর্তন সাফ করলাম—

ঃ কেন–কেন ? তুমি তা করতে গেলে কেন ? আতরজান আসেনি তো কি হয়েছে ? আর মানুষতো আছে। একটু দেরী হলেও কি আটকে থাকতো ওসব কাজ ?

ঃ তো আমি করবো কি ?

ঃ তোমার কাজ করবে। হুজুর যে ছবক তোমাকে দিয়ে গেছেন গতকাল, তা রপ্ত করা হয়েছে ?

ঃ না।

ঃ মানে ?

ঃ কি হবে তা রপ্ত করে ?

ঃ এলেম ?

ঃ জি হ্যাঁ। ঐতো শুনলেই, তোমাকে পণ্ডিত হতে হবে আর সে ব্যবস্থা আমাকেই করে দিতে হবে। আমারই যখন দায়, সবাই যখন চায় যে, এলেম শিক্ষা দিয়ে নবাবের দরবারে মুন্সি সাহেবের পদটা আমিই তোমাকে নিয়ে দেই, তখন এলেম হাসিল না করে—

সবলে হাসি চেপে শিরিবানু কথার মধ্যেই বললো—কি, কি ছোট সাহেব ? কিসের পদ ?

ঃ মুন্সি–মুন্সি, মহিলা মুন্সি। নবাবের দরবারে জেনানা মুন্সির পদ।

ঃ কি হয়েছে সেই পদ ?

ঃ নিলামে উঠেছে। এবার তুমিই হবে নবাবের মুন্সি সাহেবা। দরবার উজালা করে বসে থাকবে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরা সত্ত্বেও শিরিবানু কিছুতেই হাসির বেগ চেপে রাখতে পারলো না। সে সশব্দে হেসে উঠে বললো—আমি ?

ঃ জি তুমি। আর আমাকেই সে পদটা পাইয়ে দিতে হবে। অবস্থা যখন এই, তখন এলেম হাসিল করা রেখে তুমি বর্তন ঠলতে কেন গেলে, বাতাও ? আমাকে দোষের ভাগী করবে ?

ঃ দোষের ভাগী !

ঃ তোমার এলেম শিক্ষা না হলে দোষটা কি সবাই আমাকে দেবে না ?

মুখের হাসি বন্ধ করে শিরিবানু বললো—তা হবে কেন ? আমিই তো এলেম শিক্ষা করবো না।

ঃ করবো না মানে ? একশো বার করবে।

ঃ আমি করবো না।

শিরিবানু দৃষ্টিটা নামিয়ে নিলো। আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে বললেন,—মতবল ? আলেম সাহেবকে যে সেদিনই এককাঁড়ি টাকা গুণে দিলাম, সেকি তামাশা দেখার জন্যে ?

শিরিবানু কিছুটা ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—তা দিলেন কেন ছোট সাহেব ? আম্মাও নিষেধ করলেন। খামাখা আপনি টাকা খরচ করলেন কেন ?

আবদুল আজিজ গোস্বা হলেন। গোস্বাভরে বললেন—কি বললে ? খামাখা আমি টাকা খরচ করলাম ?

ঃ খামাখাই তো।

ঃ তবে রে ! বেরোও, বেরোও আমার ঘর থেকে। এতবড় কথা ? আমার মুখের উপর আমার কাজের সমালোচনা ? তাও আবার এক নাদান লেড়কী ? বেরোও—এক্ষুণি বেরোও—

আবদুল আজিজ কয়েক কদম এগিয়ে এলেন। মুখে কাপড় দিয়ে হাসি চেপে শিরিবানু দ্রুত পদে সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগলো। তার গমন পথে চেয়ে থেকে আবদুল আজিজ আপন আক্রোশেই বললেন—ফের আমার সামনে এলে চাবকে তোমার পিঠের ছাল তুলে নেবো।

শিরিবানুর পিঠের ছাল আবদুল আজিজ এমন আরো অনেকবারই তুলে নিতে চেয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর সেই বহু ঘোষিত কাজটি অসম্পন্নই রয়ে গেছে। পিঠের ছাল তুলে নেয়া তো দূরের কথা, তার একখানা কেশের অগ্রভাগও অদ্যতক তিনি স্পর্শ করতে পারেননি। কারণটা এর সরাসরি সনাক্ত করা শক্ত। আবদুল আজিজের সে সাধ্য নেই, এটা ভাবা মিথ্যা। সে সাধ্য তাঁর আছে, এটা ভাবাও সত্য নয়। আসলে এক গায়েবী প্রতিরোধ দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। শিরিবানু আবদুল আজিজের নিজের বোন বা ঘনিষ্ঠ কেউ হলে, তাকে দু'একটা চড়-থাপ্পড় মারা আবদুল আজিজের পক্ষে এমন কোন অসাধ্য কাজ হতো না। একেবারে অনাত্মীয়া এক কাজের মেয়ে হলে, আর না হোক, তাকে বিদায় করাও এমন কোন দুরূহ কাজ ছিল না। কিন্তু আবদুল আজিজের

সাথে শিরিবানুর সম্পর্ক এই দুই পর্যায়ের কোনটাতেই পড়ে না। সর্বোপরি, আবদুল আজিজের মুখের তেজের সাথে এ ব্যাপারে তাঁর দীলের তেজের কোনদিনই সমন্বয় সাধন হয় না।

শিরিবানু আবদুল আজিজের আত্মীয়া, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বা নিকট নয়। আবদুল আজিজের ওয়ালেদ ঢাকায় নবাব শায়েস্তা খানের এক বেসামরিক বিভাগে উচ্চপদে চাকরী করেন। শিরিবানুর আব্বা গরীব সাইদ বেগ আবদুল আজিজের আব্বার দূর সম্পর্কের ভাই। সম্পর্কটা একটু বেশী রকমের দূরের। অকস্মাৎ এক বিমারে সাইদ বেগ ইন্তেকাল করলে সহায় সম্বলহীন সাইদ বেগের স্ত্রী কন্যা চরম দুর্দশায় নিপতিত হয়। ইতিমধ্যে নেমে আসে নিদারুণ এক দুর্ভিক্ষ। সুবাদার মীরজুমলার সুবাদারীর শেষভাগে ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ বাংলা মুলুকে আঘাত হানে। পেটের দায়ে লোকজন গাছ গাছড়ার পাতা খেতে শুরু করে। একখানা রুটির জন্যে মউতের ঝুঁকি নিতেও কেউ ইতস্ততঃ করে না। আবদুল আজিজের আব্বা ছিলেন একাধারে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও দৌলতমান্দ ব্যক্তি। ঈমানদার ও পরহেজগার আদমী। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি তাঁর দূরের-নিকটের তামাম গরীব-দুঃখী আত্মীয়-স্বজন ও খাতিরের লোকদের নিয়ে এসে নিজের বিশাল মকানের এক অংশে ঠাঁই দেন ও সকলের আহার অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। সাইদ বেগের স্ত্রী কন্যাকেও তিনি ঐ একই সাথে নিয়ে আসেন এবং তাদের অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। শিরিবানুর বয়স তখন চার কি পাঁচ বছর।

এরপর একদিন দুর্ভিক্ষ কেটে যায়। আগত ব্যক্তিরা আবার সকলেই নিজ নিজ গৃহবাসে ফিরে যায়। কিন্তু যাওয়ার জায়গা না থাকায় সাইদ বেগের স্ত্রী মদিনা বিবি ও কন্যা শিরিবানু রয়ে যায়। ঠিক রয়ে যায়, তা নয়। আর পাঁচ জনের মতো তারাও আল্লাহ ভরসা করে নিজ এলাকায় ফিরে যেতে উদ্যত হলে, আবদুল আজিজের আব্বাই তাদের ঐ অসহায়ভাবে যেতে দেন না, নিজ মকানেই রেখে দেন।

সেই থেকেই শিরিবানুরা এই পরিবারে রয়ে গেছে। শিরিবানুর আম্মা মদিনা বিবি একজন অত্যন্ত বিবেক সম্পন্না মহিলা। আত্মীয় হোক, পর হোক, কারো অন্ন বসে বসে খাওয়ার তিনি বিরুদ্ধে। রুচিতে বাধে। তাই এই পরিবারে প্রবেশ করার পর থেকেই তিনি গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম নিজের হাতে তুলে নেন এবং চাকর চাকরানী সহকারে এ সংসার প্রকৃতপক্ষে তিনিই পরিচালনা করতে থাকেন। আবদুল আজিজের আম্মার বোঝা এতে করে একেবারেই হালকা হয়ে যায় এবং এই দুই মা-বেটি আবদুল আজিজের আব্বা-আম্মার সুনজরে পড়েন। এদের প্রতি তাঁদের দীলে দরদ পয়দা হয় ও সে দরদ ক্রমে ক্রমে গাঢ় হয়। শিরিবানু ও তাঁর আম্মা কালক্রমে এই পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিণত হয়। আবদুল আজিজের আব্বা শিরিবানুকে এলেম শিক্ষা দেয়ার জন্যে স্থানীয় এক মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন।

কয়েক বছর শিরিবানু মাদ্রাসায় এলেম শিক্ষা করে। এরপর তার মধ্যে সাবালিকার আভাস ফুটে উঠলে তার মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ হয় এবং তার এলেম শিক্ষা স্থগিত থাকে।

এদিকে আবদুল আজিজ উপযুক্ত এলেম শিক্ষা করার পর নবাব শায়েস্তা খানের সামরিক বিভাগে যোগদান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে ছোটবড় কয়েকটা ধাপ তর তর করে ডিঙ্গিয়ে ফৌজদার পদে উন্নীত হন। পদোন্নতির পর নয়া কর্মস্থল হুগলীতে এসে তিনি কিছুদিন হুগলীর প্রশাসক জিন্দামালিকের বাসভবনে অবস্থান করেন। পরে সরকারী বাসা মঞ্জুর হলে ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ এই নয়া সংসার খুলে বসেন। আবদুল আজিজের আব্বা আম্মা সেরেফ চাকর-নফর আর দাসীবাঁদীর উপর ভরসা করে আবদুল আজিজকে ঢাকা থেকে হুগলীতে পাঠাননি। তার সেবাযত্ন আর তয়তদবির সুনিশ্চিত করার জন্যে একান্ত বিশ্বস্ত ও গৃহকর্মে পারদর্শিনী মদিনা বিবিকে পুত্রের সাথে দিয়েছেন। শিরিবানুকে স্বাভাবিকভাবেই মায়ের সাথে আসতে হয়েছে। কাজের জন্যে অন্য আরো ঝি-চাকর থাকলেও মদিনা বিবিই আবদুল আজিজের সংসারের প্রধান পরিচারিকা। হরওয়াক্ত তিনি কাজ নিয়ে আছেন।

শিরিবানুর অবস্থা না ঘরকা, না ঘাট্‌কা। আবদুল আজিজের আত্মীয়া হওয়ায় আর বেশ খানিকটা এলেম হাসিল করায় সে না পারছে পুরোদস্তুর বাঁদীর কাতারে সামিল হতে, না পারছে উপরের কোন অবস্থানে ঠাঁই করে নিতে। তার এই বেকার অবস্থা দেখে আবদুল আজিজ তার স্থগিত এলেম শিক্ষা আবার চালু করে তার বেকারত্ব ঘুচিয়েছেন এবং গৃহশিক্ষক হিসাবে হুগলীর একজন প্রবীণ ও বিজ্ঞ আলেম সাহেবকে নিয়োগদান করেছেন।

শিরিবানুর আম্মা চান, মেয়ের বয়স হচ্ছে, কাঙ্গাল-গরীব যে ঘরে হয় তাড়াতাড়ি তার শাদি হোক। আবদুল আজিজ চান, এলেম শিক্ষা করে শিরিবানু ভাল পাত্রে পড়ুক। আবদুল আজিজের আম্মা-আব্বা চান, শাদিটা তার কিছুদিন আটকে থাকুক এবং আবদুল আজিজের শাদির পর তার শাদিটা হোক। শিরিবানু খসমের ঘরে চলে গেলে, তাঁদের ধারণা, মদিনা বিবি মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। আবদুল আজিজকে ফেলে সেও মেয়ের কাছে চলে যাবে আর আবদুল আজিজ হুগলীতে অসুবিধায় পড়ে যাবে। এ ছাড়া শিরিবানুর বয়সটা এমন কিছু বেশী হয়নি যে তার শাদিটা এক্ষুণি হতে হবে। বরং আবদুল আজিজের শাদিটা হয়ে গেলে আবদুল আজিজের আম্মা-আব্বারাই দেখেশুনে ভাল একটা জায়গায় শিরিবানুর শাদির ব্যবস্থা করবেন। আবদুল আজিজের শাদির পয়গামও জোরদারভাবে আসতে শুরু করেছে। বর হিসাবে আবদুল আজিজ খুবই আকর্ষণীয়। তিনি এলেমদার। সুপুরুষ ও

সংবংশীয়। নকরীও তাঁর খানদানী এবং নকরীতে তিনি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল। ফলে, অনেক উঁচু তবকা থেকে তাঁর অনেকগুলো শাদির পয়গাম ইতিমধ্যেই এসে গেছে এবং এদের মধ্যে দুই একজন মেয়েকে আবদুল আজিজ বেশ পছন্দও করেছেন বলে জানা গেছে।

সুতরাং আবদুল আজিজের শাদির আর দেরী নেই। তাই, আবদুল আজিজের আব্বা-আম্মা চান, শিরিবানুর শাদিটা মাত্র এই ক'টা দিন অপেক্ষা করে থাকুক।

শিরিবানু কি চায় তা শিরিবানু নিজেও বুঝে না বা বুঝার জন্যে ব্যস্তও সে নয়। পরোয়াও তার তেমন একটা কোন কিছুতেই নেই। তাঁর ধ্যান-ধারণা, জীব দিয়েছেন যিনি, তিনি শুধু আহারই দেবেন না, আর পাঁচটা দিকও দেখার দায়িত্ব তাঁরই। আত্মীয় হলেও আবদুল আজিজের ব্যক্তিত্বের জন্যে শিরিবানু তাকে যতটা ভাই হিসেবে জানে, তার চেয়ে বেশী মুনিব হিসেবে গণ্য করে। তবে একই বাড়ীতে থেকে মানুষ হয়ে উঠার দরুন এবং ছোটকাল থেকে সবসময় চোখের সামনে দেখার দরুন, বাইরে বাইরে অনেকটা ভয়-সংকোচ করলেও, আবদুল আজিজকে নিয়ে শিরিবানুর অন্তরে ভয়-সংকোচের পরিমাণটা খুবই কম। শিরিবানুর গুণ বললে বড়গুণ—সে সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী। দোষ বলতে বড় দোষ—সে কিছুটা চঞ্চল।

নাস্তার পর আবদুল আজিজ এসে এবার দহলীজে বসলেন। আমিন গাজীর তেমন কিছুই করতে হয়নি। মদিনা বিবিই ইতিমধ্যে নাস্তার আনযাম প্রায় তামামই সম্পন্ন করে এনেছিলেন। আবদুল আজিজের খানসামা বা নওকর আজব আলী সওদা নিয়ে তখনও না ফেরায় সাদামাটা আনযামেই নাস্তার পর্ব শেষ হলো। নাস্তার ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার আগে যে আজব আলী ফিরবে না, এটা সবার জানা। কারণ, তাঁরা জানেন, তাঁদের আজব আলী এক আজব চীজ। নামটা তার অর্থবহ। আজব আলী বুঝে কম, মনে রাখে আরো কম, কিন্তু জানার খাহেশ তার অদম্য। কখন কোন কাহিনীর মধ্যে কোথায় যে সে আটকে যাবে, এটা ঠাহর করে সাধ্য কার? অনেক অভিজ্ঞতার ফলেই তার সম্বন্ধে সবার এই ধারণা।

দহলীজে ঢুকেই আবদুল আজিজ খেয়াল করলেন, দহলীজের আঙ্গিনা ঘেরা প্রাচীরটার ওপারে রাস্তার উপর রীতিমতো বহাস চলছে। জব্বোর বাকযুদ্ধ। গভীর তত্ত্বালোচনা। কণ্ঠস্বর এই নরম এই গরম। তিনি আরো খেয়াল করলেন, রণটা দ্বৈত রণ। লড়াইয়ারা দুই আলী। এক আলী উমিদ আলী আর এক আলী আজব আলী।

দহলীজে আসার কালেই আবদুল আজিজ রাস্তার দিকে একটা "হায়-হায়" আওয়াজের সাথে কিছু এলোমেলো কথাবার্তা শুনেছিলেন। রাস্তার এসব

আটপৌরে কেচ্ছা। কে এসবে কান দেয়? আবদুল আজিজও দেননি। কিন্তু দহলীজে এসে বসেই তিনি কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন এবং তাদের চলন্ত বিতর্কের নিম্নরূপ কথাবার্তা শুনতে পেলেন ঃ

আজব আলী—না খেলে মানুষ কখনো বাঁচে?
উমিদ আলী—না বাঁচলে মানুষ কখনও খায়?
আঃ আলী—বেঁচে থাকার জন্যেই তো মানুষকে খেতে হয়।
উঃ আলী—খাওয়ার জন্যেই তো মানুষ বেঁচে থাকে।
আঃ আলী—আপনি ভুল করছেন সাহেব। বাঁচার জন্যেই মানুষ খায় আর তাকে খেতে হয়।
উঃ আলী—ভুলটা তুমি করছো আজব আলী। মানুষ বাঁচার জন্যে খায় না, খাওয়ার আশাতেই মানুষ বেঁচে থাকে।
আঃ আলী—কখ্খনো নয়, এ কখ্খনো সত্য নয়।
উঃ আলী—একশো বার সত্য।
আঃ আলী—হতেই পারে না।
উঃ আলী—আলবত পারে।
আঃ আলী—আপনি গায়ের জোরে বলছেন সাহেব।
উঃ আলী—জি, না, আমি মগজের জোরে বলছি।
আঃ আলী—কি রকম?
উঃ আলী—ওরে বেয়াকুফ, সুস্বাদু খাদ্যসহ দুনিয়ার তামাম সুখশান্তি গো গ্রাসে গেলার লোভেই মানুষ বেঁচে থাকে আঁর বেঁচে থাকতে চায়। মূলোর ডাঁটাটা নাকের ডগার সামনে ঝুলানো থাকে বলেই গর্ধভের দল হাঁটে। হাঁটে ঐ মূলোর ডাঁটা খাওয়ার আশায়। নইলে হাঁটার কাজে মূলোর ডাঁটা আদৌ কোন সহায়ক নয়। তার চেয়ে একজোড়া ছেঁড়া জুতাও হাঁটার জন্যে অনেক বেশী সহায়ক।
আঃ আলী—কি বলছেন সাহেব? কিছুই তো বুঝলাম না?
উঃ আলী—বুঝবে না। তোমার মাথায় এসব কিছু ঢুকবে না।
আঃ আলী—ঢুকবে না মানে?
উঃ আলী—মানে মাথায় আগে কিছুদিন "ভেজ কল্কি তৈল" দস্তুর মতো মালিশ করো, তারপর এসব কথা বুঝতে এসো।
আঃ আলী—আরে থামেন সাহেব! আপনার মতো গাছ পাগল ছাড়া এমন আজগুবী কথা দুসরা কেউ বলবে না।
উঃ আলী—তোমার মতো ধোপার গাধা ছাড়া এমন উল্টা বুঝ অন্য আর কেউ বুঝবে না।

আঃ আলী—উল্টা বুঝ !

উঃ আলী—বিলকুল। ঐ ভোগের লালসা বাদ দিলে এ দুনিয়ায় আর থাকে কি ? কেবলই তো লাথিগুড়ি ! ভাল ভাল খাওয়ার আশা না থাকলে সেরেফ লাথি খাওয়ার লোভে এ দুনিয়ায় কি কেউ একদন্ড বেঁচে থাকতে চাইতো ?

আঃ আলী—তাজ্জব। তবে যে লোকে বলে—

উঃ আলী—বলে, খাওয়াটা আসলে কোন বিষয়ই নয়, বেঁচে থাকতে হয় বলেই মানুষকে বাধ্য হয়ে খেতে হয়—এইতো ?

আঃ আলী—জি-জি। ঠিক ঐ কথাই বলে।

উঃ আলী—বেঁচে থাকার এত খাহেশটা কিসের জন্যে, তা কেউ বলে না।

আঃ আলী—সাহেব !

উঃ আলী—মিথ্যাবাদী। যারা ঐসব কথা বলে তারা ঘোর মিথ্যাবাদী। আর চরম মতলববাজ। বেয়াকুফদের ঐ বলে ভুলিয়ে রেখে ঐ খাওয়ার সুখ বা মজাটা তারা একাই ভোগ করতে চায়।

আঃ আলী—সেকি !

উঃ আলী—নইলে ঐ ঘি এর ভাণ্ডটা ভেঙ্গে যাওয়ায় এত 'হায়-হায়' তুমি করতে না। খাওয়ার সুখ বা সুখের খাওয়াটা পণ্ড হলো বলেই তোমার এত আফসোস্ !

আঃ আলী—বলেন কি !

উঃ আলী—আটার থলেটা তো আনামই আছে কাধে তোমার। সেরেফ বেঁচে থাকার জন্যেই যদি খাওয়া, তাহলে কয়েকখানা গরম গরম রুটিই বেঁচে থাকার জন্যে যথেষ্ট। দিনান্তে একখানা শুকনো রুটি খেয়েও জিন্দা থাকে মানুষ। জিন্দা থাকার জন্যে ঐ ঘি'টা কোন অপরিহার্য ব্যাপারই নয়।

আঃ আলী—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো ! কথাটা তো ঠিকই সাহেব ! ভাল খাওয়ার বিষয়টা তো সত্যি একটা গুরুতর বিষয়। সাংঘাতিকভাবে ভেবে দেখার দিক। মগজ থাকতেও তো দেখছি, দুনিয়ার সব মানুষ বুদ্ধিহীন।

উঃ আলী—আবারও ভুল করলে।

আঃ আলী—সাহেব !

উঃ আলী—দুনিয়ার সব মানুষই বুদ্ধিহীন নয়।

আঃ আলী—জি ?

উঃ আলী—কিছু মানুষ আছে যারা একেবারেই বুদ্ধিহীন। সব নয়।

আঃ আলী—তাই নাকি ? তাহলে কোন্ মানুষগুলো একেবারেই বুদ্ধিহীন, সাহেব ?

উঃ আলী—কোনগুলো ?

আঃ আলী—জি-জি। কোন্‌গুলো একেবারেই বুদ্ধিহীন আর সবচেয়ে বুদ্ধিমানই বা কারা ?

উঃ আলী—এক কথায় বলতে গেলে, যারা সৎ তারা সবচেয়ে বুদ্ধিহীন আর যারা বিশ্বাসঘাতক তারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

আঃ আলী—কেমন-কেমন—

উঃ আলী—নিজেরা সৎ বলে সৎলোকেরা চোর-চোট্টা-জালিয়ত, মানে দুনিয়ার সব মানুষকে সৎভাবে, সব মানুষকে বিশ্বাস করে, সব মানুষকে কাছে বসায়, ঘরে নেয় ব্যস, চিচিম ফাঁক!

আঃ আলী—আচ্ছা।

উঃ আলী—মগজ এদের এতই অনুর্বর যে, সর্বশান্ত হওয়ার পরও এদের কিছুই মনে থাকে না। দুটো দিন যেতে না যেতেই আবার এরা দুষ্টলোকের মিষ্ট কথায় পটে যায়। পটাও তো দেখি কেমন মুরোদ একজন বিশ্বাসঘাতককে—মানে একজন দালাল গাদ্দার মোনাফেককে ?

আঃ আলী—তা-মানে—

উঃ আলী—এদেরকে পটাতে হলে আবার ঐ দালাল গাদ্দার মোনাফেক—মানে আরো চোখা একজন বিশ্বাসঘাতকই দরকার। সৎ মানুষের কাজ নয়।

আঃ আলী—জব্বোর কথা সাহেব ! তাইতো ! এটাও তো একটা মস্তবড় কায়েমী কথা বলেছেন—খুবই উম্‌দা কথা !

উঃ আলী— উমিদ আলী উমদা কথাই বলে, ফালতু কথা বলে না। দালাল গাদ্দার বিশ্বাসঘাতকেরা সবসময়ই সৎ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেয়ে তাদের মুখেই আঠা লাগিয়ে রেখে আসে। একজন দালাল গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতকের গায়ে কাঁটার আঁচড়টি লাগানোও বড় সহজ নয়।

আঃ আলী—ঠিক ঠিক। তাহলে তো সাহেব ওরাই মানে ঐ বিশ্বাসঘাতকেরাই মন্দের বেটা মন্দ। ওরাই তো বাহাদুর ?

উঃ আলী—হ্যাঁ বাহাদুর তো বটেই। এক নর্দমা বিষ্ঠা যে গিলতে পারে, সেও একজন বাহাদুর বৈ কি ?

আঃ আলী—সাহেব !

উঃ আলী—বিলকুল বাহাদুর।

আঃ আলী—এবার তাহলে বলুন দেখি, সাহেব, আমি লোকটা কি ? বুদ্ধিহীন, না বুদ্ধিমান ?

উঃ আলী—তার আগে বলো দেখি, তুমি লোকটা কি ? সৎ না বিশ্বাসঘাতক ?

আঃ আলী—বিশ্বাসঘাতক মানে ? আমি বিশ্বাসঘাতক হবো কেন ? আমি একজন রীতিমতো সৎ ব্যক্তি।

উঃ আলী—সৎ ব্যক্তি ? তাহলে তো তুমি—

আঃ আলী—এ্যাঁ। না-না। মানে—আমি বিশ্বাসঘাতক।

উঃ আলী—বিশ্বাসঘাতক ?

আঃ আলী—এ্যাঁ! না মানে—আমি, আরে দূর ! আমি সৎ-অসৎ বিশ্বাসঘাতক কিছুই নই সাহেব।

উঃ আলী—তাহলে তুমি কি ?

আঃ আলী—আমি একজন বাংলার মুসলমান।

উঃ আলী—তাহলে তুমি খাঁটি সোনার মতো একজন নিখাদ বুদ্ধিহীন।

আঃ আলী—কেন-কেন ? মুসলমান নামধারী বাংলার সবাই কি সৎ ব্যক্তি যে, আমি বাংলার মুসলমান বলে বুদ্ধিহীন হবো ?

উঃ আলী—বাংলার মুসলামনেরা সৎ হোক আর দালাল-গাদ্দার হোক, সবাই বুদ্ধিহীন।

আঃ আলী—যাঃ ব্বাবা ! সে আবার কি রকম ?

উঃ আলী—যারা সৎ তারা ঘরে দালাল-গাদ্দার পালবে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে চিনিয়ে দিলেও তারা দালাল-গাদ্দার অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকদের ঘর থেকে বের করে দেবে না। বরং বিশ্বাসঘাতকদের আরো জামাই আদরে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরে যাবে লড়তে। ফলে, চরম মুহূর্তে বাইরে থেকেও লাথি খাবে, ভেতর থেকেও লাথি খাবে। দুইদিক থেকে পেটে পিঠে সমানে লাথি খেয়ে শেষ পর্যন্ত পটল তুলে চিৎপটাং।

আঃ আলী—এসব কি কথা সাহেব ?

উঃ আলী—আখেরী কথা।

আঃ আলী—আখেরী কথা !

উঃ আলী—একদম সার কথা। ঐভাবে তারা বংশানুক্রমে চিৎপটাং হবে। কোন্ সাপের কামড়ে তাদের বাপ দাদা আর পূর্বপুরুষেরা মরেছে, সে সাপের ফণা কেমন, সবই পরিষ্কারভাবে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও আর সে সাপকে চিনেও বুদ্ধি তাদের খুলবে না বা খেলবে না। ঐ সাপই তারাও দুধকলা দিয়ে পুষবে আর ঐ সাপের কামড় খেয়ে তারাও চিৎপটাং হবে।

আঃ আলী—সাহেব।

উঃ আলী—ওদিকে আবার বাংলার মুসলমান নামধারী দালাল গাদ্দারেরাও মস্তবড় বেয়াকুফ। বিশ্বাসঘাতক হয়েও তারা অকাট মূর্খ।

আঃ আলী—তা মানে—

উঃ আলী—মুসলমান নামধারী গাদ্দারেরা এতই নির্বোধ যে, অমুসলমানদের ভাড়াটে হয়ে অমুসলমানদের নির্দেশে তারা নিজের ঘরে আগুন দেয়। কাজ আদায় করে নিয়ে তাদের অমুসলমান প্রভুরা পাছায় তাদের কড়া কড়া লাথি মেরে নর্দমায় ফেলে দেয়। এ ঘটনা একশো একটা ঘটা সত্ত্বেও আর তাদের তা জানা থাকা সত্ত্বেও, তারা ফের ওদেরই ভাড়া খাটে। নির্বোধ আর বলে কাকে ?

আঃ আলী—হুঁউ—

উঃ আলী—বুঝেছো ?

আঃ আলী—না সাহেব।

উঃ আলী—বোঝোনি ?

আঃ আলী—একটুও না।

উঃ আলী—বলোকি।

আঃ আলী—বুঝবো কি করে সাহেব ? এসব ঘটনা কোথায় ঘটলো, কে কোথায় চিৎপটাং হলো, কে পাছায় লাথি খেলো, আমি তো এসব ঘটনা একটাও দেখিনি ?

উঃ আলী—দীর্ঘদিন বেঁচে থাকো তাহলে দেখার বরাত নির্ঘাত হবে। তবে এসব ঘটনা আগে ঘটেছে। পরেও ঘটবে। এ রকম অনেক ঘটনার কথা ইতিহাসে আছে।

আঃ আলী—ইতিহাসে আছে ?

উঃ আলী—অনেক আছে, আর পাতায় পাতায় আছে।

আঃ আলী—তাহলে তারা ইতিহাস পড়ে না ?

উঃ আলী—না। বাংলার অধিকাংশ মুসলমানেরা তাদের নিজের ইতিহাস পড়ে না।

আঃ আলী—কোন্ ইতিহাস পড়ে ?

উঃ আলী—কেউ একদম পড়েই না। যারা পড়ে তারা ইতিহাসের নামে তাদের প্রভুদের বানানো গপ্প পড়ে। নিজেদের সঠিক ইতিহাস পড়ে না।

আঃ আলী—তাজ্জব !

উঃ আলী—তুমিও তো একজন বাংলার মুসলমান। তুমি ইতিহাস পড়ো ?

আঃ আলী—আমার সে সময় কোথায় সাহেব ?

উঃ আলী—ওদের সময় থাকতেও ওরা পড়ে না। বুদ্ধিহীন হওয়ার দরুন

নিজেদের সঠিক ইতিহাস কেউ পড়ে শুনালেও তারা তা বুঝে না, বোঝার গরজও বোধ করে না। এই জন্যেই বাংলার মুসলমানদের পতন ঘটেছে বার বার বিপর্যয়ের তো হিসেবই নেই।

আঃ আলী—পতন ঘটেছে ?

উঃ আলী—অবশ্যই এবং আরো ঘটবে।

আঃ আলী—কেন সাহেব ?

উঃ আলী—রগরগে ইতিহাস চোখের সামনে থাকতে তারা ইতিহাস পড়ে না বলে তাদের হুঁশ হয় না, তারা সামাল হয় না। তাই একদল ঐভাবে পেটেপিঠে লাথি খেয়ে চিৎপটাং হয়, আর একদল ভিনজাতির ভাড়া খেটে মজুরীর বেলায় পাছায় কড়া লাথি খায়।

আঃ আলী—কি সাংঘাতিক ! আপনি ইতিহাস পড়েন সাহেব ?

উঃ আলী—পড়ি।

আঃ আলী—বোঝেন ?

উঃ আলী—বুঝি।

আঃ আলী—তাহলে তো আপনি খুব সামাল লোক সাহেব। আপনার পতন নেই।

উঃ আলী—যারা ইতিহাস সচেতন, তাদের পতন সহজে হয় না।

আঃ আলী—ইতিহাস সচেতন !

উঃ আলী—মানে যারা ইতিহাস পড়ে।

আঃ আলী—আমার তাহলে কি হবে সাহেব ? আমি যে ইতিহাস পড়িনে ?

উঃ আলী—কি হবে ?

আঃ আলী—আমার পতন তো তাহলে নির্ঘাত।

উঃ আলী—কেন-কেন ?

আঃ আলী—আমি যে ইতিহাস সচেতন নই।

উঃ আলী—ও-এই কথা ? তা এখন থেকে ইতিহাস পড়তে শুরু করো, তাহলেই আস্তে আস্তে ইতিহাস সচেতন হয়ে যাবে।

আঃ আলী—ইতিহাস সচেতন হওয়াটা উম্‌দা খুব কাজ, তাই নয় সাহেব ?

উঃ আলী—বহুৎ উম্‌দা কাজ।

আঃ আলী—তাহলে বাংলার ঐ অধিকাংশ মুসলমানেরা এই উম্‌দা কাজটা করে না কেন ?

উঃ আলী—তারা বুদ্ধিহীন বলে।

আঃ আলী—ও-আচ্ছা। তা সাহেব,এ বিশ্বে কোন্ দেশের লোক, কোন্ এলাকার লোক—মানে কোন জাতি সবচেয়ে বেশী ইতিহাস সচেতন ?

উঃ আলী—গো-জাতি।

আঃ আলী—গো-জাতি! মানে গরু ?

উঃ আলী—হ্যাঁ গরু।

আঃ আলী—গরুরা সবচেয়ে বেশী ইতিহাস সচেতন ?

উঃ আলী—সবচেয়ে বেশী।

আঃ আলী—সেকি সাহেব !

উঃ আলী—একবার যদি কোনদিন ঘরে ওদের আগুন লাগে, সে কথা ওরা জিন্দেগীতেও ভুলে না। আগুন তো দূরের কথা, আকাশে এক টুকরা সিঁদুরে মেঘ দেখলেই তাদের অতীতের কথা স্মরণ হয়, ইতিহাস মনে পড়ে।

আঃ আলী—কি সর্বনাশ ! আপনি তো দেখছি মহাজ্ঞানী, হুজুর। জবরদস্ত আলেম মানুষ আপনি সাহেব ! মানে আপনি একজন ডাকের লোক ! তল্লাটের সেরা আদমী !

উঃ আলী—তাই ?

আঃ আলী—জি-জি। জিন্দাবাদ ! আলেম হুজুর—জিন্দাবাদ ! কামেলহ হুজুর—জিন্দাবাদ ! খাস মকানের খাস হুজুর—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ—

ইতিমধ্যে আবদুল আজিজ বেগ বেরিয়ে এলেন। আর তিনি দহলীজে চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না। এদের এই তত্ত্ব-আলাপ আজকের এই গোটা দিনে শেষ হবে বলে মনে করতে না পারায়, আবদুল আজিজ অবশেষে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু এসেই যা দেখলেন, তাতে তিনি হতবাক। উমিদ আলী দাঁড়িয়ে থেকে হো হো করে হাসছে আর আজব আলী কাঁধের উপর একহাতে আটা ভর্তি একটা মোটাসোটা থলে ধরে রেখে অন্য হাতে একটা ভাঙ্গা হাঁড়ির দড়ি লাগানো 'কাঁধা' বা গলা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে উর্ধ মুখে ছুড়ছে আর জিন্দাবাদ আওয়াজ দিচ্ছে। তার প্রতিটি লাফের সাথে থলে থেকে মুঠো মুঠো আটা লাফিয়ে উঠে আজব আলীর ঘাড়ে মাথায় পড়ছে আর সেদিকটা চুনকাম করে দিচ্ছে। আজব আলী ঝোঁকের মাথায় খেয়াল করতে না পারলেও, উমিদ আলী এ দৃশ্য দেখে হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

ঘটনাটা আগাগোড়াই হাস্যোদ্দীপক। আজব আলীর হাতের ঐ দড়ি লাগানো ভাংগা হাড়ির অংশ বা গলা কোন মামুলী হাঁড়ির গলা নয়। ফৌজদার আবদুল আজিজের সংসারে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত এটি একটি ঘৃত ভাণ্ডের সদ্য ভাঙ্গা উপরিভাগ। ধরার সুবিধার জন্যে দুধের ভাঁড়ের মতো করে এই ঘৃতভাণ্ডের গলায় দড়ি লাগানো ছিল। বাজার থেকে থলে ভর্তি আটা

আর ভাঁড় ভর্তি ঘি কিনে নিয়ে আজব আলী হন হন করে বাসায় ফিরে আসছিল। ফিরতে অনেক দেরী হওয়ায়, তার হাঁটার গতি দ্রুত ছিল। কাঁধে তার আটার থলে আর হাতে ঝুলানো ঘৃতভাণ্ড। বাড়ীর কাছে এসে বাড়ীরই দেয়ালের সাথে ঝুলন্ত ভাণ্ডটি অকস্মাৎ বাড়ি খেয়ে ভেঙ্গে যায়। দড়ি বাঁধা গলাটা আজব আলীর হাতে থাকে আর ঘি ভর্তি বাদবাঁকী ভাণ্ডটা গোটাই মাটিতে থপ্ করে খসে পড়ে চুরমার হয়ে যায়। ঘিটুকু সবই ধূলোয় ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় আজব আলী "হায় হায়" করে উঠলে, ঠিক সেই সময় উমিদ আলী সেখানে এসে হাজির হয় এবং শোকাতুর আজব আলীকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করে। এ থেকেই এদের এই তত্ত্বালাপের জন্ম।

আবদুল আজিজ এসে আরো দেখলেন, ভান্ডের গলাটাকে ঝান্ডা বানিয়ে আজব আলী যেখানে দাঁড়িয়ে জিন্দাবাদ আওয়াজ দিচ্ছে তার এক পাশেই ভান্ডটা কয়েকটুকরো হয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে আর পথের ধূলোয় পড়ে আছে থাবা থাবা ঘি।

আবদুল আজিজকে দেখেই 'ওরে বাপরে!' বলে আঁতকে উঠে আজব আলী তার হাতে ধরা দড়ি সহ ভান্ডের ভাঙ্গা গলাটা তৎক্ষণাৎ ছুড়ে দিলো এবং সন্ত্রস্তভাবে ফটক পেরিয়ে মকানের মধ্যে ঢুকে পড়লো। উমিদ আলীকে হো হো করে হাসতে দেখে আবদুল আজিজ তাকে প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি উমিদ আলী ?

ঢেলে পড়া ঘি এর দিকে ইংগিত করে উমিদ আলী হাসতে হাসতে বললো—কোনটা ? ঐটা ?

আবদুল আজিজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—না। ওটাতো মোটামুটি বুঝতেই পারছি। কিন্তু তুমি এখানে হঠাৎ এলেই বা কখন আর ঐ বেয়াকুফটাকে ইতিহাস সচেতন করার কাজে এমন কোমর বেঁধে লেগেছোই বা কেন ?

উমিদ আলী মুখের হাসি খাটো করে বললো—কি করবো ? তোমরা তো অধিক বুদ্ধিমান। ইতিহাসের জ্ঞান তোমাদের দরকার নেই বা তোমরা তা নেবেও না। সে বিষয়ে এদের আগ্রহ অনেক তাজা। এদের মাথা মগজও তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার।

ঃ বটে ! তা ঐ পরিষ্কার মগজের তালাশেই বুঝি এই সকাল বেলা—

ঃ জিনা। এসেছি তোমার কাছেই। খাস্তা খবর আছে।

ঃ খাস্তা খবর !

ঃ তোমাদের ঐ ইতিহাস-বিমুখতার বৃক্ষে বড়ই সুস্বাদু ফল ধরেছে। আমি সেই খবর নিয়ে এসেছি।

ঃ সেই খবর মানে ?

ঃ মানে তোমাদের বেআক্কেলীর উম্দা খবর। ঐ ইতিহাস সচেতন না হওয়ার জমজমাট খিস্তির খবর। মানে তোমাদের ঐ —

উমিদ আলী উষ্ণ হয়ে উঠলো। উমিদ আলীর বক্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করে আবদুল আজিজ আর তাকে কোন প্রশ্ন করলেন না। তিনি উমিদ আলীকে টেনে নিয়ে সরাসরি দহলীজে চলে এলেন এবং সেখানে এসে উভয়ে মুখোমুখী বসলেন।

'খাস মকানের' উমিদ আলী প্রায় জনের জানা আদমী। অদ্ভুত এক মানুষ। ডানা পাখা না থাকলেও আসমান-জমিন সর্বত্রই অবাধ তার বিচরণ। সব বলয়ের সব খবর তার জানা। সরকারী-বেসরকারী, ইহলৌকিক-পারত্রিক, জাহিরী-বাতেনী—যে খবরই হোক, তাকে প্রশ্ন করলেই সে প্রত্যয়ের সাথে জবাব দেবে গড় গড় করে। না-জানার কোন জড়তাই তার মধ্যে কেউ দেখবে না। অচেনাদের কথাই নেই, চেনারাও অনেক সময় ভিমরি খেয়ে ভাবে, আসলেই লোকটা বোধ হয় সর্বদর্শী সব-জান্তা। কোন গায়েবী শক্তির ভর আছে তার উপর। জ্বিনের আছর আছে।

এমন ভাবার আর একটা কারণ আছে। অনেকদিন আগে একবার উমিদ আলীর মাথায় কিছু গোলমাল দেখা দেয়। গোলমালটা কিছুদিন পর সেরে গেছে। কিন্তু খারাবীতে ভালাই প্রাপ্তির মতো এর ফলে উমিদ আলীর জ্ঞান আরো বেড়ে গেছে। তার অন্তরদৃষ্টি খুলে গেছে। মেলে গেছে উমিদ আলীর হৃদয়ের আয়তন। সে এখন স্বার্থজ্ঞানহীন এক আত্মভোলা মানুষ।

উমিদ আলীর জবাবগুলো তামামই যে ঠিক, তা নয়। কিন্তু তার বলার ভঙ্গি এমন যে, বেঠিক বলে তৎক্ষণাৎ তা ঠাহর করা দুষ্কর। বয়সে সে তরুণ, আচরণে অমায়িক, আদবে ধোপদুরস্ত। বড়দের সামনে সে একদম চুপচাপ। হাঁ ছাড়া না শব্দ তার মুখে নেই। হাসি ছাড়া না খোশের অভিব্যক্তি তার মধ্যে বিরল।

হুগলীর মালিক, মালিক জিন্দি বা জিন্দা মালিক। তিনিই হুগলীর প্রশাসক। এই প্রশাসকের মকানই 'খাস মকান' নামে পরিচিত। উমিদ আলী এই জিন্দা মালিকের রিস্তেদার। সম্পর্কে মামাতো ভাই। সেও একজন ফৌজি লোক। কিন্তু প্রশাসক জিন্দা মালিকের বেগম সাহেবা ময়দানের বদলে উমিদ আলীকে মহলের মধ্যেই অহর্নিশ আবদ্ধ করে রেখেছেন। আদেশ ফরমায়েশ খাটার ও গৃহকর্ম করার এমন বিশ্বস্ত নওকর উনি হাত ছাড়া করতে রাজী নন। উমিদ আলীরও সব কিছুতেই "ওভি-আচ্ছা"। কোন কিছুতেই উমিদ আলী

না-উম্মিদ নয় বা কোন কিছুই তার কাছে না-খোশের বিষয় নয়। একমাত্র দেশ আর জাতির স্বার্থের হেরফেরটাই সে হজম করতে পারে না। এখানে সে আপোষহীন। নইলে, অন্যত্র সবদিকেই সে আত্মভোলা। আর এ কারণেই বেগম সাহেবার মনোবাঞ্ছা নির্বিবাদেই পরিপূর্ণ হয়েছে। আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী ফৌজে ঢোকেন একসাথে। কিন্তু বেগম সাহেবার হস্তক্ষেপে উমিদ আলী আজও সেরেফ একজন সেপাই। তার কোন পদোন্নতি হয়নি। উমিদ আলী যে খোদ জিন্দামালিকের রিস্তেদার—অনেকখানি নিকট আত্মীয়—হুগলী এলাকার প্রায় লোকই তা জানে না। সবাই জানে, উমিদ আলী খাস মকানের নওকর।

উমিদ আলীকে দহলীজে এনে শান্তভাবে বসানোর পর আবদুল আজিজ প্রশ্ন করলেন—কি ঘটনা দোস্ত ? কি খবর এনেছো ?

জবাবে উমিদ আলী বললো—খবরটাতো বলতেই আমাকে দিচ্ছো না। খবর হলো, তোমাদের তথাকথিত বন্ধুরা, মানে প্রিয়জনেরা গতরাতে বেশ খানিক বানিয়েছে।

ঃ আমাদের বন্ধুরা মানে ?

ঃ ইংরেজ বণিকেরা। বিশেষ করে এই হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়ালরা। তারা বেশ ভাল বানানো বানিয়েছে।

ঃ বানিয়েছে !

ঃ ধুনেছে। মানে দস্তুরমতো পিটেছে।

ঃ কাদের ? ওলন্দাজদের ?

ঃ আরে দূর ! ওলন্দাজরা শক্ত মরদ। ওদেরই কীল খেয়ে ইংরেজদের পিঠ-পাঁজর আজও ফুলে আছে। তিন তিনবার ওলন্দাজেরা ইংরেজদের ধুনেছে। ওরা পিটবে ওলন্দাজদের ?

ঃ তাহলে ? কাদের পিটেছে ইংরেজরা ?

ঃ তোমাদের পিটেছে।

ঃ উমিদ আলী।

ঃ তোমাদের শুল্ক আদায়কারীদের ধরে ওরা আচ্ছামতো কিলিয়েছে।

আবদুল আজিজ বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—তার মানে ?

ঃ মানে, ওরা পানি নেড়ে জোঁকের পরিমাণ দেখছে। এরপর তোমাদের পিঠেও কীল ফেলবে।

আবদুল আজিজ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—আহ্ ! কি বাজে বকছো ?

ঃ বাজে হলে আর আমি কি করবো বলো ? সবই নসীবের লিখন। বসার জায়গা দিয়েছো, এখন শোয়ার জায়গা করে নেবে না বন্ধুরা ?

ঃ তাজ্জব ! তো ঘটেছে কি ?

ঃ নয়া কিছুই নয়। সবই ঐ সাবেক কেচ্ছা ঃ 'কর শুল্ক কিছুই দেবো না—বাণিজ্য করবো—হিম্মত থাকলে ঠেকাও'। এতদিন মুখে বলেছে, আজ কীল ফেলেছে।

আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে বললেন—বলো কি ! এতদূর ?

ঃ কি এতদূর ?

ঃ ওরা আমাদের গায়ে হাত তুললো ? মানে এতটাও কি—

উমিদ আলী বিরক্তির সাথে বললো—দেখো দোস্ত, এই খামাখা তাজ্জব হওয়ার ভান করলেই মেজাজটা আমি ধরে রাখতে পারিনে। গায়ে হাত তোলা কেন, ওরা যে মাথায় একদিন লাথি মারবে, এটাকে কি আর অসম্ভব বলে ভাবার কোন কারণ আছে ?

ঃ উমিদ আলী !

ঃ ইংরেজরা কর-শুল্ক কিছুই না দিয়ে বাণিজ্য করবে, এটাতো কোন নয়া ঘটনা নয় ? অনেক আগে থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে আছে।

ঃ কর-শুল্ক না দিয়ে ?

ঃ ওরাও দেবে না, তোমরাও নেবে না। খামাখা ঐ আদায়কারীদের এইভাবে—

ঃ আমরাও নেবো না মানে ?

ঃ আবার ঐ মেজাজের প্রশ্ন দোস্ত ? থাক, এসব অপ্রিয় প্রসঙ্গ—

ঃ না, থাকবে কেন ? কি বলতে চাও, তা বলো। কথা যখন তুলেছো, তখন শেষ করো।

ঃ বলবো কি ? নিতে তোমরা পেরেছো তা কোনদিন ? কর-শুল্ক কিস্তি মতো ওরা কোনদিন দিয়েছে ? না তোমরা তা আদায় করতে পেরেছো ? ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, দিনেমার—তামাম বণিকেরা বছর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই নির্ধারিত বার্ষিক কর তো দিচ্ছেই সেই সাথে পণ্যের উপর হিসাব মতো শুল্কটাও নিজ গরজে পরিশোধ করে যাচ্ছে। ওদের কারো কাছে একটা পয়সা পাওনা নেই। আর এই ইংরেজেরা ? এই ইংরেজ কুঠিয়ালরা শুল্ক তো একটা পয়সাও দেয়নি, বার্ষিক তিন হাজার টাকা মূল খাজনাটাও ওদের যুগ যুগ ধরে বাঁকী ! এরপরও কথা বলো ?

আবদুল আজিজ ঠেকে গেলেন। কথা বিলকুল সত্যি। তিনি নরম কণ্ঠে বললেন—খবরতো সব ঠিকই রেখেছো দোস্ত ! খাস মকানের লোক কি না! চোখের সামনের ঘটনা। তবে একটা জিনিস তুমি কিন্তু বুঝতে পারছো না

ইয়ার। গোটা একটা প্রশাসনের ঝামেলার মধ্যে এই বাঁকী বকেয়ার ঘটনাটা এমন কিছু মারাত্মক বিষয় নয়। নিতান্তই মামুলী ব্যাপার।

উমিদ আলী ফুঁশে উঠলো। বললো—মামুলী ব্যাপার ! একটা কড়ি বাঁকী রেখে অন্যকোন বণিকেরাই এদেশে একটা হপ্তা ব্যবসা করতে পারে না। আর এই ইংরেজরা হপ্তা-মাস-বছর নয়, এক যুগেরও অধিক কাল কোন কর-শুল্ক না দিয়ে পার পেয়ে যায় কিভাবে ? বলো ইয়ার, এই ইংরেজেরা কি এমন মায়ের পেটের ভাই আমাদের যে, অন্যদের থেকে এদের আলাদাভাবে সুযোগ-সুবিধে দিতে হবে ? এদেশে বাণিজ্য করবে, এদেশের সম্পদ লুটবে, লাখ লাখ টাকা মুনাফা কামাবে, অথচ এদেশের সরকারকে এরা কর হিসাবে একটা পয়সাও দেবে না, এত সাহস কোথেকে এদের আসে ?

ঃ না মানে, ওরা দেবে না, তা বলছে নাতো। তবে—

ঃ তবে সম্রাটের কাছে এক কথা, নবাবের কাছে আর এক কথা এবং শুল্ক দপ্তরে গিয়ে তৃতীয় কথা বলে "দিবো দিচ্ছি"র খেল খেলছে।

ঃ হ্যাঁ ব্যাপার অবশ্য কতকটা ঐ রকমই দাঁড়িয়েছে।

ঃ তবু তোমরা বুঝে আছো, এরা তোমাদের বন্ধুপ্রতিম বিশ্বস্ত জীব ?

আবদুল আজিজ হেসে বললেন—এ প্রশ্ন আমাকে কেন করছো ইয়ার ? তোমার ভাই অর্থাৎ আমাদের প্রশাসক বাহাদুরকে করলেই তো অনেকটা কাজ হতো।

ঃ ওরে বাপ্‌রে ! সে মওকা কি আছে ? বলার তো আসল জায়গা প্রশাসকও নয়, নবাবও নয়, একদম সম্রাট। কিন্তু প্রশাসক, নবাব আর সম্রাট—সবাই এরা এত উপরে থাকেন যে, আমার মতো একটা সেপাইয়ের কথা তাঁদের কানে পৌছার কোন মওকাই নেই।

ঃ আচ্ছা।

ঃ দীলের বোঝাটা হালকা করার জন্যই তোমাকে আমার বলা দোস্ত। আর তাছাড়া, প্রশাসনের তুমিও একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। একটা লোককেও যদি হুঁশে আনতে পারি, তার ফায়দাই বা কম কি ?

ঃ হুঁশে আনতে পারি মানে ?

ঃ মানে বেহুঁশকে যদি হুঁশে আনতে পারি।

ঃ আমি বেহুঁশ ?

ঃ সেরেফ তুমি কেন ? আমি তো দেখছি, এই প্রশাসনের উপরতলার প্রায় সবাই তোমরা বেহুঁশ।

ঃ বটে ?

ঃ এ দেশে বাণিজ্য করতে আসার পয়লা দিন থেকেই যারা আজ পর্যন্ত সমানে জালিয়াতির খেল খেলছে, যাদের মুখের কথার কানাকড়ি মূল্য নেই, তারা যে কি সাংঘাতিক জীব, তা আজও তোমরা অনুমান করতে পারলে না ? প্রশাসনের সবাই তোমরা এই ইল্লতদের আজও কোলে করেই রাখলে ?

ঃ উমিদ আলী !

ঃ যারা অসৎ আর প্রতারক তারা যে কোন সময় যেকোন ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এটা কোন আচানক কথা নয়। সেই ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সে নজীর দু'একটি নয়। অসংখ্য হয়ে সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এরপরও হুঁশ ফিরে না যাদের, ইতিহাসের কথা বললে তারাই ঠাট্টা করে আর সব জেনে শুনেও অবাক হবার ভান করে।

উমিদ আলী মুখ ঘুরিয়ে নিলো। এর কোন বলিষ্ঠ জবাব আবদুল আজিজের ছিল না। কারণ, আবদুল আজিজ নিজে না হলেও, তাঁর উপরওয়ালারা সবাই যে এ ব্যাপারে উদাসীন, এই ইংরেজ কুঠিয়ালদের নিয়ন্ত্রণে আনতে যে সবাই তাঁরা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন—এটা এক বর্ণ মিথ্যা নয়। তাই আবদুল আজিজ আমতা আমতা করে বললেন—কথাটা তোমার অযৌক্তিক না হলেও, এখানে সঠিক কার কি করার ছিল, বলো ?

ঃ করার ছিল মানে ? তালুই তালুই না করে শুরুতেই যদি ঘাড়ে ওদের ডাণ্ডা হাঁকাতে শক্ত করে, ওদের ঐ শয়তানীর ভূৎ তখনই বাপ-বাপ করে ছুটে পালাতো। এরপর হয় ওরা পাওনা গোণ্ডা গুণে দিয়ে তেজারতি করতো, নয় লেজ খাপ করে ঘরে ফিরে চলে যেতো। এতো দুঃসাহস ওদের হতো না।

ঃ উমিদ আলী !

ঃ এখনও সময় আছে দোস্ত। শক্ত 'ছেঁকা' দিয়ে হয় ঐ আপদটাকে পোষ মানাও, নয় একদম লাথি মেরে গোহাল থেকে বের করে দাও। দুষ্ট এঁড়ের চেয়ে শূন্য গোহাল অনেক ভাল।

নীরব হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবদুল আজিজ নিশ্চিত কণ্ঠে বললেন—করতে কিছু পারি আর না পারি দোস্ত, আমি যে তোমার এই অনুভূতির একজন শক্ত সমর্থক, তা তোমাকে জানিয়ে রাখছি। এ নিয়ে কোন দ্বিধা আমার থাকবে না।

ঃ ইয়ার !

ঃ এবার ঘটনাটা খুলে বলো। কি নিয়ে আর কোথায় ঘটলো ঘটনাটা ?

ঃ ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘাটের কিঞ্চিৎ ভাটিতে—মানে-আমাদের ঐ শুল্কঘাঁটিতে। তুমি তো জানোই, বকেয়া কর শোধ না করে একটা নৌকা

মালও এই হুগলীর কুঠিয়ালরা দেশের বাইরে নেবে না—নবাবের কাছে এই মর্মে ওয়াদা করে এসেছে ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাতো জানিই।

ঃ ওদের ওয়াদা যে কচু পাতার পানির চেয়েও মিথ্যা, এইটেই প্রমাণ করেছে এই হুগলীর কুঠিয়াল জন বায়্যাম। রাতের অন্ধকারে জন বায়্যাম মালভর্তি বিশাল এক নৌবহর আমাদের ঐ শুল্কঘাঁটি দিয়ে গতরাতে বালাশোরের দিকে গোপনে পাচার করার চেষ্টা করে। টের পেয়ে আমাদের শুল্ক আদায়কারীরা ছাড়পত্র তলব করলে, তারা কিছুই দেখাতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আদায়কারীরা প্রাপ্য 'কর' দাবী করে। বেনিয়ারা তখন তাদের ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়ে এই অঘটন ঘটায়।

ঃ এই অঘটন মানে ?

ঃ আদায়কারীদের সংখ্যায় অল্প দেখে আর রাত্রির নির্জনতা পেয়ে, বদমায়েশ বায়্যাম তার লোকজনদের বল প্রয়োগের হুকুম দেয়। এতে করে ঐ বহরের তামাম ইংরেজ কর্মচারী এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদায়কারীর উপর চড়াও হয়ে তাদের এমন মারাত্মকভাবে প্রহার করেছে যে, দুইতিনজনের বাঁচার আশা খুবই কম।

ঃ বলো কি ! তারপর ?

ঃ তারপর তারা মাল বোঝাই নৌবহর আবার পাচার করে নিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু আমাদের টহলদারেরা টের পেয়ে প্রশাসককে খবর দিলে তাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

ঃ কি রকম ?

ঃ খবর পেয়েই আমাদের প্রশাসক জিন্দামালিক ভাই সাহেব তৎক্ষণাৎ ফৌজদার মির্জা মালিক আর আবদুল কাদের সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে যান এবং বদমায়েশদের ঘেরাও করে কয়েকজনকে কয়েদ করেন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ জন ব্যায়াম আর অন্যান্য বণিকেরা বিপদ দেখে তখনই পালিয়ে গেছে। আমাদের হুজুরেরা ওদের মালামাল আটক করার পর কয়েদীদের টেনে নিয়ে এই সকালের দিকে ফিরেছেন।

ঃ বলো কি !

ঃ ঐ জন বায়্যামের তালাশে ফৌজদার মির্জা মালিক সাহেব ফিরে এসেই আবার তখনই সসৈন্যে ওদের কুঠির দিকে গেছেন।

আবদুল আজিজ বেগ এবার ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—কি তাজ্জব কথা দোস্ত ! এতকাণ্ড এই রাতের মধ্যে ঘটে গেল আর আমি কিছুই টের পেলাম না বা কিছুই জানতে পারলাম না ?

ঃ পারতে। তুমি ছুটিতে না থাকলে আর ফৌজদার মির্জা মালিক ও আবদুল কাদের সাহেবকে হাতের কাছে পাওয়া না গেলে, অবশ্যই তোমার ডাক পড়তো।

ঃ আচ্ছা ! তো এই ঘটনা ? তাই তো নদীর চলমান নৌকাগুলো তখন অকস্মাৎ চমকে উঠে তীরে ফিরে এসেছিল। নিশ্চয়ই এই গোলমালের খবরই তাহলে মাঝিরা তখন পেয়েছিল !

ঃ তাহলে তাই-হবে।

ঃ এখন বলো দোস্ত, আমার প্রতি কি হুজুরের কোন হুকুম আছে ?

ঃ হুকুম কিছু নেই। তবে প্রশাসক সাহেব আমাকে বললেন—আবদুল আজিজকে খবরটা জানাও। খুব অসুবিধা না থাকলে, সে এসে ঘটনাটা জেনে যাক। আজ বাদ জোহর কয়েদীদের বিচার হবে। সেই সময় উপস্থিত হলে সে সবকিছু জানতে পারবে। এসব বিষয় তার জানা থাকা ভাল।

ঃ তাই নাকি ? আচ্ছা-আচ্ছা !

ঃ তেমন অসুবিধা না থাকলে বাদ জোহর চলে এসো। দোস্ত্—

ঃ অবশ্যই-অবশ্যই। তা আর বলতে !

উমিদ আলী এবার উঠতে উঠতে বললো—অনেক দেরী হয়ে গেল। আর আমার বসে থাকা ঠিক নয়।

আবদুল আজিজও উটে দাঁড়িয়ে বললেন—এক্ষুণি যাবে ?

ঃ হ্যাঁ, যাই। যেকোন সময় বড় হুজুরের তলব পড়তে পারে। তুমি অবশ্যই আসবে কিন্তু। এসব ব্যাপার ছাড়াও তোমার ওখানে হাজির হওয়ার আরো কিছু জরুরত আছে।

বুঝতে না পেরে আবদুল আজিজ বললেন—আরো কিছু জরুরত !

উমিদ আলী ঈষৎ হেসে বললেন—আগে এসোইনা ওখানে। এলেই বুঝতে পারবে।

ঃ দোস্ত্ !

ঐ একইভাবে হেসে উমিদ আলী ফের বললেন—আরে ইয়ার ! এ জিন্দেগীর দায় কি স্রেফ একটা ? এটা যে একাধিক !

২

জোহরের জামাত শেষ হলো। মসজিদ থেকে ফিরে এসে তরুণ ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ তৈয়ার হতে লাগলেন। খাস মকানে যাবেন তিনি। বাদ জোহর সেখানে বন্দী কুঠিয়ালদের বিচার হবে। আবদুল আজিজের সেখানে হাজির থাকার আদেশ আছে। আদেশ দিয়েছেন হুগলীর প্রশাসক জিন্দা মালিক। হাজির থাকার আরো কি এক জরুরত আছে বলে উমিদ আলী ইংগিত দিয়ে গেছে। প্রথমটা প্রধান জরুরত। সেটা উপরওয়ালার হুকুম। দ্বিতীয়টি কেবলই এক ইংগিত। অর্থ তার অস্পষ্ট। আবদুল আজিজের মগজে এই অস্পষ্ট অর্থটা কেবলই জট পাকাতে লাগলো।

তৈয়ার হয়ে বেরুতেই দরজার কাছে ছুটে এলো শিরিবানু। সে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—ছোট সাহেব-ছোট সাহেব, বলাই হয়নি আপনাকে। একটা খবর ছিল। খুবই ভাল খবর—

শিরিবানু উৎসাহ ভরে এসেছিল। আবদুল আজিজকে ফৌজি লেবাসে বেরুতে দেখে সে অনেকটা চুপসে গেল। সে নিস্তেজ কণ্ঠে বললো—কি ব্যাপার ! আজ না ছোট সাহেবের ছুটি !

আবদুল আজিজ আপন খেয়ালে ছিলেন। শিরিবানুকে অনুধাবন করতে না পেরে তিনি বিস্মিত নেত্রে নিমেষখানেক তার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু শিরিবানু আর কোন কথা না বলায় আবদুল আজিজ নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এরপর সামনের দিকে এগুতেই শিরিবানু স্বগতোক্তি করলো—কখন ফিরবেন, কি খাবেন, মেহমান কেউ থাকবে কি না—এসব কথা জেনে নেয়ার লোকও কেউ নেই, বলেও কিছু যাবেন না। এখন মরণ হয়েছে আমার। চাকর-নফর রেখে আম্মাজানও আমাকেই এসব কথা জিজ্ঞেস্ করবেন। আমি তার কি উত্তর দিবো ?

আবদুল আজিজ দাঁড়িয়ে গিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন—ফিরবো রাতে, খাবো হাওয়া, মেহমান আজ আজব আলী। ইচ্ছে করলে শিরিবানুও পাশে দাঁড়িয়ে দেদারছে হাওয়া গিলতে পারেন।

শিরিবানু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো—ছোট সাহেবের সব কিছুতেই ঠাট্টা। কোন কিছুই গায়ে লাগাতে চান না। ফিরে এসে আবার তম্বি শুরু না করলেই হলো।

আবদুল আজিজ বেগ এবার সত্যি সত্যিই ঠাট্টা শুরু করলেন। শিরিবানুকে রাগানোর জন্যে বললেন—সালুন ভাল না হলে তম্বি তো শুরু হবেই।

ঃ সালুন !

ঃ লোকে বলে, "কথায়ে কথা কয়, সালুনে খানা খায়"। সেই সালুনটাই যে পাকাতে শেখেনি, তার আবার এত খবরে গরজ কি ?

ঃ তা আমি কি করবো ? সবাই যে আমার কাছেই খবর জানতে আসে। কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন, অন্য মানুষতো করবেই, আজব ভাই—গাজী চাচা এরাও ঘুরে ফিরে আমাকেই কেবল জিজ্ঞাসা করবে।

ঃ কোথায় যাবো, কখন ফিরবো—সবই চাচী আম্মা আর গাজী মিয়াকে বলা আছে। শিরিবানুর তা নিয়ে পেরেশান হয়ে কাজ নেই।

ঃ আমার কি ? কেউ আমাকে সওয়াল করতে না এলেই হলো।

ঃ সওয়াল করলে এক জবাব—গেছেন খাস মকানে, ফিরবেন বাদমাগরিব—ব্যস্ !

আবদুল আজিজ অগ্রসর হলেন। শিরিবানু এ কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠে দ্রুতপদে সামনে এগিয়ে এলো এবং খোশদীলে বললো—আপনি খাস মকানে যাচ্ছেন ছোট সাহেব ? তা সে কথা বলবেন তো ?

আবদুল আজিজ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—তার মানে ! খাস মকানে গেলে তোমাকে বলে যেতে হবে মানে ?

ঃ মানে আমি যে ঐ কথাই বলতে এসেছিলাম।

ঃ কোন কথা ?

ঃ ঐ খাস মকানে যাওয়ার কথা।

ঃ খাস মকানে যাওয়ার কথা !

আবদুল আজিজের ললাটে কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। অন্য পাশে মুখ নিয়ে শিরিবানু হাসি মুখে বললো—গতকাল যে রওশন আপা এসেছিলেন। শাম তক্ ছিলেন।

আবদুল আজিজ এবার যারপর নেই বিস্মিত হলেন। পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—রওশন আপা !

জমিনের দিকে নজর রেখে শিরিবানু পুনরায় হাসি মুখে বললো—খাস মকানের রওশন আরা আপা।

ঃ বলো কি ! তিনি কখন এসেছিলেন ?

ঃ এসেছিলেন তো সেই বাদ আছর। মাগরিব তক্ থেকে গেলেন। তবু আপনি ফিরলেন না। তাই হতাশ হয়ে চলে গেলেন।

ঃ সে কি ! তা কি জন্যে উনি এসেছিলেন ?

ঃ আমি কি করে বলবো ? উনি এসে আপনাকেই তালাশ করলেন। না পেয়ে অপেক্ষা করলেন। শেষমেশ আপনাকে খাস মকানে যাওয়ার কথা বলতে বলে শাম ওয়াক্তে চলে গেলেন।

ঃ কই, সে কথাতো বলোনি ?

ঃ বলবো কখন ছোট সাহেব ? ফিরলেন সেই কোন রাতে তাতো জানিইনে। সকালে সামনে যেতেই তাড়া করলেন। পিঠের ছাল তুলে নিতে চাইলেন। বলি কখন ?

ঃ কেন-কেন ? তারপর এই এতবড় একটা দিন যাচ্ছে—

ঃ সবসময় তা মনে থাকলে তো ?

ঃ মনে থাকলো না ?

ঃ কই থাকলো। যখন বলার মওকা থাকলো তখন মনে থাকলো না, যখন মনে থাকলো তখন বলার মওকা পেলাম না। সবসময় তো আর ছোট সাহেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না ?

ঃ কি রকম ?

ঃ খোজ করলেই কি সবসময় সাহেবকে অন্দর মহলে পাওয়া যায় ? কখন দহলীজে, কখন বাইরে, হদিস করবো কি করে ?

আবদুল আজিজ ভ্রূকুটি করে বললেন—হদিস করবো কি করে ? আলতু ফালতু হাজার ঝামেলা নিয়ে এসে হরওয়াক্ত জ্বালিয়ে মারতে পারছো, আর এই খবরটা দেয়ার ফাঁক পেলে না ?

আঁড়চোখে চেয়ে শিরিবানু বললো—তো কি হয়েছে ছোট সাহেব ? এমন তো কত খবরই দেয়া হয় না ! কত লোক এসে কত কথা বলে যায়। সব কথাই কি সবসময় জানানো আপনাকে সম্ভব হয় ? না, জানাতে কেউ পারে তা ?

ঃ না পারে জাহান্নামে যাক। কত লোক আর রওশন বেগম এক কথা হলো ?

ঃ হলো না ?

ঃ ওরে নাদান, রওশন আরা বেগম খোদ এই হুগলীর ওয়ালীর (প্রশাসক) আত্মীয়া। তাঁর বেগম সাহেবার আপন বহিন। তাঁর কথা আর অন্যের কথা এক ?

ঃ এক নয় কেন ছোট সাহেব ? খোদ নবাব শায়েস্তা খান সাহেবের আওলাদ ইরাদাত খান হুজুর সেদিন এসে ঘুরে গেলেন তা আপনাকে জানানোই হলো না, পরে আপনি বাইরে গিয়ে তা জানলেন। ওটা যদি চলে এটা চলবে না কেন ?

ঃ শিরিবানু !

ঃ হুগলীর প্রশাসক সাহেবের শ্যালিকা কি খোদ বাংলার নবাবজাদার চেয়েও অধিক মূল্যবান ?

বেঘোরে পড়ে আবদুল আজিজ গরম হয়ে উঠলেন। তিনি ধমক দিয়ে বললেন—থামো ! তোমার সে ব্যাখ্যায় কাজ নেই। আর কি বলে গেছেন, তাই বলো।

ঃ কে ? ঐ রওশন আরা আপা ?

ঃ জি হাঁ। উনি আর কিছু বলেন নি ? মানে বলে যাননি ?

ঃ জি-জি, অনেক কথা বলেছেন।

আবদুল আজিজ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন—অনেক কথা ? কি কথা বলেছেন ?

ঃ বলেছেন, তোমার মুনিব এই নয়া ফৌজদার সাহেব বহুত বাহাদুর আদমী—এলেমদার ইনসান—পণ্ডিত লোক। তাঁর বাত বহুত মিঠা, সুরাত বহুত উমদা। এই ইনসানের খেদমতের যেন কোন গাফিলতি তোমরা করো না। কোনভাবেই যেন এই ইনসানের তকলিফ কিছু তোমাদের হাতে না হয়।

শিরিবানু ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। আবদুল আজিজ সপুত্রকে বললেন—আচ্ছা !

ঃ উনি এসে কখনো কোন ঘাট্‌তি-গল্‌তি দেখলে আমাদের মা-বেটি দুইজনেরই নকরী উনি তখনই খেয়ে নেবেন বলে হুমকি দিয়েও গেছেন।

আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে বললেন—নকরী !

ঃ আমার আর আমার আম্মার নকরী। এ মকানে নকরী আর আমাদের থাকবে না, বলেছেন।

আবদুল আজিজের দুই চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠলো। তিনি সগর্জনে বললেন—চোপ রও। এক থাপ্‌পড়ে সব ক'টি দাঁত ফেলে দেবো বেয়াদব ! তোমরা নকরী করো এখানে ?

ঃ তা-মানে—

ঃ নিজে তুমি বাঁদীর বাঁদী হওগে। চাচী আম্মা কি এই মকানের বাঁদী ? ফের বেয়াদবী করলে—

চড় মারার ভঙ্গিতে আবদুল আজিজ ডান হাত টান করলেন। শিরিবানু প্রতিবাদ করে বললো—আরে-আরে ! তা আমার কি কসুর ! আমি কি তাই বলছি ? উনি এসে এই রকমই ভেবে গেলেন, সেই কথা বলছি।

আবদুল আজিজ খামুশ হলেন। একটু পরে নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন-হুঁউ—

ঃ উনি আপনাকে খুব পেয়ার করেন, তাই না ছোট সাহেব ?

আবদুল আজিজ অন্য মনোস্কভাবে বললেন—কে ?

ঃ ঐ রওশন আপা ! দেখলাম, আপনার উপর উনার খুবই দরদ।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ চেহারাও উনার খুব মিষ্টি ছোট সাহেব ! রওশন আপাকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন পূর্ণিমার—মানে এ মকানে যতক্ষণ উনি ছিলেন, মকানটা ততক্ষণ খুব উজালা হয়েছিল। চারদিক রোশনাই।

: বটে !

: সবসময় উনি এ মকানে থাকলে, মকানটা যা মানাতো ছোট সাহেব ! মানে ঘর আপানার—

আবদুল আজিজ তেড়ে এলেন। দাঁত পিষে বললেন—তবেরে হতচ্ছারী ! এই শয়তানীটা করার জন্যেই তুমি এসে পাঁয়তারা জুড়ে দিয়েছো ? পাজী কাঁহাকার ! ভাগ শিগ্গির-ভাগ্—

শিরিবানু তৎক্ষণাৎ দৌড় দিয়ে পালালো। দৌড়ের উপর থেকেই সে উচ্চ কণ্ঠে বললো—আপার সাথে অবশ্যই মোলাকাত করবেন কিন্তু। আমাকে বিশেষ করে বলে গেছেন।

পরের ধন ঘরে এনে নিজের ভাণ্ডার ভরে তোলাই অধিক লোকের অকৃত্রিম অভ্যাস। নিজের ঘরের কণামাত্র পরের ঘরে যাক, জান থাকতে নয়। এটি কভ্ভি নেহি হো সাক্তা। কারণ এ যুক্তি কুযুক্তি। এতে নিজের ভাণ্ডার বিপন্ন হয়।

একমাত্র ঈমানদার আর আল্লাহ প্রেমিক লোক ছাড়া বাদবাঁকীদের এই হলো চিন্তা স্বভাব। এই তাদের খাসিলত ও মানসিকতা। তাদের কাছে সব কিছুই ফুরন্ত, অফুরন্ত শুধু পরের ধন আর নিজের হায়াত এ দু'টি ফুরাবার নয়। বেঈমান নাস্তিকদের পরকাল নেই, পাপ পুণ্যের বিচার নেই. ইহজীবনের বিনাশ নেই। প্রয়োজন তাদের অনন্ত, ওদিকে আবার পরের ধন অফুরন্ত। অতএব, যত পারো দুইহাতে ঘরে তোলো পরস্ব। "উও হালাল হ্যায়"। যথা সর্বস্ব লুটে নেয়ার পরও তাই বেঈমান নাস্তিকেরা কীল ফেলে বলবে—"বল ব্যাটা, আর কি আছে ? কোথায় রেখেছিস্ আরগুলো ? "কেউ বলবে—"দে-দে, বের করে দে। মরার পর কি গোরে নিয়ে যাবি ?" অধিকতর সদাশয়জন বলবে—"আমরা ছেড়ে দিলেও আর কয়দিনই বা বাঁচবে বাওয়া ? দে-দে, দীল খুছি করে দিয়ে দে।"

ওরা মরবে। এরা অমর। ওরা 'মর', তাই ধন ওদের নিষ্প্রয়োজন। এরা 'অমর' তাই এদের প্রয়োজন অপরিসীম। ক্ষুধাও এদের দুর্নিবার আর অভিনব। পেটের আর দেহের স্বাভাবিক ক্ষুধার অতিরিক্ত এদের ক্ষুধা আছে আরো একটা। সে ক্ষুধা চোখের ক্ষুধা। এটি বড় মারাত্মক। প্রথম দু'টি যদিও বা মেটে এই তৃতীয়টি মেটে না। তলাহীন ঝুড়ির মতো যত ঢালো ততই খালি। পূরণ কখনও হয় না। এ ক্ষুধা কখনোও পরিতৃপ্ত হবার নয়। লক্ষ পেলে কোটি চাই। কোটি পেলে পরার্ধ এবং তারপরও চাই-চাই। একটা কানা কড়ির কাঙ্গালও পাওয়ার সন্ধান পেলে তারও এত চাই যে, বিশ্বের সেরা ধনী হওয়ার

পরও তার অন্তরের গহিনে ডুব দিলে দেখা যাবে, "চাই চাই" আওয়াজটা ঘড়ির কাঁটার মতো টিক্ টিক্ করছে তখনও। ব্যক্তি, জাতি, দেশ—সবারই চাহিদার আকার প্রকার—রং বর্ণ ঐ এক। আল্লাহভীরুদের ব্যাপার ছাড়া, কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। কোন দেশ সম্পদশালী হওয়ার পরও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং নিত্য নূতন ঘাঁটি-বাজার তৈয়ার করে সে দেশের আরো সম্পদ সংগ্রহ করা চাই। শ্রেষ্ঠধনী হওয়ার পরও ধন চাই আরো।

ফলে, ধন আহরণের নামে পরস্ব হরণের প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সভ্যতা নামের প্রচণ্ড এই আত্মপ্রবঞ্চনা এ বিশ্বে নাজেল হওয়ার সাথে সাথেই। এতে করে ফলে ফুলে সুশোভিত কুঞ্জবন পঙ্গপালের আক্রমণে ছারখার হচ্ছে একদিকে, অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতির উপেক্ষিত অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অযোগ্য ভাগাড় ভূমি সম্পদে ও চাকচিক্যে ভাস্বর হচ্ছে দিন দিন। ফকির হচ্ছে বাদশাহ আর বিত্ত হারিয়ে দিন দিন বাদশাহ হচ্ছে ফকির। বাংলার নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহও ভুখানাঙ্গা পঙ্গপালের নজরে পড়ে একদিন, আর সেদিন থেকেই শুরু হয় এ মুলুকের শ্রীহীন হওয়ার পালা।

এই পালাবদলের চালচিত্র বড় করুণ। মসলিন পরিহিত বাংলার মানুষ যখন অতিশয় উন্নত, রুচিশীল ও সুসভ্য এক জাতি, তখন খাল-চামড়া, চট-কম্বল আর লোম-পশমে আবৃত শীতবিদ্ধ পাশ্চাত্যের এক একজন মানুষ এক একটা উল্লুকের প্রতিকৃতি তুলে ধরা ছাড়া, রুচি ও সৌখিনতার লেশমাত্র স্বাক্ষরও রাখতে আদৌ শেখেনি। অথচ কালক্রমে তাদেরই পাণ্ডুর মুখে চিক্নাই ধরতে শুরু করে আর দীন থেকে দীনাতিদীন হালতে রূপান্তরিত হতে থাকে বাংলা মুলুকের রুচিশীল ও বিত্তবান জনগোষ্ঠী।

স্মরণাতীত কাল থেকেই হিন্দুস্তান তথা বাংলা মুলুকের ধন-সম্পদের কাহিনী উপকথার আকারে নানা মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে। আরব, ইরাক, ইরান ও দূরপ্রাচ্যের বণিকদের বদৌলতে এদেশের সামগ্রী সেকালেই স্থল জল উভয় পথে এ বিশ্বের নানা দেশে পৌছে যায়। পৌছে যায় শৈত্যাহত পাশ্চাত্যের অনেক অনুর্বর, নিরন্ন ও ভূখা-নাঙ্গা দেশেও। এতে করে দুইচোখ ঝলসে যায় বন্ধ্যা মাটির শাক-পাতা আর মৎস্যভোজী আধা-জংলী জনতার। 'হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ' শোর পড়ে লোহা-লক্করের দোকান-সর্বস্ব অনাবাদী দেশ ভূইয়ে।

ছুটে বেরোয় "ভূখা-হুঁ"রা। খুঁজতে থাকে লঙ্গরখানা। খুঁজতে থাকে খাদ্যবস্ত্র ও ধন-সম্পদের আস্তানা। সীমাহীন সাগরের দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধাও তাদের আটকে রাখতে পারে না। জানবাজী রেখে তারা সওয়ার হয় ঢেউয়ের পিঠে। ছুটতে থাকে এলোপাতাড়ি। তালকানা হয়ে পয়লা পয়লা এক একজন ছিটকে যায় এক একদিকে। হিন্দুস্তানের বদলে কলম্বস পথ হারিয়ে হাজির

হয় আমেরিকায়। কেউবা শুধুই ঘোরপাক খায় অতলান্তিকের আবর্তে। অবশেষে কামিয়াব হয় পর্তুগীজ নৌ-সওয়ারী ভাস্কো-ডা-গামা। ঈসায়ী ১৪৯৮ সনে ভাস্কো-ডা-গামা ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যায় হিন্দুস্তানে, হাজির হয় কালিকটে।

খুলে যায় পথ। ভাস্কো-ডা-গামার পদাঙ্ক ধরে একের পর এক ভূখা মিছিল ছুটতে থাকে প্রাচ্যের দিকে। খাদ্যই শুধু নয়, প্রাচ্যের অফুরন্ত সম্পদ চাই সবার। সবারই ঘাড়ে মাথায় পণ্যের ডালি। কারণ সুস্পষ্ট। এত সম্পদ লুটে নেয়া বা ভিক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। বিকিকিনি-বাণিজ্যই পরের ধন ঘরে তোলার প্রকৃষ্ট পন্থা। অতএব, "ছুরি-কাঁছি-খেল্‌না চাইয়ে—পেট্‌রা-ডিব্বা-ঘন্টি চাইয়ে—চিড়িয়া ধরা ফাঁদ আর চূঁহা মারা কল চাইয়ে—।" দ্বারে দ্বারে ফিরতে লাগলো পসারীরা।

শুরু হলো প্রাচ্যের সাথে প্রতীচ্যের তেজারতী বা বাণিজ্য। হিন্দুস্তানের ঘাটে-বন্দরে সওদাগরী নাও ভেড়ালো ইউরোপীয় বণিকেরা। পর্তুগীজেরাই পয়লা এলো এদেশে। কালিকটে নেমে গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি সমুদ্র বন্দর ধরে তারা হিন্দুস্তানের পূর্বদিকে ধাবিত হলো এবং কালক্রমে হুগলী ও চট্টগ্রামে কুঠি স্থাপন করলো। পর্তুগীজদের পরেই এলো হল্যান্ডের ওলন্দাজ ও ডেনমার্কের দিনেমার বণিকেরা। তারাও এসে হিন্দুস্তানে তথা বাংলা মুলুকে বাণিজ্য করতে লাগলো।

ঈসায়ী ১৬০০ সনে ইংলন্ডে গড়ে উঠলো 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামে বণিকদের এক সমিতি। তাদেরও বাণিজ্যতরী হাজির হলো হিন্দুস্তানে। শুরু হলো ফট্‌কাবাজী। ইংরেজ জাতি অতিশয় সুবিধেবাদী ও সুযোগ সন্ধানী জাতি। শুরুতেই তারা সুবিধে হাসিলের ধান্দায় তৎপর হয়ে উঠলো। পরিশ্রমের পরিবর্তে শুরু থেকেই তারা দাঁও-মওকার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলো। স্থানের মালিক মুঘল সম্রাট। সুবিধের উৎস সেখানে। তাই রাণী এলিজাবেথের পত্র নিয়ে সর্বপ্রথম জন মিল্‌ডেন হল দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহর দরবারে এসে হাজির হলো। এরপর রাজা প্রথম জেম্‌স্‌-এর দূত হয়ে হকিন্স ও তৎপরে টমাস্‌ রো বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে এলেন পর পর। সবাই এসে শাহী দরবারে হাঁটু গেড়ে সালাম ঠুকলেন এবং একথা সে কথার পর একটু করে পান পাতা চাওয়ার মতো সবাই তারা হিন্দুস্তানে বাণিজ্য করার এযাযত সহ কিছু সুযোগ সুবিধে সম্রাটের কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। হৃষ্টচিত্তে দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন দূতেরা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

ইংরেজ কর্মচারীরা অতপর অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের মতো গা মেলে এ মুলুকে ব্যবসা শুরু করলো।

ইউরোপীয় সব ক'টি জাতির মধ্যে নোংরামীতে ইংরেজ জাতি সবার সেরা। নিজেদের আচরণের মাধ্যমে তাদের নোংরা মানসিকতাকে তারাই পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। মুসলমান জাতির সাথে এখানে ফারাগ তাদের পর্বত প্রমাণ। আচরণ তাদের বিপরীত। বিজয় ও পরাক্রমের যতই উচ্চ শিখরে মুসলমান জাতি উঠেছে, তাদের মধ্যে ততই মহত্বের ও উদারতার অকুণ্ঠ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এই ইংরেজ জাতি যতই উন্নতি ও পরাক্রমের দিকে এগিয়েছে তাদের মধ্যে উত্তরোত্তর ততই ছলনা, চাতুরী, কুটিলতা ও নোংরামী বৃদ্ধি পেয়েছে। পরাক্রমের সাথে সাথে তারা হীনমন্যতায় অন্যান্য সকল জাতিকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবু সার্বিকভাবে এ প্রসঙ্গে সন্দেহ কারো থাকলেও, বাংলা মুলুকে ইংরেজ বেনিয়াদের চরিত্রে এ সত্যের ব্যত্যয় নেই। এ ব্যাপারে এত তথ্য আছে যে, মুখে অস্বীকার করলেও, মুখের কালী বিলকুল মুছে ফেলার উপায় নেই।

অন্যান্য বণিকেরা এ মুলুকে এসে প্রথমতঃ সততাকেই আকড়ে ধরে। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের চিন্তা করে। এ পন্থায় অনেকে, বিশেষ করে ওলন্দাজেরা, প্রভূত উন্নতি সাধন করে। বাণিজ্যে তাদের অগ্রগতি সকলকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এই ইংরেজ বণিকেরা এ মুলুকে আসার পর থেকেই তারা যে ভদ্রবেশী বর্বর, ময়ুরপুচ্ছের আবরণে তারা যে নিছক দাঁড়কাক, এইটেই তারা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করতে থাকে। ফাঁকিবাজী, ফট্‌কাবাজী আর জাল জুচ্চুরীর পথকেই অবলম্বন করে তারা। তোয়াজ, উৎকোচ, উস্কানী আর মিথ্যাচারের বেসাতি নিয়ে শুল্ক দপ্তর থেকে সম্রাটের দরবার তক্‌ হরওয়াক্ত ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় তারা। বিনাশ্রমে ফায়দা হাসিলের মওকা খুঁজতে থাকে।

কথায় বলে "হর হাট করে যে, এক হাট পায় সে।" মওকাও তারা পেয়ে গেলো, আর মাঝে মাঝেই পেতে লাগলো। পয়লা দাঁওটাই বড়। সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম রোগাক্রান্ত হলেন। বিমার তাঁর জটিল আকার ধারণ করলো। শাহী হেকিমদের দাওয়াই তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্ক্রীয় বলে মনে হতে লাগলো। সম্রাট চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সুরাটের ইংরেজ কুঠির ডাক্তার জেব্রায়েল ব্রাউটন সহ সুরাটের কুঠিয়াল এই সময় সম্রাটের কাছে এলেন ব্যবসা বাণিজ্যের দরবার নিয়ে। শাহজাদীর বিমারের কথা শুনে জেব্রায়েল ব্রাউটন দরদভরে বললেন—সেকি-সেকি ! এযাযত পেলে আমি একটু কোশেশ করে দেখতাম প্রভু !

এযাবত দেয়া হলো। উপলক্ষ ব্রাউটনের চিকিৎসাই হোক বা দেশী হেকিমের পূর্ব প্রদত্ত দাওয়াই হোক, ব্রাউটন হাত দেয়ার পর শাহজাদী রোগ মুক্ত হলেন। খুশীতে শাহান শাহ ডাক্তার ব্রাউটনের উপর যারপর নেই প্রীত হলেন এবং ইনাম দেয়ার জন্যে আবেগ ভরে বললেন—বলুন ডাক্তার কি চাই? সম্ভব আর সংগত হলে আপনার যে কোন প্রার্থনা পূরণ করা হবে।

বিনিময়ে ডাক্তার জেব্রায়েল ব্রাউটন চাইলেন ইংরেজ বণিকদের জন্যে উড়িষ্যার বালাশোরে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার।

বাণিজ্যে তখনও ইংরেজদের নিতান্তই করুণ অবস্থা। তা দেখে সম্রাট তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন। বালাশোরে কুঠি নির্মাণ সহ তাদের আপাততঃ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করলেন। কিন্তু হিতে হলো বিপরীত। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পরবর্তী আদেশ উপেক্ষা করে ইংরেজ বণিকেরা এই দানকেই মূলধন করে অনন্ত কালতকও হিন্দুস্তানের সর্বত্র বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার বাহানা খুঁজতে লাগলো। মাঝে মাঝে শুল্ক কিছু দিলেও কোম্পানীর দুষ্ট কর্মচারীরা ঐ অজুহাতেই পুনঃ পুনঃ শুল্ক ফাঁকি দিতে লাগলো এবং সরকারী আদেশ এড়িয়ে যেতে লাগলো।

পরবর্তীতে তারা আরো নামমাত্র কারণে আরো অনেক মঞ্জুরী লাভ করলো। তবু তাদের হীনমন্যতা গেল না। আর পাঁচজন ব্যবসায়ীর মতো নিয়মিত কর ও শুল্ক দেয়ার পরিবর্তে তারা অবিরাম কর ফাঁকি ও চালাকী চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করলো। শেষ পর্যন্ত বল প্রয়োগেও এগিয়ে এলো ইংরেজ।

নীতিবাক্য বিতরণেও ইংরেজদের জুটি নেই। জীবে দয়া, বিপন্নকে সাহায্য, পরের প্রতি সহানুভূতি, উপকারীর উপকার স্বীকার প্রভৃতি নানাবিধ গুণের মাহাত্ম্য প্রচারে ইংরেজরা শুধু মুখেই পারদর্শী নয়, লেখনিও তাদের দড়। কিন্তু কাজের বেলায়, বালাই বলেও যে তারা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না বা উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, এমন নজীরের অভাব নেই এদেশে। ওলন্দাজদের সাথে ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় মার খেয়ে আর লড়াইয়ের ময়দানে ওলন্দাজদের মুগুর খেয়ে ইংরেজ বণিকদের যখন এদেশ থেকে উৎখাত হওয়ার অবস্থা হলো, তখন বাংলার প্রশাসনই ইংরেজদের পক্ষ হয়ে ওলন্দাজদের শাসন ও ইংরেজদের পুনর্বাসন করলো। অথচ ওলন্দাজদের লাঠির ঘা না শুকোতেই উপকারী বাংলার বিরুদ্ধে কীল তুললো ইংরেজ বেনিয়ারা। দূরদর্শিতার অভাবে দিল্লীর বাদশাহ আর বাংলার নবাবেরা বরাবরই নীরিহবোধে এই কালসাপকে উপেক্ষা করে গেলেন। ফলে, কালক্রমে এই

কালসাপেরই দংশনে লীন হয়ে গেল তাঁদের পর্বত প্রমাণ হুকুমাত আর আসমান স্পর্শী প্রতাপ। সে ইতিহাস এখানে নিষ্প্রয়োজন।

রওশন আরা বেগমের সাথে মোলাকাত করার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে শিরিবানু পালালো। ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ সেই কথা ভাবতে ভাবতে খাস মকানে হাজির হলেন। বিচার কক্ষে গিয়ে দেখলেন, অনেকেই হাজির আছেন, তবে প্রশাসক জিন্দামালিক সাহেব তখনও বিচার কক্ষে পৌছেননি। তিনি তাঁর খাস দপ্তরে অপেক্ষা করছেন। আবদুল আজিজ দপ্তরের দিকে এগুতেই জিন্দামালিক সাহেব বেরিয়ে এলেন এবং আবদুল আজিজকে দেখেই তিনি সানন্দে বললেন—আরে এই যে আবদুল আজিজ, এসো-এসো। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সালাম বিনিময় অন্তে আবদুল আজিজ তাজিমের সাথে প্রশ্ন করলেন—আসল আসামী, মানে জন বায়্যাম কি ধরা পড়েছে জনাব?

জিন্দামালিক সাহেব ক্ষোভের সাথে বললেন—নাঃ! বদমায়েশটা তখনই পালিয়েছে। ফৌজদার মির্জা মালিক সাহেব তালাশ করে যথেষ্ট হয়রান হয়েছেন। ব্যাটা আর এই হুগলীর ত্রিসীমানাতেই নেই।

ঃ তাজ্জব!

ঃ শুনছি ঐ শয়তানদের পক্ষে হুগলীর কুঠিয়ালদের উকিল সাহেব এসেছেন দরবার করতে।

ঃ কুঠিয়ালদের উকিল?

ঃ হ্যাঁ। এসো দেখি, এই উকিল আবার কি বলতে চান?

বিচারকক্ষে এসে প্রশাসক সাহেব বিচারকের আসনে গিয়ে উপবেসন করলেন। আবদুল আজিজ বিচারকের মঞ্চের নীচে দর্শকদের কাতারে গিয়ে বসলেন। সেখানে ফৌজদার আবদুল কাদের ও ফৌজদার মির্জা মালিক সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বিচারকের হুকুমে কয়েদী ইংরেজদের বিচারকক্ষে হাজির করা হলো। সাত আটজন ইংরেজ কর্মচারী। প্রত্যেকেরই দুইহাত শক্ত করে বাঁধা। বিচারকের আদেশে অপেক্ষাকৃত কম আঘাত প্রাপ্ত দুইজন আদায়কারী ঘটনাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করে শুনালেন। বিচারক সাহেব অতপর কয়েদীদের উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন—বলো, যা শুনলে তা কি সত্য?

আসামীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলো। বিচারক জিন্দামালিক হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে পুনরায় বললেন—সত্য ছাড়া মিথ্যার আশ্রয় নিলে আসামীর পক্ষে কানুনের যে অনুকম্পা আছে, তাও তোমরা হারাবে, একথা খেয়াল রেখে জবাব দাও—

কয়েদীদের একজন কাঁপতে কাঁপতে বললো—তামাম কাহানী হামাডের জানা না আছে। লেকেন আসলী ফ্যাক্ট, আইমিন, আসলী ঘটনা এয়সাই বিলকুল। হামরা উহাডের এ্যাটাক্ করিয়াছে।

বিচারক জিন্দা মালিক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁ। আমাদেরই দেশে এসে, আমাদেরই আশ্রয়ে থেকে যে অপরাধ তোমরা করেছো, তাতে তোমাদের একজনেরও এতক্ষণ জিন্দা থাকার কথা নয়। কিন্তু কয়েদ হওয়ার পর বিনা বিচারে কাউকে দণ্ড দেয়া যায় না বলেই তোমাদের এই বিচারালয়ে হাজির করা হয়েছে। বলো, আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমাদের কার কি বলার আছে?

কয়েদীদের কারো মুখেই আর কথা সরলো না। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থেকে তারা কেবলই কাঁপতে লাগলো। হুগলীর কুঠির উকিল সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করলেন এবং বিনীত কণ্ঠে বললেন—হুজুর মহানুভব। ওদের হয়ে আমি কিছু বলতে চাই হুজুর। মেহেরবানী করে আমাকে সে এযাযত দেয়া হোক।

জিন্দামালিক সাহেব উকিল সাহেবকে চিনতেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন—এযাযত দেয়া হলো। বলুন, কি আপনি বলতে চান?

আরো অধিক বিনয়ের সাথে উকিল সাহেব বললেন—ধর্মাবতার, এই আসামীরা সকলেই কোম্পানীর কর্মচারী। সবাই হুকুমের গোলাম। এরা কেউই হুকুমের মালিক নয়।

ঃ হুকুমের মালিক কোথায়? তাকে রেখে আপনি কেন এসেছেন?

ঃ তিনি পালিয়েছেন হুজুর। আমাদের বেঙ্গল কাউন্সিলে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। কাউন্সিলার ম্যাথুস্ ভিন্‌সেন্ট সাহেব জরুর ঐ দুর্মতি জন বায়্যামের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবেন।

তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে প্রশাসক জিন্দা মালিক বললেন—তার সাথে বাংলার প্রশাসনের সম্পর্ক কি? এ মুলুকে অপরাধীর বিচারের মালিক কি বেঙ্গল কাউন্সিল, না বাংলার হুকুমাত্?

ঃ জি জনাব, বাংলার হুকুমাত্।

ঃ তবে?

উকিল সাহেব দুইহাত জোড় করে বললেন—আমার আরজ হুজুর, অপরাধী জন বায়্যাম, এরা নয়। মেহেরবাণী করে এদের নাজাত দেয়া হোক হুজুর।

বিচারক সাহেব সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—আমার আদায়কারীদের প্রহার করেছে কারা? জন বায়্যাম, না এরা?

উকিল সাহেব কাঁচুমাচু করে বললেন—এরাই করেছে হুজুর, তবে অন্যের হুকুমে।

ঃ কানুন কাকে আগে ধরবে? আঘাতকারীকে, না হুকুমদাতাকে?

ঃ তা-মানে—

ঃ অপরাধ সংঘটনকারীর শাস্তি আগে হবে, না উস্কানীদাতার আগে হবে? আমাদের আদায়কারীদের পিঠে কীল ফেলার সময় তো তারা ভাবেনি যে, আদায়কারীরা তাদের দুশমন নয়, হুকুম দাতার দুশমন, কীলটা একটু নরম করে ফেলি?

ঃ হুজুর!

বিচারক জিন্দামালিক আরো শক্ত কণ্ঠে বললেন—জন বায়্যামকে হাজির করুন। নইলে, এরা তো মরবেই আপনাদের এই হুগলীর কুঠিটাও আমি ভিটে সমেত তুলে হুগলী নদীতে ভাসিয়ে দেবো।

ঃ ধর্মাবতার।

ঃ কুঠির কর্মকর্তাই যেখানে আসামী, সেখানে কুঠির সেই কর্মকর্তার হাজিরা চাই আগে, কুঠির উকিলের সুপারিশ শুনবো তার পরে।

উকিল সাহেব ভড়কে গেলেন। কিছুক্ষণ থতমত করার পর ফের তিনি সবিনয়ে বললেন—যে আসামী গরহাজির তার সম্বন্ধে আমি কোন সুপারিশ করবো না হুজুর। আমার আরজ, এই উপস্থিত আসামীদের নিয়ে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ধর্মাবতার, তামাম ঘটনা বেঙ্গল কাউন্সিলকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বেঙ্গল কাউন্সিল যদি তাদের পদক্ষেপ দ্বারা হুজুরকে তুষ্ট করতে না পারে, তখন হুজুর জন বায়্যামসহ এই আসামীদের বিরুদ্ধে মারুণ, বাঁচান, হুজুরের মর্জি মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমি শুধু সময় প্রার্থনা করছি হুজুর। এই কয়দিন এদের দণ্ড প্রদান স্থগিত রাখা হোক, এই আমার আরজ।

বিচারক জিন্দা মালিক ভাবতে লাগলেন। সময়ের জন্যে উকিল সাহেব আরো অনেক মিনতি ও আরো অনেক যুক্তি পেশ করলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর বিচারক জিন্দামালিক সাহেব কয়েদীদের কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেয়ার হুকুম দিয়ে বিচারকার্য আপাততঃ স্থগিত করে দিলেন।

বিচার কক্ষ থেকে বেরিয়ে অন্যান্যেরা সকলেই নিজ আলয়ে ফিরে গেলেন। আবদুল আজিজকে ফাঁকে পেয়ে প্রশাসক জিন্দা মালিক বললেন—এসো হে ফৌজদার, তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। তোমার এখন চলে গেলে চলবে না।

আবদুল আজিজ সসংকোচে বললেন—অভিযোগ !

প্রশাসক সাহেব হাসি মুখে বললেন—জিয়াদা অভিযোগ। তবে ঘাবড়াইয়ে মাৎ। কোন প্রশাসনিক অভিযোগ নয়। অভিযোগটা এসেছে আমার অন্দর মহল থেকে।

ঃ জনাব।

ঃ তোমার ভাবী সাহেবা তোমার উপর জব্বোর খাপ্পা হয়ে আছেন। তাকে সামলিয়ে তবে তুমি মকানে ফিরে যাবে।

ঃ ভাবী সাহেবা !

ঃ এই হুগলীর খোদ মালিকা জাহান।

ঃ কেন জনাব, তিনি আমার উপর নারাজ হলেন কেন ?

ঃ হবেন না-ই বা কেন ? তুমি লোকটা কি ? এতদিন একসঙ্গে থাকার পর, সেই যে জুদা হয়ে গেলে, তারপর আর একটা দিনও কি আমাদের সঙ্গে কাটানো উচিত ছিল না তোমার ?

ঃ তা কথা হলো—

ঃ অন্ততঃ বেচারীর খোঁজ-খবরটা তো নেবে ?

ঃ সে তো নিয়েছি জনাব। এর মধ্যে দু'তিন দিন এসেছি। সালাম দিয়ে গেছি।

ঃ ব্যস ! এতেই তোমার দায় দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল ! সরকারী কাজে এসে ঝড়ের বেগে দু'এক কথা বলে ফের ঝড়ের বেগে চলে গেছো। এতেই তার দরদের দাম শোধ ?

আবদুল আজিজ শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন—জনাব !

ঃ বেচারী যে আবদুল আজিজ বলতে একদম অজ্ঞান, সে কথা ভুলে গেলে ? তোমার পছন্দের সেই হুড়কো কাবাব দুইখানা তৈয়ার হলেও তার একখানা রেখে দিয়ে বলবে—আবদুল আজিজ একয়দিন আসেনি, জরুর আজ আসবে। নাস্তার সাথে এটা পেলে সে মহাখুশী হবে। ব্যস ! কাবাব পচে গন্ধ ছুটে গেল, তার সাধের আবদুল আজিজের পাত্তা নেই !

আবদুল আজিজ চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং স্মিতহাস্যে বললেন—তাই নাকি জনাব ? তাতো জানিনে। তা জানলে তো—

ঃ জানবে কি করে আর জানাবে কে ? একি আনুষ্ঠানিক কোন খাওয়া যে তোমাকে দাওয়াত দেয়া হবে ? ঘুরতে ফিরতে না এলে ঐ এক দুইখানা কাবাব খাওয়ার জন্যে কেউ দাওয়াত দেয় কাউকে ?

ঃ তা অবশ্য ঠিক।

ঃ অথচ ঝড়টা যায় তামামই আমার উপর দিয়ে। "কি এমন ডাঁটের মুনিব, কি এমন তোড়ের প্রশাসক যে, একটা কর্মচারীও তাকে পরোয়া করে তার মকানে আসে না ?"—এই কিসিমের খোঁচা খেয়ে মরতে হচ্ছে আমাকে।

ঃ বলেন কি জনাব ! এসব কথা ভাবী সাহেবা—

ঃ স্রেফ ভাবী সাহেবা ? তার পেছনে ফেউ আছে না আর একটা ? জানতো, বাঘের চেয়ে ফেউ এর দাপট বেশী ? ফেউটাই কি কম জ্বালাচ্ছে আমাকে ?

ঃ ফেউ ?

ঃ রওশন-রওশন। রওশন আরা বেগম সাহেবা। বাঘটা যদি একবার পড়ছে ঘাড়ে আমার, ফেউ পড়ছে দশবার।

শিরিবানুর নির্দেশটা চকিতে একবার ভেসে উঠলো আঃ আজিজের দীলে। তিনি শরমিন্দা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কেন জনাব ?

ঃ তোমার উপস্থিতির জন্যে—মানে তোমার কাব্য শুনার জন্যে।

ঃ কাব্য ?

ঃ জি, কাব্য। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" জানো না, আউরাতকুল গপ্প-কেচ্ছা পেলে আহার-নিদ্রা ছাড়ে ? এখানে থাকার কালে তোমার ফারসী কাব্যের কি সব কেচ্ছা কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে তুমি ওদের নেশা ধরিয়ে দিয়েছো আর শুরু করে শেষ না করে গেছো। এখন আর ওদের থামায় কে ? উঠতেও আবদুল আজিজ, বসতেও আবদুল আজিজ। ফৌজি লোকের মধ্যে যে এসব রস কোত্থেকে আসে, কিছু বুঝিনে।

ঃ জনাব।

ঃ ঐ হুড়কো কাবাব আর পিঠে-পুলী—সবই টোপ্‌হে। ওসব আমি বুঝি। আসল বস্তু তোমার কাব্য।

ঃ তাই ?

ঃ তোমার কাব্যকে ভাল বেসেই ওরা তোমাকে ভাল বেসেছে। অমনি অমনি নয়। দরদ, পয়দা হওয়ার তো একটা উৎস থাকা চাই ? আমার বুঝতে বাঁকী নেই যে, তোমার কাব্যই সেই উৎস। কাজকর্ম কিছু নেই, সেরেফ অন্দরে বন্দী। সময় কাটে কি করে ? তোমার মতো গুণীজনের যে কত কদর তাদের কাছে, এটা বুঝতে পারো না ?

ঃ তা-মানে—

ঃ চলো-চলো। আর না হোক, দু'টো কথাবার্তা বলে ওদের শান্ত করে তবে যাবে।

আবদুল আজিজকে সাথে নিয়ে প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব অন্দর মহলে এলেন এবং হাত-পা মেলে বিরাম কক্ষে বসলেন। প্রশাসকের আহবানে উমিদ আলীও এসে তাদের সাথে শামিল হলেন। দুই চার কথার পরেই ফের বিচারের কথা উঠলো। আবদুল আজিজ এ প্রসঙ্গে বললেন—তা যা-ই বলুন জনাব, এবার কিন্তু আমাদের নরম হলে চলবে না। আগেই আমাদের বিড়াল মারা উচিত ছিল। তা যখন হয়নি, তখন এইটেই আমাদের শেষ মওকা। এই শয়তানদের চূড়ান্ত, মোকাবেলা এবার কিন্তু করতেই হবে আমাদের।

প্রশাসক সাহেব বললেন—চূড়ান্ত মোকাবেলা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো ? কয়েদীদের, মানে আমাদের লোকের গায়ে হাত তুলেছে যারা তাদের কঠোর শাস্তি দেয়ার কথা বলছো ?

আবদুল আজিজ চকিতে একবার উমিদ আলীর মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, উমিদ আলীর মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে গেছে। প্রশাসকের প্রশ্নের জবাবে আবদুল আজিজ বললেন—তাদের না হলেও, জন বায়্যামের জরুর প্রাণদণ্ড হওয়া প্রয়োজন জনাব। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসে স্রেফ আমাদের প্রশাসনের দয়ার উপর এ মুলুকে টিকে আছে যারা, তারা সেই প্রশাসনেরই লোকের গায়ে হাত তুলবে, এটা কি চিন্তা করা যায় ? এ মুলুকে থাকার অধিকার তাদের বিলকুল ফুরিয়ে গেছে।

ঃ হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিক তা-ই বটে।

ঃ যারা আমাদের আদায়কারীদের প্রহার করেছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক দৈহিক শাস্তি প্রদানের সাথে ঐ দুরাচার জন বায়্যামকে কোতল করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে চরম এক আতংক পয়দা না করলে, এদের হাতে ভবিষ্যৎ আমাদের মোটেই নিরাপদ নয়।

ঃ হ্যাঁ, এটাও ঠিক কথা। কিন্তু দলবল নিয়ে জন বায়্যাম যেভাবে গা-ঢাকা দিয়েছে, তাতে তাকে আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা—

ঃ আমরা খুঁজতে যাবো কেন জনাব ? ঐ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীই তাকে খুঁজে আনবে। যেখানে থেকে পারুক, ঐ অপরাধীদের তারাই খুঁজে বের করবে। না করলে, তাদের কুঠিতে আগুন দিয়ে ব্যাটাদের পিটে এ মুলুক থেকে বের করে দিতে হবে। এখানে গড়বড় করলে এ ভুল আমরা কখনও সংশোধন করতে পারবো না।

আবদুল আজিজ আবার উমিদ আলীর মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, সে মুখ মণ্ডল এবার প্রসন্ন। কিঞ্চিৎ নীরব থেকে প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব ঈষৎ হাসিমুখে উমিদ আলীকে প্রশ্ন করলেন—কি বলো হে দার্শনিক ? সবাই

বলে, সব ব্যাপারেই তুমি নাকি খুব কায়েমী সমাধান দিতে পারো। এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি ?

উমিদ আলী একেবারেই আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে কাঁচুমাচু করে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—আমার আর কি অভিমত থাকবে জনাব ? সবাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে বলেই ওসব কথা বলে। নইলে, বুদ্ধি আমার নিতান্তই মোটা বুদ্ধি। তা দিয়ে কোন রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটে ?

ঃ তোমার সেই মোটা বুদ্ধিটাই খাটাও না দেখি, তা থেকে কি বেরিয়ে আসে ?

উমিদ আলী পুনরায় সসংকোচে বললো—কিছুই আসবে না ভাইজান। আমার কথা গেঁয়ো কথা। এই ফৌজদার সাহেবের সাথেও আমার কথা মিলবে না।

ঃ কি রকম ?

ঃ গেঁয়ো লোকেরা বলে, যে ব্যক্তি একবার বিশ্বাসের ঘরে চুরি করে, তাকে আর মেরে পিটে কখনও বিশ্বাসী বানানো যায় না। তার সংশ্রব বিলকুল ত্যাগ করাই নিরাপদ।

ঃ বটে !

ঃ তদুপরি, অন্যান্য বণিকদের মতো ইংরেজরা তো কোনদিনই বিশ্বাসভাজন ছিল না বা এই প্রশাসনের প্রতি তাদের পরোয়াও তেমন ছিল না। এই ঘটনায় তাদের সেই পরোয়াহীন মানসিকতা দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। এরপরও আর এত চিন্তাভাবনার কি আছে, তাতো আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ধরে না।

তাজিমের সাথে কথা বললেও উমিদ আলীর কণ্ঠে শেষের দিকে ক্ষোভের রেশ ধ্বনিত হলো। তার কথার খেই ধরে আবদুল আজিজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন—এর চেয়ে আর কায়েমী কথা হয় না জনাব। শুরু থেকেই এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটা নানাভাবে হয়রান করছে আমাদের। অন্যান্য বণিকদের নিয়ে যা ঝুটঝামেলা হচ্ছে, এই ইংরেজরা একাই তার চেয়ে দশগুণে অধিক ঝঞ্ঝাট পয়দা করে আমাদের অস্থির করে রেখেছে। এ ইল্লত এ দেশ থেকে বের করে দেয়াই উচিত।

প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনি গভীরভাবে চিন্তামগ্ন রইলেন। এরপর আস্তে আস্তে চোখ তুলে এঁদের দিকে তাকালেন। এঁরা তখন উভয়েই উদগ্রীব হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। আবদুল আজিজকে লক্ষ্য করে জিন্দা মালিক সাহেব ধীর কণ্ঠে বললেন—কথা যে দুইজনেরই তোমাদের কায়েমী, তা নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই ফৌজদার ! কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

আবদুল আজিজ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন—কি কথা জনাব ?

প্রশাসক সাহেব বললেন—ঘটনাটা আমার এলাকাতেই ঘটেছে আর বিচারটাও আমার হাতেই আছে ঠিকই, কিন্তু এদের ব্যাপারে সেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয়ার কতখানি এক্তিয়ার আমার আছে, আমি সেই কথাই ভাবছি।

ঃ জনাব !

ঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বলতে শুধু এই হুগলীর কুঠি আর হুগলীর এই কয়জন কুঠিয়াল নয়। তামাম বাংলা ব্যাপী এর ব্যাপ্তি। বাংলার বাইরেও বিস্তার আছে এদের। সুতরাং এদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ—সে এক জটিল ব্যাপার।

ঃ কিন্তু—

ঃ কিন্তুর অবকাশ কোথায় ? তুমি, আমি, এই উমিদ আলী, কেউ আমরা এদের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নই। সবাই আমরা কর্মচারী। আমাদের উপরে নবাব আছেন, নবাবের উপরে দিল্লীর শাহান শাহ আছেন। খোদ শাহান শাহ না চাইলে, বাংলার নবাব বাহাদুরও এদের হিন্দুস্তান থেকে বের করতে পারবেন না।

ঃ আমি হিন্দুস্তানের কথা বলছিনে জনাব, বলছি বাংলার মুলুকের কথা। এই বাংলা থেকে এদের বের করতে আপনি আর বাংলার নবাব বাহাদুরই যথেষ্ট। আপনার সুপারিশ নবাব বাহাদুর নিশ্চয়ই—

প্রশাসক সাহেব বাধা দিয়ে বললেন—নিশ্চয়ই বলে কোন কথা সব ক্ষেত্রে নেই। এতবড় একটা জটিল ব্যাপারে সম্রাটের মতামত তিনিও চাইতে পারেন। সেখান থেকে ঈপ্সিত জবাব না এলে, আমার সুপারিশও উপেক্ষিত হবে।

আবদুল আজিজ তবুও জিদ ধরে বললেন—সেখান থেকে বাঞ্ছিত জবাব কেন আসবে না জনাব ? আমাদের নবাব শায়েস্তা খান বাহাদুর দিল্লীর বাদশাহ মহীউদ্দীন আলমগীর আওরঙ্গজেব বাহাদুরের আপন মাতুল। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। বাদশাহ তাঁকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করেন। তাঁর ইচ্ছার অমর্যাদা বাদশাহ নামদার করবেন, এটা হয় কি করে ?

প্রশাসক সাহেব শক্ত কণ্ঠে বললেন—হয়। তামাম হিন্দুস্তানের ভালমন্দ সম্রাটের মাথায়। প্রশাসনিক প্রয়োজনে অনেক কিছুই করতে হয়।

ঃ জনাব !

ঃ এসব কথা যাক। এত অগ্রিম ভেবে আমাদের কাজ নেই। ঘটনাটা আমি নবাব বাহাদুরকে সবিস্তারে জানানোর জন্যে আর এ ব্যাপারে তাঁর

নির্দেশ পাওয়ার আরজ সহ ঢাকায় লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন দেখা যাক, কি নির্দেশ সেখান থেকে আসে।

অন্দরের যে বিরাম কক্ষে বসে তাঁরা কথাবার্তা বলছিলেন সেটি অন্দরের আর একটি কক্ষের সাথে যুক্ত ছিল। এই দুইকক্ষের মাঝখানের দুয়ারে পর্দা ঝুলানো ছিল। ঠিক এই সময় পর্দার ওপাশে ফুঁশে উঠলো এক নারী কণ্ঠ—"গোস্তাকী মাফ হয়। জনাবকে তো আমি বার বার বলেছি, রাজকার্য-রাজনীতি যত আছে মেহেরবানী করে জনাব তা অন্দরের বাইরে দপ্তর-দরবার সর্বত্র চালাবেন, জেনানাদের এই অন্দরটুকু আর ঐ বিষে বিষাক্ত করবেন না। বন্দি জেনানারা যদি এটুকু চত্বরে একটু বিশুদ্ধ বাতাস না পায়, তাহলে তারা বাঁচে কি করে ?

কথা বললেন জিন্দা মালিকের স্ত্রী গুলশান আরা বেগম। প্রশাসক সাহেব কপট খেদে আবদুল আজিজকে বললেন—দেখো-দেখো, আমি বলিনি, তেতে একদম হাঁপরে-পোড়া লোহা হয়ে আছেন ? এবার দেখো তার নমুনা !

প্রশাসক গিন্নী আরো খানিক উষ্ণ কণ্ঠে বললেন—তার মানে ?

প্রশাসক সাহেব অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—না মানে, আমার ভুল হয়ে গেছে বেগম। অন্দরে রাজনীতি আর দুসরাবার হবে না। এবারের ভুলটা আমার মাফ হোক।

ঃ ভুল ?

ঃ নির্জলা ভুল। আসলে আমার কোন দোষ নেই। দোষটা আমার এই মাথার। রাজনীতিতো গুদাম ঘরে থাকে না, থাকে মানুষের মাথায়। গোটা এই হুগলীর রাজনীতি আমার এই ক্ষুদে মাথাটায় এক সাথে ঢুকে জাম হয়ে আছে। অন্দরে আসার কালে আমার এই নাদান মাথাটা বাইরে রেখে আসতে পারলেই আর কোন ঝামেলা থাকে না।

ঃ বটে !

ঃ দুনিয়ার অনেক পত্নীরাই পতি প্রেমের আধিক্যে ও কম্মটি করেছেন। আমার বেগম সাহেবাও যদি সদয় হয়ে আমার মাথাটা নামিয়ে বাইরেই রাখার ব্যবস্থাটা করতেন—তাহলে বর্তে যেতাম !

আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী সতর্কভাবে হাসি সম্বরণ করলেন। চাপা কণ্ঠে হলেও পর্দার ওপারে খিল খিল করে হেসে উঠলেন প্রশাসকের শ্যালিকা রওশন আরা বেগম। তেতে উঠলেন প্রশাসকের পত্নী। তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—উঃ ! আর পারিনে ! তবুও মস্করা ! আমার কোন কথাই কি গায়ে লাগার মতো নয় ?

ঃ আহহা, কি বলতে চান বলুন না ?

ঃ ও ঘরে নাস্তা দেয়া হয়েছে। এতদিন পরে আবদুল আজিজ সাহেব আমাদের মকানে এলেন। জনাব কি এখানেও ঐ রাজনীতির ছবক দিয়েই তাঁর পেট ভরাবেন, না মুখে কিছু দিতে দেবেন !

ঃ ওরে বাপ্‌রে ! তা কি কখনও হয় ? যাও হে খোশ নসীব ফৌজদার, তোমার জন্যে ও ঘরে নাস্তা অপেক্ষা করছে, নাস্তা খেয়ে এসো। আমাদের নসীব তো আর তোমার মতো শানদার নয়, আমরা বসে বসে কড়িকাঠগুলোই গুণি এখানে।

ঃ কি গজব ! আলী ভাই, তিনজনেরই নাস্তা দেয়া হয়েছে। জনাব যদি কড়িকাঠ গুণেই আরাম পান, উনি মনের সুখে গুণতে থাকুন। তুমি আবদুল আজিজ ভাইকে নিয়ে ঐ ঘরে এসো। এসব শুকনো রসিকতা করার আমার সময় নেই।

গুলশান আরা বেগম পর্দার নিকট থেকে গোস্বাভরে সরে গেলেন। উমিদ আলী কি করবে তা ভাবতেই জিন্দা মালিক সাহেব শশব্যস্তে বলে উঠলেন—চলো হে, চলো—চলো। চলো শিগ্গির সবাই। হাওয়া বেজায় গরম। বিলম্বে বিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনা !

কক্ষান্তরে বাঁদী বাবুর্চি নাস্তা সাজিয়ে নিয়ে এন্তেজারে ছিল। সবাই এসে নাস্তা ঘিরে বসে পড়লেন। নাস্তার সাথে গরম গরম হুড়ুকো কাবাব ছিল। এটি আবদুল আজিজের দেয়া নাম, কাবাবের কোন বুনিয়াদি নাম নয়। রসুন-পেয়াজ-মশলা-মরিচ চোখা করে দিয়ে, সব্‌জি বা ডাল মেশানো গোস্তের ঘরুয়া পদ্ধতিতে তৈরী পেঁয়াজ বড়া মাফিক এটি এক মুখরোচক কাবাব। পর্দার আড়ালের নির্দেশে উমিদ আলী আবদুল আজিজের রেকাবীতে কয়েকটা অতিরিক্ত হুড়ুকো কাবাব তুলে দিলো। আবদুল আজিজ সরবে বাধা দিতে গেলেন। জিন্দা মালিক সাহেব সহাস্যে বললেন—খাও হে ফৌজদার, খাও-খাও। আল্লাহ যারে দেয় ছাপ্পড় ফেঁড়ে দেয়। আল্লাহর দান কি সবসময় আর সবার নসীবে জুটে ?

পর্দার আড়াল থেকে প্রশাসক পত্নীর নির্দেশ এলো—আলী ভাই, জনাবকেও আরো ক'খানা দাও আর সেই সাথে তাঁকে জানাও, জিয়াদা কাবাবই তৈয়ার করা হয়েছে। উনি যতগুলো খেতে পারেন ততগুলোই দেয়া হবে। আফসোস্ করার কারণ নেই।

উমিদ আলী নির্দেশ পেয়ে প্রশাসক সাহেবের রেকাবীতেও আরো ক'খানা কাবাব তুলে দিতে গেল। প্রশাসক সাহেব চমকে উঠে রেকাবী সরিয়ে নিয়ে বললেন—আরে-রে ! খবরদার খবরদার—

আবদুল আজিজ হেসে বললেন—আর দু'এক খান নিন জনাব।

প্রশাসক সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—পাগল হয়েছো ? একখানাও নয়। এত ঝাল মশলার দাপট সবার পেটে সয় ! তোমাদের লোহার পেট, তোমরা আচ্ছা মতো খাও।

ঃ জনাব !

ঃ আচ্ছা নামই দিয়েছো তুমি এই বস্তুর। হুড়ুকো কাবাব ! এক টুকরো মুখে দিতেই এমন হুড়ুকো ঠ্যালা মারছে যে, নাক মুখ ফুটো করে বেরিয়ে যেতে চাইছে।

উপস্থিত সকলেই সংযতভাবে হেসে উঠলেন। পর্দার আড়াল থেকে প্রশাসক শ্যালিকা রওশন আরা বেগম মস্করা করে বললেন— থাক-থাক, তাহলে আর খাবেন না দুলাহ ভাই। সবার কাছেই কি আর সব বস্তু কদর পায় ? বিশেষ বিশেষ প্রাণী বিশেষ বিশেষ বস্তুকেই কদর দেয়।

প্রশাসক সাহেব কপট রোষে বললেন—বটে ! এর অর্থটা কিন্তু এক তরফে বর্তায় না বহিন, সব তরফেই বর্তে।

রওশন আরা বললেন—তা যেদিকেই বর্তুক, আপনার খাদ্যতো এক টুক্‌রো রুটি আর এক সুরাহী পানি। এর সোয়াদ আপনি পাবেন কি ?

ঃ আমার পেয়ে কাজ নেই। যিনি পেলে তোমরা দুই বহিনই খুশী হও আর যার উদ্দেশ্যে এ বস্তু বানিয়েছো, তার পাতে আর এক গামলা ঢালো, আমার আপত্তি নেই।

আবদুল আজিজকে কটাক্ষ করে প্রশাসক সাহেব হাসলেন। আবদুল আজিজ শরম পেয়ে মাথা নীচু করলেন। রওশন আরা বেগম এর জবাবে বললেন—তা ঢালতে হলে ঢালবোই তো। এক গামলা কেন, দশ গামলা ঢালবো। সবাই কি আপনার মতো পেট মরা, না এক মুটো শাক ভাত খেয়েই আর না আর না করে সবাই ?

ঃ ঢালো-ঢালো। দশ গামলা কেন, বিশ গামলা ঢালো। তবে এ কথাও বলে রাখি, এই নয়া ফৌজদারের ছুটি কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। যত পারো তত ঢালো, ছুটি কিন্তু আর একটা দিনও বাড়িয়ে দেয়া যাবে না। হেকিম সাহেবের সুপারিশেও নয়।

রসিকতার মধ্যে দিয়ে নাস্তার পর্ব শেষ হলো। আবদুল আজিজের আপত্তি সত্ত্বেও সকলের দুর্বার আগ্রহে এই বৈঠকেই সাব্যস্ত হলো, আবদুল আজিজ আজ রাতের খানাটা এই মকানেই খেয়ে তবে যাবেন। এর আগে ছুটি নেই।

নাস্তা সেরে বেরিয়ে এসে জিন্দা মালিক সাহেব জরুরী কাজে বাইরে গেলেন আর আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী ফিরে এসে ফের সেই বিরাম

কক্ষে বসলেন। কিঞ্চিৎ ফাঁক পেয়ে আবদুল আজিজ উমিদ আলীকে প্রশ্ন করলেন—কই দোস্ত, সকালে যে বললে, আমার খাস মকানে হাজির হওয়ার আরো অন্য জরুরত আছে ? সে জরুরতটা কি, তা ঠিক বুঝতে পারলাম নাতো ?

উমিদ আলী হেসে বললো—দোস্ত, এতটা নির্বোধ তো তুমি নও ? এরপরও কিছুই বুঝতে পারছো না ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ এই অন্দর মহলেরই তাকিদ ছিল। কুঠিয়ালদের ঐ ঘটনা না ঘটলেও তোমাকে ডাকার জন্যে আমাকে আজ যেতেই হতো তোমার ওখানে। বেশ কিছুদিন হলো, তুমি এদিকে আসোইনি। এরপর আর ডাক না পড়ে পারে ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ রওশন আরা বেগম সাহেবা গতকাল তোমার খোঁজে গিয়ে সারা বেলা বসে থেকে এসেছেন, সে খবর তুমি পাওনি ?

ঃ হ্যাঁ। সেটা এই আসার ওয়াক্তে পেলাম। তা উনি—

ঃ তোমার নয়া মকান দেখার জন্যেও বটে, তোমাকে ধরে আনতেও বটে।

ঃ ধরে আনতে ? কেন-কেন ?

ঃ কাব্য-কাহিনী শোনার জন্যে। কাব্যচর্চা করতে গিয়ে ফ্যাসাদ তো একটা দস্তুর মতো বাধিয়ে রেখে গেছো এখানে।

ঃ আচ্ছা !

ঃ তোমার ফারসী কাব্যের যে কাহিনী এদের তুমি শোনাতে শুরু করেছিলে, সেটা শেষ করে যাবে তো ? ঐ ব্যাপারে আমাকে নিয়ে দিন দুয়েক বেশ খানিকটা টানা হেঁচড়া করলেন এঁরা। কিন্তু আমি তো ও রসে বঞ্চিত। সোনারের কাজ কামারকে দিয়ে হয় ? আমার দ্বারা কাজ না হওয়ায়, তোমার উপর এই চাপ।

ঃ বলো কি ?

ঃ মকান তো তোমার এমন কিছু দূরে নয়। কাজ কাম শেষ হলে সকাল-সাঁঝে আর ফাঁকে-অবসরে তুমি এখানে আসবে, এইটেই তো এ মকানের সকলের উম্মিদ। সবাই এটা কামনা করে।

এমন সময় শোরগোল করে এসে দুই বোনই পর্দার ওপারে বসলেন। আবদুল আজিজের উদ্দেশ্যে গুলশান আরা বেগম সাহেবা হাল্‌কা ক্ষোভের সাথে বললেন—নয়া ফৌজদার সাহেব কি কোন কারণে না-খোশ আছেন আমাদের উপর ?

ফৌজদার আবদুল আজিজ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হলেন। তিনি শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন—কেন ভাবী সাহেবা ? একথা কেন ?

ঃ নইলে আমাদের এভাবে খারিজ করে দিলেন কেন ?

ঃ খারিজ !

ঃ নয়তো কি ? এতবড় মকান। বান্দাবাঁদি ছাড়া বালবাচ্চা বা আর কোন লোক নেই। আপনি আসার আগে কি যে মনমরা হয়ে এই কয়েদখানায় থাকতাম আমরা, তাতো নিজেই আপনি দেখেছেন। ওদিকে আবার, আপনার এখানে থাকার সময়টা কি আনন্দে আমাদের কেটেছে, তাও আপনি অনুভব করে গেছেন। এসব দেখে বুঝেও আমাদের এভাবে এতিম করে দিলেন কেন আবার ?

ঃ ভাবী সাহেবা !

ঃ অবসর ওয়াক্তে এখানে বসে কত খোশহালে কিতাব শুনতাম আপনার। দিনটা আমাদের ঐ আমেজেই কেটে যেতো। কাজের লোক আপনারা দৈনিকের কথা বলবো না। হপ্তায় দু'একদিন এসে কিছু সময়ের জন্যে কিতাবখানা খুলে বসলে তো আমরা তাজা হয়ে উঠি আবার ?

ঃ তা মানে, এমনভাবে তো এর আগে কেউ একথা আমাকে বলেনি ভাবী সাহেবা ! তা বলতে তো জরুর আমি আসতাম !

ঃ বেশী জোর দিয়ে কি তা বলা যায় ভাই ? নিজের খেয়ালে আর দীলের টানে ঘুরতে ফিরতে এলে সে কথা আলাদা। তাকিদ দিয়ে ধরে এনে কাব্য করতে বসালে দীলের সেই স্বতঃস্ফূর্তটাও থাকে না, তার উপর এটাকে উপরওয়ালা কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া অতিরিক্ত এক দায়িত্ব বলেও আপনি ধারণা করতে পারেন। কাব্য-কাহিনী হলো খুশী মনের ব্যাপার। এ নিয়ে আপনার উপর কোন জুলুম হোক, এটাতো আমরা চাইবো না।

অতিশয় সংকুচিত হয়ে আবদুল আজিজ বললেন—তওবা-তওবা ! এতটা নির্মম আমাকে ভাববেন না ভাবী সাহেবা। যে কয়দিন আমি এখানে ছিলাম, নিজের বড় বোনের মতো স্নেহ আমি আপনার কাছে পেয়েছি। আপনাদের সাথে দু'দণ্ড বসতে আমি অস্বস্তি বা জুলুম বোধ করবো কেন ?

ঃ ফৌজদার ভাই !

ঃ অবশ্য কাজটা আমার কাব্য সাহিত্যের একেবারেই বিপরীত কাজ। শিক্ষকতা করার জন্যে লেখাপড়া শিখলাম, কাজ পেলাম লেঠেলের। তা সেই কাজকেই যখন কবুল করে নিয়েছি, তখন তো এখানে আমার কোন ফাঁক রাখলে চলবে না। সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারি আর না পারি, আমি যে একাজের অযোগ্য নই, এ স্বাক্ষর তো রাখতেই হবে আমাকে। তাই বলছিলাম কাজটা আমার অনেকখানী বিপরীতধর্মী। কিন্তু তা হলেই বা

হয়েছে কি ? তাই বলে কি কাব্যচর্চা বাদ দিয়েছি আমি ? ফাঁক পেলেই তো এখনও আমি আমার কুতুবখানায় বসে অনেক সময় কাটাই। এই সময়টা অনায়াসে আমি এখানে এসে দিতে পারি। আর সমঝদার পেলে কাব্যচর্চার আনন্দটাও অনেক বাড়ে।

ঃ তাহলে ?

ঃ প্রথম দিকে কিছুদিন ঘর সংসার গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত ছিলাম ঠিকই, কিন্তু এখন তো আমি অবসর। একটু আভাস পেলেই এ গলতিটা হতো না।

এবার মুখ খুললেন রওশন আরা বেগম। তিনি বললেন—ব্যস্-ব্যস্। গলতি যা হয়েছে, নয়া ফৌজদার সাহেব তা নিয়ে আফসোস্ করেই এবেলাটাও কাটিয়ে দিন, ওটা কিন্তু মানবো না। মেহেরবানী করে উনি এই সামান্য সময়টা আসল কাজে লাগাবেন, এই আমার আরজ।

আবদুল আজিজ স্মিতহাস্যে বললেন—আসল কাজ !

রওশন আরা বেগম বললেন—গতকাল যে আপনার মকানে গিয়ে শাম ওয়াক্ত পর্যন্ত উঠবোস্ করে এলাম, তা থেকেও কিছুই বুঝতে পারছেন না ? নিন, তারপর কি হলো ? ঐ যে যেখানে কিতাব বন্ধ করে উঠে গেলেন, মানে তুরানের সেই শাহজাদী ঝরোকার ফাঁক দিয়ে আগত বাহাদুরের রূপ দেখে উতলা হয়ে গেল। তারপর কি হলো ?

ঃ তারপর কি হলো ?

ঃ জি-জি। নিন শুরু করুন।

আবদুল আজিজ পুনরায় হেসে বললেন—বলেন কি ! এখনই আর কিতাব ছাড়াই ?

ঃ কিতাব ?

ঃ কাব্যের রস আলাদা। কিতাব ছাড়া মুখে মুখে ওসব কথা বললে রস কিছু পাবেন না। নীরস বিবৃতির মতো স্রেফ শুকনো কথা হবে।

গুলশান আরা বেগম সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তা কেন ? আলী ভাই, কিতাবখানা কোথায় ? ওটা তো তোমার কাছেই ছিল। কিতাবখানা আনোতো

উমিদ আলী থতমত করে বললেন—এ্যাঁ, কিতাব ? এহহে ! কিতাবখানাতো এখন আমার কাছে নেই ভাবী সাহেবা। আমাদের বড় মাদ্রাসার আলীম আবদুর রাজ্জাক সাহেব, এইতো আমাদের এ পাড়াতেই বাড়ী, উনি ওটা চেয়ে নিয়ে গেছেন।

ঃ কি মুস্কিল।

ঃ গেলেই আমি পাবো। কিন্তু তাতে একটু সময় লাগবে।

ঃ তা লাগুক। ওটা তুমি এক্ষুণি গিয়ে নিয়ে এসো। মাগরিবের আর দেরী নাই। আবদুল আজিজ ভাই এর মধ্যে মাগরিবের নামাজ আদায় করে এসে

একেবারে স্থির হয়ে বসুন। আমিও যাই, মেহমানদারীর ব্যাপারে বাবুর্চিকে একটু নসিহত করে আসি—

গুলশান আরা বেগম রন্ধনশালার দিকে আর উমিদ আলী কিতাবের খোঁজে বাইরের দিকে চলে গেলেন। রইলেন শুধু পর্দার ওপারে রওশন আরা বেগম ও পর্দার এপারে ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ। রওশন আরাকে উদ্দেশ করে আবদুল আজিজ বেগ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—তার মানে ! কিতাব এখানে কোত্থেকে এলো ? আমার খানাতো আমার কুতুবখানায় তালাবন্দ ?

জবাবে রওশন আরা বেগম স্মিতহাস্যে বললেন—আনিয়ে নিয়েছি। আপনার পথ চেয়ে থেকে হতাশ হওয়ার পর, ঢাকা থেকে কিনে আনিয়েছি ও কিতাব।

ঃ বলেন কি !

ঃ জি হাঁ। ঢাকায় সেদিন জরুরী এক পত্র নিয়ে আমাদের মুন্সি সাহেব গিয়েছিলেন, তাঁর মারফত কিনে এনেছি কিতাবখানা।

ঃ আপনি !

ঃ কি করবো ? নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন যে ! এত সুন্দর কাহিনীর লোভটা কি ছাড়া যায় ? তদুপরি, ওটা ছাড়াও, ঐ রকম আরো নাকি অনেক ভাল ভাল কাহিনী আছে ঐ কিতাবে, আপনিই বলেছিলেন।

ঃ জি-জি। অনেক ভাল ভাল কাহিনী আছে।

ঃ সেই জন্যে ঐ কিতাবটাই আনিয়ে নিলাম।

ঃ আচ্ছা। তাহলে তো অনেক কাহিনীই পড়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

ঃ কিযে বলেন ? আমাদের বিদ্যা কি আদৌ কিছু বেশী ? মূল্যবান বয়াত আর গভীর জ্ঞানের কথাবার্তা। নিজে নিজে পড়ে কি আমরা বুঝতে পারি ওসব ?

ঃ তা উমিদ আলী সাহেবকে বললেও তো উনি আপনাদের সাহায্য করতে পারতেন। উনিও খুব পণ্ডিত মানুষ।

রওশন আরা বেগম এবার উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। তিনি কলকণ্ঠে বললেন—ওরে বাপ্‌রে। পণ্ডিত মানে ? গভীর জ্ঞানের মানুষ। এত জ্ঞান যে, আমাদের সাধ্য নেই যা করি। আর এই জন্যেই আমাদের কাছে কিছুটা পাগলাটে মনে হয়। আসলে জ্ঞান গভীর হলে মানুষের আচরণ যে অল্পজ্ঞানীর চেয়ে পৃথক হয়, আমরা এটা বুঝতে চাইনে।

ঃ আপনি তা বোঝেন ? মানে উনি খুব জ্ঞানী মানুষ, এটা ?

ঃ কেন বুঝবো না ? শুধু কথাবার্তাই নয়, উনার জ্ঞান অর্জনের আগ্রহটাও তো বিরাট এক ব্যাপার। একটু ফাঁক পেলেই উনি কিতাবের মধ্যে তলিয়ে যান, দুসরা কোন চিন্তা-ভাবনা নেই।

ঃ আচ্ছা !

ঃ হৈ-হৈ করে সর্বত্র দৌড়ে বেড়ান ঠিকই, কিন্তু সবাই যখন ঘুমে তখন দেখবেন, উনি জেগে আছেন কিতাব নিয়ে।

ঃ বলেন কি ? তবে যে সবাই উনাকে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, কদর কেউ দেয় না ?

ঃ দেবে কেন ? এ দুনিয়ায় জ্ঞানের চেয়ে ক্ষমতার কদর ঢের ঢের বেশী। ক্ষমতা হাতে না থাকলে জ্ঞানের খবর করে কে ?

আবদুল আজিজ প্রীত হলেন। এ লোকটার প্রতি যে এ মেয়েটার এতটা শ্রদ্ধাবোধ আছে, তা দেখে তিনি তৃপ্ত হলেন। লহমাখানেক থেমেই ফের বললেন—তা ঠিক-তা ঠিক। আপনিও খুব জ্ঞানী ব্যক্তি দেখছি। অত্যন্ত বাস্তব কথা বলেছেন।

ঃ জি ?

ঃ এসব কথা থাক এখন। যা বলছিলাম, ঐ কাব্য কবিতা বোঝার জন্যে আপনারা উমিদ আলী সাহেবের সাহায্যটাও নিতে পারতেন। উনি যে খুব জ্ঞানী তাতো বুঝতেই পেরেছেন আপনি।

এর জবাবে রওশন আরা নির্বিকার কণ্ঠে বললেন —তা হলে কি হবে ? সবার তো নেশা-ঝোঁক একদিকে হয় না। উনার ধ্যান-ধারণা আর ঝোঁক-আগ্রহ বিলকুল অন্যদিকে। শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস। কাব্য কবিতা উনি বেশী বোঝেনও না, সে রসও তাঁর নেই।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ দিন দুয়েক তাঁকে ধরে এনে বসিয়েছিলাম। কিন্তু দু'পাতা না পড়তেই উনি ইতিহাসে চলে যান। বলেন, এসব কাব্য কবিতার রস আবদুল আজিজ সাহেব এলেই বরং ভাল আপনাদের দিতে পারবেন। আমার কাছে শুনতে চান, ইতিহাসের গল্প বলি শুনুন।

আবদুল আজিজ হেসে বললেন—আচ্ছা ! তারপর ?

ঃ আমি বললাম, ঐসব আরব পারস্যের ইতিহাস কি বুঝবো আমরা ? উনি বলেন, না-না, আরব পারস্যের কথা নয়, এই বাংলা মুলুকের কথা বলি, শুনুন। এই বলেই উনি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজী থেকে শুরু করে এদেশের এমন সব জটিল রাজনীতির কথা শুরু করলেন —মানে, মুসলমানদের প্রশংসনীয় চরিত্র ও মহত্ব, অমুসলমানদের দুশমনী

আর মুসলমান নামধারী গান্দারদের গান্দারীর এমন সব তত্ত্বকথা শুরু করলেন যে, আমার মাথাটা একদম ঘুরে গেল। ওদিকে দেখি, আমার আপাটা বসে বসেই ঘুমানো শুরু করেছেন।

রওশন আরা হাসতে লাগলেন। আবদুল আজিজ বললেন—বলেন কি ! এতটাই দুর্বোধ্য ?

ঃ একেবারে দুর্বোধ্য না হলেও, কিছুটা কঠিন তো বটেই। আপার ভাব দেখে বুঝলাম, উনি একদম কিছুই বুঝতে পারেননি।

ঃ আর আপনি ?

ঃ আমি কিছু কিছু বুঝেছি। আসলে এদিকে তো মন কখনও দেইনি, মন দিলে মনে হয় ঠিকই বুঝতে পারবো। মাঝে মাঝে এমন সব আজব কথা বলেন উনি, তাতে ওদিকেও মন দিতে ইচ্ছে কিছুটা হয় বৈ কি ?

ঃ তাহলে দেননি কেন ?

ঃ বাহ, কাব্য সাহিত্যের মতো এমন সরস বিষয় রেখে ঐসব নীরস তত্ত্বের দিকে মন সহজে যেতে চায় ?

আবদুল আজিজ থামলেন। কিঞ্চিৎ নীরব থেকে বললেন—মন দিলে আমার মনে হয় ওদিকেও রস পাবেন। তত্ত্ব কথা হলেও, এতসব আজব বিষয় এর মধ্যে আছে, আর এ ব্যাপারে উনার জ্ঞান এত গভীর যে, একবার ধৈর্যের সাথে মনোনিবেশ করলে, ক্রমেই আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন।

রওশন আরা বেগম কিছুটা করুণ কণ্ঠে বললেন—তা ঠিক। উনার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয় বুঝলেন ? এমন একজন জ্ঞানী গুণী লোককে অন্দরে এভাবে আটকিয়ে না রেখে উনার কাজ উনাকে যদি করতে দেয়া হতো, তাহলে আমার মনে হয় উনি অনেক বড় হতে পারতেন। এই ফৌজী কাজও উনার কাজ নয়। উনার কাজ ছিল জ্ঞান চর্চা করার কাজ।

আবদুল আজিজ প্রশ্ন করলেন—তাহলে আপনারা তাঁকে এইভাবে অন্দরে আটকে রেখেছেন কেন ?

ঃ কি আর বলবো বলুন। এটা আমার আপার একগুঁয়েমী। আমার আপার ধারণা, আলী ভাই অন্দরে না থাকলে, অন্দরের সর্বস্ব একদিনেই নিলাম ডাকে বিক্রি হয়ে যাবে আর উনার হুকুম-আদেশ এমন বিশ্বস্তভাবে পালন করার লোক একটাও উনি পাবেন না। ওদিকে আলী ভাইও আবার বিলকুল আলাভোলা। পাগল কি আর ভাবে লোকে সাধে ? হুকুম করলে 'না' কখনও বলবেন না, বা হুকুম পালনে না-খোশও কখনও হবেন না। যেন এর মধ্যেই তামাম আনন্দ উনার। এরপর আর কিসে কি হবে বলুন ?

ঃ ঠিক-ঠিক। এ এক বিচিত্র মানুষ !

ঃ বিচিত্র তো বটেই। এছাড়া, মাটির মানুষ বলতে বোধ হয় এদেরকেই বুঝায়।

ঃ অথচ দেখুন, এইসব মানুষেরা সবারই খেদমত করে বেড়ায় আর এদের খেদমত করার লোক এ বিশ্বে কেউ নেই। এরা একদম এতিম !

রওশন আরা সঙ্গে সঙ্গে কিছুই বলতে পারলেন না। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আল্লাহর কি খেয়াল তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন ! তবে নিজের ব্যাপারে নিজে যত্নবান না হলে এমন অবস্থা রোধ কখনও হবে না। আমার মনে হয়, কিছু লোক এতিম হয়ে থাকাকেই অধিক পছন্দ করেন।

ঃ তাই কি ?

ঃ আমার তো তাই মনে হয়।

ঃ তা মনে হওয়ার কারণ ?

নিমেষখানেক চিন্তা করে রওশন আরা বললেন—কারণটা জানিনে। তবে কিছু লোককে প্রায়ই এই রকমই দেখি।

ঃ প্রায়ই দেখেন ?

ঃ দেখিই তো। এই আপনারও তো ঐ অবস্থাই দেখে এলাম কাল গিয়ে। অতবড় মকান। তয় তদবিরের লোক কিছু থাকলেও আপনিও তো একদম এতিম। আপনার নিজের চত্বর, নিজের কক্ষ, বিলকুল ঢন ঢন। কি করে যে দিন কাটে আপনার !

আবদুল আজিজ হাসি মুখে বললেন—আচ্ছা !

ঃ কিযে খান তার আর কে যে যত্ন নেয় আপনার, তাতো অনুমান করতে আদৌ কষ্ট হয় না, খামাখা আপনি জুদা হয়ে গেলেন কেন বলুন দেখি ?

আবদুল আজিজ পুনরায় মৃদু হেসে বললেন—না গিয়ে কি করতে পারতাম ?

ঃ এখানে থাকতেন।

ঃ এখানে থাকলেই বা কে আমার যত্ন নিতো ?

ঃ লোকের এখানে অভাব আছে ? কেউ না নেয়, আমি নিতাম।

ঃ আপনি ? আপনি আমার যত্ন নিতেন ?

ঃ নিতামই তো।

ঃ আপনি তকলিফ বোধ করতেন না ?

ঃ তকলিফ হবে কেন ? আপা আর দাসদাসীদের কথা থাক, আমি আছি, আলী ভাই আছেন, আমরা কি আপনাকে অযত্নে থাকতে দিতাম ?

ইতিমধ্যে মাগরিবের আজান শুরু হলো। নামাজ অন্তে এসে আবদুল আজিজ অনেক সময় পর্যন্ত এঁদের কাব্য কাহিনী শুনালেন। অতপর আহার অন্তে যখন তিনি নিজ গৃহে ফিরলেন, তখন অনেক রাত।

৩

উলুবেড়িয়া থেকে হুগলীর দূরত্ব স্থলপথে অনেক কম। হুগলী নদী ঘুরে ঘুরে এখান থেকে হুগলীর যে দূরত্ব স্থলপথে এ দূরত্ব প্রায় আধেকের কাছাকাছি। এ কারণে অশ্বযোগে তো বটেই, নদী-নৌকোর ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে পদব্রজেও অনেকে এই পথে হুগলীতক চলাচল করে থাকে। হাতের ডাইনে পড়ে থাকে সুতানদী, সিরানপুর (শ্রীরামপুর), চাঁদের নগর (চন্দননগর), চিঁচূড়া, প্রভৃতি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও নদী বন্দর। এসব স্থান থেকেও সংযোগ পথে লোকজন এসে এই বড় রাস্তায় উঠে ও উত্তর দক্ষিণে যাতায়াত করে। এ রাস্তার নির্মাতা মূলত অশ্বারোহীরা। সরাসরি অশ্ব ছুটিয়ে যাতায়াত করার ফলে সরল রেখার আকারে রাস্তাটি সোজা হয়ে হুগলীতে এসে পৌছেছে, ডাইনে বাঁয়ের গ্রাম বন্দরে ঢুকে এঁকেবেঁকে যায়নি। পথিকদের চলাচলের সুবিধার্থে বাংলার প্রশাসন বহুদিন পূর্বেই দেশের আর পাঁচটা বড় রাস্তার মতো এ রাস্তাটিও মাটি ফেলে উঁচু করে ও ছাঁয়া প্রদানের গাছ-গাছড়া রোপণ করে। সেই গাছ-গাছড়ার কিছু কিছু আজও টিকে আছে এবং মহীরুহ হয়ে রাস্তাটির মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। অতপর স্থানে-স্থানে মাদ্রাসা-মক্তব আর দোকান পাট গড়ে উঠে রাস্তাটির গুরুত্ব আরো বাড়িয়েছে। এতদসত্বেও লোক বসতি থেকে দূরে তেপান্তরের রাস্তার মতো রাস্তাটি স্থানে স্থানে ক্রোশের পর ক্রোশ একেবারেই নির্জন।

ঝাঁ-ঝাঁ দ্বিপ্রহর। কাঠফাটা রোদ। চৈত্র মাসের শুরুতেই রোদের তেজ ভয়ানক বেড়ে গেছে। এই রোদ মাথায় নিয়ে উলুবেড়িয়ার দিক থেকে একটা আচ্ছাদন ওয়ালা টমটম বা ঘোড়ার গাড়ী হুগলীর দিকে ছুটে আসছে। হুগলী তখনও অনেকখানি দূরে আছে। মাঝখানে উন্মুক্ত এক মাঠের মধ্যে রাস্তাটি আবার একেবারেই জনহীন। এই নির্জন পথের মধ্যভাগে একরখানেক মাটি জুড়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক বটগাছ। পাশেই তার এক স্বচ্ছ পানির সরোবর।

দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসে অশ্বটি খুবই হাঁপিয়ে গেছে। ফেনা জমেছে মুখে। তার নাসিকার গহবর দ্বয় পুনঃ পুনঃ প্রসারিত হচ্ছে। এই বটতলায় এসেই গাড়োয়ান তার গাড়ীটা থামিয়ে দিল। লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে সে গাড়ীখানা গাছের দিকে টেনে নিতে লাগলো। গাড়ীর আরোহী ছিলেন একজন বয়স্ক ইংরেজ। সে বেচারা এতে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি শংকিত কণ্ঠে বললেন—আরে-আরে, কেয়া হুয়া ল্যাংকাশায়ার ? টুমি লোগ্ এখানে গাড়ী ঠামাইলে কেনো ?

গাড়োয়ানের নাম লঙ্কেশ্বর। লঙ্কেশ্বর এর জবাবে বললেন—না থামালে আর যাওয়া যাবে না সাহেব। ঘোড়া বেজায় ধুর্কে গেছে। বিরাম না দিলে ঘোড়ার সর্দি গর্মী হবে।

সাহেব বুঝতে না পেরে বললেন—সর্দি গর্মী !

ঃ ঘামে গরমে ঘোড়া আমার মারা যাবে।

ঃ ও, সমঝলিয়ে। গোড়ার ষ্ট্রোক্ হবে। লেকেন হিঁয়াপর ঠামিলে কেনো ? এটো একডম নোম্যান্স্ ল্যান্ড্। আইমিন, লা-ওয়ারিশ ময়ডান আছে। কুয়ী ডাকু লুটেরা—

লঙ্কেশ্বর আশ্বাস দিয়ে বললো—না-না সাহেব, ওসবের কোন ভয় নেই। আপনি ঐ ছায়ায় গিয়ে আরাম করে বসুন। একটু হাওয়া খান। গাড়ী ছাড়তে এখন বেশ দেরী হবে।

ঃ ডেরী হোবে ?

ঃ জি সাহেব। ঘোড়াটা ঠাণ্ডা করবো, পানি খাওয়াবো, তারপর ফের গাড়ী ছাড়বো।

ঃ ও গড্ ! সেভ্ মি।

স্বগতোক্তি করে সাহেব তাঁর বুকে ক্রসচিহ্ন আকলেন এবং শংকাকুল চিত্তে গাড়ী থেকে নামলেন। গাড়ী থেকে ঘোড়া খুলে লঙ্কেশ্বর সেটা এনে সামনেই বটগাছের এক শিকড়ের সাথে বাঁধলো এবং ওখানেই বসে পড়লো। সাহেব এসে বটগাছের ডাল থেকে নেমে আসা মোটা চিকন অসংখ্য শিকড়গুলি অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ দেখলেন। এরপর শিশ্ দিতে দিতে এক পা দু'পা করে বটগাছটির অপর পাশে চলে এলেন। সাহেবের চোখ দু'টি এতক্ষণ গাছের দিকে ছিল। জমিনের দিকে নজর দিয়েই তিনি মহাতংকে "ডাকু-ডাকু, রাহাজান—" বলে চীৎকার দিতে লাগলেন।

বটগাছটির বিশাল গুঁড়ি ও শিকড় ঢাকা প্রশস্ত এলাকার এ পাশে এক ছায়া ঢাকা পরিচ্ছন্ন স্থানে অন্য এক পথিক হাত-পা মেলে শুয়েছিলেন। পরিশ্রান্ত দেহে খোলা হাওয়া লাগায় তাঁর তন্দ্রাভাব এসেছিল। তাঁর মাথার তলে মোটা একটা থলে ছিল এবং পাশেই তাঁর বেঁধে রাখা ঘোড়াটা ঘাস পাতা চিবুচ্ছিলো। শিকড়-গুঁড়িতে আড়াল থাকায় আর অনেকখানি দূরে হওয়ায়, এপার থেকে সাহেবেরা পথিককে দেখতে পাননি। ওদিকে আবার, তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকায় এঁদের আগমন পথিকটিও অনুভব করতে পারেননি। এক্ষণে সাহেবটি চীৎকার দিয়ে উঠায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। "কি হলো-কি হলো" বলে গাড়োয়ান লঙ্কেশ্বর পড়িমরি ছুটে এলো। পথিকটিও ধড়মড় করে উঠে বসে "কৈ ডাকু, কোথায় ডাকু" বলে ক্ষিপ্রগতিতে চারদিকে নজর দিতে

লাগলেন। কোথাও কাউকে না দেখে তিনি সবিস্ময়ে সাহেবের দিকে চেয়ে রইলেন।

লঙ্কেশ্বর এসে পথিককে দেখেই সসম্ভ্রমে বলে উঠলো—আরে ! পোদ্দার বাবু যে ! নমস্কার-নমস্কার—

নমস্কারের জবাব দিয়ে পথিকটি বললেন—কি ব্যাপার লঙ্কেশ্বর ? তোমরা—মানে ইনি ?

লঙ্কেশ্বর সহাস্যে বললো—সাহেব-সাহেব, ইংরেজ সাহেব। উলুবেড়িয়া থেকে আসছেন। বাংলা মুলুকে নতুন এসেছেন তো ! উনার বড় ডাকুর ভয়।

ঃ বলো কি !

ঃ আর কি বলবো বাবু ! উলুবেড়িয়ার প্রায় সব সাহেবেরাই আমাকে চেনেন আর তাঁরাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বলে এই সাহেব একা একা আমার গাড়ীতে এলেন। নইলে এই দিনের বেলাতেই ইনি একা একা কারো গাড়ীতে আসতেন না।

সাহেবটি অনেকখানি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এদের উভয়কে কথাবার্তা বলতে দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন। কিছুটা এগিয়ে এসে অপেক্ষাকৃত সহজকণ্ঠে বললেন—কেয়া ল্যাংকাশায়ার ? ইয়ে আড্মী জেন্টলম্যান আছে ? কুয়ী ডাকু না আছে ?

লঙ্কেশ্বর বিরক্তির সাথে বললো—আরে কি ডাকু-ডাকু করছেন সাহেব ? ইনি একজন রীতিমতো ভদ্রলোক। পোদ্দার বাবু। বিখ্যাত ব্যবসায়ী কেষ্টলাল পোদ্দার।

সঠিক বুঝতে না পেরে সাহেব বললেন—ইজ ইট ? ইয়ে আড্মী বিজনেস্ম্যান ? ক্যাষ্টার ওয়েল পাউডার কা বিজ্নেস্ম্যান ?

লঙ্কেশ্বর গরম কণ্ঠে বললো—ক্যাষ্টার ওয়েল পাউডার নয় সাহেব, কেষ্টলাল পোদ্দার। এটা উনার নাম।

সাহেব এবার শরম পেয়ে বললেন—ও, আই এ্যাম সরি ! কেষ্টালাল পাড্ডার। ইয়ে আড্মী কো নেম্ ! গুড্ গুড্, ভেরী গুড্ নেম্।

এরপর এগিয়ে আসতে আসতে সাহেব অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—এক্সকিউস্ মি, মিঃ পাড্ডার। হামি বহুট্ গলটি করিয়াছে। হামাকে মাফ করিয়া ডিন—

সাহেব এসে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কেষ্টলাল বাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবের সাথে করমর্দন করলেন। লঙ্কেশ্বর বললো—এই বাবুর সাথেই বসে বসে গল্প করুন সাহেব। আমার ঘোড়া ঠাণ্ডা হতে অনেক সময় লাগবে। এছাড়া রোদটাও একটু পড়ুক।

লক্ষেশ্বর চলে গেল। পোদ্দার বাবু সাহেবকে বললেন—বসুন সাহেব, বসুন। এই জায়গাটা ভাল। এখানেই বসে পড়ুন।

সাহেব খুশী হয়ে বললেন—ও ইয়েস্-ইয়েস্। থ্যাংক্ ইউ !

উভয়েই ঘাসের উপর বসে পড়লেন। কেষ্টলাল পোদ্দার হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন—মহাশয়ের নাম ?

ঃ হামার নাম ? হামার নাম ডেভিড্ স্মিথ্ আছে। মিঃ স্মিথ্।

ঃ আচ্ছা ! তা মিঃ স্মিথ্ কি এ দেশে নতুন এসেছেন ?

ঃ ইয়েস্-ইয়েস্। বিলকুল নিউম্যান, নয়া আড্মী।

ঃ আপনি কি কোম্পানীর লোক ? মানে এই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে নকরী নিয়ে এসেছেন ?

ঃ নকরী ! নো-নো। হামি টুর করিটে আসিয়াছে। হামি এডেশ ভ্রমণ করিটে চায়।

ঃ ভ্রমণ করতে ?

ঃ হাঁ, ভ্রমণ করিটে। এ ডেশে হামাডের কোম্পানীর মধ্যে বহুট গোলমাল চলিটেছে। জিয়াডা হচ্পচ্। টহবিল টস্রুপ হইটেছে আওর লীডারশিপ লইয়া কোম্পানীর আডমীরা গোলমাল করিটেছে। হামাডের ডেশ হইটে হামাডের কোম্পানীর ডাইরেকটার মিঃ ষ্ট্রেনশ্যাম মাষ্টার একঠো টিম, আইমিন ডল লইয়া উহা টডক্ট করিটে আসিল। মওকা পাইয়া হামি উহাডের সাঠে সামিল হইলো।

মিঃ ডেভিড্ স্মিথ হাসতে লাগলেন। কেষ্টলাল বাবু বললেন—তাহলে তো শিগ্গিরই আবার দেশে ফিরে যাবেন, নাকি বলেন ?

ঃ অফ্ কোর্স হামি লোক একজন টিচার আছে। হামার ডেশে একঠো বড় বিড্যালয়ে হামি শিক্ষাডান কাম করে। বিড্যালয়ে ফের জয়েন করিটে হোবে জরুর।

ঃ ও, আপনি একজন পণ্ডিত ? মানে বিদ্যালয়ের আলীম ?

ঃ রাইট। একজন আলীম আছে। এ টিচার অফ্ হিউম্যানিটি এ্যাণ্ড সিভিলাইজেশান। হামার টালেবে এলেমডের হামি মানবিক বিড্যা আওর সভ্যটার ইটিহাস শেখায়। ইস্ লিয়ে হাপনাডের ডেশ দেখিটে হামার জরুরট হইল। কোম্পানীর লোক-নওকর টৈয়ার করার কাযে হাপনাডের সোসাইটি, আইমিন, সমাজ আওর সভ্যটা হামার জানার জরুরট হইল। হামি চলিয়া আসিল।

কেষ্টলাল পোদ্দার ব্যবসায়ী হলেও রসিক মানুষ। কিছু লেখাপড়াও জানেন। তিনি বললেন—আচ্ছা। তা আমাদের দেশ কেমন দেখছেন ?

এ প্রসঙ্গে মিঃ স্মিথ উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। বললেন—ওঃ, ওয়াণ্ডারফুল ! ভেরী প্রস্পারাস কান্ট্রি। এট্না ডৌলট হামি ডুসরা কোঠাও দেখিল না। বহুট উন্নট ডেশ। নগর-বন্দর, বিল্ডিং-ইমারট, লেবাস-ড্রেস্, বিলকুল বহুট উমডা। হামার খুব ভাল লাগিটেছে। হামি টাজ্জব বনিয়া যাইটেছে।

ঃ তাই ?

ঃ শিওর-শিওর। ইহার সাঠে হাপনাডের নিরাপট্টা মজবুট ঠাকিলে হামি হাপনাডের আউর জিয়াডা টারিফ করিটো।

ঃ তারিফ তো আপনারও আমার করতে হচ্ছে সাহেব।

ঃ হামার টারিফ ! কেন্যে-কেনো ?

ঃ আপনি এদেশে নতুন এসেছেন। অথচ এদেশের ভাষাটা আপনি এত শিগ্গির এতটা রপ্ত করলেন কি করে ?

মিঃ স্মিথ্ সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন—ও মাই ডিয়ার ! হামি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এডেশে আসিবার জন্যে হামি বেঙ্গলী আওর পারসিয়ান ল্যাংগুয়েজে জিয়াডা টালিম লইয়া আসিয়াছে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ ও শিওর। লোকাল ল্যাংগুয়েজ, আইমিন, স্টানীয় ভাষা না জানিলে ভ্রমণ করিয়া ফায়ডা কি হোবে, বলুন ?

ঃ তা ঠিক, তা ঠিক।

যে থলেটা পোদ্দার বাবুর মাথার তলে ছিল, সেটা ওখানেই পড়েছিল। এবার সেটা কাছে টেনে নিতেই তা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো। মিঃ স্মিথ চমকিত হয়ে বললেন—কেয়া মিঃ পাড্ডার ? উহার ভিটর কি আছে ? উহা বাজিটেছে কেনো ?

পোদ্দার বাবু হেসে বললেন—কিছু তংকা আছে।

ঃ টংকা ! আইমিন, রুপেয়া ?

ঃ হ্যাঁ, রুপেয়া।

ঃ কেট্না রুপেয়া ?

ঃ বেশী নয়। শ' পাঁচেক। ঘাটে মাল দিয়ে এলাম তো ? তার দাম।

সাহেবের দুইচোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তিনি অপার বিস্ময়ে বললেন পাঁন ছো ? ও মাইগড্ ! পাঁন ছো রুপেয়া লইয়া হাপনি বিরাণ ময়ডানে একা ঘুমাইয়া আছেন ?

ঃ কেন ? তাতে কি হয়েছে ?

ঃ লুটেরা ! কুয়ী লুটেরা-ডাকু ডেখিলে টো বিলকুল লুটিয়া লইবে !

ঃ লুটেরা ডাকু কোথায় দেখলেন আপনি ?

ঃ নাই ? এ মুলুকে কুয়ী থিফ-রাবার, আইমিন চোর ডাকু নাই ?

কেষ্টলাল পোদ্দার নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন—না, নেই। বিশেষ করে এই স্থল পথে এখন আর একটাও খুঁজে পাবেন না আপনি।

ঃ হাউ স্ট্রেঞ্জ !

ঃ নৌপথে অবশ্য এখনও কিছু দস্যু তস্কর আছে, আর তারা এদেশের কেউ নয়। সবাই তারা আপনাদের ঐ পশ্চিম মুলুক থেকে আসা দস্যু-তস্কর। স্থল পথে চোর ডাকাতের উৎপাত এখন কিছুমাত্র নেই।

ঃ কেয়া টাজ্জব ! হামি যে শুনিলো, বাংলা মুলুকে বহুট লুটেরা আড্‌মী আছে, বাংলা মুলুক লুটেরা আড্‌মী কো ডেরা আছে, কুয়ী সেফটি কোঠাও নাই ?

ঃ আপনি ভুল শুনেছেন।

ঃ ভুল ?

ঃ আগে অবশ্য জিয়াদাই ছিল। কিন্তু এখন বিলকুল সাফ। এ মুলুকের শাসন এখন এত কড়া যে, মউত নিশ্চিত জেনে চোর-দস্যু সবাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এদেশ থেকে পালিয়েছে।

ঃ কোঠায় গেলো ?

ঃ নিজ নিজ মুলুকে। বাংলা মুলুকের মানুষ স্বভাবতঃই সরল ও সাদাসিধে। লুটপাটে তেমন একটা অভ্যস্ত এরা কোনদিনই ছিল না। এদেশ ধনধান্যে ভরা দেশ। কদাচিৎ দু'একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও তা নিতান্তই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। একটা আঞ্চলিক ব্যাপার স্যাপার। পশুর মতো আজীবন লুটতরাজ করে খাওয়ার গরজ এ মুলুকের কোন লোকের নেই। বহিরাগত নিরন্ন দেশের লুটেরা এসেই মাঝে মাঝে এদেশে লুটতরাজের হিড়িক পয়দা করে।

ঃ বহিরাগট ? আইমিন ভিন দেশী ?

ঃ হ্যাঁ, ভিন দেশী। কিছুদিন আগে তো আপনাদের ঐ এলাকার লোকেরাই এদেশে লুটতরাজের তুফান ছুটিয়ে দিয়েছিল। আপনাদের ঐ ইউরোপীয় বণিকেরা এদেশে আসার আগে এদেশের নদী-বন্দরে কোন বিপত্তি ছিল না। হাজার হাজার টাকার ধন-সম্পদ নিয়ে যে কেউ নিশ্চিন্তে নদী পথে চলাফেরা করতে পারতো আর যেখানে সেখানে নৌকা বেঁধে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতো। কিন্তু যেদিন থেকে ইউরোপীয় বণিকেরা এদেশে আসা শুরু করলো, সেদিন থেকেই নৌপথের নিরাপত্তা উধাও হয়ে গেল। বাণিজ্য করার সাথে বণিকেরা সবাই সুযোগ পেলেই জলপথে দস্যুতা করতে শুরু করলো।

সাহেব এবার সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—সবাই মানে ? হামার ডেশের আড্‌মীরাও ?

ঃ হ্যাঁ, আপনার দেশের আদমীরাও। যদিও পর্তুগীজেরাই এ দুষ্কর্ম আগে আর ব্যাপকভাবে শুরু করে, তবু ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, কেউই এই নোংরামী করতে কম করেনি।

ঃ আই সি !

ঃ এখনও নৌপথে যে কিছু কিছু লুটতরাজের অঘটন ঘটে, ধরা পড়লে দেখা যায়, প্রতি পাঁচটা অঘটনে কমপক্ষে একটাতে ইংরেজরা আছেই। বাদবাঁকীতে অন্য দেশের লোকেরা।

ঃ পাড্‌ডার বাবু !

ঃ খেতে না পাস্ ভিক্ষে চা, আমরা ভিক্ষে দেবো। তোরা লুটতে আসিস্ কোন সাহসে ? এদেশটা কি লা-ওয়ারিস ? কিছুদিন এদেশের শাসনটা কিছু দুর্বল ছিল বটে, কিন্তু তাই বলে কি চিরদিনই এক অবস্থা থাকে ? আজ দ্যাখ্ শাসন কাকে বলে। আমাদের এই নবাব শায়েস্তা খান বাহাদুর এসে এমন কোৎকা হাঁকিয়েছেন যে, সব ব্যাটার লেজ এখন খাপ্ ! অধিকাংশেরাই বাপ্ বাপ্ করে নিজ মুলুকে পালিয়েছে আর বাদবাঁকী যারা আছে, ঐ কম্মে হাত দেয়ার কথা ভাবার আগেই পিলে তাদের চমকে চমকে উঠছে।

ঃ বলেন কি ! এয়সা ?

ঃ এদেশে বড়জোর দু'দশজন সিঁধেল আর ছ্যাঁচড়া চোর ছিল। দেশের শাসন দুর্বল হলে এরা যা কিছু উৎপাত করতো, তা নিতান্তই মামুলী। আপনাদের ঐ পশ্চিমা দেশের লোকের মতো এমন জাহাজ মারা আর গুদাম কাটা চোর বদমায়েশ এদেশে কেউ ছিল না বা পশুর মতো লুটে খাওয়ার এমন হিংস্র মনোবৃত্তিও এদেশের লোকের ছিল না। এখন যে দু'চারজন চোর ডাকু পয়দা হয়েছে এদেশে, তা ঐ আপনাদের দেশের লোকেরাই বানিয়েছে।

ঃ টাজ্জব !

ঃ এই দেখুন না, পর্তুগীজেরা এদেশে এসে বাণিজ্য করার নামে এমন ব্যাপক হারে দস্যুতা শুরু করলো যে, ওদের দেখা দেখি আরাকানের মগেরাও দলে দলে এই কর্মে ঝুঁকে পড়লো। পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী আর আরাকানের মগেরা কয়েক বছর আগে এদেশে লুটপাট ও চুরি ডাকাতির যে মাতম শুরু করেছিল, তার মধ্যে এদেশের লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই জঘন্য কাজ এদেশের লোক মোটেই পছন্দ করেনি। পর্তুগীজদের সাথে ইংরেজেরাই ব্যাপকভাবে এই নোংরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর ক্রমে ক্রমে অন্য দেশের কিছু কিছু বণিকেরাও তাদের সাথে যোগ দিল। নবাব শায়েস্তা খান এসে শক্ত মুগুর না ফেললে, এদেশে সত্যি সত্যি চোর-ডাকাতের রাজত্বই কায়েম হয়ে যেতো।

এসব কথা শুনে সাহেব কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। এরপর আফসোস্ করে বললেন—স্যাড্-স্যাড্, ভেরী স্যাড্ !

সমঝদার শ্রোতা পেয়ে কেষ্টলাল বাবু আর একটু যোগ দিয়ে বললেন—আফসোসের কথা অনেক আছে সাহেব। সেগুলো প্রায় সবই আপনাদের এই ইংরেজ বণিকদের নিয়ে। কিন্তু আপনি এদেশে মেহমান। সেসব কথা বললে আপনি নাখোশ হতে পারেন বা দুঃখ পেতে পারেন বলেই তা আর বলতে চাইনে।

মিঃ স্মিথ একথায় চাঙ্গা হয়ে উঠে বললেন—নো-নো, হামি দুঃখ পাইবে না। হাপনি বলুন পাড্ডার বাবু, হামি শুনিটে চায়-জানিটে চায়। হামার জানার বহুট খাহেশ হয়। কাইন্ডলী হাপনি টামাম কঠা বলুন।

পোদ্দার বাবু মৃদু হেসে বললেন—অত কথা কি আর বলে শেষ করা যায় স্যাহেব ? মোদ্দাকথা হলো, আপনাদের ঐ ইউরোপের আর পাঁচটা দেশের বণিকদের তবু কিছুটা আদব কায়দা আর শরমবোধ আছে। তারা রীতিনীতি অনেকটা মেনে চলে ও ন্যায় অন্যায় বোঝে। কিন্তু ন্যায়নীতি পড়ে থাক, আপনাদের এই ইংরেজ বণিকদের যে হায়া শরম বা রুচি বলে কিছু আছে, আজ পর্যন্ত তা আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না। আপনাদের এই কোম্পানীর ছোট ছোট কর্মকর্তাদের তো কথাই নেই, বড় বড় মানুষেরাও যে রকম হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে, তা এদেশের কোন কুলি কামিনও কল্পনা করতে পারে না।

সাহেবের সাদা মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—মাই গড্ !

ঃ অধিক কথা বলবো কি ? এই হুগলীর কুঠিয়াল জন বায়্যাম তো কোম্পানীর একজন উচ্চ পর্যায়ের লোক। অথচ চুরি করে মাল পাচার করতে আর সে জন্যে একেবারেই বর্বরোচিত পদক্ষেপ নিতে যে রুচিতে তার বাধেনি, একথা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন। শুনেন নি ?

মিঃ ডেভিড স্মিথ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—ও, ইয়েস্। হামি জরুর শুনিয়াছে আওর শুনিয়া বহুট শরমবোড্ করিয়াছে। উহার কারণেই টো হামাডের কুয়ী বোট এখোন হুগলীর ডিকে আসিটেছে না। আটক হওয়ার বয় পাইটেছে।

ঃ সাহেব !

ঃ ইস লিয়ে হামাকে বাই কার্ট, আইমিন, গাড়ীটে করিয়া হুগলী যাইটে হইটেছে, বাই বোট যাইটে পারিটেছে না।

মিঃ ডেভিড স্মিথ যে একজন মোটামুটি ভাল লোক, কেষ্টলাল বাবু তা বুঝতে পারলেন। তিনি একজন আলীম অর্থাৎ শিক্ষক। শিক্ষকেরা যে সর্বত্রই প্রায় কিছুটা চরিত্রবান, এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হলেন। মিঃ স্মিথকে আঘাত বা অপমান করার ইরাদা তাঁর ছিল না। তবু আবেগ তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না। চুপ করে যেতে চেয়েও ফস্ করে বলে ফেললেন—আচ্ছা সাহেব, এই যে সব মানবিক শিক্ষা-সভ্যতা শিক্ষার কথা বললেন, এত করেও আপনার দেশের লোকদের আপনারা মানুষ বানাতে পারলেন না ?

মিঃ স্মিথ ম্লান কণ্ঠে বললেন—পাড্ডার বাবু !

সম্বিতে ফিরে এসে কেষ্টলাল পোদ্দার অনুতাপ করে বললেন—আমি দুঃখিত মিঃ স্মিথ। কথাটা আমার সত্যিই বড় কটু হয়ে গেছে। আমি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। আপনি আমাকে মাফ করে দিন।

মিঃ স্মিথ সংগে সংগে সরবে বলে উঠলেন—ও, নেভার-নেভার। আপনি কুছু বাড়াইয়া বলে নাই, সাচ্ বাট্ বলিয়াছেন। রেজাল্ট, আইমিন, অবষ্টা যে এইসা মাফিক হোবে, ডেশে ঠাকিটেই উহা হামি আন্তাজ করিয়া লইয়াছে।

ঃ সাহেব !

ঃ কিন্টু এটো জিয়াডা মন্ড হোবে, উহা বুঝিটে পারে নাই।

ঃ কি রকম ?

ঃ পাড্ডার বাবু, যখন হামি ডেখিল, হামার ডেশের বহুট গুণ্ডা আওর রাস্কেল আডমী ডল বাঁধিয়া কোম্পানীর নকরীটে যোগডান করিটেছে, ভ্যাগাবন্ড আওর রাফিয়ানডের লইয়া কোম্পানীর শিপ্ ভিন্ মুলুকে বাণিজ করিটে যাইটেছে, টখনই হামি বুঝিল, কারবার জরুর এইসা মাফিক হোবে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ হামার ডেশে ওয়েল্থ, আইমিন, সম্পড্ রিয়ালী বহুট কম আছে। লাইফ বহুট্ হার্ড আছে। রোটির জন্যে অনেক কষ্ট করিটে হয়। ভিনডেশের জিয়াডা তৌলট্ ডেখিলে যে উহাডের মাঠা বিগ্ড়াইয়া যাইবে, টাহা হামি আগারী সমঝিয়া লইলো। সটটার জন্যে, আইমিন, অনেষ্টি কো লিয়ে জরুরট মজবুট চরিট্ট পাড্ডার বাবু, উমড়া ক্যারেকটার। লেকেন, হামাডের এই কোম্পানীর আডমীর মধ্যে যে উহার বিষ্টর অভাব আছে, টাহা হামাকে এ্যাড্মিট্ করিটেই হোবে। মানিয়া লইটেই হোবে।

ঃ বলেন কি সাহেব !

ঃ হামি প্রোটেষ্ট করিলো, প্রটিবাদ করিলো, কোম্পানীকে সমঝাইটে চাহিল, ইহাটে হামার ডেশের ইমেজ ভিন্ডেশে বহুট খারাব হোবে। লেকেন কুয়ী ফায়ডা হইল না। ভুখার কাছে গসপেল, আইমিন, হিটোপডেশ কাম করে না পাড্ডার বাবু। বিষ্টর মুনাফা ডেখিয়া হামাডের কোম্পানীর অথরিটি বেজায়

খোশ হইয়াছে, জিয়াডা প্লীজড্ বনিয়া গিয়াছে। ইটার ফের, বাই হুক অর ক্রুক, আইমিন, সঠ অসঠ যে পঠেই হোক, ডেশে হিউজ ওয়েল্‌থ ঢালিয়া পড়িটেছে ডেখিয়া হামাডের রাজা ভি মজিয়া গিয়াছে। জানেন টো, সম্পডের লোভ বহুট বেয়াড়া লোভ আছে।

ঃ সাহেব !

ঃ ডেশে ফিরিয়া যাইয়া এগেন হামি প্রটেষ্ট করিবে। জোরডার প্রটিবাড করিবে জরুর। লেকেন ফায়ডা কি হোবে হামি বলিটে পারে না পাড্‌ডার বাবু।

সাহেব অত্যন্ত মনমরা হয়ে গেলেন। তিনি উদাস নেত্রে শূন্যের দিকে চেয়ে রইলেন। কারো মুখে আর কোন কথা ফুটলো না। কিছুক্ষণ পর কেষ্টলাল পোদ্দার মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন—আপনি সত্যিই একজন মহৎ লোক সাহেব, একজন খাঁটি ভদ্রলোক। আপনাকে না দেখলে, দু'একজন ভাল লোকও যে আপনার দেশে থাকতে পারে, এ বিশ্বাস আমার হতো না।

ঃ পাড্‌ডার বাবু !

ঃ আমার এক জ্ঞাতি ভাই রঘুলাল পোদ্দারকে আপনাদের এই ইংরেজ কুঠিয়ালরা নির্মমভাবে খুন করেছে সাহেব। একেবারে অন্যায়ভাবে পিটে মেরে ফেলেছে। নিজেদের অন্ধ স্বার্থ হাসিলের জন্যে মানুষকে মানুষ কায়দায় পেয়ে যে এমনভাবে হত্যা করতে পারে, তা কল্পনা করা যায় না।

ডেভিড স্মিথ চমকে উঠে বললেন—পাড্‌ডার বাবু !

কেষ্টলাল পোদ্দার পুনরায় সহৃদয় কণ্ঠে বললেন—এ কারণেই আপনাদের বণিকদের প্রসঙ্গে ঝোঁকের মাথায় আমি এত কথা বললাম মিঃ স্মিথ। আপনাকে শরম বা দুঃখ দেয়ার জন্যে নয়। দয়া করে আমার কথায় আর আচরণে আপনি কোন যাতনাবোধ করবেন না বা দীলে কোন দুঃখ রাখবেন না।

ইতিমধ্যে লঙ্কেশ্বর পুনরায় এসে হাজির হলো। সে বললো—গাড়ীতে ঘোড়া জুড়ে দিয়েছি সাহেব। চলুন, এবার রওনা হওয়া যাক।

লঙ্কেশ্বর কথায় কেষ্টলাল বাবুও নড়ে চড়ে উঠে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ। অনেক দেরী হলো। আমিও উঠি—

উভয়ে উভয়ের কাছে বিদায় নিয়ে কেষ্টলাল পোদ্দার তাঁর অশ্বের দিকে এগুলেন আর মিঃ ডেভিড স্মিথ এসে গাড়ীতে উঠে বসলেন। লংঙ্কেশ্বর গাড়ীতে উঠে ঘোড়াকে তাড়া দিতে যেতেই তাঁদের পেছন থেকে এক শক্ত কণ্ঠের আওয়াজ এলো-রোখ্ যাও—

তাঁরা চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখলেন, অশ্বারোহী সেপাইয়ের ছোট্ট একটা দল তাঁদের একদম কাছাকাছি এসে গেছে। এদের অগ্রভাগে রয়েছেন ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ।

তাঁকে দেখেই লঙ্কেশ্বর লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নামলো এবং দূরে থেকেই সালাম দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। আবদুল আজিজ নিকটে এসে প্রশ্ন করলেন—কে এই সাহেব ? ইনি কি ইংরেজ ?

লঙ্কেশ্বরের সভয়ে বললো—কি হুজুর !

আবদুল আজিজ ফের প্রশ্ন করলেন—ইনি কোন কুঠির কুঠিয়াল ?

ঃ তা বলতে পারবো না হুজুর। তবে ইনি এদেশে নতুন এসেছেন।

ঃ কোথা থেকে আসছো তোমরা ? যাবে কোথায় ?

ঃ উলুবেড়িয়া থেকে হুজুর। সাহেব হুগলী হয়ে কাশিম বাজার যাবেন।

ঃ আচ্ছা।

অতপর আবদুল আজিজ বেগ সাহেবের দিকে এগিয়ে এসে সাহেবকে প্রশ্ন করলেন—আপনি উলুবেড়িয়ার কুঠিতে ছিলেন ?

এ ঘটনায় সাহেব কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শুষ্ক কণ্ঠে বললেন— হাঁ-হাঁ। টাহাই ছিল।

ঃ কত দিন ধরে ছিলেন ?

ঃ বহুট ডিন না হোবে। হপ্তাকাল হোবে।

ঃ জন বায়্যাম নামে কোন ইংরেজ কুঠিয়ালকে আপনি চেনেন ?

ঃ পারসোন্যালী, আইমিন, ব্যকিটগভাবে চেনে না। লেকেন, উলুবেড়িয়াটে আসিয়া হামি উহার নাম শুনিলো আওর উহার ঘটনা শুনিলো।

ঃ এ দুইতিন দিনের মধ্যে জন বায়্যাম বা তার দুকর্মের কোন সহযোগী উলুবেড়িয়ায় এসেছিল ?

ঃ হামি ডেখে নাই বিলকুল।

ঃ শুনেননি ?

ঃ ও-নো। উলুবেড়িয়াটে উহার উপষ্ঠিটির কোন কঠা হামি এ্যাট্‌অল শুনে নাই।

ঃ কি রকম ?

ঃ আডৌ শুনে নাই।

ঃ সত্যি কথা বলুন সাহেব ?

সাহেব হোঁচট খেলেন। তিনি সবিস্ময়ে বললেন—ইয়ে কোন বাট্ আছে জেন্টলম্যান ? হামি মিঠ্ঠা বলিবে কেনো ?

আবদুল আজিজ শক্ত কণ্ঠে বললেন—কারণ, কোন ইংরেজ যে সত্য কথা বলে, এ অভিজ্ঞতা এখানে কারো নেই।

মিঃ স্মিথ শরমে মাথা নীচু করলেন এবং ম্লানকণ্ঠে বললেন—ও, আই সি!

কেষ্টলাল পোদ্দার ইতিমধ্যে তাঁর অশ্বের পিঠে উঠেছিলেন। এদিকে গোলামাল শুনে তিনি আবার তৎক্ষণাৎ অশ্ব থেকে নামলেন। ত্বরিতপদে

এদিকে এসে ফৌজদার আবদুল আজিজকে দেখেই তিনি সবিনয়ে বললেন—সালাম জনাব, সালাম। কসুর মাফ হয়, কি হয়েছে জনাব ?

কেষ্টলালকে দেখে ফৌজদার আবদুল আজিজ নরম কণ্ঠে বললেন—আরে, পোদ্দার বাবু যে !

পোদ্দার বাবু বললেন—ঘাটে মাল দিয়ে এলাম জনাব। তা জনাব এখানে কোন্‌দিক থেকে ?

ঃ গিয়েছিলাম সুতানটিতে। ওখান থেকে উলুবেড়িয়া হয়ে এলাম। ঘটনাটা তো শুনেছেন—মানে-জন বায়্যামের নোংরামী আর দুঃসাহসের কথা ?

ঃ জি-জি। তামাম শুনেছি।

ঃ খবর পেলাম, আসামীদের কয়েকজন এইদিকে এসে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। কিন্তু তালাশ করে কাউকেই পেলাম না। কুঠিয়ালদের সওয়াল করলে তারা এমন ভাব দেখাল, যেন ঘটনাটি সম্পর্কে তারা তেমন ওয়াকিফহালই নয়। কেউ কেউ নাকি শোনেইনি কথাটা। বেঈমানের জাত কাঁহাকার।

ঃ জনাব !

ঃ আগে জন বায়্যামের ফয়সালাটা হয়ে যাক। এরপর এইসব মিথ্যাবাদী নেমকহারামদের ফয়সালাও সাথে সাথেই করতে হবে।

ঃ জি জনাব। এদের কিছুটা আক্কেল হওয়া খুবই প্রয়োজন। ঘাটে মাল দিতে গেলে যে এরা কি হয়রানীটাই করে আর নানা রকম জালজুচ্চুরীর সাথে কত যে নির্জলা মিথ্যা কথা বলে, তার ইয়ত্তা নেই। তা এই সাহেবকে কি বলেছেন জনাব ? ইনি এদেশে নতুন এসেছেন।

ঃ তা আসুন। কিছু তথ্য ইনার কাছেও যে থাকবে না, এমন কথা নেই। ইনিও ইংরেজ তো ?

ঈষৎ হাসি মুখে কেষ্টলাল পোদ্দার বিনয়ের সাথে বললো—ইংরেজ ঠিকই। তবে ইনি একেবারেই একটা ব্যতিক্রম জনাব ! একেবারেই এক ভিন্ন মানুষ।

ঃ মানে ?

ঃ ইনি একজন অতিশয় সৎ ব্যক্তি। পণ্ডিত মানুষ। এই কুঠিয়ালদের অসততার জন্যে নিজেও ইনি দুঃখিত আর লজ্জিত।

ঃ পোদ্দার বাবু !

ঃ তদুপরি, ইনি মানে ঐ মিঃ ডেভিড স্মিথ একজন আলীম মানুষ জনাব। তাঁর দেশে তিনি এলেম শিক্ষা দেন। এদেশে তিনি নকরী করতে আসেননি, ভ্রমণ করতে এসেছেন আর এদেশের হাল হকিকত দেখার জন্যে এসেছেন।

রঘুলাল পোদ্দারকে খুন করায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে কেষ্টলাল পোদ্দারের দীলেও যে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ আছে, আবদুল আজিজ তা জানেন। ইংরেজদের কেষ্টলাল মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। সেই কেষ্টলাল সুপারিশ করায় আবদুল আজিজ বেগ থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন—তাই নাকি ?

সাহেবের মানসিকতা ও চরিত্র সম্বন্ধে আবদুল আজিজকে সংক্ষেপে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে কেষ্টলাল পোদ্দার ফের বললেন—ইংরেজদের মধ্যেও যে ভাল মানুষ থাকতে পারে এই আমি প্রথম দেখলাম জনাব। আসলে আলীম, মানে হুজুর মানুষ তো ? মস্তবড় বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা দেন।

ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ লাফ দিয়ে অশ্ব থেকে নামলেন এবং অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—ইশ্ ! বড্ড কসুর করে ফেললাম তো ! আমাকে মাফ করে দিন সাহেব। না জেনে আমি আপনার সাথে জব্বোর বেয়াদবী করে ফেলেছি।

করমর্দন করার জন্যে আবদুল আজিজ হাত বাড়িয়ে আসতে লাগলেন। তা দেখে ডেভিড স্মিথ শশব্যস্তে গাড়ী থেকে নেমে এলেন এবং করমর্দন করতে করতে বিনয়ের সাথে বললেন—ও-নো-নো। হাপনার কুয়ী কসুর না আছে। বিলকুল না আছে। হাপনি তো হামারে জানে না।

ঃ সাহেব !

ঃ আপনি সোলজার আড্‌মী, জেন্টলম্যান আড্‌মী। ইস্ লিয়ে এয়সা চিন্টা করিটেছেন।

কেষ্টলাল পোদ্দার এই ফাঁকে বললেন—জনাব স্রেফ সেপাই নন মিঃ স্মিথ, এই হুগলীর একজন নামকরা ফৌজদার মশহুর ব্যক্তি। বয়সে তরুণ হলে কি হবে, একটা গোটা বাহিনীর ইনি মালিক।

ঃ ইজ ইট্ ?

ঃ ইনি আমাদের হুজুর, ছোট হুজুর।

ঃ কেয়া টাজ্জব ! টবে তো বিলকুল মাষ্টার আড্‌মী, স্যার আড্‌মী ?

ঃ জরুর।

সাহেব আরো অভিভূত হয়ে বললেন—ও-মাইগড্ ! চিনিটে না পারিয়া হামি গাড়ীটে বসিয়া রহিল, অনারেব্‌ল্ আড্‌মীকো অনার করিল না, সম্মান ডেখাইলো না ! কাইণ্ডলী হামাকে মাফ করিয়া ডিন্ জনাব। হামার বহুট্ গোস্তাকী হইল।

সাহেব একইভাবে আফ্‌সোস্ করতে লাগলেন। আবদুল আজিজ সহাস্যে বললেন—আরে না-না। ব্যাপারটাতো ঐ একটাই—আমরা কেউ কাউকে চিনি না।

ঃ জনাব !

ঃ তদুপরি আপনি মুরুব্বী মানুষ। আমি ছেলে মানুষ। এনিয়ে আপনি পেরেশান হবেন না। আপনি কোন গোস্তাকী করেননি।

ঃ ও ইয়ং ম্যান, ইউ আর রিয়ালী এ নোব্‌ল্‌ম্যান। হাপনি একজন মহট্ আড্‌মী আছে।

কেষ্টলাল পোদ্দার ফের বললেন—শুধু তাই নয় সাহেব ? আমাদের এই হুজুর একজন দানেশমান্দ লোক। মস্তবড় এলেমদার আদমী।

দুইচোখ বিস্ফারিত করে মিঃ স্মিথ ফের বললেন—আই সি ! জিয়াডা এলেমডার ডি আছে। সমঝলিয়ে সমঝলিয়া। ইস্‌লিয়া এয়সা সুইট ডিলিংস্, আই মিন, মিঠা আচরণ আছে। এলেমডার আড্‌মীকো আচরণ জরুর সুইট হোবে।

আবদুল আজিজ পুনরায় হেসে বললেন—সৎমানুষের সাথে সৎ আচরণ করাই ঈমানদারী মিঃ স্মিথ্। এর জন্যে জিয়াদা এলেমদার হওয়ার জরুরত নেই। কিন্তু আমি তো আপনার সাথে সৎ আচরণ করিনি !

ঃ করে নাই ?

ঃ কই করলাম ? চিনতে না পেরে প্রথমে তো আমি অনেক বদ্‌জবান বলেছি। আপনাকে ইজ্জত দিতে পারিনি।

সাহেব একটু থামলেন। এরপর ম্লান হেসে বললেন—চিনিটে পারিয়া ভি বড্‌জবান বলিলে হাপনার কসুর হোবে না জনাব ! আসলে টো ইজ্জট হামার পাওনা না আছে।

আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে বললেন—কেন সাহেব ?

ঃ জনাব, হামার কান্ট্রিমেন, আইমিন হামার ডেশের লোগ্ হামার ডেশের, হামার জাটির ইজ্জট না রাখিয়াছে। উহা বিলকুল বিকাইয়া ডিয়াছে। যাহার জাটির ইজ্জট নাই, টাহার ইজ্জট পাওয়ার হক নাই। হাপনি হামাকে যে ইজ্জট করিটেছে, উহা সেরেফ হাপনার মহট্ট আছে, হামার হক না আছে।

সাহেবের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে গেল। আবদুল আজিজের বুঝতে আর ফাঁক রইলো না যে, কেষ্টলাল পোদ্দার একবিন্দুও বাড়িয়ে বলেননি। এ ব্যক্তি সত্যিই একটা ব্যতিক্রম। হীনমন্য তামাম ইংরেজ বণিকদের চেয়ে এ ইংরেজ একেবারেই পৃথক এক ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গ খাটো করে আবদুল আজিজ বললেন—একথা ঠিক নয় সাহেব। যিনি সৎব্যক্তি তাঁর সম্মান সর্বত্রই আছে। এদেশে অবস্থিত আপনার স্বজাতির খাসিলত যা-ই হোক, আপনার এই মহৎ অনুভূতির জন্যে আপনাকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এবার বলুন, আপনার কি খেদমত করতে পারি আমি ?

সাহেব বুঝতে না পেরে বললেন—খেড্‌মট্ ।

ঃ আপনি আমার দেশে মেহমান। আপনার মতো একজন সৎ মেহমানের মেহমানদারী করতে পারলে আমরা জিয়াদা খুশী হবো। বলুন, আমাদের মেহমানদারী কবুল করতে আপনি রাজী আছেন কিনা ?

অত্যন্ত খুশী হয়ে মিঃ স্মিথ বললেন—ও স্যার, থ্যাংক ইউ-থ্যাংক ইউ ! হাপনার মহট্ট বিলকুল আন প্যারাল্যাল, একডম অটুলনীয়। লেকেন, হামার সময় এখোন বহুট কম আছে জনাব। হামি একঠো টিমের সাঠে এ মুলুকে আসিয়াছে। উও টিম আইমেন ডল, এখোন কাশিম বাজারে আছে। উহাডের সাঠে জল্‌ডি হামাকে মোলাকাট্ করিটে হোবে। লেট্ হইলে উহাডের সাঠে হামার কঠা হইবে না। উহারা ডুস্‌রা কোঠাও চলিয়া যাইবে। হামার ডেশে ফিরিটে মুস্কিল হোবে।

ঃ তাহলে ?

ঃ আজ আমি হুগলীর কুঠিটে হল্‌ট করিবে সট্য, লেকেন অটি প্রট্যুষে হামি ফের কাশিম বাজার ছুটিবে। নিরাপদ বোট্ পাইলে হামি রাত্রিকালেই ছুটিবে। হাপনার মেহমান হইটে পারিলে হামি জরুর খুশী হইটো। কিন্টু হামার টাইম থাকিল না।

ঃ তাহলে চলুন, হুগলীর কুঠিতেই আপনাকে পৌছে দিই। সেখানে আপনার থাকার আর নদীপথে কাশিম বাজার যাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করি ?

ঃ করিবেন ? টাহা করিবেন ? টবেটো হামি বহুট বাটিটো হোবে জনাব ! জিয়াডা গ্রেটফুল হোবে। বোট্ পাওয়ার ব্যাপারে হামি বহুট চিন্টিট আছে। এইসা মডড্ আইমিন হেল্‌ফ পাইলে হামি একডম বর্টিয়া যাইবে।

ঃ ঠিক আছে-ঠিক আছে। হুগলীর কুঠিতে আপনার আরামে থাকার আর যথা শিঘ্র সম্ভব কাশিম বাজারে আপনাকে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আমি নিলাম।

ঃ ও ! ইউ আর রিয়ালী এ নোব্‌ল্ স্যার ! টাহলে চলিয়ে জনাব, আপ্ আগারী চলিয়ে। হামার গাড়ী হাপনাডের গোড়ার সাঠে ডৌড়াইটে পারিবে না। হামি পিছে পিছে আসিটেছে।

ঃ পিছে পিছে নয় মিঃ স্মিথ। হুগলী আর অধিক দূরে নেই। চলুন এক সাথেই যাই। আমাদের ঘোড়া ধীরে ধীরে চলবে।

ঃ ভেরী নাইস্-ভেরী নাইস্ !

সেপাই আমিন গাজী আবদুল আজিজের দলের সাথেই ছিল। এক ফাঁকে সে আবদুল আজিজকে নীচু কণ্ঠে বললো—হুগলীর কুঠিয়ালরা এখন সবাই অস্থির আছে হুজুর। সাহেবের তদবিরটা কি সেখানে ঠিকমতো হবে ?

জবাবে আবদুল আজিজ বললেন—হুকুম করলেই হবে। তাদের আশ্বাস দিলে তারা খুশী হয়ে সে ব্যবস্থা করবে।

ঃ জি হুজুর, তাহলে অবশ্য হবে।

অতপর ইশারা পেয়ে লক্ষেশ্বর গাড়ী ছাড়লো। এযাবত নিয়ে কেষ্টলাল পোদ্দারও নিজ পথ ধরলো। আবদুল আজিজ সদলবলে গাড়ীর সাথে রওনা হলেন এবং মিঃ ডেভিট স্মিথের সাথে গল্পে গল্পে পথ চলতে লাগলেন। এতে করে মিঃ স্মিথের সাথে আবদুল আজিজের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হলো। ফলে, আবদুল আজিজের অনুরোধ ক্রমে মিঃ স্মিথ এই মর্মে কথা দিলেন যে, কাশিম বাজারের কাজ শেষ করে সময় পেলে তিনি ফেরার পথে অবশ্যই হুগলীতে আবার নামবেন এবং আর না হোক, আবদুল আজিজের সাথে একবার মোলাকাত করে যাবেন।

হুগলীর কুঠিতে সাহেবের অবস্থানের এবং নৌপথে তাঁর কাশিম বাজার যাবার সুব্যবস্থা করে দিয়ে ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ যখন মকানে ফিরে এলেন তখন দেখলেন, তাঁর মকানের অবস্থা বেশ নাজুক। সালুন রাঁধতে দিয়ে শিরিবানু হাত পুড়িয়ে ফেলেছে। আবদুল আজিজ, গাজী মিয়া ও অন্যান্যেরা বাইরে থাকায়, আজব আলী পাড়ার এক হেকিম ডেকে এনে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। শিরিবানুর আম্মা মদিনা বিবি সঙ্গে সঙ্গে হাতে দু'টি আণ্ডা ভেঙ্গে দিলে যন্ত্রণাটা ক্ষণিকের জন্যে সামান্য একটু লাঘব হয়। এরপর হেকিম এসে আরো কিছু প্রলেপ দেয়ার ব্যবস্থা করে যান। কিন্তু যে কি সেই। কিছুতেই কিছু হয় না। প্রদাহের আধিক্যে শিরিবানু সেই থেকে এনতার কাত্‌রাতে থাকে। সারা বেলা কাত্‌রানোর পর সে কিছু আগে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। এই নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মদিনা বিবি সহকারে কারো কারো এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি।

ঘটনা শুনেই আবদুল আজিজ শিরিবানুর কামরার দিকে ছুটে এলেন। পর্দা করা দরজা-জানালার তামাম পাল্লা খোলা ছিল। দুয়ারের পর্দাটা অল্প একটু ফাঁক করে তিনি দেখলেন, পুড়ে যাওয়া হাতখানা আলতোভাবে বালিশের উপর রেখে শিরিবানু ঘুমিয়ে আছে। তার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আবদুল আজিজ একটু পরেই নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে এলেন এবং মদিনা বিবির খোঁজ করলেন। মদিনা বিবি সবেমাত্র গোছল সেরে খাবার ঘরে যাচ্ছিলেন। তাঁকে সামনে পেয়েই আবদুল আজিজ প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার চাচী আম্মা ? শিরিবানুর হাত পুড়লো কি করে ?

মদিনা বিবি সখেদে বললেন—কি বলবো বাপজান ? অভ্যাস নেই তবু সে জোর করে একাই সালুন রাঁধবে। নিষেধ শুনবে না। এমনটিতো হবেই।

আবদুল আজিজ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—একাই সালুন রাঁধবে ?

ঃ সালুন রাঁধা শিখবে। কি এক খেয়াল চেপেছে, তাকে নাকি সালুন রাঁধা শিখতেই হবে। আমি বলি, শিখবে তো আমার পাশে বসে বসে দেখো আর দেখে দেখে শিখো। আস্তে আস্তে অভ্যাস করো। তা কথা আমার শুনলে তো ? একাই গেল উস্তাদী করতে। এখন মজা বোঝো ?

আবদুল আজিজ ক্ষণিকের জন্যে নীরব হয়ে গেলেন। কেন যে একাজে শিরিবানুর এত আগ্রহ, তা বুঝতে আবদুল আজিজের কিছুই বাঁকী রইলো না। এ জন্যে যে সাকুল্যে তিনিই দায়ী, এটা অনুভব করে আবদুল আজিজ মনে মনে অনুতপ্ত হলেন। লহমা খানেক নীরব থেকে শংকাকুল কণ্ঠে তিনি ফের প্রশ্ন করলেন—কতখানি পুড়েছে চাচী আম্মা ? খুব বেশী পুড়েছে কি ?

ঃ পুড়েছে তো অনেক খানিই ? ডান হাতের পিঠে আর দুইতিনটে আঙ্গুলে ফোস্কা পড়ে গেছে। কনিষ্ঠা আঙ্গুলের ফোস্কাটাই বড়। সঙ্গে সঙ্গে আণ্ডা ভেঙ্গে না দিলে ফোস্কায় হাত-আঙ্গুল ব্যাঙের মতো ফুলে উঠতো।

আবদুল আজিজ ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—সেকি ! কি করে হাত পুড়ালো ?

মদিনা বিবি বললেন—ফুটন্ত ঝোল কড়াই ধরে পাক দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে হাতে তাপ লাগে আর হাত ফস্‌কে ঐ টগবগে ঝোল এসে অর্ধেকটাই হাতের উপর ঢেলে পড়ে।

ঃ ইশ !

ঃ চীৎকার শুনে এসে দেখি, একদিকে ঝোল-তরকারী গড়াচ্ছে আর এক দিকে যন্ত্রণায় সে গড়াগড়ি দিচ্ছে। যত্তসব আনাড়ীর কাণ্ড !

ঃ শিরিবানু কি খুবই কাত্‌রিয়েছে ?

ঃ কাত্‌রানো বলে কাত্‌রানো বাপজান ? জবাই করা মুরগীর মতো সেই থেকে কেবলই দাফিয়েছে। ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ার পর তবে তার চীৎকারটা থেমেছে।

ঃ কি গজব ! তা হেকিম-বৈদ্য ডাকার আর কি গরজ আছে চাচী আম্মা ?

ঃ না বাপজান, আপাততঃ গরজ নেই। তবে ঘা'টা যদি বেশী হয়, তাহলে পরে ঘা শুকানোর জন্যে কিছু দাওয়াই-মলম লাগতে পারে।

আবদুল আজিজ আর কথা বাড়ালেন না। বেচারীর যে এখনও খাওয়া হয়নি তা বুঝতে পেরে আবদুল আজিজ মদিনা বিবিকে খাওয়ার মওকা দিয়ে

সেখান থেকে ধীরে-ধীরে চলে এলেন এবং পেরেশান দীলে এসে নিজ কামরায় ঢুকলেন। অতপর ফৌজী লেবাস খুলে তিনি সরাসরি টান হয়ে শুয়ে পড়লেন ও কিছুক্ষণ ঐভাবেই চোখ মুজে রইলেন।

শিরিবানুর ঘুম ভাঙ্গলো মাগরিবের খানিক পরে। এখন আর তার প্রদাহ নেই। এখন সে সুস্থ। দুপুরে তার খাওয়ার অবস্থা ছিল না। তার আম্মা মদিনা বিবি এসে এখন তাকে খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু ক্ষুধা নেই বলে সে ভাত রুটি কিছুই খেতে আগ্রহ প্রকাশ করলো না। অবশেষে মদিনা বিবি খানিকটা দুধ-মেশানো সুজি এনে দিলে সে চুমুক দিয়ে ঐ দুধ-সুজি খেয়ে ফের চুপচাপ শুয়ে পড়লো।

শিরিবানুর ঘুম ভেঙ্গেছে শুনে মদিনা বিবি সহকারে আবদুল আজিজ ফের তাকে দেখতে এলেন। আওয়াজ দিয়ে মদিনা বিবির পিছে পিছে আবদুল আজিজ ঘরে ঢুকতেই শিরিবানু ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলো। তার ওড়নাটা বালিশের পাশেই পড়েছিল। আব্রু করার জন্যে সে বামহাতে তড়িঘড়ি ওড়না টানতে লাগলো। তা দেখে মদিনা বিবি এসে শিরিবানুর মাথায় ওড়নাটা ঘোমটার আকারে পরিয়ে দিলেন। অতপর মদিনা বিবি পাশে রাখা কুরসীখানা শিরিবানুর খাটের কাছে এগিয়ে দিয়ে আবদুল আজিজকে বললেন—বসো বাপজান, বসো। দেখো, পাগলামী করতে গিয়ে হাতখানার হালতটা কি করেছে, দেখো।

আবদুল আজিজ বসলেন। মদিনা বিবি শিরিবানুর পোড়া হাতটা সামনের দিকে টেনে নিয়ে আবদুল আজিজকে দেখালেন। দেখে আবদুল আজিজ ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—ইশ ! এতো অনেকখানি পুড়েছে ! কনিষ্ঠা আঙ্গুলে তো রীতিমতো ঘা বেরিয়ে গেছে।

মদিনা বিবি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—যাবেই তো। যেমন আক্কেল তেমনই শিক্ষা হয়েছে। ঝোলটা এসে মুখে পড়তে পারলো না ? মুখখানা বেগুন পোড়া হলে তবেই আক্কেলটা পুরোপুরি হতো। বাঁদরীমুখী হয়ে মানুষের ঘৃণা কুড়িয়ে বেড়াতে হতো জিন্দেগীভর।

ঝাড় বাতির উজ্জ্বল আলোতে ছোটখাটো কামরাটা উদ্ভাসিত ছিল। আবদুল আজিজ দেখলেন, আম্মার কথায় দুঃখ পাওয়ার বদলে ওড়নার আড়ালে মুখ লুকিয়ে নিয়ে শিরিবানু মিটিমিটি হাসছে আর তাঁর দিকে তলচোখে তাকাচ্ছে। এটা লক্ষ্য করে আবদুল আজিজ কপট রোষে বললেন—তাই হলেই বোধ হয় ভাল হতো চাচী আম্মা। আমার মনে হচ্ছে, এতটার পরও

আপনার এই দুর্দান্ত মেয়েটার মোটেই আক্কেল হয়নি। নিজের মুখ পুড়িয়ে আমাদের সকলের মুখগুলো পুড়িয়ে না দিলে এর সখটা মিটবে না।

মদিনা বিবি বললেন—তো আর বলছি কি বাপজান ? জন্ম কাঙ্গালের ঘরে আর চাল চলন বিবিয়ানা। এই বাপজানদের দয়ায় আজ যে বিবিয়ানাগিরি করছো, কাল তা নসীবে তোমার না-ও জুটতে পারে, সে চিন্তা কি করো ? হাত-পা চোখ-মুখ সব পুড়িয়ে পেত্নী মুখী হলে একটা পথের ফকিরও ঘরে তুলবে তোমাকে ?

আবদুল আজিজ দেখলেন, মদিনা বিবি ক্রমশঃই নিজেদের অসহায় ভাবটা প্রকট করে তুলছেন। এতে তিনি ক্ষুণ্ন হলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—না-না চাচী আম্মা, এতটা বলবেন না ! একটা অঘটন ঘটেছে বলেই এতটা ভাববেন কেন ? আমরা কি আপনার পর, না মেয়ে আপনার এতটাই নাদান যে ভেসে বেড়াবে ? নিজের মেয়েকে নিজে আপনি চেনেন না ?

ঃ বাপজান !

ঃ আমি যা বললাম তা মস্করা করে বললাম। নইলে মেয়ে আপনার পাগলও নয়, নির্বোধও নয়। যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি আর হুঁশ-বিবেক আছে ওর।

ঃ কিযে বলো ! ওর আবার জ্ঞানবুদ্ধি আছে ?

ঃ আছে-আছে। জ্ঞানবুদ্ধি, রূপ-গুণ, কোন কিছুরই অভাব নেই। সেরেফ যদি মেয়ের আপনার দুষ্টামী আর জিদ্‌টা একটু খাটো হতো তাহলে তার একটা কসুরও ধরে, এমন সাধ্য কোন লোকের থাকতো না।

আবদুল আজিজও আঁড় চোখে শিরিবানুর দিকে তাকালেন। শিরিবানু শরমে মাথা নীচু করলো। মদিনা বিবি বললেন—তাহলে বুঝো কি স্বভাব ? দজ্জালগিরি করে অবাধ্য মেয়েটা যে শেষ অবধি কি জিল্লতি আনবে আমার নসীবে, তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। একটু যদি বারণ-নিষেধ মানতো ! নসীব-মরা মেয়ের এত জিদ্ হবে কেন ?

ঃ চাচী আম্মা !

ঃ উঠতে বসতে জিদ্। দুপুরে হাত পুড়িয়ে পড়ে রইলে, পেটে কিছু গেল না। ভাত-রুটি যা হোক, এখন একটু মুখে দাও, না, সাধাসাধি করেও বিবি সাহেবার মন তুলতে পারলাম না। সাধ করে হাত পোড়ালে তুমি, আর কার উপর গোস্বা করে বলো যে, ক্ষুধা নেই, কিছু খাবো না ?

আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে বললেন—সেকি ! কিছু খায়নি ?

ঃ চুমুকখানেক সুজি-দুধ জোর করে খাইয়েছি। দিনটাতো অনাহারে

গেলই, এখন এতবড় রাতটাও যদি ঐ খেয়েই থাকে, তাহলে উঠতে পারবে সকালে ? হর-হামেশাই অনাহারে থাকলে বিমার-ব্যাধিতে ধরবে না ?

ঃ তাতো বটেই–তাতো বটেই। তা খাবে না কেন আর ?

ঃ কেন আর খাবে না, সেটা আমি কি বলবো বাপজান ? এত আহলাদ দেখার আর আমার তাকত্ নেই।

কাজের মেয়ে আতরজান দুয়ারে এসে কি এক কাজে ডাক দিলে মদিনা বিবি বেরিয়ে গেলেন আর আবদুল আজিজ চুপচাপ কুরসীর উপর বসে রইলেন। লহমাখানেক ঐভাবে কাটতেই শিরিবানু মুখ তুলে স্মিতহাস্যে বললো—খাহেশটা কি ছোট সাহেবের মিটেছে ?

কিঞ্চিৎ চমকে উঠে আবদুল আজিজ বললেন—খাহেশ ! কিসের খাহেশ ?

ঃ মরার উপর খাঁড়ার ঘা মারার খাহেশ ! এমনিতেই হাতের ব্যাথায় সারা বেলা কাটলো ! সেটা একটু আরাম হতেই আম্মাজানের সাথে মিলে ছোট সাহেব আবার যেভাবে আমাকে ধোলাই দিতে লেগেছেন, তাতে আর আমার বাঁচার উপায় আছে ?

আঁড়চোখে চেয়ে শিরিবানু হাসতে লাগলো। আবদুল আজিজ সরোষে বললেন—বেঁচে আর তোমার কাজ নেই। সব কিছুতেই এতটা বাঁদরামী তোমার সহ্য করবে কে ?

শিরিবানু বিস্মিত কণ্ঠে বললো—ওমা ! আমি আবার বাঁদরামী করলাম কোথায় ?

ঃ তুমি সালুন রাঁধতে গেলে কেন ? তোমাকে সালুন রাঁধতে কে বলেছে ?

ঃ সেকি ! ছোট সাহেবই তো বললেন ! সালুন রাঁধতে পারিনে বলে ছোট সাহেবই তো আমার উপর নারাজ হয়ে আছেন। আমাকে গালমন্দ করেন !

ঃ তা না হয় করলামই। কিন্তু যা পারো না, তা করতে গেলে কেন ?

ঃ না করে উপায় কি ? যা পারিনে তা শিখতে হবে না আমাকে ? কতদিন আর ছোট সাহেবের গালমন্দ খাবো ?

শিরিবানু পুনরায় মুখটিপে হাসতে লাগলো। আবদুল আজিজ গম্ভীর হয়ে বললেন—বটে ! তাহলে আমার উপর গোস্বা হয়েই এই কাজটি করতে গেছো তুমি ?

ঃ গোস্বা হয়ে হবে কেন ? এটা তো আমার কর্তব্য।

ঃ কর্তব্য !

ঃ যিনি মালিক, তাঁকে নারাজ রাখলে চলবে কেন ? তাঁর ইচ্ছে-আদেশ পালন করাই তো উচিত আমার ?

ঃ মালিক মানে ? কে কার মালিক ? এক আল্লাহ ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কোন মালিক কারো আছে কেউ ?

ঃ তা না থাকুক, এ সংসারের আপনিই তো মালিক। আল্লাহর পরে আমাদের মালিক বলেন, মুনিব বলেন, মুরুব্বী বলেন, সব তো আপনিই। যাঁর খাই, আর যাঁর অধীনে থাকি, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে চললে আমার চলবে কেন ছোট সাহেব ?

আবদুল আজিজ নাখোশ হলেন। নাখোশ কণ্ঠে বললেন—হুঁ ! তাহলে আমার ইচ্ছেটা বুঝি এই যে, তুমি সালুন রাঁধতে শিখো, আর শেখার পর আমাকে সালুন রেঁধে খাওয়াও ?

ঃ তা মানে, ছোট সাহেব তো মাঝে মাঝে এই রকমই বলেন।

ঃ তোমার রাঁধা সালুন খাওয়ার জন্যে কি আমি পেট ধুয়ে বসে আছি ?

ঃ না, তা হবে কেন ? তবে এই কাজটা করার জন্যেই তো—

ঃ সালুন রাঁধা লোকের কি এতই আমার অভাব যে তুমি সালুন না রাঁধলে সংসার আমার অচল হয়ে যাবে ?

ঃ তা আমি কি করে বলবো ? এই কাজটা জানিনে বলেই তো ছোট সাহেব আমাকে হর হামেশাই খোঁটা দেন আর আমার উপর গোস্বা হন। আমি এখন কোনদিকে যাবো ?

কপট অভিমানে শিরিবানু মুখ ভারী করলো। আবদুল আজিজ হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। এক ধেয়ানে কিছুক্ষণ শিরিবানুর মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর তিনি হতাশ কণ্ঠে বললেন—তুমি কি সত্যিই এতটা নির্বোধ ?

ঃ কেন ছোট সাহেব ?

ঃ কোনটা আমার ইচ্ছের কথা আর কোনটা আমার মস্করা, এটা কি সত্যিই বুঝতে পারো না তুমি ?

শিরিবানু অপ্রতিভ হলো। অভিমান ছেড়ে দিয়ে সে নত মস্তকে বললো—ছোট সাহেব !

ঃ তোমার জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে কত আমার গর্ব, আর এই সামান্য বোধটা তোমার নেই দেখে আমি আজ বড় তকলিফ বোধ করছি।

শিরিবানু অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কোন্ বোধটা ছোট সাহেব ?

ঃ আমি যে তোমাকে সালুন রাঁধতে বলি, সেটা সত্যি সত্যিই আমার মনের কথা, মানে তোমাকে রাঁধতেই হবে বলে বলি, এই তুমি বুঝলে ?

শিরিবানু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেল না। সে মাথা নীচু করলো এবং আবার সে লজ্জাজড়িত নয়নে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। আবদুল আজিজ অধৈর্য হয়ে বললেন—চুপ্ রইলে কেন ? বলো, সত্যিই তুমি এই বুঝটাই বুঝেছো ?

অন্যদিকে মুখ নিয়ে শিরিবানু হাসি চেপে বললো—ছোট সাহেব যে কি ! আমি সত্যি সত্যিই তাই বুঝেছি, ছোট সাহেবই বা তা ভাবলেন কি করে ?

আবদুল আজিজ সজাগ হয়ে বললেন—তার মানে ? তা বুঝোনি ?

হাসি থামিয়ে শিরিবানু সহজ হলো ও আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে সহজ কণ্ঠে বললো—না ছোট সাহেব, তা বুঝবো কেন ? ছোট সাহেব যে আমাকে জিয়াদা দরদ করেন আর ওসব কথা যে আমাকে রাগানোর জন্যে বলেন—এটুকু বোঝার জ্ঞান আমার থাকবে না কেন ? ছোট সাহেবকেই যদি চিনতে আমি না পারলাম, তাহলে কিসের আমার লেখাপড়া আর কিসের আমার জ্ঞানবুদ্ধি ?

সহজভাবে কথা বলতে বলতে শিরিবানু শেষের দিকে গম্ভীর হয়ে গেল। আবদুল আজিজ বেগ প্রসন্ন দীলে বললেন—তাই ? তাহলে আমার কথা শুনে তুমি সালুন রাঁধতে গেলে কেন, আর এই অঘটনটা ঘটালে কেন ?

শিরিবানু গম্ভীর কণ্ঠে বললো—না ছোট সাহেব, আপনার কথা শুনেই নয়। ওটা একটা উপলক্ষ্য। আসলে তো আমার এসব কাজ শিক্ষা করা উচিত।

ঃ কেন, উচিত কেন ?

ঃ কেন আবার ? আম্মাজন যেসব কথা বলে গেলেন তাতো আর ফালতু নয় ? ভবিষ্যৎটাও তো ভাবতে হবে আমাকে ?

ঃ ভবিষ্যৎ !

ঃ জি। ছোট সাহেবদের রহমে আজ না হয় খোশহালেই দিন কাটছে আমার। কিন্তু আজ বাদে কাল যে এই হালে কাটবে না, এটুকু জ্ঞান আজও কি আমার হয়নি ছোট সাহেব ? শুধু রান্নাবান্না কেন, তখন তো এর চেয়ে আরো অনেক ছোট আর কঠিন কাজ করতে হবে আমাকে। আতরজানকে দেখলেই তো বুঝতে পারি, কত রকমের কাজ কাম করতে হয় তাকে ?

ঃ শিরিবানু !

ঃ অতটা না হলেও মোটামুটি কাজ কামতো শিখতেই হবে আমাকে। আগে থেকেই কিছুটা অভ্যাস করে না রাখলে, পরে আমি হঠাৎ করে সামাল দেবো কিভাবে ?

আবদুল আজিজের মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি ক্রোধ চেপে বললেন—তার মানে ? মানুষের বাড়ীতে ঝি-গিরি করে খেতে হবে তোমাকে ?

ঃ তা পারে বৈকি ছোট সাহেব ? ভবিষ্যতের কথা কি কিছু বলা যায় ?

আবদুল আজিজ ফেটে পড়লেন। তিনি বিকৃত কণ্ঠে বললেন—ছিঃ !

তোমাদের এই মা-মেয়ের মানসিকতার আজও কোন পরিবর্তন হলো না। বড়ই নিম্নমানের চিন্তা-ভাবনা তোমাদের।

ঃ ছোট সাহেব !

ঃ এ জন্যে খুবই আমার দুঃখ হয়। আমার উপর তো নয়ই, নিজের উপরও তোমাদের জারুরামাত্র আস্থা কারো নেই।

ঃ নিজের উপর আস্থা !

ঃ এত লেখাপড়া শিখছো তুমি, আদব-আক্কেল আর রূপগুণ তোমার এতটা উমদা, তোমাকে কেন ভবিষ্যতে ঝি-গিরি করে খেতে হবে ?

শুকনো হাসি হেসে শিরিবানু বললো—কাঙ্গালের লেখাপড়ার কি দাম আছে ছোট সাহেব ? কোন খানদান ঘরের মেয়ে না হলে ঐ লেখাপড়া দিয়ে যে খুব একটা ফায়দা হয় না, একথা আম্মাজান হামেশাই বলেন, আমিও তা বুঝি। দুনিয়ার হালচাল বুঝার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার। কাজেই—

আবদুল আজিজ গর্জে উঠে বললেন—খামুশ ! আমার বংশ আর তোমার বংশ কি পৃথক ? বংশ আমাদের খানদান নয়তো কি নাদান ? নিজের পরিচয়টা ভুলতে পারলে কি করে ?

শিরিবানু থমমত খেয়ে বললো—ছোট সাহেব !

ঃ তার উপর, মানুষের মূল্য বংশ দিয়ে নিরূপণ হয় না, হয় তার কর্ম দিয়ে, তার গুণাবলী দিয়ে।

ঃ তা-মানে—

ঃ ফের এ ধরনের কথা বললে, তোমার পিঠের ছাল সত্যি সত্যিই তুলে নিয়ে ছাড়বো আমি।

ঃ জি ?

ঃ মুনিব বলেই যদি মনে করো আমাকে, তাহলে মুনিবের আসল হুকুম অগ্রাহ্য করে সালুন রাঁধতে যাওয়ার এত আগ্রহ হয় কি জন্যে ?

শিরিবানু চিন্তিত কণ্ঠে বললো—আসল হুকুম ! সেটা আবার কি, তাতো বুঝিনে।

আবদুল আজিজ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন—সেটা এলেম শিক্ষা করা। তোমাকে আমি বার বার বলিনি, উস্তাদের দেয়া ছবকটাই তুমি রপ্ত করবে সব সময়, সালুন রাঁধা বা বর্তন ঠেলার জরুরত নেই ? তবু কথার অবাধ্য হও কেন ?

শিরিবানুর মুখে আবার হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে হঠাৎ ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললো—না ছোট সাহেব, অবাধ্য হলাম কোথায় ? ছবক তো কখনো ফেলে রাখি না আমি ? মন দিয়েই ওটা আমি হররোজ রপ্ত করি।

ঃ করো ?

ঃ জি। বিশ্বাস না হয়, উস্তাদজিকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। ছবকে কোন গলতি পান না বলে উস্তাদজি আমার উপর খুবই খুশী আছেন।

আবদুল আজিজও খুশী হয়ে বললেন—তা থাকলে আমিও খুশী। আরো আমি খুশী হবো, ভবিষ্যতে আর রান্নাবান্নায় না গিয়ে লেখাপড়াটাই মনোযোগ দিয়ে করো যদি।

ঃ তা আর কি করিনে ?

ঃ করিনে নয়, করবে। এই আমার হুকুম। আমাকে মুনিব বলে মানলে, মুনিবের হুকুমটাও কাঁটায় কাঁটায় পালন করতে হবে। ফালতু কাজে যাওয়া আর চলবে না। রাজী ?

মাথা কাত করে সম্মতি জানিয়ে শিরিবানু বললো—তাই হবে ছোট সাহেব, অবাধ্য আমি হবো না। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি ?

ঃ রান্নাবান্নাটা সেই ফাঁকে শেখা কিন্তু দোষের নয়। প্রত্যেক আউরাতকেই ওটা জানতে হয় আর জানা থাকা ভাল।

ঃ কে বললে প্রত্যেক আউরাতকে ওটা জানতে হয় ? উঁচু তব্‌কার আউরাতেরা সবাই কি রান্নাবান্না জানে, না জানার কোন গরজ আছে ?

ঃ জানা থাকাটাই ভাল ছোট সাহেব। সব তব্‌কার আউরাতেরই ওটা জানা থাকা ভাল। ওটা যে একটা গুণ !

ঃ গুণ ! কোথায় পেলে সে কথা ?

ঃ কিতাবে।

ঃ কিতাবে ! আমাদের এই হুগলীর প্রশাসকের বেগম সাহেবা রান্নাবান্না জানেন নাতো কি হয়েছে ? তাঁর গুণ কমেছে ?

ঃ না কমলেও বাড়েনি ছোট হুজুর। এই তো কিতাবেই পড়লাম, তামাম হিন্দুস্তানের বেগম সাহেবা, মানে সম্রাট নাসিরুদ্দীন সাহেবের বেগম সাহেবা নিজের হাতে রান্নাবান্না করতেন। তাঁর কোন দাসীবাঁদী ছিল না। কিতাবে লিখা আছে, সে জন্যে তিনি এ দুনিয়ার সব মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। তাতে সম্মান তাঁর আমাদের প্রশাসকের বেগম সাহেবার চেয়ে লক্ষ গুণে বেড়ে গেছে। রান্না করার জন্যে তা কমেনি।

আবদুল আজিজ অতিশয় খুশী হলেন। কিন্তু তা প্রকাশ না করে কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন—হুঃ এতক্ষণে বুঝলাম, আসল গিট্‌টা কোথায় ? তাহলে তুমি ইচ্ছে করেই হাতটা পুড়িয়েছো ?

ঃ ইচ্ছে করে ! ওমা সেকি ! তা পোড়াবো কেন ? ইচ্ছে করে কেউ কখনও হাত পোড়ায় ?

ঃ তা না পোড়ালে সম্রাট নাসিরুদ্দীনের বেগম সাহেবার মতো তুমি মশহুর হবে কি করে ? তোমার নাম ফুটবে কি করে ? উনিও তো রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। ফেলেননি ? লেখা নেই কিতাবে ?

ঃ জি, আছে।

ঃ তাহলে ? মনে মনে এতই তোমার সখ ?

ঃ সখ ! কিসের সখ ?

ঃ সম্রাটের বেগমের মতো বিখ্যাত হবার, আবার কিসের ?

ঃ তাই বুঝি ? তা ছোট সাহেব যদি এতই ভাবেন, তাহলে তাই।

শিরিবানু চাপা হাসি হাসতে লাগলেন। আবদুল আজিজ বললেন—কিন্তু এত আগে হাত পোড়ালে তো মশহুর হতে পারবে না। আগে সুলতান বা সম্রাটের বেগম হতে হবে। সেটা আগে হও—

শরম পেয়ে শিরিবানু অধোবদনে বললো—ছোট সাহেব !

আবদুল আজিজ বললেন—চাও তো আমাদের দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব হুজুরের কাছে প্রস্তাবটা না হয় আমিই পাঠাই ! ও বেচারাও বাদশাহ হয়ে ফকির। টুপি সেলাই ও কুরআন নকল করে খান। ওখানে গেলে রাঁধার মওকা জরুর তুমি পাবে। তবে এদিক দিয়ে উনি খুব কড়া মানুষ। পয়গামটা উনি প্রত্যাখ্যান করলে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না। ধরে নেবে, বাদশাহর বেগম হওয়া নসীবে তোমার নেই।

শরমে সংকুচিত হয়ে শিরিবানু বললো—ধ্যাৎ !

ইতিমধ্যে মদিনা বিবি এসে দুয়ার থেকে বললেন—কিছু খাবে নাকি সে কথাটা জিজ্ঞাসা করো তো বাপজান। জিদের বশে সারারাত ঐভাবে থাকলে তবিয়ত জরুর খারাপ হবে। তুমি হুকুম করলেই খেতে ও বাধ্য হবে।

আবদুল আজিজ উচ্চ কণ্ঠে বললেন—খাবে-খাবে। খাবে না মানে ? আপনি নিয়ে আসুন, খায় কিনা দেখছি।

ঃ আচ্ছা বাপজান, আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি—

মদিনা বিবি খুশী হয়ে চলে গেলেন। শিরিবানু বিস্মিত কণ্ঠে বললো—ওমা! ছোট সাহেব আমাকে জোর করেই খাওয়াবেন নাকি ?

ঃ তা দরকার হলে করবোই তো। না খেয়ে থাকবে, এটি বরদাস্ত করবো না। জরুর তোমাকে খেতে হবে।

ঃ এটাও কি ছোট সাহেবের হুকুম ?

ঃ আলবত। মুনিবের হুকুম। মুনিবের হুকুমের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা আছে তোমার, এবার সে পরীক্ষা হয়ে যাক।

মুখ টিপে হেসে শিরিবানু বললো—

ঃ ওরে বাবা ! আজ যে ছোট সাহেব খুব বেশী বেশী মুনিব হতে লাগলেন আমার। আমার অসুবিধেটা দেখবেন না ?

ঃ আবদুল আজিজ বললেন—অসুবিধে !

ঃ খাওয়ার হাত পুড়ে গেছে। খাবো আমি কি করে ?

ঃ বাম হাতে চামচ দিয়ে খাবে।

শিরিবানু দুষ্টুমী করে বললো—তাহলে তো কানাও হয়ে যেতে পারি আমি। বাম হাতের চামচ মুখে না গিয়ে চোখের মধ্যেও যেতে পারে তো !

ঃ যাবে না। যেতে লাগলে আমি তোমাকে তুলে খাওয়াবো।

ঃ আপনি ?

ঃ আমার কথায় সালুন রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছো তুমি। আমাকেই তো খাওয়াতে হবে তোমাকে এখন।

ঃ ছিঃ !

ঃ ছিঃ কেন ?

ঃ মুনিব কখনোও খেদমত করে খাদেমের ?

ঃ করে-করে। যে খাদেম সব হুকুম পালন করে মুনিব তার খেদমতই শুধু করে না, তাকে জিয়াদা পেয়ারও করে।

ঃ ছোট সাহেব !

ঃ ভালবাসে। সোহাগ করে।

ঃ ধ্যাৎ !

শরমে শিরিবানু চোখ মুজলো। এই সময় মদিনা বিবি খাবার নিয়ে হাজির হলেন। আবদুল আজিজ কুরসী থেকে উঠতে উঠতে বললেন—আপনি এখানে বসুন চাচী আম্মা। ওতো আর তুলে খেতে পারবে না। আপনি একটু মুখে তুলে খাওয়ান।

৪

উমিদ আলী পাগল হয়েছে। অন্ততঃ মাথায় তার আগেকার সেই গোলমালটা আবার দেখা দিয়েছে, এই সকলের ধারণা। ব্যাধি নেই, বিমার নেই, কেউ তাকে কোন রকম কটু কথাও বলেনি। তবু সে ঠিকমতো আহার-গোছল করছে না, মন খুলে কথাবার্তা বলছে না, ঘুমটাও তার নেই। চালচলনে সে এখন আওয়ারা। হুকুম-আদেশ সব কিছুই সে পালন করছে বটে, কিন্তু মুখের জবান বন্ধ। অনর্গল যে কথা বলে বেড়ায়, সেই

উমিদ আলীর মুখে 'হু-হাঁ' আর 'জি-আচ্ছা'র অতিরিক্ত একটা কথাও নেই। তার চোখ মুখের সেই সদা প্রফুল্ল ভাবটাও অন্তর্হিত হয়েছে। অবসরে ফুরসুতে সে এখন কেবলই গুম্ হয়ে বসে থাকে।

পরিবর্তনটা দেখা দিয়েছে গত পরশু বিকেল থেকে। গত পরশু বিকেলে সে রওশন আরা বেগমের জন্যে ঢাকা থেকে আরো ক'খানা কিতাব কিনে আনার কথা মুন্সি সাহেবকে বলতে যায়। মুন্সি সাহেব তখন তাঁর দপ্তর কক্ষে দুইজন বিশ্বস্ত সহকারীর সাথে একটি পত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বাইরের লোকের প্রবেশ তখন নিষেধ ছিল। উমিদ আলী খোদ প্রশাসকের লোক হওয়ায় তার পথ কেউ আগলায়না। মুন্সি সাহেবের কক্ষে ঢুকে মুন্সি সাহেবকে অতিশয় ব্যস্ত দেখে উমিদ আলী দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কথা বলার মওকা অভাবে সে দরজার পর্দার পাশেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মুন্সি সাহেব ও তাঁর সহকারীরা আলাপের মধ্যে মসগুল থাকায় এদিকে কারো নজর পড়ে না। ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই উমিদ আলী অকস্মাৎ ক্ষেপে যায়। মুন্সি সাহেবের সাথে একটা কথাও না বলে সে ক্ষিপ্তভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে আর সে যা কোনদিন করেনি, তাই করে বসে। মুন্সি সাহেবের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই তার সামনে পড়ে প্রশাসক সাহেবের দপ্তর। প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব তখন কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে আলাপরত ছিলেন। কি জানি কি ভেবে উমিদ আলী বিক্ষুব্ধভাবে প্রশাসকের দপ্তরকক্ষে ঢুকে পড়ে এবং তাঁদের আলাপের মাঝেই সরাসরি জিন্দা মালিকের সামনে এসে দাঁড়ায়। এতে করে প্রশাসক সাহেব সহ উপস্থিত সকলেই হকচকিয়ে যান। আলাপ বন্ধ করে প্রশাসক সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কি ব্যাপার ! তোমাকে তো ডাকিনি ? তুমি হঠাৎ এখানে কেন ?

উমিদ আলী জবাব দেয় না। বিশেষ এক কারণে প্রশাসক সাহেবের মন-মেজাজ তখন অত্যন্ত খারাপ ছিল। উমিদ আলী জবাব না দেয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করেন—চুপ্ করে রইলে যে ? কথাই যদি না বলবে, তাহলে এসেছো কেন এখানে ?

কিঞ্চিৎ চিন্তা করে উমিদ আলী নতমস্তকে বলে—আমি যাচ্ছি —

উমিদ আলী বেরিয়ে আসে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সহ প্রশাসক সাহেব এতে তাজ্জব হয়ে যান।

সেই থেকেই উমিদ আলী আওয়ারা। আর নাহোক, তার মধ্যে কোন স্বতঃস্ফূর্ততাও নেই, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নেই। সবার ধারণা, সাবেক ব্যাধিটা তার নিশ্চয়ই আবার জেগেছে। মাথায় তার গড়বড় দেখা দিয়েছে।

একমাত্র রওশন আরা বেগমের ধারণাটা ভিন্ন। তাঁর ধারণা, গড়বড়টা তার মাথায় দেখা দেয়নি, গড়বড়টা জরুর অন্য কোথাও ঘটেছে। এই মুলুকের কোথাও বা এই প্রশাসনের কোনখানে। এ কারণে, তার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে না পেরে রওশন আরা বেগম আবদুল আজিজকে সংবাদ দেন। ইতিমধ্যে প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেবও আবদুল আজিজকে তলব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এই উভয়বিধ কারণে আবদুল আজিজ প্রশাসকের দেয়া নির্ধারিত সময়ের আগেই খাস্ মকানে হাজির হন এবং উমিদ আলীর খবর করেন। তাকে নিয়ে আবদুল আজিজ নিবিড়ভাবে বসলে আসল ঘটনা বেরিয়ে আসে।

রওশন আরা বেগমের ধারণাটাই ঠিক। গড়বড়টা দেখা দিয়েছে বাংলা তথা তামাম হিন্দুস্তানের প্রশাসনে ঃ

জন বায়্যামের ব্যাপারে নবাবের নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব হুগলীতে বসে রইলেন। ওদিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল কাউন্সিল, বিশেষ করে কাউন্সিলের প্রধান ম্যাথুস্ ভিন্‌সেন্ট আসমান জমিন চষে বেড়াতে লাগলো। জন বায়্যামের এই ঔদ্ধত্যমূলক পদক্ষেপের পেছনে যে বেঙ্গল কাউন্সিলের সমর্থন ছিল না, তা নয়। বরং এই ধরনের জালিয়াতিই ছিল তাদের ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। কিন্তু বায়্যামের পদক্ষেপটা অকস্মাৎ অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। ইংরেজরা ধূর্ত জাতি। হুগলীর প্রশাসন ও বাংলার নবাবকে তারা চিনতো। এই পদক্ষেপের পরিণামে এ মুলুক থেকে সদলবলে বিদায় হওয়ার সম্ভাবনা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ফলে, তোয়াজ, তোষামোদ, আনুগত্য আর উৎকোচ নিয়ে তারা ঢাকা ও দিল্লীতে ছুটোছুটি শুরু করলো। বেকায়দায় পায়ে ধরতে আর কায়দায় ল্যাং মারতে এদের তিল পরিমাণ সংকোচ নেই। মোটা উৎকোচ ও দক্ষ উকিল সহ কয়েকজন কাউন্সিলর দিল্লীর দরবারে ছুটলো। ম্যাথুস্ ভিন্‌সেন্ট এলো ঢাকায়। ঢাকার কুঠিয়াল প্রধান ফীচ নেদহ্যামকে সাথে নিয়ে সে নবাবের দরবারটা প্রভাবিত করার কাজে লিপ্ত হলো। বাদশাহ ও নবাবকে উৎকোচ প্রদানের কিছুমাত্র পথ-পন্থা না থাকায়, তারা দিল্লীর ও ঢাকার—এই উভয় দরবারের বিশেষ বিশেষ লোভী সভাসদ ও দিল্লীর কিছু অপরিণামদর্শী রাজ পুরুষদের শরণাপন্ন হলো।

ঢাকাতে তদবিরটা ফলপ্রসূ হলো না। ঘটনা শুনে নবাব শায়েস্তা খান অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেন। এদের বিরুদ্ধে চরম পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে তিনি বাদশাহর নির্দেশ চাইতে গেলেন। কিন্তু নির্দেশ চাওয়ার আগেই দিল্লী থেকে নির্দেশ এলো—"মূল আসামীর বিরুদ্ধে বেঙ্গল কাউন্সিল উপযুক্ত

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতিশীল পদক্ষেপ নেয়া হোক এবং তাদের মাল-মানুষ খালাস করে দেয়া হোক।"

নির্দেশ পেয়ে নবাব শায়েস্তা খান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সম্রাটের নিকট থেকে এমন একটা এক তরফা রায় তিনি কল্পনা করতে পারেননি। সম্রাটকে এতটা অবিবেচক তিনি ভাবেন না। নির্দেশ পেয়ে শায়েস্তা খান বাক হারিয়ে ফেললেন।

নির্দেশটাও আসলে সম্রাটের নিজস্ব বিবেচনা থেকে আসেনি। মারাঠাদের উৎপাত নিয়ে দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেব অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত থাকায়, এদিকে গভীরভাবে মন দেয়ার অবকাশ তিনি পাননি। সম্রাটের এই অন্য মনস্কতার সুযোগ নিয়ে এ নির্দেশ আদায় করেছেন কিছু লোভী সভাসদ ও মোটা উপঢৌকনে বশীভূত সম্রাটের গুটিকয় অপরিণামদর্শী পুত্র ও পৌত্রেরা।

সম্রাটের সীল মোহর যুক্ত আদেশ। অন্যথা করার উপায় নেই। দাক্ষিণাত্যের সমস্যার কাছে বাংলার এ সমস্যা এখন নিতান্তই নগণ্য বোধে, এ নিয়ে বাদশাহর কাছে দরবার করতে যাওয়াটা নবাব সমীচীনবোধ করলেন না। তিনি বেঙ্গল কাউন্সিলের অধিকর্তা ম্যাথুস্ ভিন্‌সেন্টকে তলব দিলেন এবং কি পদক্ষেপ তারা বায়্যামের বিরুদ্ধে নিয়েছে, তা প্রদর্শন করতে বললেন।

ভিন্‌সেন্ট্ এসে নবাবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গেল এবং কুর্নিশ করে জার জার কণ্ঠে নবাবকে জানালো, জন বায়্যামের এ আচরণ জঘন্য ও অমার্জনীয়। এ জন্যে বেঙ্গল কাউন্সিল তথা গোটা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যথিত ও অনুতপ্ত। এ কারণে জন বায়্যামকে কোম্পানী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং তাৎক্ষণিক শাস্তি স্বরূপ একশত টাকা জরিমানা করে তা সঙ্গে সঙ্গে আদায় করা হয়েছে।

বক্তব্যের সমর্থনে ম্যাথুস্ ভিন্‌সেন্ট্ কিছু কাগজ ও কোম্পানীর নথীপত্র দেখালো। অতপর ভবিষ্যতে প্রশাসনের প্রতি তাদের আনুগত্যে আর জাররামাত্র গলতি দেখা দেবে না বলে পুনঃ পুনঃ শপথ করে সে এবারের গলতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

নবাব কিছুক্ষণ দম ধরে রইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন বসে বসে। এরপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বিচারটা আমার কাছে নেই। ওটা হুগলীর প্রশাসনের কাছে। এ এক্তিয়ার একমাত্র তাঁরই। ওখানে যান আপনারা। ওখান থেকে পরিষ্কার হয়ে আসুন।

ম্যাথুস্ ভিন্‌সেন্ট্ ভড়কে গেল। সে শংকিত কণ্ঠে বললো—কিন্তু হুজুর—

নবাব বাহাদুর শক্ত কণ্ঠে বললেন—সম্রাটের অভিপ্রায় তাঁকে জানিয়ে দেয়া হবে। চূড়ান্ত রায় আসতে হবে ওখান থেকেই।

নবাব বাহাদুর অন্য কাজে মন দিলেন। আর কথা বলার ফাঁক না থাকায় ম্যাথুস্ ভিনসেন্ট নীরবে বিদেয় হলো।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সম্রাটের আদেশের অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে নবাব শায়েস্তা খান হুগলীর প্রশাসক জিন্দা মালিককে জানিয়েছেন, বেঙ্গল কাউন্সিল বায়্যামকে একশত টাকা জরিমানা করে নকরীচ্যুত করেছে। অতএব, সম্রাটের আদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে, কিছুটা বেদনাদায়ক হলেও, আটক মালামাল আর কয়েদীদের ব্যাপারে যথা সম্ভব নরম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

উমিদ আলী যখন কেতাব কেনার ব্যাপারে মুন্সি সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন মুন্সি সাহেব নবাবের এই নির্দেশ সম্বলিত পত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন। ঐ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি অযৌক্তিক ও দূরদর্শিতাহীন নির্দেশের ব্যাপার অবহিত হওয়া মাত্রই উমিদ আলী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। দেশের ও হুকুমাতের কোন রকম ভবিষ্যত চিন্তা না করে সম্রাট ও নবাব অনুক্ষণ এই বেঈমান গোষ্ঠীটাকে বুকের সাথেই জড়িয়ে রাখতে চান দেখে, উমিদ আলী দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কেতাব কেনার ব্যাপারটা তার কাছে তখন ফালতু হয়ে যায়। সে ক্ষিপ্ত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এবং তাল সামলাতে না পেরে প্রশাসক সাহেবের দপ্তর কক্ষে ঢুকে পড়ে। কিন্তু পরে সে বুঝে দেখে, এ নিয়ে এখানে কথা বলা অর্থহীন। তাই সে কিছু না বলেই আবার সেখান থেকে ফিরে আসে।

উমির অলীর মুখে ঘটনাটি শুনে ফৌজদার আবদুল আজিজ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এমন একটি আত্মঘাতি খবর সম্বন্ধে এখনও তিনি কিছুই জানেন না। এটাও একটা তাঁর কাছে আজব ব্যাপার বলেই তিনি মনে করলেন।

আবদুল আজিজ এটা জানার কথাও নয়। প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেবই এ খবর এখনও কাউকে জানাননি। এতবড় একটা মারাত্মক অপরাধ এইভাবে উপেক্ষিত হয়ে যাবে, একটা হ্যাস্তন্যাস্ত করার জন্যে এতটা তোড়জোড়ের পর তাঁকে আবার এইভাবে নেতিয়ে পড়তে হবে, এসব ভেবে তিনি দিশেহারা ছিলেন। বহুভারম্ভে লঘু ক্রিয়া কি করে তিনি করবেন, কিভাবে তিনি কথাটি তাঁর ফৌজদার, সেরেস্তাদার ও নিকট সহকর্মীদের কাছে ব্যক্ত করবেন, নবাবের ঐ "নরম পদক্ষেপ" কথাটির কি ব্যাখ্যা দেবেন তিনি, তাৎক্ষণিকভাবে কিছুই স্থির করতে না পেরে পত্রটির বিষয়বস্তু কাউকেই জানাননি। মুন্সি সাহেবকে তিনি পত্রটি আপাততঃ চেপে রাখতে বলেছেন। উমিদ আলী যে ইতিমধ্যেই খবরটি জেনে গেছে, তা প্রশাসক সাহেব জানেন না। পত্রখানা চাপা দেয়ার প্রসঙ্গে মুন্সি সাহেব তাঁর সহকর্মীদের পত্রটির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়ার কালে উমিদ আলী খবরটি জেনে যায়।

আবদুল আজিজের পীড়াপীড়িতে ঘটনাটি বর্ণনা করে উমিদ আলী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—যাও, সবাই মিলে এবার ইংরেজদের পা জড়িয়ে ধরোগে, যাও—

স্তম্ভিত আবদুল আজিজ অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—তাজ্জব ! ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়ালো দেখছি !

একই রকম রুষ্ট কণ্ঠে উমিদ আলী বললো—গলায় দড়ি জোটে না তোমাদের ? এমন একটা আহম্মক হুকুমাতের গোলামী করার মধ্যে কি মধু পেয়েছো তোমরা ? গোলামী করে ঘি খাওয়ার এতই তোমাদের সাধ ?

ঃ দোস্ত !

ঃ রুচিতে তোমাদের বাধে না ? এর চেয়ে ক্ষেতে-খামারে মজুর খেটে খাওয়াও হাজার গুণে বেহতর।

আবদুল আজিজ উদাস কণ্ঠে বললেন—তা হয়তো ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে কি করতে পারি আমরা ?

ঃ অনেক কিছুই করতে পারো, আর করার এইটেই সময়।

আবদুল আজিজ সচেতন হয়ে বললেন—অর্থাৎ ?

ঃ সবাই মিলে নকরীতে ইস্তফা দাও তোমরা। এ মুলুকের পদস্থ কর্মচারী-কর্মকর্তা সবাই। তুমি, মির্জা মালিক, আবদুল কাদের, ভাইজান, অন্যান্য এলাকার এই কিসিমের প্রশাসনের তামাম ব্যক্তিবর্গ, মায় বাংলার নবাব বাহাদুর পর্যন্ত। সবাই তোমরা ইস্তফা দিয়ে দিল্লীর বাদশাহকে জানিয়ে দাও, দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে অক্ষম তোমরা। দেশ ও জাতির সাথে বেঈমানী করা সম্ভব নয় তোমাদের পক্ষে।

ঃ বলো কি !

ঃ সাহস না পাও, আমিও তো ক্ষুদে এক কর্মচারী। ভাইজানের সাথে থাকলেও, এই হুকুমাতেরই গোলাম। আমার ইস্তফাটাই আগে নাও। দেখো, এই গাঁড়োল হুকুমাতের গোলামী না করলে, ভাত আমার জোটে কিনা ?

দুঃখেও আবদুল আজিজ ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন—কথা তোমার গুরুত্বপূর্ণ হলেও যুক্তিপূর্ণ নয় দোস্ত। সবাই আমরা ইস্তফা দিলেই কি সমাধান হবে সমস্যার ? ইস্তফা দিয়ে সরে দাঁড়ালে দেশটাতো তখন এতিম হয়ে যাবে আর এই বিদেশী বাঁদরেরা দেশটাকে তখন তো আরো বেশী খুলে-খুবলে খাবে।

ঃ মানে !

ঃ আমরা সরে গেলে দেশ চালাবে কে ?

ঃ ভূতে চালাবে। গরু-গাধা ছাগল-ভেড়া যে পারে সে চালাবে। তা ভেবে তোমাদের কাজ কি ?

ঃ তাতে কি টিকে থাকবে দেশটা ?

ঃ তোমরা চালালেই কি টিকে থাকবে দেশ ? দেশটাকে টিকিয়ে রাখার কিছুমাত্র সামর্থ আছে তোমাদের কারো ? সঠিকভাবে চালনা করে দেশকে যারা টিকিয়ে রাখতে পারে, তাদের চেহারা আলাদা। তোমরা নও।

ঃ দোস্ত !

ঃ তাদের সিনাটান আছে, কোমরে জোর আছে, মেরুদণ্ড সোজা আছে। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে হুংকার তুলতে পারে, খেয়ালী হুকুম-নির্দেশ ভাগাড়ে ফেলতে পারে, যা করণীয় তা নির্ভিকচিত্তে করে যেতে পারে। দেশের স্বার্থে তাতে তারা নির্দ্বিধায় জান কোরবান করতে পারে, নকরীতো ফালতু চীজ।

আবদুল আজিজ নাখোশ কণ্ঠে বললেন—এ তোমার হুজুগের কথা দোস্ত ! আবেগের কথা। এর মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই।

ঃ নেই ?

ঃ ইচ্ছে করলেই কথায় কথায় প্রতিবাদ করা যায় না, আর হাঁক দিলেই সকলে এক সাথে ইস্তফা লিখতে বসে না। হাজার রকম মানসিকতার লোক থাকে এক একটা প্রশাসনে।

ঃ সেই জন্যেই তো বলছি, সে লোক তোমরা নও।

ঃ দোস্ত !

ঃ হাজার জনের কথা থাক। সম্রাট একটা খামখেয়ালী নির্দেশ দিলেন আর অমনি আমাদের নবাব বাহাদুর ঝাঁপির মধ্যে মুখ লুকিয়ে আমাদের প্রশাসক সাহেবকেও মুখ লুকাতে বললেন ? অন্ততঃ এঁরা দুইজন কি এর প্রতিবাদ করতে পারেন না ? প্রশাসক সাহেব করবেন নবাবের কাছে, নবাব করবেন বাদশাহর কাছে। আমি যতদূর বুঝি, এমন একটা না-লায়েক নির্দেশ সম্রাটের মগজ থেকে আসেনি। একটা ঘাপ্‌লা আছে এর মধ্যে। আমার বিশ্বাস, এই ঘাপ্‌লাটা ধরিয়ে দিতে পারলেই, সম্রাট সংগে সংগে এ নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেবেন।

ঃ হুঁ !

ঃ মুখ খুলো তোমরা দোস্ত। প্রতিবাদ করো। নসীবে যা ঘটে ঘটুক, এই প্রতিবাদ তোমরা দিল্লীতক পৌছাও। এই বদমায়েশ বণিকদের আর ছাড় দিও না। এতটার পরও এদের গায়ে কাঁটার আঁচড় না লাগলে, ভবিষ্যতে এদের আর সামাল দিতে পারবে না।

সামাল দেয়া এদের যে আর মোটেই সহজ হবে না, আবদুল আজিজও যথার্থই তা বোঝেন। কিন্তু তবুও উপায় কি ? আবেগের বশে যত কথাই বলা

যাক, বাস্তবে তা কাজে লাগানো কঠিন। কোন উজির-আমলার নয়, খোদ শাহান শাহর ইচ্ছে। এর অন্যথা হবে কি করে ? একমাত্র নবাব বাহাদুরই পারতেন সম্রাটকে সমঝাতে। তা তিনি করেননি। নদী বেয়ে পানি এখন অনেক নীচে নেমে এসেছে। এ পানিকে পুনরায় উজানে পাঠিয়ে দেয়া শুধু দুরূহ কাজই নয়, অচিন্তনীয়ও বটে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবদুল আজিজ নারাজ কণ্ঠে বললেন—আমি আর কি করতে পারি দোস্ত ! প্রশাসক সাহেব তো পত্রের এই ব্যাপাটা আমাকে আদৌ জানাননি বা আমার মতামতও চাননি। তোমার মুখেই শুনছি কেবল ঘটনাটা। নীচের লোক হয়ে অযাচিতভাবে উপরের ব্যাপারে নাক গলানো রীতিমতো বেয়াদবী।

এতটার পরও আবদুল আজিজ ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন ভেবে উমিদ আলী পুনরায় বিগড়ে গেল। সে তিক্ত কণ্ঠে বললো—আর দেশের সর্বনাশ করাটা বুঝি খুবই আদবের কাজ ?

ঃ দোস্ত !

ঃ নাক গলাতেই পারবে নাতো গোলামী করছো কিভাবে ? চোখকান বন্ধ করে ?

ঃ মানে ?

ঃ কর্তা যদি বলেন, আগুন দাও ঘরে, কেন দেবে তা বুঝে নিতেও যাবে না ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ ভাইজান যদি বলেন এখন, যাও—আটক মালগুলো কুঠিয়ালদের পা ধরে কুঠিতে ফেরত দিয়ে এসো, তাই করবে তুমি ?

ঃ তা-মানে—

ঃ এই জন্যেই তো বললাম, এমন গোলামী করার বদলে গলায় দড়ি দাওগে তোমরা। আর নাহোক, তাতে ঈমানটা তাজা থাকবে।

আবদুল আজিজও গরম হলেন। তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বললেন—তা এসব কথা আমাকে বলছো কেন ? তুমি তো তোমার ভাইজানের কাছে গিয়েছিলেই। তাঁকে বলোনি কেন ?

ঃ কি হতো ? আমি বললে কি আমার কথায় গুরুত্ব দিতেন উনি ? পাগলের পাগলামী বলে বিরক্তই হতেন শুধু। তুমি ফৌজদার। পদস্থ লোক। তোমার কথায় জরুর গুরুত্ব দেবেন উনি। তুমি ভাইজানকে বলো, ভাইজান নবাবকে আর নবাব বাদশাহকে বললে, সুরাহা একটা হবেই ইনশাআল্লাহ।

আবদুল আজিজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁ, খোয়াবতো বসে বসে মন্তবড়ই ফাঁদিয়েছো !

উমিদ আলী অনুনয় করে বললো—খোয়াব নয় দোস্ত, একটা কিছু করো। ইতিহাসের পাতাগুলো আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভাসছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমি স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছি। বেঈমান ইল্লতেরা এইভাবেই বরাবর আস্কারা পেয়ে সুঁই থেকে ফুলে ফেঁপে কুড়ালের আকার ধারণ করেছে আর আমাদের হুকুমাতের মহাবিপর্যয় ঘটিয়েছে। এ প্রক্রিয়া যেভাবেই হোক রোধ করো দোস্ত।

এমন সময় এক হুকুম বরদার ব্যস্তভাবে এসে আবদুল আজিজকে বললো—এই যে, হুজুর, আপনি এখানে ? আমি আপনাকে তালাশ করে হয়রান ! আসুন-আসুন, বড় হুজুরের দপ্তর কক্ষে সকলেই এসে গেছেন। বড় হুজুর এক্ষুণি আপনাকে যেতে বললেন সেখানে।

আবদুল আজিজ খেয়াল করে দেখলেন, প্রশাসকের দেয়া সেই নির্ধারিত সময়টা ইতিমধ্যেই কিছুটা পেরিয়ে গেছে। খেয়াল হতেই আবদুল আজিজ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং হুকুম বরদারের সাথে রওনা হতে গিয়ে উমিদ আলীকে স্মিতহাস্যে বললেন—দোয়া করো দোস্ত, আল্লাহ হাফেজ—

প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব অবশেষে নবাবের সেই পত্র নিয়ে বসেছেন এবং বিশ্বস্ত ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বৈঠকে ডেকেছেন। আবদুল আজিজ এসে হাজির হওয়ার পর প্রশাসক সাহেব ভারাক্রান্ত কণ্ঠে পত্রটির সারমর্ম ব্যাখ্যা করলেন এবং তাঁরা যে সবাই হুকুমের গোলাম, দেশের ভালমন্দ নিয়ে তাঁদের যে চিন্তাভাবনা করাটা আসলেই বৃথা, এ নিয়ে অনেকক্ষণ একটানা আফসোস্ করলেন। উপস্থিত ফৌজদার-সেরেস্তাদার সকলেই পত্রের বিষয়বস্তু অবহিত হয়ে মর্মাহত হলেন এবং প্রশাসক সাহেবের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আফসোসে শরিক হলেন। এরপর প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা দিক নিয়ে নানাজন নানা কথা বললেন। 'নরম পদক্ষেপ' কথাটা নিয়েও কিছু কথাবার্তা হলো। আবদুল আজিজ এসে অবধি নীরবে বসেছিলেন। এযাবত তিনি কোন কথাই বলেননি। তা লক্ষ্য করে প্রশাসক সাহেব সবিস্ময়ে বললেন—কি ব্যাপার ! আবদুল আজিজ কোন কথাই বলছো না যে ?

আবদুল আজিজ শুষ্ক কণ্ঠে বললেন—জনাব !

প্রশাসক সাহেব ভারী কণ্ঠে বললেন—এ খবরে তুমি যে যারপর নেই মর্মাহত হবে, তা জানি। মর্মাহত আমরাও কেউ কম হইনি। কিন্তু তাই বলে তো আমাদের না-উম্মিদ হলে চলবে না। এই অবস্থার মধ্য দিয়েই কাজ করতে হবে আমাদের। তোমার কি এ নিয়ে নতুন কিছু বলার আছে ?

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে আবদুল আজিজ বললেন—জি জনাব, আছে।

ঃ বলো, কি বলতে চাও ?

ঃ আমি ভাবছি, এ আদেশটা বদলিয়ে আনা যায় কিনা।

প্রশাসক সাহেব চমকে গেলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—মানে ?

ঃ আদেশটা পুনর্বিবেচনা করার জন্যে সুপারিশ করা যায় কি না ?

প্রশাসক সাহেব পুনরায় চমকে উঠে বললেন—ওরে বাপরে ! এটা খোদ শাহান শাহর আদেশ। নবাবের আদেশ নয়। এ ব্যাপারে কথা বলাও অমার্জনীয় গোস্তাকী।

ঃ জনাব !

ঃ সেই সুপারিশটা করবে কে ?

ঃ নবাব বাহাদুর করবেন।

ঃ তিনি করলে তো আগেই করতেন। এখন করবেন কেন ?

ঃ বিষয়টা জনাব একটু নবাব বাহাদুরকে বুঝিয়ে বললেই—মানে, এর আগে এই ইংরেজদের অনেক আস্কারা দেয়া হয়েছে, যতই আস্কারা পাচ্ছে ততই তাদের ঔদ্ধত্ব বেড়ে যাচ্ছে, এবারের এই এতবড় ঘটনার পর একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি-দণ্ড না হলে পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আরো জটিল হবে—এসব কথা বুঝিয়ে বললেই—

আবদুল আজিজকে থামিয়ে দিয়ে প্রশাসক সাহেব শক্ত কণ্ঠে বললেন—অসম্ভব ! এ ব্যাপারে নবাব বাহাদুরকে কোন কিছুই বলা আমার সম্ভব নয়। গোটা বাংলার তামাম সমস্যা নবাব বাহাদুরের ঘাড়ে। এই এক ইংরেজ চরানোই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। আমি তাঁকে বিরক্ত করতে পারবো না।

ঃ জনাব—

ঃ না, কিছুতেই না। এ অনুরোধ তুমি আমাকে করবে না।

নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে আবদুল আজিজ ভাবতে লাগলেন। প্রশাসক সাহেব পুনরায় প্রশ্ন করলেন—তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে ? এরপরও কি আর কিছু বলার আছে তোমার ?

আবদুল আজিজ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন—কসুর নেবেন না জনাব। আমাকে তাহলে মেহেরবানী করে ঢাকায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক।

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে প্রশাসক সাহেব বললেন—তার মানে ! তুমি যাবে এ নিয়ে নবাব বাহাদুরের কাছে দরবার করতে ? এ সাহস করো তুমি ?

ঃ জনাব !

ঃ তাঁর সাক্ষাৎটাই কি আদৌ তুমি পাবে ?

ঃ একটু কোশেশ করে দেখি জনাব। নবাব বাহাদুর আমাকে অল্প বিস্তর চেনেন।

খেয়াল হতেই প্রশাসক সাহেব বিস্ময়টা খাটো করে বললেন—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। তোমার আব্বাজানের তো ঢাকার দরবারে অনেক প্রতিপত্তি। উনি একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা। তোমার আব্বাজান তোমাকে সাহায্য করলে অবশ্য তা হতে পারে।

ঃ জি জনাব। আমি তাঁর মদদটাই নেবো।

ঃ কিন্তু তাতেই বা কি হবে ? তুমি কি ভাবো, তুমি বললেই নবাব বাহাদুর সম্রাটের কাছে দরবার করতে ছুটবেন ?

ঃ জিনা জনাব। তা আমি আদৌ ভাবিনে। হুকুম যা হয়েছে তা আর পরিবর্তন হবার নয়, বা আমার মতো মামুলী আদমীর পক্ষে তা করে নেয়াও সম্ভব নয়।

ঃ তাহলে আর যাবে কেন ?

আবদুল আজিজ নির্ভিক কণ্ঠে বললেন—জনাব, আমি যেতে চাই এই কারণে যে, এই হুগলীর, বিশেষ করে ইংরেজদের সমস্যা নিয়ে নবাব বাহাদুরের আসলেই কি ধ্যান-ধারণা আর "নরম পদক্ষেপ" বলতে তাঁর চিন্তা ভাবনাই বা কি—এসব বিষয় জানার আমার বড়ই আগ্রহ। এসব কিছু আঁচ করতে না পারলে কাজে কামে আমি কোন উদ্যম খুঁজে পাবো না।

প্রশাসক সাহেব আকৃষ্ট হয়ে বললেন—আচ্ছা।

ঃ এসব বিষয়ে জানার কিছুটা কোশেশ করতেই যেতে চাই।

ঃ পারবে ? তা তুমি পারবে ?

ঃ জনাবের দোআ থাকলে অবশ্যই পারবো জনাব।

প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব চকিতে একটু চিন্তা করলেন। ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ যে একজন সাহসী নওজোয়ান, যে কোন বিষয় নিয়ে যে কোন ব্যক্তির সাথে নির্ভিক ও সচ্ছলচিত্তে আলাপ করার শিক্ষা ও সাহস যে আবদুল আজিজের আছে, প্রশাসক জিন্দা মালিক সবিশেষ তা জানেন। তাই বিস্ময়ের বদলে তিনি এবার উৎসাহ দিয়ে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ কাজটা করতে পারো যদি, বিশেষ করে ঐ নরম পদক্ষেপের ব্যাখ্যাটা আনতে পারো যদি, তাহলে খুব ভাল হবে। আসলেই একেবারে বিনাশর্তে সব কিছু খালাস করে দেবো, না আমাদেরও এজিয়ার কিছু আছে এখানে, এমন একটা আভাস পেলে বড়ই সুবিধে হয়।

ঃ জি জনাব, সেই আভাসটাই পাওয়ার কোশেশ করবো আমি।

পরিস্থিতি সহজ হলো। প্রথম দিকে বিস্ময় প্রকাশ করলেও শেষের দিকে একটি দাপ্তরিক পত্রসহ প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব বিশেষ উৎসাহ ভরে আবদুল আজিজ বেগকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

আবদুল আজিজ চিন্তিতভাবেই ঢাকায় এলেন। তাঁর আব্বা তাঁকে সাহায্য করবেন ঠিকই, কিন্তু ব্যস্ত নবাব বাহাদুর তাঁকে কতখানি পাত্তা দেবেন, এ নিয়ে তাঁর যথেষ্টই সংশয় ছিল। নবাব তাঁকে চিনতেন এবং কিছুটা নেক নজরেও দেখতেন। কিন্তু সেটা বেশ কিছুদিন আগের কথা। এখন তিনি কতখানি ইয়াদে আছেন নবাবের, তা অনিশ্চিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলেন, তাঁর সংশয়টা অমূলক। বৃদ্ধ হলেও নবাব শায়েস্তা খানের স্মরণশক্তি বেশ তাজা। হুগলী থেকে আবদুল আজিজ এসেছে এবং ক্ষণিকের জন্যে হলেও সে হুজুর বাহাদুরের সাথে মোলাকাত করার এজাযত চায়, আবদুল আজিজের আব্বাজান নবাবের কাছে এ আরজ পেশ করলে, নবাব তা সাগ্রহে গ্রহণ করলেন ও আবদুল আজিজের সাথে নিরিবিলিতে কথা বলার জন্যে একটা পৃথক সময় নির্ধারণ করে দিলেন।

আবদুল আজিজের দুশ্চিন্তা কেটে গেল। নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে তিনি নবাব শায়েস্তা খান সাহেবের সাথে মোলাকাত করতে এলেন। নবাব বাহাদুর তখন তাঁর মহলের এক বাইরের কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন এবং একা একাই বসে কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন। একজন প্রহরী এসে আবদুল আজিজের উপস্থিতির কথা জানালে নবাব তাঁকে পাঠিয়ে দিতে বললেন এবং কাগজপত্র গুছিয়ে রাখলেন।

আবদুল আজিজ এসে সসংকোচে দ্বার প্রান্তে দাঁড়ালেন। নবাব বাহাদুর বললেন—এসো এসো, আমি তোমার অপেক্ষাই করছি।

আবদুল আজিজ কক্ষে ঢুকে সালাম করে দাঁড়াতেই সামনের এক আসন দেখিয়ে দিয়ে নবাব বাহাদুর তাঁকে বসার নির্দেশ দিলেন। আবদুল আজিজ সসম্ভ্রমে আসন গ্রহণ করলে নবাব বাহাদুর বললেন—শেষবারে তোমায় যখন দেখি, তার চেয়ে এখন তো আরো বেশী জোয়ান আর তাগড়া হয়ে উঠেছো তুমি। বেশ-বেশ ! তা আছো কেমন ?

আবদুল আজিজ মাথাটা নত করে তাজিমের সাথে জবাব দিলেন—হুজুরের নেক দোআয় সহি সালামতেই আছি হুজুর।

নবাব শায়েস্তা খান খোশদীলে বললেন—তোমাকে ফৌজদার পদে নিয়োগ করার কালে তোমার আব্বাজান সহ অনেকেই দ্বিধার সাথে বলেছিলেন—" একেবারেই ছেলে মানুষ, এতবড় দায়িত্ব কি সে এত শিগ্গির

বহন করতে পারবে ?" কিন্তু তোমার প্রতি কেন যেন আমার দীলে এ বিশ্বাস ছিল যে, এ দায়িত্ব বহন করার জিয়াদা যোগ্যতা তোমার এই বয়সেই আছে। এবার বলো, এ কাজে কোন রকম তকলিফ বা অসুবিধা বোধ করছো কি ?

আবদুল আজিজ সচ্ছল কণ্ঠে জবাব দিলেন—জিনা হুজুর, জিনা। মোটেই কোন কঠিন কাজ বলে এটাকে মনে হচ্ছে না আমার।

নবাব শায়েস্তা খান খুশী হয়ে বললেন—তাই ?

আবদুল আজিজের মাথা আবার নুইয়ে এলো। তিনি ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—আমি তো হুজুর স্বচ্ছন্দেই আমার করনীয় করে যাচ্ছি। এখন আমার মুরুব্বীরা এটাকে কোন নজরে দেখছেন, তা বলতে পারবো না হুজুর। তাঁরা পছন্দ করছেন কিনা বা তাঁরা খুশী আছেন কিনা—

নবাব বাহাদুর কথার মাঝেই হাসি মুখে বললেন—আছেন আছেন। প্রশাসক মালিক জিন্দির মুখে তোমার এন্তার তারিফ শুনতে পাচ্ছি বলেই বলছি। মানুষ চিনতে ভুল করিনি আমি।

জিন্দা মালিকের অপর নাম মালিক জিন্দি। নবাব তাঁকে এই নামেই ডাকতেন। আবদুল আজিজ হৃষ্টচিত্তে বললেন—হুজুর !

ঃ তোমরা, মানে তোমার মতো নওজোয়ানেরাই এ মুলুকের গর্ব আর ভরসা। একটা মস্তবড় দুঃসময় তরিয়ে উঠতে হচ্ছে আমাদের। অতীতের আবিলতা সাফ করে একটা স্বচ্ছ ও সুন্দর জামানা ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে। এখন আমাদের কারোই হাত গুটিয়ে বসে থাকার অবকাশ নেই। বেহুঁশ হয়ে চলারও মওকা নেই জাররামাত্র। খুব হুঁশিয়ারভাবে নজর রাখবে চারদিকে।

আবদুল আজিজ বিনয়ের সাথে বললেন—মহানুভব হুজুর আমার পিতৃতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় জন। হুজুরের নেক দোআ যতক্ষণ আমার উপর আছে, কর্তব্য কাজে জান দিতেও জাররামাত্র দ্বিধা আমার থাকবে না হুজুর।

ঃ সাব্বাস ! এবার বলো, কি কাজ নিয়ে এসেছো তুমি ?

লেফাফা বন্ধ একখানা খত্ বের করে আবদুল আজিজ বললেন—হুগলীর মাননীয় প্রশাসক সাহেবের এই খত্ নিয়ে এসেছি হুজুর। এযাযত পেলে আমার কিছু আরজ আছে।

আবদুল আজিজ উঠে গিয়ে খত্খানা নবাবের সামনে রাখলেন এবং ফিরে এসে পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন। নবাব শায়েস্তা খানের নজর এবার স্থির হলো। স্থির নজরে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন—খত্টার বিষয়বস্তু কি কিছু জানা আছে তোমার ?

ঃ জি মেহেরবান। খত্খানা পাঠ করে তিনি আমাকে শুনিয়েছেন।

ঃ খতখানা কি জন বায়্যামের ব্যাপারে ?

আবদুল আজিজ চমকে গেলেন। এমন আসল প্রসঙ্গে সরাসরি হাত দেবেন নবাব বাহাদুর, এটা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তাই থমমত কণ্ঠে সমর্থন দিয়ে বললেন—মহানুভব !

ঃ তোমার আরজটাও বুঝি ঐ প্রসঙ্গে ?

ঃ জি মেহেরবান।

ঃ এ ছাড়া কি আর কোন দরবার আছে তোমার ?

ঃ জিনা।

নবাব বাহাদুর থামলেন। আবদুল আজিজের মুখের দিকে তীর্যক নয়নে চেয়ে থেকে একটু পরে বললেন—হুঁ ! তোমার আসার খবর পেয়েই আমার এই ধারণা হয়েছিল।

ঃ হুজুর !

ঃ মালিক জিন্দি সাহেব কি নিজে ডেকে পাঠিয়ে দিলেন তোমাকে ?

ঃ জিনা হুজুর। অনেক অনুরোধ করার পর এই আসার এজাযত আমি পেয়েছি।

নবাব আরো সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—এটাও আমার আগে থেকেই ধ্যান-ধারণায় ছিল যে, আমার ঐ নির্দেশ নিয়ে কথা বলতে আসার সাহস প্রশাসক মালিক জিন্দি সাহেব কখনও করবেন না। হুকুম তামিলের অতিরিক্ত তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যাস তাঁর কম। এ নিয়ে একান্তই কেউ কথা বলতে এলে, তোমাদের মতো উষ্ণ রক্তেরই কেউ না কেউ আসতে পারে।

আবদুল আজিজ শংকিত কণ্ঠে বললেন—জি ?

নবাব বাহাদুর একইভাবে বললেন—সে জন্যে আমি না-খোশ হইনি। আমার ধারণাটা যে কাজ করেছে, তার জন্যে আমি খুশী হয়েছি। আরো খুশী হয়েছি যে, হুগলীর প্রশাসনে এমন লোকও আছে যারা খোদ নবাবের আদেশ হলেও, একটা অবাঞ্ছিত আদেশ নিয়ে নির্দ্বিধায় নবাবের সাথে দরবার করতে আসতে পারে। নকরীর ভবিষ্যত নিয়ে তারা মোটেই ভাবতে যায় না।

ঃ মেহেরবান !

ঃ নওকর আর দেশ প্রেমিকের ফারাগটা এখানেই। তোমার এই আসাতে দীলটা আমার তাজা হলো।

আবদুল আজিজ আশ্বস্ত হলেন। তিনি প্রসন্নদীলে চুপচাপ বসে রইলেন। একটু দম নিয়ে নবাব ফের বললেন—খোদ শাহান শাহর নির্দেশ। অন্যথা করার উপায় নেই। তাই মর্মাহত হয়েও, ঐ নির্দেশই বলবত করতে আমিও সুপারিশ করে পাঠিয়েছি। এমন একটা হুকুম নির্দ্বিধায় প্রতিপালিত হবে, এ মুলুকে আমি ছাড়া এ হুকুম নিয়ে আর একটা লোকও মর্মাহত হবে না,

এমনটি কল্পনা করতে তকলিফ আমার হয় কিনা বলো ? নওকর বলেই সকলে হুকুম তামিলের যন্ত্র হলে, এ দেশের ভবিষ্যত কি ?

আবদুল আজিজ অভিভূত হয়ে বললেন—মহানুভব !

ঃ এ কারণেই যখন আমি শুনলাম তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছো, তখনই আমার মনে হলো, জরুর তুমি এই জন্যেই এসেছো। শুনেই আমার মনটা অনেক হাল্‌কা হলো আর তাই তোমার সাথে নিরিবিলিতে কথা বলতে চাইলাম।

ঃ হুজুর।

ঃ এমন ভাবাটা আমার আকস্মিক। ভাবনাটা সঠিক না হলে আমি বড় মুষড়ে পড়তাম।

নবাবকে উজ্জীবিত করে আবদুল আজিজ বললেন—এইটেই যে হুগলীর এখন মুখ্য বিষয় হুজুর। এটি ছাড়া হুজুরকে তকলিফ দিতে আসার মতো দুস্‌রা কোন সমস্যা আর হুগলীতে এখন নেই। এনিয়ে আমাদের প্রশাসক সাহেবও অনেক পেরেশানীতে আছেন আর হুজুরের সাথে আমার কথা বলার এজাযাত প্রার্থনা করে এই খতনামা লিখেছেন।

ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে নবাব বাহাদুর বললেন—কথা বলতে তবুতো তিনি নিজে আসতে যাননি !

জনাব না থাকায় আবদুল আজিজ ঢোকচিপে বললেন—তা মানে—

উষ্ণতাহীন কণ্ঠে নবাব বাহাদুর বললেন—মনের ব্যথা মনে চেপে রাখাতে কোন ঝঞ্ঝাট নেই। যত বালাই তার প্রতিকার করতে যাওয়াতে। ঝঞ্ঝাট পয়দা করার চেয়ে অনেকে নিরিবিলিতে কষ্ট পেতেই ভাল বাসেন। মালিক জিন্দি খুব ঈমাদার লোক। কিন্তু বড়ই নীরিহ।

ঃ মালিক-ই-মুলক্ !

শায়েস্তা খান স্মিতহাস্যে বললেন—মালিক আমি নই আবদুল আজিজ। আমিও তোমাদের মতোই গোলাম। মালিক যিনি তিনি আছেন দিল্লীতে।

ঃ মেহেরবান !

ঃ তাই, তোমরা কেউ প্রতিবাদ নিয়ে আসো, এটাও যেমন চেয়েছি, তেমনি আবার প্রতিবাদের ঝড় তুললেও যে এ নির্দেশের ব্যতিক্রম আমি কিছু করতে পারবো না, এটাও নিশ্চিতভাবে জেনে রেখেছি। আমার এই চাওয়াটা সেরেফ একটা আত্মতৃপ্তির ব্যাপার বৈ নয়।

ঃ আত্মতৃপ্তি ! কেন হুজুর ?

ঃ এ মুলুকে সবার মধ্যে দেশ প্রেম জাগরুক থাকুক, মুলুকের ভাল-মন্দ

বোধটা সবার মধ্যে উষ্ণ থাকুক, এই টুকুই আমি চেয়েছি। গোলাম আমরা যে যতটাই হই না কেন, এ বোধটা জিন্দা থাকলে এ মুলুকের চরম ক্ষতি কখনও হতে পারবে না।

আবদুল আজিজ ইতস্ততঃ করে বললেন—কসুর মাফ হয় হুজুর ! জন বায়্যামের হুজুরদের এই আদেশ কি সেই চরম ক্ষতিরই আলামত নয় ?

নবাব শায়েস্তা খান মাথা তুলে বললেন—অর্থাৎ ?

আবদুল আজিজ ভয়ে ভয়ে বললেন—আমাদের শাহান শাহ একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। একজন বিরল প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিচারক। এদিকের কোন মতামত না নিয়ে এমন একটা আদেশ তাঁর তরফ থেকে কেমন করে এলো, আমি বুঝে উঠতে পারছিনে হুজুর।

নবাব বাহাদুর গম্ভীর হলেন। ক্ষণিকের জন্যে নজর আবার তাঁর স্থির হলো। এরপর তিনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন—বুঝে উঠতে আমারও কষ্ট হচ্ছে। তবু শাহান শাহর আদেশ। এ নিয়ে অধিক বুঝতে যাওয়াও সমীচীন নয় আমাদের। এ আদেশে আমরা যে তকলিফ বোধ করছি, এই যথেষ্ট। আদেশ তাঁর প্রতিপালন করতেই হবে।

ঃ আমার মনে হয় হুজুর, এ আদেশ জারীর পেছনে কোন অশুভ শক্তির হাত আছে।

ঃ থাকাই স্বাভাবিক। শাহান শাহর খাস বিবেচনায় যে এতটা গলদ থাকতে পারে না, ওটা আমিও বুঝি। কিন্তু হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন তা জরুর তামিল হওয়া চাই, এই হলো শেষ কথা।

আবদুল আজিজ নিবৃত্ত হতে পারলেন না। ফের তিনি ইতস্ততঃ করে বললেন—কিন্তু হুজুর আমি বলছিলাম—

ঃ বলো—

ঃ এই হুকুমটি কি পালটিয়ে নেয়া যায় না ? আমার মনে হয় বাদশাহ হুজুরকে আসল ঘটনা সমঝিয়ে দিতে পারলে, এ আদেশ তিনি অবশ্যই প্রত্যাহার করে নেবেন। একেবারেই এমন একটা বিবেচনাহীন আদেশ—

হাত তুলে আবদুল আজিজকে থামিয়ে দিয়ে নবাব বাহাদুর বললেন—দাঁড়াও-দাঁড়াও, শাহান শাহ কি করবেন, সে ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত হওয়া ঠিক নয়। অনেক উপরের ব্যাপার সেটা। কিন্তু এ আদেশকে তুমি একেবারেই বিবেচনাহীন বলছো কেন ? কিছুটা গা-কাটা আর একতরফা আদেশ হলেও, তিনি তো একদম হাওয়ার উপর এ নির্দেশ দেননি। মূল আসামীর দণ্ডবিধান হয়েছে। জন বায়্যামকে কোম্পানী থেকে বহিষ্কার করা

হয়েছে। সে এখন নকরীচ্যুত। কোম্পানীও এ ব্যাপারে অনুতপ্ত। এসব জেনেই শাহান শাহ কোম্পানীর প্রতি আমাদের সদয় হতে বলেছেন। বিবেচনা কিছুই তিনি করেননি, এ কথা তো মোটেই এখানে খাটে না।

ঃ হুজুর !

ঃ যথোপযুক্ত না হলেও অপরাধের দণ্ড বিধান কিছুটা তো হয়েছেই।

আবদুল আজিজ আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে নিলেন। তাঁর চোখ মুখ মলিন হয়ে গেল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে আফসোস্ করে বললেন—এটা কি কোন দণ্ড বিধান হলো হুজুর ?

নবাব বাহাদুর সবিস্ময়ে বললেন—হলো না ? নকরীচ্যুত জন বায়্যামকে একশত টাকা জরিমানা করে নগদ তা আদায় করা হয়েছে। এটাকে তুমি একেবারেই নগণ্য মনে করছো কেন ?

খাল্প একটু মাথা তুলে আবদুল আজিজ ম্লান কণ্ঠে বললেন—কসুর নেবেন না হুজুর ! নগণ্য মনে করতে পারলেও আমার হয়তো অধিক আফসোস্ থাকতো না। কিন্তু জন বায়্যামের যে কোন দণ্ডই হলো না, এই আফসোস্ আমি সম্বরণ করতে পারছিনে।

নবাব কিছুটা নাখোশ কণ্ঠে বললেন—কোন দণ্ডই হলো না মানে ?

ঃ কৈ হলো হুজুর ? এটা তো কোম্পানীর একটা চাল, সেরেফ হাত সাফাই। ঐ নকরীচ্যুত আর জরিমানা সেরেফ একটা তৈরী করা কাহিনী।

ঃ কাহিনী হবে কেন ? আমি ওদের নথীপত্র দেখেছি।

ঃ নথীপত্র ঠিকই আছে মেহেরবান। জন বায়্যামকে আর বাংলা মুলুকে দেখা যাবে না ঠিকই, কিন্তু বাংলা মুলুক থেকে বিদায় করা মানেই বহিষ্কার করাও নয়, নকরীচ্যুত করাও নয়। এই বাংলা মুলুকের বাইরে অনেক মুলুকে কারবার আছে তাদের। এই হিন্দুস্তানেরই দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একাধিক ও প্রশস্ত বাণিজ্য ঘাঁটি আছে। বাংলা থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও পার করে দেয়াকেই কি আমরা নকরীচ্যুত ধরে নেবো হুজুর ?

নবাব শায়েস্তা খান থমকে গেলেন। তিনি চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—আবদুল আজিজ !

আবদুল আজিজ বলেই চললেন—আর জরিমানা তো কাগজপত্রের ব্যাপার এবং তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কাগজপত্রে জরিমানা দেখিয়ে পরে সে কাগজপত্র বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে গেলেই বা কে তার হদিস্ করছে হুজুর !

নবাব শায়েস্তা খান যে এসব কিছুই ভাবেননি, তা নয়। ইংরেজ বেনিয়ারা যে জালিয়াতিতে দক্ষ, তাও তিনি জানেন। কিন্তু এতবড় একটা ক্ষেত্রে, বিশেষ

করে সম্রাটের দরবার তক্ যে বিষয়টি গড়িয়েছে, তা নিয়েও তারা জালিয়তি করার সাহস করবে, নবাব শায়েস্তা খান এতটা ভাবতে চাননি। আবদুল আজিজের কথায় এবার তাঁর মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিলো। ফের তিনি চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, তোমার আন্দাজটা একেবারেই উড়িয়ে দেবার নয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই এতটা ভাবতে গেলে আর মানুষকে একেবারেই বিশ্বাস না করলে এ মুলুকের প্রশাসনটা চালাবো আমরা কিভাবে ?

ঃ আমি অন্যের কথা বলিনে হুজুর। কিন্তু এই ইংরেজদের এতটুকু বিশ্বাস করার কোন ফাঁক আছে কি ? এরা করতে পারে না, এমন জালিয়তি এ দুনিয়ায় বিরল।

ঃ আবদুল আজিজ !

ঃ টমাস প্র্যাটের কথাই মেহেরবানী করে ভাবুন হুজুর। টমাস প্র্যাট্কে নিয়ে কি জালিয়তিটাই না করলে তারা ?

নবাব শায়েস্তা খান খামুশ হয়ে গেলেন। টমাস প্র্যাটের কথা মনে পড়তেই তিনি স্থবির বনে গেলেন। ললাটে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। বিষণ্ন দীলে বসে বসে কেবলই তিনি ভাবতে লাগলেন। ইংরেজদের জঘন্য চরিত্রের সাথে এই প্র্যাটের ঘটনার মধ্যে দিয়েই তিনি সর্ব প্রথম পরিচিত হন।

ঘটনাটি ঘটে সুবাদার হিসাবে নবাব শায়েস্তা খানের বাংলা মুলুকে আগমনের প্রথম দিকে। আবদুল আজিজ তখনও তালেবে এলেম। তিনি নিজে কিছুটা জানেন এবং তাঁর ওয়ালেদের মুখে ঘটনাটি সবিস্তারে শুনেন। শায়েস্তা খান যখন সুবাদার হয়ে বাংলা মুলুকে এলেন তখন বাংলার অবস্থা অতিশয় করুণ। তিনি এসে দেখলেন, তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদারদের ব্যর্থতার দরুন বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তার জের তখনও কাটেনি। দেখলেন, কর্মচারী-কর্মকর্তারা দায়িত্বহীন, লোভী, কলহপ্রিয় ও দুর্নীতিবাজ। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং সারা দেশে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। আরো তিনি দেখলেন, এই অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রাম তথা আরাকান (স্বাধীন সুলতানদের পর সুবাদারদের দুর্বল শাসনকালে আরাকান রাজ মুসলমানদের হাত থেকে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেয় এবং আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে) কুচবিহার, জয়ন্তিয়া, মুরাং—প্রভৃতি চারপাশের রাজ্যগুলি আগ্রাসী থাবা মেলে বাংলা মুলুককে গ্রাস করতে উদ্যত। এর সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে লুটতরাজের বিভীষিকা। কুচবিহার জয়ন্তিয়া, মুরাং ও অন্যান্য মুলুক থেকে স্থলপথে অগণিত লুটেরা এসে বাংলা মুলুকে অবাধ লুটতরাজে

লিপ্ত। এর চেয়েও যা বিভৎস তা হলো, জল পথে আরাকানের মগ আর ফিরিঙ্গী (পর্তুগীজ) জল দস্যুদের বেপরোয়া লুটপাট, নরহত্যা ও অগ্নি সংযোগ। লা-ওয়ারিশ বোধে বাংলার মাল-মানুষ-জীব-জন্তু—সব কিছুই এই মগ-ফিরিঙ্গী লুটেরারা দিনে দুপুরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আর জাহাজ ভর্তি করছে। এত ব্যাপক আর লোমহর্ষক এই জল দস্যুদের লুটতরাজ আর হত্যাকাণ্ড যে, এদের আতংকে গোটা দেশ তখন থর থর কম্পমান।

এই অবস্থা সামনে নিয়ে ৬৩ বছরের বৃদ্ধ শায়েস্তা খান সাহেব বাংলার সুবাদার হয়ে এলেন। বিচক্ষণতায় তিনি অতুলনীয় হলেও, দেহের তাকত তাঁর তখন অনেকখানি হ্রাস পেয়ে গেছে। কিন্তু এটা কোন অন্তরায় হলো না। তাঁর এই ঘাটতিটুকু ষোলকলায় পূর্ণ করলেন তাঁর বীর্যবান ও তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন চার পুত্র—বুজুর্গ উমিদ খান, জাফর খান, আবু নাসের ও ইরাদত খান। ওয়ালেদের পরিচালনায় এই চার আওলাদ ঝাঁপিয়ে পড়লেন সর্বাঙ্গনে—রণক্ষেত্রে, প্রশাসনে, দস্যুতস্কর দমনে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। কুচবিহার, জয়ন্তিয়া, মুরাং প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি বিজিত হলো এবং স্থলপথের দস্যুতস্কর মহাতংকে বাংলার জমিন হারাম জ্ঞানে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল।

চট্টগ্রাম জয় করলেন শায়েস্তা খানের বীরপুত্র বুজুর্গ উমিদ খান। চট্টগ্রাম বিজয় নবাব শায়েস্তা খানের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তিনি নিজেই এই অভিযানের পরিকল্পনা তৈয়ার করলেন এবং বুজুর্গ উমিদ খান এই অভিযান পরিচালনা করলেন। বুজুর্গ উমিদ খানের প্রশংসনীয় বীরত্বে চট্টগ্রাম বিজিত হলো, আরাকান রাজ পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন, মগ ও ফিরিঙ্গী জল দস্যুদের অনেকে নিহত হলো এবং বাঁদবাকীরা বঙ্গোপসাগর ত্যাগ করলো। বাংলা মুলুকে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলো।

কিন্তু কথায় বলে, "ইল্লত যায় না ধুলে আর স্বভাব যায় না ম'লে"। কিছুদিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। এরপর পালিয়ে যাওয়া কিছু কিছু মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যু সম্মুখ সংঘাত এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে এসে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় মাঝে মাঝে উৎপাত শুরু করলো। বাংলার নৌবাহিনী এই জলদস্যুদের তালাশে বঙ্গোপসাগরে ছিলই, নবাব শায়েস্তা খান আবার এই টমাস প্র্যাট্‌কেও ঐ কাজে নিয়োজিত করলেন।

টমাস প্র্যাট ছিল ঢাকার নবাব দরবারে ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধি। সুবাদার মীর জুমলার আমল থেকে এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের তামাম দয়-দরবার এই টমাস প্র্যাট্‌ই ঢাকার নবাবের কাছে করতো। নবাবের তরফ থেকে সুবিধে আদায়ের মতলবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

টমাস প্র্যাট্‌কে নবাব শায়েস্তা খানের কাছে আরো নিবিড়ভাবে ভিড়িয়ে দেয়। তাই নবাবের একান্ত শুভাকাঙ্খী হিসেবে প্র্যাটের আচরণে আনুগত্যের বান ডাকে। সে অযাচিতভাবেই নবাব শায়েস্তা খান ও তাঁর প্রশাসনকে নানা কাজে সহায়তা করতে থাকে। নৌযুদ্ধে প্র্যাটের অনেকখানি দক্ষতা থাকায় জলদস্যু দমন করার ব্যাপারে সে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে উঠে। এতে করে চট্টগ্রাম বিজয়ের অল্পকাল পরেই প্র্যাট্ সরাসরিভাবে নবাবের নৌবাহিনীতে যোগদান করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। কোম্পানীর কাজের অতিরিক্ত নবাবের নৌবাহিনীরও কিছু খেদমত করুক প্র্যাট্, এই মর্মে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা সুপারিশ করতে এলে, নবাব বাহাদুর তার পক্ষে জামিন চান। বিনা জামিনে কোন বিদেশীকে নৌবহরে ভর্তি করতে, বিশেষ করে তার হাতে কোন নৌযান ছেড়ে দিতে, নবাব বাহাদুর সম্মত হতে পারেন না। ইংরেজদের উস্কানীতে ইংরেজ প্রেমিক দুইজন মুসলমান দালাল দশ হাজার টাকার মুচলেকা সই করে প্র্যাটের পক্ষে জামিন হলে নবাব তাকে তাঁর নৌবাহিনীতে নিয়োগ করেন। অতপর কাজকর্মে প্র্যাটের আগ্রহ দেখে নবাব তাকে তিনশত সেপাইয়ের মনসবদার বানান এবং মগ-ফিরিঙ্গী পুনরায় উৎপাত শুরু করলে এদের দমন করার কাজে প্র্যাটকে নিয়োগ করেন।

কিন্তু কয়েকটা দিন না যেতেই প্র্যাট্ তার স্বরূপ প্রকাশ করলো। দশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে নবাব শায়েস্তা খান একদিন টমাস প্র্যাট্‌কে সম্রাটের দরবারে বিশেষ এক কাজে প্রেরণ করলেন। প্র্যাট্ তার তিন শত সৈন্যের নৌবহর নিয়ে জলপথে রওনা হলো এবং বঙ্গোপসাগরের কিছু পথ পেরিয়ে এসেই সে তার গতি বদল করলো। কয়েকজন ইংরেজ ও পর্তুগীজ জলদস্যুর সহায়তায় প্র্যাট্ তার বহর নিয়ে আরাকানের সীমান্তে এসে হাজির হলো এবং আসার পথে বাংলার ছোট একটি নৌবহরকে হামলা করে দুই দুইটি নৌযান ছিনিয়ে নিয়ে এলো। শুধু তাই নয়, আরাকানে এসে পরাজিত আরাকান রাজের ফৌজের সাথে সামিল হয়ে নবাবের অধিকৃত সীমান্তের একটি দুর্গও সে সাময়িকভাবে দখল করে নিল। অতপর বাংলার নৌবহর প্র্যাট্‌কে তাড়া করলে সে পালিয়ে আরাকানের গভীরে চলে গেল।

ঘটনাটি আকস্মিক কিছু নয়। নবাবের কাছে আনুগত্য দেখালেও আরাকান রাজের সাথে টমাস প্র্যাট্‌সহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বরাবরই গোপন আঁতাত ছিল। প্রয়োজন কালে আরাকান রাজের সহায়তায় বাংলাকে ঘায়েল করার নীল নকসা ইংরেজদের অনেক দিনের। পরাজিত হয়ে এলেও আরাকান রাজ আবার সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন। টাকায় আট মণ চালের বাজারে দশ হাজার টাকা প্রচুর টাকা। তিন শত সৈন্যের সাথে প্রচুর অর্থ হাতে পেয়ে

স্বাভাবিকভাবেই প্র্যাট্ এই সুযোগ গ্রহণ করলো। সে আরাকান ফৌজে যোগদান করে আরাকান রাজের শক্তি বৃদ্ধি করলো।

ঘটনার প্রেক্ষিতে নবাব শায়েস্তা খান টমাস প্র্যাট্‌কে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে ইংরেজ কোম্পানীকে কঠোর নির্দেশ প্রদান করলেন এবং এই নির্দেশ অন্যথা করলে বাংলা মুলুকে ইংরেজদের তামাম ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেবেন বলে হুমকি দিলেন। কিন্তু এ নির্দেশে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে ইংরেজ কোম্পানী নবাবকে সরাসরি জানালো যে, টমাস প্র্যাট্ তাদের লোক নয়. প্র্যাটের সাথে কোম্পানীর কোন সম্পর্ক নেই।

এই জবাবের প্রেক্ষিতে নবাব ক্রোধ ভরে জানতে চাইলেন, টমাস প্র্যাট তাদের দীর্ঘদিনের প্রতিনিধি, পলায়নের একদিন আগেও সে কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে নবাবের দরবারে ওকালতি করেছে এবং তার মাধ্যমেই ইংরেজরা তাদের আবেদন-অভিযোগ নবাবের দরবারে উপস্থাপন করেছে। তবু প্র্যাট তাদের লোক নয়, এর অর্থ কি ?

বেশরম ইংরেজ বেনিয়ারা এসব দিক এড়িয়ে গিয়ে জানালো, টমাস প্র্যাট্ কোনভাবেই তাদের সাথে সম্পৃক্ত নয়। প্র্যাটের ব্যাপারে তাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। দায় দায়িত্ব কারো থাকলে, তা প্র্যাটের জামিনদারদের। প্র্যাট্ তাদের কেউ নয়। সেই সাথে তারাও হুমকি দিয়ে জানালো যে, প্র্যাট্ কোম্পানীর কর্মচারী নয়, নবাবের কর্মচারী। সুতরাং নিজের কর্মচারীর আচরণের জন্যে নবাব যদি কোম্পানীর উপর জুলুম করেন, তাহলে তারা এ নিয়ে তাদের দেশের রাজা ও "বোর্ড অফ ডাইরেকটর"-এর মাধ্যমে দিল্লীর বাদশাহর কাছে দরবার করতে বাধ্য হবে।

অতীতের তামাম আচরণ ঝেড়ে ফেলে ইংরেজরা কায়দা মাফিক অবস্থান নিলো। ইংরেজদের এই নির্লজ্জ বেঈমানী দেখে নবাব শায়েস্তা খান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। প্রকৃত ঘটনা যা-ই হোক আর প্র্যাট্‌কে ইংরেজরা যেভাবেই ব্যবহার করুক, সে যে সাময়িকভাবে নবাবের নৌবহরে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়, এটা সত্য। শায়েস্তা খান তাই খামুশ হয়ে গেলেন। প্র্যাট্‌কে ও তার সহচরদের প্রদত্ত সাকুল্যে বার হাজার টাকার দায় জামিনদারদের ঘাড়ে এসে পড়লো। ইংরেজরা তাদের দিকে এবার চোখ তুলেও চাইলো না। ইংরেজ প্রীতির আতিশয্যের কারণে দুইজন নির্বোধ 'চামচে'কে নগদ বার হাজার টাকা নবাবের কোষাগারে জমা দিতে হলো।

এই হলো টমাস প্র্যাটের উপাখ্যান। ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগের সামনে বসে নবাব শায়েস্তা খান এসব কথা ভেবে ভেবে পেরেশান

হতে লাগলেন। চামচেদের কথা নয়। কুকুর মাফিক মুগুর পেয়েছে চামচেরা। তিনি ভেবে পেরেশান হতে লাগলেন এই মর্মে যে, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের আপদ থাকার দরুন সেদিনও তিনি এই ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্কেল মাফিক কোৎকা হাঁকাতে পারেননি।

এই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের বালাই নিয়ে কেবলই ভাবতে লাগলেন তিনি। খোলাফায়ে রাশেদীন ও মহান খলিফাদের আমল পেরিয়ে গেছে। তখনকার মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা আর এখনকার এই সপ্তদশ শতাব্দির হিন্দুস্তানের অবস্থা অনেক পৃথক। সেখানে তখন দরবারের ভেতরে ও বাইরে সবাই ছিলেন ঈমানদার। এখানে এখন দরবারের ভেতরে ও বাইরে অনেক আবিলতা। বাদশাহ আওরঙ্গজেব একজন জবরদস্ত ঈমানদার ইনসান ও প্রজ্ঞাশীল শাসক ঠিকই, কিন্তু তাঁর সভাসদদের, বিশেষ করে তাঁর পুত্র-পৌত্রদের, ঈমান বড়ই নিম্নমানের। তাৎক্ষণিক ও ব্যক্তিগত লাভ ছাড়া দূরদর্শিতা বলে তাঁর পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে উল্লেখ করার মতো তেমন কিছুই নেই। যত বিজ্ঞ আর ঈমানদারই হোন না কেন তিনি, সর্বাধিক বিস্তৃত এই মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সম্রাট আওরঙ্গজেবের একার পক্ষে সমানভাবে নজর রাখার সাধ্য ও সুযোগ কোনটাই নেই। তদুপরি, দাক্ষিণাত্যের বিশেষ করে মারাঠাদের সমস্যা তাঁকে এমনভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে যে, অন্য দিকে সুষ্ঠভাবে নজর দেয়ার অবকাশ তাঁর ক্ষীণ। ফলে, স্বাধীন সুলতানদের পতনের পর থেকেই বাংলার শাসন দণ্ড সেই যে কমজোর হয়ে পড়েছে, সেটা আর কোনমতে সবল হওয়ার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছে না। সুবাদারদের ব্যর্থতার আর কেন্দ্রের পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপের কারণে বাংলার নড়বড়ে নসীবের আর পরিবর্তন ঘটছে না। যথেষ্ট সদেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলার ভবিষ্যতকে তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পরিচালিত করতে সুবাদার হিসেবে তিনি নিজেও পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছেন। অক্লান্ত শ্রম আর কঠোর মনোবলের মাধ্যমে অর্জিত বাংলার এই বর্তমান উন্নতিকে তিনি কোন কায়েমী ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারছেন না। নিরাপদ করতে পারছেন না বাংলার ভবিষ্যতকে। কেন্দ্রের দ্বারা নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে স্বাধীনভাবে অবস্থা মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অবকাশ আর এক্তিয়ার তাঁর নেই। ডাক পড়লেই তাঁকে গুটাতে হবে পাততাড়ি। বাংলাকে বড় ভাল-বাসেন তিনি। এসব কথা মনে পড়তেই দীল তাঁর টন টন করে উঠছে।

আবদুল আজিজ বেগকে সামনে বসিয়ে রেখে ভেবেই চললেন নবাব শায়েস্তা খান সাহেব। টমাস প্র্যাটের ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে সেদিনই প্রয়োজন ছিল এই ইংরেজদের তৎক্ষণাৎ এ মুলুক থেকে লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে

দেয়ার। কিন্তু কেন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে তা করার অধিকার তাঁর সেদিনও ছিল না, আজও জন বায়্যামের প্রসঙ্গে এই ইংরেজদের উৎখাত করার স্বাধীনতা তাঁর নেই। পরিস্থিতির কোন পরোয়া না রেখে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ আসমান থেকে এসে গেছে।

অনেকক্ষণ যাবত নবাব শায়েস্তা খানকে নীরব দেখে ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ নড়ে চড়ে উঠে বললেন—বলুন মেহেরবান, এরপরও কি বিশ্বাস করা যায় ওদের ?

ঘুম থেকে উঠার মতো নবাব শায়েস্তা খান বললেন—এ্যাঁ ? কি বললে ?

ঃ ঐ বেঈমান বেনিয়াদের বিশ্বাস করার অবকাশ কি কিছু আছে হুজুর ?

নবাব বাহাদুর বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন—অবকাশ ? যারা বেশরম আর বেহায়া, তাদের বিশ্বাস করা আর শয়তানকে বিশ্বাস করা সমান।

উৎসাহিত হয়ে উঠে আবদুল আজিজ বললেন—সেই জন্যেই তো বলছি হুজুর, এই ইংরেজ কুঠিয়ালদের এত সহজে ছেড়ে দেয়া যায় না। একান্তই যদি এদের উৎখাত করা না যায়, তাহলে অন্ততঃ এদের এমন শিক্ষা হওয়া উচিত যাতে করে এরা আর কোনদিনই মাথা তুলতে না পারে।

ঃ আবদুল আজিজ !

আবদুল আজিজ অনুনয় করে বললেন—একটা কিছু করুন মেহেরবান। শাহান শাহর এ আদেশ একেবারেই অক্ষরে অক্ষরে তামিল করা যায় না।

নবাব শায়েস্তা খান ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললেন—আবদুল আজিজ, তোমাকে তো আগেই বলেছি, তোমাদের মতো আমিও একজন গোলাম। গোলামের আর করার সাধ্য কতটুকু ?

ঃ আসল অবস্থাটা কি শাহান শাহকে সমঝিয়ে দেয়া যায় না হুজুর ?

আবদুল আজিজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির নজরে চেয়ে থাকার পর নবাব শায়েস্তা খান শক্ত কণ্ঠে বললেন—না, যায় না। মুঘল সাম্রাজ্যের চৌহদ্দিটা আজ আগের চেয়ে অনেক-অনেক বেশী বিস্তৃত। এই বিশাল সাম্রাজ্যের তামাম দিক সামাল দেয়ার লোক একমাত্র ঐ শাহান শাহ একজন। সাম্রাজ্যের ভালাই নিয়ে গভীরভাবে মাথা ঘামানোর লোক দুসরা আর কেউ নেই। অনেকেই এ কাজে পুত্র-পৌত্রদের সক্রীয় মদদ পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা এক রত্তিও ভরসা করার মতো নয়।

ঃ মেহেরবান !

ঃ তদুপরি দাক্ষিণাত্যের সমস্যা এতই জটিল হয়ে উঠেছে যে, মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই এখন বিরাট এক হুমকীর সম্মুখীন। এই হিন্দুস্তানে গোটা

মুসলমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের প্রশ্নের সামনে বাংলার এই আঞ্চলিক সমস্যা, বিশেষ করে একদল বেনিয়াদের উৎপাত শাহান শাহর কাছে কোন সমস্যাই নয়।

ঃ হুজুর !

ঃ ভবিষ্যতে বাংলা মুলুকের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও, এখনই বাংলা মুলুক উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু গোটা দিল্লী সাম্রাজ্যটা এখনই এক বিরাট উলট-পালটের সম্মুখীন। এ অবস্থার মধ্যেও বাংলার এই সমস্যার উপর যা হোক একটা সিদ্ধান্ত তিনি দিয়েছেন। গোটা সাম্রাজ্যের নিদারুণ ঐ সংকটের সামনে তাঁর ঐ সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ ত্রুটি বিচ্যুতি এতই ফালতু বিষয় যে, এ নিয়ে এখন কথা বলতে যাওয়াটা সম্রাটকে শুধু যারপরনেই উত্যক্ত করে তোলাই নয়, নিরেট বাতুলতাও বটে।

ঃ মেহেরবান !

ঃ এসব চিন্তা আমি আগেই করে দেখেছি। অবস্থা এমন না হলে তোমাদের সুপারিশের অপেক্ষায় আমি বসে থাকতাম না ঢাকাতে। আগেই দিল্লীতে ছুটে যেতাম।

আবদুল আজিজ হতোদ্দম হয়ে গেলেন। কিঞ্চিৎ নীরব থেকে তিনি হতাশ কণ্ঠে বললেন—বাংলার আর তাহলে কোন ভরসা রইলো না হুজুর ?

শায়েস্তা খান উৎসাহ দিয়ে বললেন—কেন থাকবে না ? ভরসা তো তোমরাই। তোমরাই বাংলাকে জান প্রাণ দিয়ে হেফাজত করবে।

ঃ হুজুর !

ঃ আমাকে যে কোন সময় কেন্দ্রের ডাকে বাংলা ছাড়তে হতে পারে। কিন্তু তোমরা স্থানীয় লোক। তোমরা এই বাংলা মুলুকেই রইবে। তোমরা যদি এই বেনিয়াদের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখো আর তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ পদে পদে ব্যহত করতে থাকো, তাহলে বেনিয়ারা হতাশ হয়ে একদিন আপছে আপ খামুশ হয়ে যাবে।

ঃ তা কি কখনও সম্ভব হুজুর ? শাহান শাহর কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু বাংলার নবাব বাহাদুরের সমর্থন না থাকলে, আমাদের কি সাধ্য যে আমরা ইচ্ছে মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করি ?

ঃ সমর্থনের অভাব নিশ্চয়ই ঘটবে না। অন্য সুবাদারদের সমর্থন তোমাদের পেছনে থাকাটা অনিশ্চিত কিছু হলেও, যাবার আগে তাদেরও আমি যথাযথ নসিহত করে যাবো। আর তাছাড়া আমি তো আজই যাচ্ছিনে। আমি যতদিন আছি ততদিন সমর্থনের অভাব থাকার প্রশ্নই কিছু উঠে না।

ঃ মেহেরবান !

ঃ না-উম্মিদ হওয়ার কারণ নেই নওজোয়ান। তোমরা তৈয়ার হয়ে থেকো। আমি এখন স্থির সংকল্প যে, মওকা পেলেই এই বেনিয়াদের উপর মরণ আঘাত আমি না হেনে ছাড়বো না।

ঃ হুজুর !

ঃ এরপরও যদি ইংরেজরা বাড়তে চায়, বাড়তে দাও। হাতিয়ার শানাও আর শাহান শাহর নজরে পড়ার মতো এই ইংরেজদের বাড়তে দাও। স্বর্ণকারের মতো ঠুকঠাক আঘাত করার বদলে আমি একবার কামারের ঘা মারতে চাই আমার পদক্ষেপের সমর্থনে কিছুটা ক্ষেত্র তৈয়ার হলেই।

আবদুল আজিজ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—মেহেরবান !

চাপা উত্তেজনায় নবাব বাহাদুর ঈষৎ কাঁপছিলেন। নিজেকে কিছুটা সংযত করে নিয়ে তিনি বললেন—এখন হুগলীতে ফিরে যাও আবদুল আজিজ। সবাই তোমরা মনোযোগ দিয়ে কাজ করো গিয়ে আর চারদিকে হুঁশিয়ার নজর রাখো গিয়ে।

ঃ মহানুভব !

ঃ আমার বিশ্বাস, আমি তোমার কাছে পরিষ্কার হতে পেরেছি।

ঃ জি মেহেরবান, জি। এ নিয়ে আর আমার প্রশ্ন নেই। এখন আর একটা ছোট্ট কথা জানার আছে হুজুর। হুজুরের নির্দেশ নামায় "নরম পদক্ষেপ' বলে একটা কথা আছে। এখানে কি বিচারকের বিচার করার অবকাশ কিছু আছে হুজুর ?

কিঞ্চিৎ নীরব থেকে নবাব বাহাদুর কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—তুমি না হয় ছেলে মানুষ, এসব কাজে নতুন এসেছো। কিন্তু মালিক জিন্দি সাহেবও কি এতটাই না-লায়েক যে এই কথাটির অর্থ তিনিও বোঝেননি ?

ঃ হুজুর !

ঃ বিচার করার অবকাশই যদি না থাকবে, তাহলে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রশ্ন তাঁর কাছে থাকবে কেন ? একেবারে চূড়ান্ত আদেশ এখান থেকেই যেতো। কিন্তু বিষয়টি তো মালিক জিন্দির বিচারাধীন। এখান থেকে চূড়ান্ত আদেশ যায় কি করে ?

ঃ মেহেরবান !

ঃ বিচারকের মানদণ্ড অনুযায়ী মালিক জিন্দিই বিচার করবেন। শাস্তি দেয়া—মাফ করা সম্পূর্ণ তাঁরই এক্তিয়ার। তবে শাস্তি হলে, শাস্তিটা যাতে করে মারাত্মক কিছু না হয় অর্থাৎ শাহান শাহর ইচ্ছেটা একেবারেই উপেক্ষিত না হয়, এই সুপারিশই করা হয়েছে শুধু। কারণ শাহান শাহই তো সর্বোচ্চ আদালাত। এ নিয়ে তোমাদের সংশয় থাকার কোন কারণ তো দেখিনে।

আবদুল আজিজ তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—হুজুর দরাজ দীল ! আর কোন সংশয় নেই হুজুর।

নবাব বাহাদুর প্রগাঢ় কণ্ঠে বললেন—যাও, ফিরে গিয়ে আবার খোশদীলে কাজ কাম শুরু করে দাও গে। এই সাহসটুকু সব সময় বুকে রাখবে যে, বাংলার ভবিষ্যত নিয়ে বাদশাহ ঘুমিয়ে থাকলেও বাংলার নবাব শায়েস্তা খান ঘুমিয়ে নেই, তিনি জেগেই আছেন।

৫

ঢাকা থেকে হুগলীতে ওয়াপস্ এসে আবদুল আজিজ বেগ প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেবকে তামাম কথা জানালে, জিন্দা মালিক খুশীতে জার জার হয়ে গেলেন এবং আবদুল আজিজের পারদর্শিতার প্রশংসায় দপ্তরের ভেতর বাহির গরম করে তুললেন। দপ্তর থেকে ঘরে ফিরে গুলশান আরা বেগমকে সামনে পেয়েই তিনি সরবে বলে উঠলেন—আরে এই যে বেগম সাহেবা, শুনুন-শুনুন, আপনার আবদুল আজিজের বাহাদুরীর খবরটা আগে শুনুন—

গুলশান আরা বেগম কৌতূহলভরে প্রশ্ন করলেন—বাহাদুরীর খবর ! কি করেছেন তিনি ?

জিন্দা মালিক সাহেব হাত-পা নেড়ে বললেন—যাদু করে এসেছে। ঢাকায় গিয়ে নবাব বাহাদুরকে একদম যাদু করে এসেছে। বাপ্‌রে বাপ ! নবাব শায়েস্তা খানের নামে বাঘে-ছাগে এক ঘাটে পানি খায়, আচ্ছা আচ্ছা সালারেরা তাঁর সামনে মাথা তুলে কথা বলার সাহস পান না। সেই মানুষকে আবদুল আজিজ শিশু বানিয়ে ফেললে ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ পোষমানা পাখী বানিয়ে ফেলেছে। কাজ-কর্ম সে ভুলিয়ে দিয়েছে নবাবকে। নিরিবিলিতে দুইজনের সেকি নিবিড় বৈঠক ! গোটা একটা বেলা ধরে কত কথা, কত আলাপ !

ঃ বলেন কি !

ঃ এতসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এত আলাপ আবদুল আজিজ নবাবের সাথে করেছে যে, আমি তো আমি, মারাত্মক মারাত্মক বিষয় নিয়ে গিয়ে তা-বড়ো তা-বড়ো আমির-উমরাহ নবাবের সাথে এর সিকি পরিমাণ আলাপ করারও মওকা পান না। আর সে কি খাতির ! খোদ নবাবকে খাতির করতে দেখে গোটা রাজধানীর আমির-আমলা নওকর-নফর আবদুল আজিজকে যে খাতির করেছে এমন খাতির নাকি দিল্লী থেকে আগত অনেক হোমরা-চোমরারাও পান না।

ঃ আবদুল আজিজ নিজেই বললেন সে কথা ?

ঃ আবদুল আজিজ বলবে কেন ? যে কয়জন লোক-লস্কর তার সফরসঙ্গী ছিল, তাদের মুখেই শুনলাম। আবদুল আজিজের সেখানে খাতির-ইজ্জত দেখে সবাই তারা তাজ্জব বনে গেছে।

উৎফুল্লভাবে শুনতে শুনতে গুলশান আরা বেগম ক্রমেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি সংক্ষেপে বললেন—হুঁউ !

জিন্দা মালিক জোশের মাথায় বলেই চললেন—এ নিয়ে রাজধানীতে আবদুল আজিজের নাকি খুব খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে। সবাই নাকি আবদুল আজিজের খোঁজ নিচ্ছে এখন। সবাই বলছে, নবাব বাহাদুরের এত পেয়ারা সেই আবদুল আজিজ নওজোয়ানটি কে ?

গুলশান আরা বেগম এবার ঠেশ্ দিয়ে বললেন—সবাই যখন খোঁজ নিচ্ছেন আবদুল আজিজকে, হুগলীর প্রশাসক সাহেব তখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ভুলেও তিনি লোকটিকে নিয়ে একবারও ভাবছেন না।

জিন্দা মালিক হোঁচট খেয়ে বললেন—ভাবছেন না মানে ?

গুলশান আরা বেগম ঝাঁঝের সাথে বললেন—এখনই যদি ছোঁ মেরে কেউ তুলে নিয়ে যায় আবদুল আজিজকে, তবু তিনি সে দিকটা খেয়াল করে দেখবেন না।

উচ্ছ্বাস বন্ধ করে জিন্দা মালিক বললেন—তুলে নিয়ে যাবে মানে ?

ঃ যাবে না ? এমন একটা খাশা বরের খবর পেলে মেয়ের বাপেরা বসে থাকবে চুপ করে ? এমনিতেই তাঁর বংশ-বুনিয়াদ, পদ-পদবী আর আদব-চেহারা ইতিমধ্যেই চোখ কেড়েছে সবার। তার উপর আবার এইভাবে নাম ডাক ছড়ালে, আর দুটো দিনও তাঁকে পড়ে থাকতে দেবে কেউ ? যে কোন সময় যে কেউ তাঁকে তুলে নেবে না ছোঁ মেরে ?

জিন্দা মালিকও হুঁশে এলেন। হুঁশে এসে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো বেগম ! কথাটা আপনার তো ফেলে দেয়ার মতো নয়।

ঃ এতদিন ধরে বলছি, জনাবের একবার ঢাকাতে যাওয়া দরকার। আবদুল আজিজের আব্বা-আম্মার সাথে একবার আলাপটা করে আসা দরকার। কিন্তু জনাবের গড়িমসি আর কোনদিনই গেল না।

ঃ তা-মানে—

ঃ জনাব কি চান না, রওশন আরার শাদিটা আবদুল আজিজের মতো একটা তুখোড় ছেলের সাথে হোক ?

ঃ আরে-আরে ! তা চাইবো না কেন ? মনে মনে আমারও কি সে আগ্রহ কম ?

ঃ তাহলে আর এ ব্যাপারে জনাব আজও এতটা উদাসীন আছেন কেন ?

ঃ উদাসীন নয়—উদাসীন নয়। অবস্থাটা আমি নিরিখ করে দেখছি। দেখছি, আসলেই প্রকৃত ঘটনাটা কি ? আবদুল আজিজ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। রওশন আরাও সাবালিকা আর বুদ্ধিমতি। এরা তো কেউ গরু-ছাগল নয় যে টেনে নিয়ে এসে জোড় লাগিয়ে দিলেই এরা তা মেনে নেবে ?

গুলশান আরা বেগম উদ্যমের সাথে বললেন—নেবে না মানে ? নেবে না বলে কাকে ? আরো কি তা নিরিখ করে দেখার জরুরত আছে ? এদের গতিমতি ইচ্ছা-আকর্ষণ—কিছুই কি এতদিন নজরে পড়েনি জনাবের ?

ঃ বেগম !

ঃ এইযে দুইজনের প্রতি দুইজনের এত টান, রওশন আরার সাথে কথা বলতে এইযে আবদুল আজিজের এত আগ্রহ, রওশন আরাও আবদুল আজিজের খোঁজ খবরে ব্যস্ত, খবর করতে আবদুল আজিজের মকান পর্যন্ত ধাওয়া করা—এসব কি অমনি অমনি ?

কিছুটা সন্দেহাকুল চিত্তে প্রশাসক সাহেব বললেন—না, মানে—আবদুল আজিজের কাব্য কবিতা শোনার জন্যেও তো তার প্রতি রওশন আরার এ আগ্রহ হতে পারে ? তাকে যে শাদি করার জন্যেই এতটা তার আগ্রহ, এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হবো কি করে ?

ঈষৎ হাসি মুখে গুলশান আরা বললেন—জনাব পুরুষ মানুষ। তাঁর নজর ঝাপসা হলে হতে পারে। কিন্তু আমি মেয়েছেলে। আমার নজরকে ফাঁকি দেবে এমন সাধ্য কার ?

ঃ বটে !

ঃ জনাবই কি আমার নজর ফাঁকি দিতে পেরেছিলেন ? কাজের অছিলায় জনাব সেই যে আব্বার মকানে ঘনঘন যাতায়াত শুরু করেছিলেন, সবাই ভাবলে কাজের ছেলে কাজের ধান্দায় ঘুরছে। কিন্তু কেন যে জনাব ঘুরছেন, আমার নজর কি ঠিকই তা ধরে ফেলেনি সেদিন ?

বলেই গুলশান আরা বেগম মাথা নত করে হাসতে লাগলেন। জিন্দা মালিকও হেসে ফেলে বললেন—কি তাজ্জব ! বেগম সাহেবার মনেই আছে সে কথা ?

ঃ কেন থাকবে না ? পুরুষেরা সব বর্ণচোরা মানুষ। তাদের যে কার কি মতলব, মেয়েরা ঠিকই বুঝতে পারে।

ঃ তাই ? তাহলে আবদুল আজিজের—

ঃ নেশা ধরে গেছে। জনাবের শ্যালিকার আকর্ষণে তাঁর দুই চোখে নেশা ধরে গেছে। এখন যদি আমাদের অবহেলার দরুন এ নেশা তাঁর ছুটে যায়, অন্য কেউ টেনে নিয়ে গিয়ে যদি তাঁকে অন্য ফুলে বসিয়ে দেয়, তখন আর করার থাকবে কিছু ?

ঃ ঠিক আছে-ঠিক আছে। নেশা যদি ধরেই থাকে তার, আবদুল আজিজ দানাদার ছেলে, ফালতু ছেলে নয়। কেউ তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেই, সঙ্গে সঙ্গেই তা নিয়ে যেতে পারবে না। আমি এবার নিজেই খোঁজখবর নিয়ে দেখছি। আবদুল আজিজের মত-মতলব আর তার আব্বা-আম্মার ইচ্ছা-অনিচ্ছা—সবই আমি খবর করে দেখবো 'খন।

রওশন আরা বেগম চাপ দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, তাই দেখুন। অধিক দেরী হলে আখেরে পোস্তাতে হবে, এ কথাও বলে রাখছি।

জিন্দা মালিক হেসে বললেন—আচ্ছা-আচ্ছা। বেগম সাহেবার এ নসিহত হর হামেশাই ইয়াদে থাকবে আমার।

স্থগিত বিচার কার্য পুনরায় শুরু হলো। কয়েদী কুঠিয়ালদের এনে আবার বিচার কক্ষ হাজির করানো হলো। হুগলীর কুঠির উকিলকে সঙ্গে নিয়ে এবার ম্যাথুস ভিনসেট বিচারের তদবির করতে নিজে এলেন প্রশাসক জিন্দা মালিকের কক্ষে। আসামী, ফরিয়াদ, সাক্ষী ও উৎসাহী দর্শকদের ভিড়ে বিচার কক্ষ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

শুরু হলো বিচার। বাদী-বিবাদীর বক্তব্য, উকিল-সাক্ষীর জিজ্ঞাসা-জবাব ও বিতর্কের পর আসামীদের অপরাধ নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। বিচারক জিন্দা মালিকের মুখমণ্ডল এবার ইস্পাতবৎ কঠিন হয়ে গেল। তা লক্ষ্য করে আসামী পক্ষ ভড়কে গেল। সম্রাটের নির্দেশ পুরো গুরুত্ব না পেলে যে কোন ভয়ানক দণ্ডও হয়ে যেতে পারে। উকিলকে সঙ্গে নিয়ে কোম্পানীর প্রতিনিধি ম্যাথুস ভিনসেন্ট বিচারকের সামনে এসে করজোড়ে দাঁড়ালো। সম্রাটের অনুগ্রহ ও জন বায়্যামের দণ্ড বিধানের প্রতি ইংগিত করে তারা নতমস্তকে বিচারকের সহানুভূতি ও অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা করলো। বিচারককে তবুও অচঞ্চল দেখে কয়েদী কুঠিয়ালরা থর থর করে কেঁপে উঠলো। অধিক কিছু না হলেও, কায়িক শাস্তির আশংকা দীলে তাদের প্রবল হয়ে উঠলো।

কিন্তু বিচারক জিন্দা মালিক তাঁর সে কাঠিন্য কাজে লাগাতে পারলেন না। সম্রাটের নির্দেশের কথা বিবেচনায় নিয়ে অবশেষে নরম হয়েই রায় প্রকাশ করলেন। সর্ব সমেত পাঁচশত টাকা জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে অপরাধী

কয়েদীদের খালাস দেয়ার হুকুম হলো। বকেয়া তিন হাজার টাকা বার্ষিক কর পরিশোধ করা সাপেক্ষে মালামাল সহ বাণিজ্য তরীগুলিও খালাস দেয়ার আদেশ হলো।

ম্যাথুস ভিনসেন্টের সাথে কুঠির উকিল সাহেব এসে আবার করজোড়ে দাঁড়ালেন। উকিল সাহেব এই মর্মে আরজ পেশ করলেন যে, এক্ষণে কর পরিশোধ করার মতো এত টাকা ম্যাথুস ভিনসেন্ট সাহেবের কাছে নেই। এ ছাড়া, বহিষ্কৃত দুরাচার জন বায়্যামের দুষ্কর্মের সহযোগীদের এ অপরাধ তাদের ব্যক্তিগত অপরাধ। এদের দায় কোম্পানী বহন করবে না। এ দায় কয়েদীরা নিজেরা বহন করবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নগদ অর্থ প্রদান করার সামর্থ এক্ষণে কারো নেই। সুতরাং এই উভয় দায়ের জন্যে উকিল সাহেব নিজে জামিন থাকছেন। হপ্তাকালের মধ্যে তিন হাজার টাকা কর ও কয়েদীদের পাঁচ শত টাকা জরিমানা উকিল সাহেব নিজে এসে প্রশাসক সাহেবের কোষাগারে জমা দিয়ে যাবেন। মেহেরবানী করে আটক মালামাল ও কয়েদীদের অদ্যই খালাস করে দেয়ার হুকুম হোক।

উকিল সাহেব নিজে এই জামিন থাকতে চাওয়ায় কিছুটা অনিচ্ছা সত্বেও বিচারক রাজী হলেন। উকিল সাহেবের দ্বারা মুচলেকা সহি করে নেয়ার পর তিনি মাল-মানুষ সব কিছুই খালাস করে দেয়ার আদেশ দিয়ে বিচার কক্ষ ত্যাগ করলেন।

কিন্তু বিচারটা শেষ পর্যন্ত অনেকটা প্রহসনে পরিণত হলো। আমড়া গাছে যে আমড়াই ধরে, আম ধরে না,—এই চিরসত্য কথাটাকে ইংরেজ বেনিয়ারা নয়াভাবে স্মরণ করিয়ে দিল। এক হপ্তার পর আরো কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু কর বা জরিমানা কোন কিছুই জমা দিতে উকিল সাহেব এলেন না। অবশেষে প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব বাধ্য হয়ে সেপাই পাঠিয়ে উকিল সাহেবকে ধরে আনলেন। উকিল সাহেব এসেই জিন্দা মালিকের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন এবং ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে জানালেন, ম্যাথুস ভিনসেন্ট সেই যে মালামাল খালাস করে নিয়ে চলে গেছে, আর তার পাত্তা নেই। অনেক চেষ্টা করেও উকিল সাহেব কোম্পানীর নিকট থেকে প্রতিশ্রুত ঐ তিন হাজার বকেয়া অদ্যতক্ আদায় করতে পারেননি। এ ছাড়া, কয়েদীদের জরিমানার ব্যাপারে উকিল আরো যা জানালেন, তা যেমনই হাস্যোদ্দীপক, তেমনই মর্মান্তিক। কয়েদীদের অনুরোধেই উকিল সাহেব সদয় হয়ে তাদের পক্ষে জামিন থাকেন। কিন্তু খালাস পাওয়ার পরেই কয়েদীরা গোপনে স্বদেশে পালিয়ে গেছে। কিয়ামত কালতক আর তাদের এ মুলুকে পাওয়ার প্রশ্ন নেই

এবং ঐ জরিমানার অর্থও আর আদায় হবার নয়। অতএব, প্রশাসক সাহেব নিতান্তই নির্দয় হলে উকিল সাহেবকে শূলে দেয়ার হুকুম দিতে পারেন, কিন্তু এতটাকা পরিশোধ করার কোন আর্থিক সঙ্গতি উকিল সাহেবের নেই।

কয়েদী কুঠিয়ালদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করাটাও ছিল ইংরেজ কোম্পানীর একটি পাতানো খেলা। কোন প্রকার জরিমানা না দেয়ার একটা কৌশল। চালাকী করে ইংরেজ কোম্পানীই ঐ কয়েদীদের সরিয়ে দিয়েছে এবং উকিল সাহেব তা কিছুই অনুধাবন করতে পারেননি।

যা হোক, উকিল সাহেবের বাচনিক শুনে ক্রুদ্ধ প্রশাসক সাহেব উকিল সাহেবকে কয়েদ করে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন এবং হুগলী নদী দিয়ে ইংরেজদের যাবতীয় মাল চলাচল বন্ধ করে দিলেন। ক্ষুধায় বাঘ ঘাস খায়। হুগলী নদীই মাল চলাচলের প্রধান পথ। বাংলার বাইরে মাল যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা। এতে করে ইংরেজদের তামাম ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নয়া দুইজন প্রতিনিধি এসে ঐ তিন হাজার টাকা কর জমা দিয়ে প্রশাসক সাহেবকে জানালো, ম্যাথুস্ ভিনসেন্ট যে এতদিনও প্রতিশ্রুত কর জমা দেয়নি, তা তারা জানতো না। জানা মাত্রই তারা কর নিয়ে এসেছে। অতপর এই গাফিলতির জন্যে তারা ভিনসেন্টের উদ্দেশ্যে ফাঁকা কিছু গালাগালি করে ও বিস্তর অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে মাল চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়ে গেল।

উকিল সাহেব কয়েদখানায় পচতে লাগলেন। হুগলীর কুঠির কিছু কুঠিয়াল মাঝে মাঝে জিন্দা মালিকের কাছে এসে উকিল সাহেবের পক্ষে আরজ-আবেদনই করতে লাগলো শুধু, অর্থ নিয়ে এলো না। কয়েদীদের ব্যক্তিগত জরিমানা কোম্পানীর তহবিল থেকে দেয়ার আদেশ না থাকার অজুহাত দেখিয়ে তারা অর্থের ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করে চললো। আরো কিছুদিন আটকিয়ে রাখার পর উকিল সাহেবের স্ত্রী ও বাল বাচ্চাদের অনুরোধে জিন্দা মালিক মানবিক কারণে উকিলকেও শেষ পর্যন্ত খালাস করে দিলেন।

জন বায়্যামের নাটক এইভাবে শেষ হলো। এ নাটকের জের অন্য কোথাও গড়ালো না। গড়ালো এসে প্রশাসক জিন্দা মালিকের মকানে। শাসনের নামে এই প্রহসন সহ্য করতে না পেরে, খাস মকানের উমিদ আলী কম্বল গুটাতে লাগলো। এই গাঁড়োল হুকুমাতের নকরী আর সে করবে না। এই নপুংসে পরিবেশে অধিককাল থাকলে সে সত্যি সত্যিই একদিন পাগল হয়ে যাবে।

উমিদ আলী বেশ কিছুদিন ধরেই না-উমিদ আছে, কোন কিছুতেই তার আর আগের মতো উদ্যম নেই—এটা সবাই জানতো। কিন্তু তাই বলে যে

একদম সে নকরী ছেড়ে চলে যাবে, এতটা কেউ ভাবেনি। যেদিন সে বাস্তবিকই জিনিস-পত্র গুছাতে শুরু করলো, সেদিন সবাই তাজ্জব বনে গেল। "কেয়াবাত-কেয়াবাত" বলে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন জন এসে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে লাগলো। জিন্দা মালিক এসে গভীর কণ্ঠে বললেন—তার অর্থ ?

মর্মব্যথা মর্মে চেপে উমিদ আলী সবাইকে শান্ত কণ্ঠে জানালো, তার সংসারটা বিরাণ হয়ে যাচ্ছে, সংসারে তার ফিরে যাওয়া উচিত।

জিন্দা মালিক সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন, সংসার বলতে কে আছে তার সেখানে ? বিষয় বিত্ত যা কিছু আছে সবই তো রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করা আছে। জনশূন্য গৃহে গিয়ে করবে কি সে একা একা ?

জবাবে উমিদ আলী তাজিমের সাথে জানালো, ক্ষেত-খামারের কাজগুলো সে দেখবে আর গাঁয়ে-ভূঁইয়েই থাকবে এখন। এখানে আর মন টিকছে না তার।

জিন্দা মালিক সাহেব এ ধরনের খেয়ালের কোন হেতুই খুঁজে পেলেন না। বছপন কাল থেকেই সে ঘর-বিমুখ বাউরে। ছোট বেলা থেকেই সে শহর বন্দর ও বড় বড় লোকের মাঝে বসবাস করতে আগ্রহী। বহুৎ কোশেশ করেও তাকে গাঁয়ে ভূঁইয়ে স্থায়ী করা যায়নি। তার আম্মাও এ নিয়ে অনেক চেষ্টা করে গেছেন এবং ব্যর্থ হয়ে একা একাই গাঁয়ের বাড়ীতে কাল কাটিয়ে গেছেন। কোনবারেই দু'তিন দিনের বেশী উমিদ আলী সেখানে গিয়ে থাকেনি। হঠাৎ তার হলো কি ?

গুলশান আরা বেগম অনেকটা বিলাপই জুড়ে দিলেন। বার বার তিনি বলতে লাগলেন, উমিদ আলী চলে গেলে সংসার তাঁর বিরাণ হয়ে যাবে। ঢন ঢন করবে মকানটা। উমিদ আলীকে আটকাও।

মওকা পেয়ে অনেকেই আড়ালে ও প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে লাগলেন —থাকবে কেন সে এখানে ? কি আকর্ষণ আছে তার ? এক সাথে নকরীতে এসে এক একজন আচ্ছা আচ্ছা আদমী বনে গেছেন, সাহেব-সুবা হয়েছেন। কিন্তু উমিদ আলী আজও খাস মকানের বান্দাই রয়ে গেছে। কত তার জ্ঞান বুদ্ধি আর এলেম ! এমন মানুষ জিন্দেগীভর এই হালে থাকতে যাবে কোন্ দুঃখে ?

জবাবে জিন্দা মালিক বলেছেন, পদোন্নতির জন্যে চাই আলাদা আগ্রহ আর উম্মিদ। উমিদ আলীর মধ্যে সে উম্মিদের নাম গন্ধও নেই। সে কোনদিনই এই জিন্দেগীর বাইরে যেতে চায়নি। পদোন্নতি দিতে চেয়েও তারই তীব্র আপত্তি হেতু দিতে পারেননি তিনি। ফৌজদার সালারের পদ না হয় নবাব বাহাদুরের

হাতে। কিন্তু তার হাতেও কিছু ভাল ভাল পদ আছে। সে বলুক না, কোন্ কাজটা চায় সে? পড়াশুনায় এত তার ঝোঁক, চায়তো সরকারী প্রকাশনা বা কুতুবখানার কোন একটা পদে এখনই তাকে ঢুকিয়ে দিই। সেখানে বসে পড়া শুনার মধ্যেই থাকুক সে?

প্রশাসক সাহেবের এসব কথা অনেকেই উমিদ আলীকে বলেছে ও বুঝিয়েছে। কিন্তু উমিদ আলী বড় পদও চায় না। সে যে অবস্থায় আছে এর চেয়ে আর কোন অবস্থাই কাংখিত নয় তার কাছে। কোন ধরাবাঁধা দায় দায়িত্বে মোটেই সে আটকা পড়তে রাজী নয়। মন টিকলে সে এইভাবেই থাকতে ভাল বাসতো। কিন্তু মনই তার টিকছে না।

শুরু হলো উমিদ আলীকে সমঝানো। জিন্দা মালিক জানেন, উমিদ আলী আগাগোড়াই খেয়ালী। যে কোন কারণেই হোক, মনটা তার বিগড়ে গেছে। কিছুটা প্রবোধ দিয়ে কয়েকটা দিন ধরে রাখলেই আপছে আপ সে ঠিক হয়ে যাবে। উমিদ আলী জিন্দা মালিকের ঘনিষ্ঠ রিস্তেদার। তাঁর সবিশেষ স্নেহভাজনও বটে। এই পাগলাটে ভাইটাই তাঁর মাতৃকুলের বংশের বাতি। এ ছাড়া, জিন্দা মালিকই এখন উমিদ আলীর অভিভাবক। কাজেই পাগলামী সে যতই করুক, ঐ অনিশ্চয়তার মুখে তিনি তাকে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিতে পারেন না।

গুলশান আরা বেগম সহ খাস মকানের ভেতর-বাইরের অনেকেই কথা বললেন উমিদ আলীর সাথে। প্রবোধ দেয়ার মাঝে তাঁরা তার ভাবান্তরের কারণ খুঁজতে গেলেন। কিন্তু উমিদ আলীর অতিশয় নির্লিপ্ততার কারণে কেউ তার মনের খবর পেলেন না।

তার মনের খবর জানতেন শুধু দুইজন। উমিদ আলীর নিকট থেকে আর তাঁদের নতুন করে জেনে নিতে হয়নি। উমিদ আলীর উম্মিদ তাঁরা বরাবরই জানেন। এ দুইজন আবদুল আজিজ ও রওশন আরা বেগম। সে কথা তারা প্রকাশ করলেও তাতে কেউ আমল দেননি। অনেকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। উমিদ আলী এ মুলুকের বাদশাহও নয়, নবাবও নয়। তামাম মুলুকের প্রশাসনের সাথে উমিদ আলীর কি সম্পর্ক যে সেখানে কিছু গড়বড় দেখা দিলেই উমিদ আলীকে বিগড়ে যেতে হবে? তার বিবাগী হওয়া না হওয়াতে প্রশাসনের কি এসে যায় বা তার প্রভাব প্রশাসনে কি পড়বে যে সেই উদ্দেশ্যে তাকে নকরী ছেড়ে চলে যেতে হবে? আসলেই সে পাগলাটে আর খেয়ালী। পাগলের মাথার কলকব্জা কোথায় কিভাবে বিগড়ে গেছে, এটা খুঁজতে যাওয়াও আর একটা পাগলামী।

খুব শক্ত যুক্তি। নাকোচ করার উপায় নেই। কাজেই, বিতর্কে না গিয়ে আবদুল আজিজ ও রওশন আরা বেগম উভয়েই পৃথক পৃথকভাবে কথা বললেন উমিদ আলীর সাথে। আবদুল আজিজই আগে বললেন। কিন্তু আবদুল আজিজের হাজার কথা নীরবে বসে শুনার পর উমিদ আলী যে জবাব দিলো তাতে আবদুল আজিজের তামাম উদ্যম মুমূর্ষু রুগীর মতো মুখ থুবড়ে পড়লো।

অত্যন্ত শান্ত ও উত্তাপহীন কণ্ঠে উমিদ আলী বললো—দোস্ত, আগেই তোমাদের বলেছি, গোলামী করার মধ্যে যে আমেজ তোমরা পেয়েছ, তার কিঞ্চিৎ আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। শুধু নকরী করার খাতিরেই নকরী করার গরজ আমার জাররামাত্রও নেই। একক মানুষ আমি। একমাত্র রিস্তেদার এই জিন্দা মালিক ভাই সাহেব ছাড়া মাতা-পিতা পরিবার-পরিজন কেউ আমার নেই, তা তুমিও জানো। এ দুনিয়ায় আমি একদম একা। বিষয় বিত্ত যেটুকু আছে, আমার একার জন্যে তা জিয়াদাই বলা চলে। সেরেফ পেটের দায়ে নকরী করতে হবে আমাকে বা পরিবার-পরিজন নিয়ে ভবিষ্যতে ঘি-ভাত খাওয়ার সংস্থান করতে হবে আমাকে, এমন গরজ—এমন রুচি কোনটাই আমার নেই। আমি এখানে তোমাদের মাঝে এসেছিলাম এই বাংলা মুলুকে আমাদের মুসলমান হুকুমাতটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছে দেখেই। বড় রকমের খেদমত কিছু করতে পারবো, সে ভরসায় নয়। সে হিম্মত আমার নেই। কিন্তু যাঁরা এই হুকুমাতের নড়বড়ে ভিতটা আবার মজবুত করার জন্যে মেহনত করে যাচ্ছেন, তাঁদের সান্নিধ্যে থাকার আগ্রহ সম্বরণ করতে পারিনি বলেই আমি এখানে এসেছিলাম। তোমাদের মতো পণ্ডিত তো হতে পারিনি, তবে আমার হুজুর ছিলেন ইতিহাসের আলীম। তাঁর কুতুবখানায় আমার অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। নিজেও তিনি অনেক দিন আমাদের এই মুসলমান হুকুমাতের ইতিহাস বলে শুনাতেন। সেই থেকেই আমাদের এই কওম আর হুকুমাতের ইতিহাস, এর অতীত বর্তমান ভবিষ্যত পেয়ে বসালো আমাকে। এর ভালাইয়ের আলামত দেখেই আমি খোশদীলে ছুটে এলাম। যাঁরা ইতিহাস তৈয়ার করছেন তাঁদের সান্নিধ্যে থাকার আকর্ষণই টেনে আনলো আমাকে।

একটু দম নিয়ে উমিদ আলী নিজের খেয়ালে বলেই চললো—কিন্তু যাঁদের ইতিহাস-নির্মাতা ভেবে আমি গাঁ থেকে এসে নগর-বন্দরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আর এই হুকুমাতের নকরী নিয়ে এসে ভাইজানের মকানে স্থির হয়ে বসলাম, এখন দেখছি, কেউ তাঁরা ইতিহাস নির্মাতা নন। সবাই তাঁরা অন্ধ গোলাম। নকরী করে সুখে খাওয়ার সবাই তাঁরা ধান্দাবাজ। নবাব, প্রশাসক সালার, ফৌজদার,—সবারই লক্ষ্য নকরীটা টিকিয়ে রাখা। দেশ জাতির আখেরের কথা তাঁদের মুখে কিছুটা থাকলেও, দীলে তাঁদের তার

দাগ চিহ্নও নেই। নবাবের তো সাহস কিছু হলোই না, এমন কয়েকটা সালার, ফৌজদার বা প্রশাসকও এ মুলুকে নেই, যাঁরা একজোট হয়ে বাদশাহর আদেশ পয়জার-চাপা করে আর কুঠিতে আগুন দিয়ে এই ইংরেজ বেনিয়াদের ঘাড় ধরে এ মুলুক থেকে বের করে দেয় এবং প্রয়োজনে সেজন্যে শহীদ হয়। দেশের দরদে একটা বিপ্লব-বিদ্রোহের ঝুঁকি নেয়ার লোক কেউ নেই–কেউ নেই। আমার ভ্রান্তিটা তাই ধরা পড়েছে নাঙ্গাভাবে। আমি ভুলের পেছনে ছুটে এখানে এসেছিলাম।

আবদুল আজিজ পুনরায় তাকে সমঝানোর চেষ্টা করলে উমিদ আলী ফের বললো—তোমাদের মতো বড় ধরনের কিছু করার আমার তো যোগ্যতা নেই, আমি সেরেফ এক অকেজো শুননেওয়ালা আর দ্যাখনেওয়ালা। সেই দেখাশুনাটাই যদি তৃপ্তির না হয়, আর ভবিষ্যত বিপর্যয়ের এমন জ্বলন্ত এক সম্ভাবনার কথাটা কাউকেই বোঝাতে যদি না পারি, তাহলে আর কোন্ পুলকে এখানে বসে থাকি আমি, বলো ?

এতদিন পরে ক্ষেত খামারের কাজে গিয়ে সে মন লাগাতে পারবে না, ঐ পরিবেশে সে শান্তি খুঁজে পাবে না, তার এই দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত জিন্দেগী আবার তাকে হাতছানী দিয়ে এইদিকেই টানতে থাকবে—এসব কথা বলে শেষ পর্যন্ত উমিদ আলীর জিদ কিছুটা কমজোর করতে সফলকাম হলেও, আবদুল আজিজ উমিদ আলীকে তার খেয়াল থেকে বিলকুল বিচ্যুত করতে পারলেন না। আরো গভীরভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ জানিয়ে আবদুল আজিজ বিদায় নিলেন।

রওশন আরা বেগমের অনুভূতিটা আরো খানিক গভীর। এতবড় একটা প্রতিভা এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, এটা ভাবতে তিনি বড়ই কষ্টবোধ করতে লাগলেন। এমন শিশুর মতো সরল একটা মানুষ অসহায়ভাবে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবে, এটা তিনি কল্পনা করতে পারলেন না। অনুভূতির টানে তিনিও এগিয়ে এলেন।

আসর ওয়াক্তের পর উমিদ আলী তার নিজ কক্ষে একা একাই চিন্তামগ্ন ছিল। আশে পাশে কেউ না থাকায় রওশন আরা বেগম আব্রু অবস্থায় এসে তার দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন এবং বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন—চলেই যাচ্ছেন তাহলে ?

উমিদ আলী চমকে উঠে বললো—কে ? সেকি ! আপনি এখানে !

তার বিস্ময়ে সাড়া না দিয়ে রওশন আরা বেগম পূর্ববৎ বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন—আমি বলছি, আপনি তাহলে চলেই যাচ্ছেন ?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে উমিদ আলী থতমত করে বললো—এ্যাঁ ! তা মানে—আপনাকে এখন বসাই কোথায় বলুন তো—

রওশন আরা বেগম ক্ষুণ্ন হলেন। বললেন—আমি বসতে আসিনি। আমার কথার জবাব দিন। একেবারেই চলে যাচ্ছেন আপনি ?

ঃ হ্যাঁ। মানে, সেই সিদ্ধান্তই নিয়েছি।

ঃ চলে গেলে আর কে আপনাকে আটকাবে বলুন ! কিন্তু কথাটা আমি আদৌ বিশ্বাস করতে পারিনি।

ঃ কেন বলুন তো ?

রওশন আরা এবার শক্ত কণ্ঠে বললেন—এটা শোনার জন্যে মোটেই আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

উমিদ আলী ভারী কণ্ঠে বললো—তা আর কি করবো বলুন ? কিছুই ভাল না লাগলে কি করে আর থাকি ?

ঃ আপনার ক্ষোভটা কি তা জানি। কিন্তু সে জন্যে আমাদের দায়ী করছেন কেন ?

উমিদ আলী অপ্রতিভ হয়ে বললেন—নাতো–নাতো ! আপনাদের দায়ী করবো কেন ?

ঃ শোধটা তো আপনি আমাদের উপরই নিচ্ছেন। আপনি চলে গেলে এ মুলুকের প্রশাসন তো নয়ই, সে খবরে একজন পথচারীও থমকে দাঁড়াতে যাবে না। অথচ তামাম শাস্তিটা ভোগ করবো আমরা।

উমিদ আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো—কেন, আপনারা শাস্তি ভোগ করবেন কেন ?

ক্লীষ্ট হাসি হেসে রওশন আরা বেগম বললেন—এই যে এই 'কেন'র অর্থটাও বুঝেন না, এটাই কি একটা কম দিগ্‌দারী ? বাড়ীর একটা গরু-ছাগলও বিদেয় হতে লাগলে ঘুরে ফিরে সে বাড়ীর দিকে চায়, বাড়ীর মানুষের দিকে তাকায়, দড়ি টেনে বাড়ীর দিকে আসার চেষ্টা করে। অথচ এতদিন এক সাথে থাকার পর এই বাড়ীর আর বাড়ীর মানুষের প্রতি আপনার দীলে সে মুহাব্বতটুকুও পয়দা হয়নি, এটা ভাবা কি কষ্টকর নয় ?

প্রবল বেগে বাধা দিয়ে উমিদ আলী বললো—না-না, কে বললে যেতে আমার কষ্ট হবে না কিছুই ? আমি তো আর সখ করে যাচ্ছিনে। নেহাতই ভাল লাগছে না বলেই—

ঃ আপনি ভাল-লাগা খুঁজতে যাচ্ছেন ?

ঃ জি ?

ঃ কি আপনার ভাল লাগবে, কোথায় আপনি ভাল থাকবেন—এটা আপনি বোঝেন ?

ঃ তা কি কারো সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব ?

ঃ তাহলে যাচ্ছেন কোন্ সাহসে ?

ঃ যাচ্ছি মানে—ঐ যে বললাম, এখানে ভাল লাগছে না তাই।

ঃ ওখানে গেলেই ভাল লাগবে আপনার ?

ঃ সেটা তো বলা মুস্কিল।

ঃ কে আছে আপনার ওখানে ?

ঃ জিনা, কেউ নেই।

ঃ আপনার লেখাপড়া আর ইতিহাস চর্চা ঐ ক্ষেত খামারে গেলে আর হবে কিছু ?

ঃ জিনা-জিনা। ওটা একদম বন্ধ হয়ে যাবে।

ঃ আপনার তত্ত্ব-দর্শন বোঝার মতো একটা লোকও পাবেন ওখানে ?

ঃ কি করে পাবো ? ক্ষেতখামারের লোকেরা ওসব কি বুঝবে ?

ঃ আপনার এই পুঞ্জিভূত আক্ষেপ খুলে বলে দীলটা যদি হালকা করতে না পারেন, তাহলে দম আপনার বন্ধ হয়ে আসবে না ?

উমিদ আলী আরো অধিক ম্লান কণ্ঠে বললো—তা এলেই বা কি করবো বলুন ? এখানেই বা সে কথা আমার কে বুঝলো আর বুঝতেই বা কে চাইলো ?

ঃ কেউ চায় না ? আপনার ঐ দুর্বার অনুভূতি বোঝার মতো একটা লোকও পেলেন না ?

ঃ কই আর পেলাম। আবদুল আজিজ দোস্তটা কিছু বুঝলেও সে আবার পরক্ষণেই আমাকে পাগল বলে উপহাস করে। ঐ এক আবদুল আজিজই যদি দীল দিয়ে বুঝতে চাইতো আমাকে, তাহলে আর গরজ কিছু ছিল না। আমাকে আটকিয়ে দিতে ও একাই জিয়াদা ছিল। কিন্তু আমার কথা দীল দিয়ে অনুভব করতে সেও চায় না।

ঃ দীল দিয়ে অনুভব করার লোক কাউকেই পেলেন না ? আপনার ঐ মহৎ উপলব্ধির কদর দেয়, এমন আর একজনকেও চোখে পড়েনি আপনার ?

উমিদ আলী সরল চিত্তে বললো—সেতো সেরেফ এক আপনি। আপনি ছাড়া আর কাউকেই তো দেখলাম না। একমাত্র আপনিই যে আমার মর্মব্যথাটা বোঝেন, এটা আমি বুঝতে পারি। এর বাইরে এ দুনিয়ায় আর একটা লোকও দেখলাম না, যে আমাকে বুঝতে চায়, আর সমাধান করতে না পারুক, দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো বাস্তব এই অংকটা নির্ভুল বলে মনে প্রাণে স্বীকার করে সত্যের মর্যাদা দেয়। "আমাদের এই হুকুমাতের চরম দুর্দিন বরাবর এইভাবেই ঘনিয়ে এসেছে আর আজও এলো বলে, এটা সবার বোঝা উচিত," আপনার মতো আমার এই উপলব্ধির একজনও যদি সাচ্চা সমঝদার থাকতো, তাহলে তো অধিক দুঃখ ছিল না আমার ?

ঃ তাহলে আর এখান থেকে কার কাছে যাচ্ছেন ? কে সে ব্যক্তি যে আপনার এই অনুভূতির দোসর হয়ে আপনার দুঃখ লাঘব করবে ?

ঃ নেই-নেই, একজনও নেই। থাকলে কি আর কথা ছিল ?

ঃ যাচ্ছেন কেন তাহলে ? আপনার ব্যথা বোঝার মতো আর যখন কেউ নেই, যে বুঝে তাকে ফেলে তাহলে আপনি যাচ্ছেন কেন ?

উমিদ আলী থতমত করে বললো—না মানে যেতাম না। আপনি যদি মেয়ে ছেলে না হতেন, আবদুল আজিজের মতো যদি হর হামেশাই আপনার কাছে আসতে পারতাম আমি, মিশতে পারতাম, আলাপ আলোচনা করে যদি মনটা হাল্কা করতে পারতাম, তাহলে কি আর যেতাম ? আপনাকেই আমার দুনিয়া বানিয়ে নিয়ে আপনাকে ঘিরেই দিন কাটিয়ে দিতাম। ঐ চরম সত্যটা উপলব্ধি করার মতো একটা লোক পেলেও আমি বর্তে যেতাম।

রওশন আরা বেগম স্মিত হাস্যে বললেন—তাই ?

উমিদ আলী বললো—তাই বৈ কি ? আমার তো আর তলোয়ারের জোর নেই যে তাই দিয়ে এ মুলুকের অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়টা রোধ করবো আমি ? আমি চাইলাম নকীবের কাজ করতে। দিক-ভ্রান্ত হিম্মতদারদের হুঁশিয়ারী বা দিক-দর্শন দিয়ে বিপর্যয়টা রোধ করার সহায়তা করতে। কিন্তু আমার কথা কানেই তুলে না কেউ। আমার ঐ সুস্পষ্ট ভবিষ্যত বাণী নিয়ে আমি কারো কাছেই দাঁড়াবার ঠাঁই পেলাম না। কিছু করতে পারুক চাই না পারুক, একজন লোকও যদি এটা বুঝতো, তাহলেই সান্ত্বনাটা কম হতো কি আমার ? সেই ব্যক্তিইতো ধরার খুঁটি হতো।

ঃ ধরার খুঁটি !

ঃ বিলকুল। আমার কথা তো স্বাভাবিক বলে মনে করেন না আপনারা। আমার চিন্তা-ভাবনাটা তাই আপনাদের স্বাভাবিকতার উপরে। একটা ধরার খুঁটি পেলে তাকে অবলম্বন করেই যতটা পারি, ঐ হুঁশিয়ারীটা আমি সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতাম। গ্রহণ কেউ করুক না করুক, ঐ অবলম্বনের জোরেই আমি আমার নকীবের কাজটা করে যেতাম। পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হয়ে এসে আমার ব্যর্থতার তামাম গ্লানী আমার ঐ দোসরের সান্নিধ্য দিয়ে লাঘব করে নিতাম। তার উৎসাহেই আবার নতুন করে কোমর বাঁধতে পারতাম। তা যখন দুসরা আর কাউকেই পেলাম না, তখন এই হুগলী শহর আর আমার পল্লীর বন বাদার একই সমান আমার কাছে।

রওশন আরা বেগম অভিভূত হয়ে গেলেন। পাগল বলে অভিহিত এই লোকটির অন্তরে যে কতবড় এক বিশ্বাসের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, কতবড় একটা উদ্যম মাথা কুটে মরছে, তা পরিমাপ করতে গিয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। মনের ভাব গোপন করে তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে

বললেন—তাই যদি বোঝেন, আমি তো আছিই এই মকানে, চলে তো কোথাও যাচ্ছিনে যে, উৎসাহ দেয়ার লোক পাবেন না বলে আপনি হতাশ হয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছেন ?

উমিদ আলী নির্বিকার কণ্ঠে বললো—তাহলে কি হবে ? আপনি কি আমার সঙ্গী আর সহকর্মী হতে পারেন ? আমার ঐ বোধটা ছড়িয়ে দেয়ার কাজে আপনি কি সবসময়ই আমার পাশে থাকতে পারেন যে আপনার ভরসায় থাকবো আমি এখানে ?

ঃ কেন পারবো না ? আপনার দর্শনটা আর একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে আপনি আমাকে আপনার সহকর্মী করে নিলেই পারবো।

উমিদ আলী হেসে উঠে বললো—ধ্যাৎ ! আপনি খানদান ঘরের পর্দানশীন মেয়ে। আপনি আমার সহকর্মী হবেন কি করে ?

ঃ সাথে সাথে থাকতে না পারি, আশেপাশে থেকে আপনাকে উৎসাহ দিতে পারবো।

ঃ সে আর কয়দিন ? আজ বাদে কাল যখন অন্যের ঘরে চলে যাবেন, তখন তো আবার যে একা সেই একা।

ঃ অন্যের ঘরে !

ঃ হ্যাঁ। যেতে হবে না আপনাকে ?

ঃ অন্যের ঘরে যাবো মানে ?

ঃ আরে। যাবেন নাতো কি আমার বউ হয়ে আমার ঘরে আসবেন আপনি যে অন্যের ঘরে যাবেন না ?

ঃ এ্যাঁ !

রওশন আরা বেগম থর থর করে কেঁপে উঠলেন। শরমে তাঁর মুখমণ্ডলে রক্ত ছুটে এলো। কিছুক্ষণ আর কথা বলতেই পারলেন না। রওশন আরার নীরবতায় উমিদ আলীর হুঁশ ফিরলো। তার বক্তব্যের জন্য সেও খুবই শরমিন্দা হলো এবং তা সংশোধন করার প্রয়াসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—না, মানে আমি একটা কথার কথা বললাম আর কি। আপনি বুঝতে চাচ্ছেন না তাই। এ জন্যে আপনি মেহেরবানী করে কোন কসুর নেবেন না আমার।

অনেকক্ষণ পর সহজ হয়ে রওশন আরা প্রশ্ন করলেন—কি বললেন ?

উমিদ আলী অনুনয় করে বললো—বলছি, কি বলতে কি বলে আমি মস্তবড় বেয়াদবী করে ফেলেছি। আমি কিছু ভেবে বলিনি বুঝলেন ? ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি !

ঃ ঝোঁকের মাথায় ?

ঃ জি–জি। আসলে পাগল কি আর লোকে সাধে বলে আমাকে ? বলতে গিয়ে কথা আমি মেপে বলতে পারিনে বলেই বলে। ওটা মনে না নিয়ে আপনি আমাকে মেহেরবানী করে মাফ করে দিন।

উমিদ আলীর মাথাটা ঝুঁকে পড়লো। তার কথায় আর অবস্থায় রওশন আরার ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি হাসি চেপে বললেন—মাফ ? এতবড় একটা অপরাধের পর মাফ ?

মাথা না তুলে উমিদ আলী বললো—জি, মাফই তো। একটা কথার কথার জন্যে আপনার মতো একজন দানাদার মেয়েছেলের কিছু মনে করা উচিত নয়। ওটা আপনার মাফ করে দেয়া উচিত।

পুনরায় হাসি চেপে রওশন আরা বললেন—উচিত ?

ঃ জি। আপনিই বিবেচনা করে দেখুন, একটা ভুলের জন্যে কেউ আন্তরিকভাবে মাফ চাইলে তাকে মাফ করে দেয়া উচিত কিনা ?

ঃ মাফ আমি করতে পারি, তবে একটা শর্তে।

উমিদ আলী মাথা তুলে বললো—শর্ত !

ঃ এখান থেকে যাওয়া আপনার হবে না।

ঃ হবে না ?

ঃ না।

ঃ তা–মানে—

ঃ আপনার আন্তরিক অনুরোধটা যদি আমি রাখতে পারি, আপনি আমারটা পারেন না ?

ঃ জি ?

ঃ এটা আমার আন্তরিক অনুরোধ। এখান থেকেই আপনাকে আপনার নকীবের কর্তব্য করে যেতে হবে। না করলে আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন আপনি। আপনারই কথা, এদেশবাসী বড়ই ইতিহাস বিমুখ, সময় থাকতে এরা কেউ হুঁশে আসতে চায় না। সুতরাং হুঁশিয়ারী আপনাকে ছড়িয়ে যেতেই হবে। কেউ গ্রহণ করছে না বলেই আপনার ভীরুর মতো পালিয়ে গেলে চলবে না। বলা কি যায়, কখন কোন্ হিম্মতদার হঠাৎ করেই চরম গুরুত্ব দিয়ে বসবে নসিহতে আপনার ?

ঃ কিন্তু—

ঃ হতাশ হওয়ার কি আছে ? আমি তো আছিই ইনশাআল্লাহ। উৎসাহ আর সান্ত্বনা যথাসম্ভব আমার কাছেই পাবেন আপনি। মনে রাখবেন, আমার এই অনুরোধ না রাখলে আমি বড় কষ্ট পাবো।

লোকজনের সাড়া পেয়ে রওশন আরা তড়িৎ বেগে সেখান থেকে সরে গেলেন।

৬

শিরিবানু সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার হাতের ঘা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। দাওয়াই ও মালিশের সুব্যবস্থা গুণে একমাত্র কনিষ্ঠা আঙ্গুল ছাড়া হাতের আর কোথাও পোড়ার কোন দাগ চিহ্ন নেই। কনিষ্ঠা আঙ্গুলের মাঝখানে ছোট আকারের হলেও একটা সুস্পষ্ট দাগ পড়ে গেছে। এ দাগের ফয়সালাটা সময়ের উপর নির্ভরশীল। কালক্রমে মিলিয়ে যেতেও পারে, আবার জিন্দেগীর সাথী হয়ে এ চিহ্ন আমৃত্যু স্থায়ী হতেও পারে।

শিরিবানুর এ জন্যে মনটা একটু ভারী। চাঁদের কলংকের মতো এটুকুই শিরিবানুর সর্বাঙ্গের কলংক। এতে করে সে ভাবে, এটুকুই যেন তাকে বিলকুল মলিন করে দিয়েছে। তাকে অসুন্দরী বানিয়েছে। যেন সারা অঙ্গ বাদ দিয়ে সর্বজনের নজর এখন এখানেই এসে ঠিকরে গেছে। যেজন তার সামনে আসছে, সবার আগে এটুকুই যেন নজর টানছে সে ব্যক্তির। কাজে কামে বা অধ্যয়নে মশগুল থাকার কালে এখানে হঠাৎ নজর পড়লে, সে চকিতে একটু থেমে যায়। আনমনা হয়ে নিমেষ খানেক ভাবে। কখনও বা নিজে নিজেই সে হেসে ফেলে ফিক্ করে। তৃপ্তিতে তার সারা অন্তর ভরে যায়। এ চিহ্নকে তখন আর মলিন কিছু মনে হয় না। এটা তখন কনকপ্রভার কদর পায়। ছোট সাহেবের তাকিদে এটা তার সালুন রাঁধার স্বাক্ষর। তার ছোট সাহেবের ইচ্ছা পূরণের তৃপ্তি ভেজা স্মৃতি।

বলা বাহুল্য, শিরিবানুর "বড় সাহেব" আবদুল আজিজের আব্বা, আবদুল খালেক সাহেব। দূর দিয়ে হলেও আবদুল খালেক সাহেব শিরিবানুর বড় আব্বা। কিন্তু পদমর্যাদা আর ব্যক্তিত্বের গুণে স্ত্রী-পুত্র ছাড়া তাঁর বিশাল সংসারের সবাই তাঁকে 'বড় সাহেব' বলে সম্বোধন করে থাকে। আবদুল আজিজ সবার কাছে 'ছোট সাহেব'। শিরিবানু এ ধারাটি অব্যাহত রেখেছে। শিশুকাল থেকেই সে সকলের দেখাদেখি 'বড় সাহেব' 'ছোট সাহেব'—এই সম্বোধন শুরু করে। হাসাহাসি করে সবাই এটা মেনে নিয়েছেন তখন। আজও তাই মানতে হচ্ছে। আবদুল আজিজ সেই থেকে শিরিবানুর 'ছোট সাহেব'ই হয়ে আছেন, ভাই হতে পারেননি। এ প্রসঙ্গ এখন বিলকুল অবান্তর।

সুস্থ হওয়ার পরেপরেই আবদুল আজিজের উৎসাহে শিরিবানু পুনরায় গভীরভাবে বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছে। আবদুল আজিজের উষ্ণ আন্তরিকতায় সে এখন তরতর করে ছবকের পর ছবক পেরিয়ে যাচ্ছে। অধ্যায়ের পর অধ্যায় শেষ করছে। এই অগ্রগতি দেখে আবদুল আজিজ অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করছেন।

এমনই সময় একদিন হুগলীতে এসে হাজির হলেন আবদুল আজিজের আম্মা কামরুন নাহার বেগম। দপ্তর থেকে মকানে ফিরে আম্মাজানকে দেখে আবদুল আজিজ যুগপৎ আনন্দিত ও চমকৃত হলেন। কোন প্রকার খবরা খবর ছাড়াই তাঁর কর্মস্থলের নয়া মকানে আম্মা এসে হাজির হবেন, এটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। তাই ছুটে গিয়ে কদম বুঁচি করেই আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার আম্মাজান ? আপনি এমন হঠাৎ করে এখানে ?

আম্মাজান সহাস্যে জবাব দিলেন—কেন বাপজান, ছেলের কাছে কি আম্মাজানের আসতে নেই ?

আবদুল আজিজ শরমিন্দা হয়ে বললেন—তওবা-তওবা ! এ আপনি কি বলছেন আম্মাজান ? আপনি যে আমার এখানে এসেছেন, এটা তো আমার এক মস্তবড় খোশ-কিস্মতি। এতে যে কত আমি আনন্দিত হয়েছি, তা বলে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আমি বলছি, আপনি এমন আচানকভাবে—

ঃ এই একটু এলাম। সরকারী নকরী তোমার। আজ আসবো কাল আসবো করে আসাই হয়ে উঠে না। দেখলাম, হঠাৎ করে অন্য কোথাও বদলী হয়ে গেলে এই হুগলীটা আর দেখাই হবে না আমার। এ জায়গার এত সুনাম শুনেছি, অথচ তুমি থাকতেও একবার যদি না আসি এখানে, তাহলে বড় আফসোস্ থেকে যাবে। তাই হঠাৎ করেই চলে এলাম বাপজান। তোমার নয়া-সংসারটা দেখাও হবে, সেই সুবাদে হুগলী থেকে বেড়িয়ে যাওয়াও হবে।

কামরুন নাহার বেগম খোশদীলে হাসতে লাগলেন। আবদুল আজিজ আর এ প্রসঙ্গ না টেনে বাড়ীর সবার কুশলা-কুশল নিতে লাগলেন।

কামুরুন নাহার বেগম সাহেবার এই হুগলী সফরের এত আগ্রহ অমনি অমনি পয়দা হয়নি। এর পেছনে হাত রয়েছে খোদ হুগলীর প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেবের। স্ত্রী গুলশান আরা বেগমের নসিহতটা প্রশাসক সাহেব ঠিকই ইয়াদে রেখেছিলেন। ওটা তিনি মোটেই অগ্রাহ্য করেননি। সময় করে একদিন তিনি কাজের অছিলায় ঢাকা গেলেন এবং দাপ্তরিক কাজ তড়িৎ গতিতে শেষ করে আবদুল আজিজের আব্বা আবদুল খালেক সাহেবের মকানে এসে হাজির হলেন। পয়পরিচয় ও কুশল বিনিময় অন্তে প্রশাসক সাহেব এক ফাঁকে আসল কথা তুললে, আবদুল আজিজের আব্বা-আম্মা তাতে সাগ্রহে সাড়া দিলেন। আবদুল আজিজের শাদির বেশ কয়টি প্রস্তাব ইতিমধ্যেই তাঁদের কাছে এসে গেছে। আওলাদের শাদির ব্যাপারে এখন তাঁরা

জোরদারভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। এই ওয়াক্তে আওলাদের কর্মস্থল থেকে, বিশেষ করে তাঁর উপরওয়ালার তরফ থেকে, এই সম্ভ্রান্ত প্রস্তাব আসায় তাঁরা অতিশয় আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, আবদুল আজিজের নিশ্চয়ই কিছু ইচ্ছা-আগ্রহের প্রসঙ্গ এখানে আছে। সন্তানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাঁরা কিছুই করতে রাজী নন।

উষ্ণ মেহমানদারীর মাধ্যমে জিন্দা মালিক সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনার পর আবদুল আজিজের আব্বা-আম্মা জিন্দা মালিক সাহেবকে খোশদীলে জানালেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুইজনই হুগলীতে একবার আসবেন। দুলহীনকে তাঁদের মোটামুটি পছন্দ হলে আর আবদুল আজিজের একান্তই আপত্তি না থাকলে, দু'দিন আগে হোক আর পরে হোক, শুভ কাজ তাঁরা অবশ্যই সুসম্পন্ন করবেন।

আসার কথা আবদুল আজিজের আব্বা-আম্মা দু'জনেরই। কিন্তু আবদুল আজিজের আব্বা হঠাৎ সরকারী কাজে আটকে যাওয়ায়, আম্মা কামরুন নাহার বেগম সাহেবা একাই চলে এসেছেন। আগ্রহের আতিশয্যে খসমের কখন সময় হবে, সে জন্যে তিনি অপেক্ষা করতে পারেননি। তবে হুগলীতে এসে আগেই তিনি আবদুল আজিজকে এসব কিছু জানালেন না। বেড়াতে আসার নাম করে আগে তিনি বিষয়টা বুঝে নিতে চাইলেন।

কিন্তু এসব বিষয় একেবারে চাপা থাকার বিষয় নয়। আবদুল আজিজের আম্মা হুগলীতে এসেছেন—এ খবর খাস মকানে পৌঁছা মাত্র গুলশান আরা বেগম মহানন্দে তৎক্ষণাৎ দাসীবাঁদী সমভিব্যহারে আবদুল আজিজের মকানে এসে হাজির হলেন। কলকণ্ঠে কিছুক্ষণ খোশ-আমদেদ, সালাম-শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরই তিনি আবদুল আজিজের আম্মাকে নিজ মকানে নেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেই সাথে আবদুল আজিজের আম্মার খাতির-যত্নের ও তুষ্টি হাসিলের ব্যাপারে এতই তিনি সক্রীয় হয়ে উঠলেন যে, ব্যাপারটা আবদুল আজিজের মকানের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। শিরিবানু, মদিনা বিবি, আতরজান, আজব আলী, আমিন গাজী সহ এ মকানের শুধু তামাম নারী-পুরুষেরাই নয়, এই আতিশয্যে আবদুল আজিজের নিজেরও দৃষ্টিকটু লাগতে লাগলো। পূর্ব পরিচয়হীন একজন আগন্তুক মহিলাকে নিয়ে গুলশান আরা বেগমের এই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে আবদুল আজিজের আম্মাজান এই সম্ভ্রান্ত মহিলাটিকে অর্থাৎ গুলশান আরা বেগমকে বাচাল ভাবতে পারেন, আবদুল আজিজ এই ভয়ে সংকুচিত হতে লাগলেন। কিন্তু এরপর যখন দেখলেন, গুলশান আরার আগ্রহের মুখে তাঁর আম্মাজানও সাগ্রহে খাস মকানে যাওয়ার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন, কোন ওজর-আপত্তি করলেন না, তখন অন্যান্য সকলের মতো আবদুল আজিজও এটাকে

আর নিরর্থক ভাবতে পারলেন না। সকলেই এর অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজতে লাগলেন। আবদুল আজিজ আরো অধিক তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করলেন, সঙ্গে যাওয়ার জন্যে গুলশান আরা বেগম নিজেও তাঁকে কোন আহবান জানাচ্ছেন না বা তাঁর আম্মাজানও এ ব্যাপারে কোন কিছুই বলছেন না। শুধু তা-ই নয়, শিরিবানু বা মদিনা বিবিকেও সঙ্গে নেয়ার কোন ইচ্ছে আম্মাজান দেখাচ্ছেন না। আবদুল আজিজ তাই বাধ্য হয়ে আজব আলী ও আতরজানকে খেদমতের জন্যে সঙ্গে দিয়ে আম্মাজানকে খাস মকানে পাঠিয়ে দিলেন এবং বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন।

আবদুল আজিজের আম্মা কামরুন নাহার বেগমকে মকানে এনে গুলশান আরা বেগম ও প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব অনেকটা রাজ-অতিথির মর্যাদায় তাঁর মেহমানদারী করলেন, রওশন আরাকে দেখালেন, রওশন আরার গুণাবলী ও রওশান আরার প্রতি আবদুল আজিজের দুর্বলতার কথাও হেসে হেসে বর্ণনা করে শুনালেন। বিদায়কালে কামরুন নাহার বেগম গুলশান আরাদের জানালেন, তাঁর আর না-পছন্দের কিছু নেই। তবে আবদুল আজিজের আব্বাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক। ঢাকায় ফিরে গিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করে তিনি তাঁদের মতামত ও সিদ্ধান্ত অচিরেই জানিয়ে দেবেন।

জিন্দা মালিক সাহেব ভূতভবিষ্যত চিন্তা করে চলা লোক। আবদুল আজিজের আম্মাকে নিয়ে তাঁদের এই আবেগ উৎসাহ তিনি অন্দর মহলেই সীমাবদ্ধ রাখলেন। রওশন আরাকে দেখানোটাও রওশন আরাকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে না দিয়ে একটু কায়দা করে দেখালেন। বাড়ীর কিছু দাসদাসী আর আবদুল আজিজের মকান থেকে আগত আজব আলী ও আতরজান হয় কিছু আন্দাজ-অনুমান করলেও, প্রশাসক সাহেব হৈ চৈ করে ভেতরের কথা এর বাইরে আর কাউকে জানালেন না। বাড়ীর অতিরিক্ত লোকজনদেরও তিনি এই সময় সুকৌশলে ফাঁকে ফাঁকে রাখলেন। শাদির কথা চূড়ান্ত আর দিনক্ষণ পাকাপাকি হওয়ার আগে তিনি এটা জানান দিতে নারাজ।

উমিদ আলীর গাঁয়ে ফিরে যাওয়া হয়নি। রওশন আরা বেগমের আচানক প্যাঁচে পড়ে সে বাধ্য হয়ে খাস মকানেই রয়ে গেছে। রওশন আরার দাবী আরজ উপেক্ষা করার প্রশ্নটা তার কাছে মানবিকতার বরখেলাপ বলে মনে হয়েছে। এই উমিদ আলীও আসল খবর জানলো না। জরুরী এক কাজে সে স্থানান্তরে যায় আর ঐদিন ওখানেই আটকে থাকে।

কিন্তু বিষয়টি একেবারে অজ্ঞাতও রইলো না। আবদুল আজিজের আম্মা কামরুন নাহার বেগমই এটাকে অনেকটা উদোম করে দিলেন। দুলহীনের

প্রতি আবদুল আজিজের অনুরাগের কথা তিনি খাস মকানে শুনলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে এর সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বস্ত মহিলা মদিনা বিবির শরণাপন্ন হলেন। তিনি মদিনা বিবিকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেন—বহিন, তোমার সাথে আমি একটু গোপন আলাপ করতে চাই। তুমি আমাদের আপনজনও বটে, বিশ্বাসীও বটে। তাই কথাটা কিছুদিন গোপন রাখবে, এই আমার ইচ্ছা।

সপ্রতিভভাবে মদিনা বিবি বললেন—কি কথা বড় আপা ?

কামরুন নাহার বেগম বললেন—আমি এখানে একেবারেই অকারণে আসিনি। এসেছিলাম আমার আবদুল আজিজের শাদির ব্যাপার নিয়ে। বলতে কি, আমি কণে দেখতেই এসেছিলাম।

মদিনা বিবি উৎসুক হয়ে বললেন—তাই নাকি বড় আপা ? খুব ভাল খবরতো ! তা কণেটি কে ?

ঃ তোমাদের এই হুগলীর প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেবের শ্যালিকা। ঐতো, যে মহিলা আমাকে নিয়ে গেলেন এখান থেকে, তাঁরই বোন।

ঃ ও, রওশন আরা বেগম ? মানে ঐ গুলশান আরা বেগম সাহেবার বোন ?

কামরুন নাহার বেগম খুশী হয়ে বললেন—এইতো ! তাঁদের সবাইকে তুমি তাহলে চেনো দেখছি। ভালই হলো। এখন যে কথাটা তোমার কাছে জানতে চাই, তাহলো ঐ রওশন আরার সাথে আমার আবদুল আজিজের কোন আলাপ পরিচয় আছে কি না, ওদের দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কিনা, এই খবরটা তোমার কাছে চাই আমি। ছেলের সাথে তো এ নিয়ে আমি আলাপ করতে পারিনে, তাই তোমাকে বলা।

ঃ বড় আপা !

ঃ তোমার নজরে এমন কিছু পড়েছে কিনা, বা এসব খবর তুমি কিছু জানো কিনা, এই খবরটা তোমার কাছে জানতে চাই।

মদিনা বিবি কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বললেন—ভেতরের খবরতো আমি কিছু বলতে পারবো না আপা, তবে আমার মনে হয় এদের মধ্যে সম্পর্ক একটা ঠিকই গড়ে উঠেছে।

কামরুন নাহার বেগম খুশী হয়ে বললেন—তাই নাকি ? কি করে তা জানলে ?

ঃ আবদুল আজিজ বাপজানের খোঁজে ঐ রওশন আরাই তো বার দুইয়েক

নিজে এখানে এসেছিলেন। আবদুল আজিজের ব্যাপারে তার যে আগ্রহ দেখেছি, তা থেকে তাই আমার মনে হয়।

ঃ বলো কি !

ঃ শুধু তাই নয়। আবদুল আজিজ বাপজানও মাঝে মাঝেই ঐ খাশ মকানে গিয়ে ওঁদের কিতাব পড়ে শুনায়, ওখানে অনেকক্ষণ থাকে আর প্রায়দিনই খাওয়াটা ওখানেই সেরে আসে।

ঃ আচ্ছা !

ঃ কোন কারণে কয়েকদিন না গেলেই ওখান থেকে লোক আসে আবদুল আজিজকে ডাকতে। বলে, রওশন আরা বেগম সাহেবা সালাম দিয়েছেন তাঁকে।

অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে উঠে কামরুন নাহার বেগম বললেন—ওমা-এতদূর ! তাহলে তো একবিন্দু মিছে বলেননি তাঁরা ? বেশ-বেশ !

একটু ইতস্ততঃ করে মদিনা বিবি বললেন—শাদির কথা তাহলে কি পাকাপাকি করে এলেন বড় আপা ?

ঃ এ্যাঁ ? পাকাপাকি ? না-না, তা আমি করবো কিলো ? আবদুল আজিজের আব্বা ছাড়া আমি কোন চূড়ান্ত কথা দিতে পারি ?

ঃ মেয়েতো আপনার পছন্দ হয়েছে, না কি বলেন বড় আপা ?

ঃ পছন্দ ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা নাহবার কি আছে ? সুরাতটা তোমার শিরির মতো এত উজালা না হলেও, সেও বেশ সুন্দরী মেয়ে। চোখ, মুখ, নাক-চুল, গড়ন-গঠন, গায়ের রং—সবই বড় চমৎকার। তার উপর কি জবরদস্ত খানদান ঘরের মেয়ে ! বিরাট এক পদস্থ লোকের শ্যালিকা ! এ মেয়েকে পছন্দ হবে না কেন ?

মদিনা বিবি ঢোক চিপে বললেন—জি বড় আপা। আপনি ঠিকই বলেছেন। আবদুল আজিজ বাপজানের পাশে তাকে খুবই মানাবে। ঘরও আপনাদের সমান সমান।

ঃ সেই কথাই তো বলছি। তবে কথাটা তুমি আপাততঃ কারো কাছেই ফাঁশ করবে না। আবদুল আজিজের আব্বার তরফ থেকে চূড়ান্ত সম্মতি আসার আগে কথাটা প্রকাশ পেলে তিনি বড়ই গোস্বা হবেন।

মদিনা বিবি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—জিনা-জিনা। আমি আবার কার কাছে প্রকাশ করবো বড় আপা ? আমি কাউকে বলবো না।

আবদুল আজিজের আম্মার সাথে খাস মকান থেকে ফিরে আসার পর আজব আলী আর আতরজান ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে গেল। সকলের উৎসুক নজর

তাদেরকে ধাওয়া করে ফিরতে লাগলো। আড়ালে-আবডালে তাদের কাউকে পেলেই, সবাই এসে তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করতে থাকলো—ব্যাপার কি-ব্যাপার কি ? হুজুরের আম্মাকে নিয়ে খাস মকানের এতটা উদ্বেল হওয়ার কারণ কি ?

আতরজানের হুঁশবুদ্ধি মন্দ নয়। কিন্তু সে একদম অবলা। কাজের মেয়ে আতরজান। সে কাজ করে যায় নীরবে। মুখ সহজে খোলে না। সে কোন সাত-পাঁচেও থাকে না, কারো কোন কথার মধ্যেও যায় না। কোথায় কি হচ্ছে, এসব ব্যাপারে আগ্রহ তার বরাবরই কম। ফলে, তার কাছে কেউ কোন খবরই পেলো না।

আজব আলী বোকা। কিন্তু সে সবাক। বুঝুক আর না বুঝুক সব কিছুতেই কৌতূহল তার দুর্বার। এখানেও সে কৌতূহল তার অবরুদ্ধ রাখেনি। কি ঘটনা -কি ঘটনা করে সে নাক গলিয়েছে সবখানেই আর ভুল-শুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক-অপাসঙ্গিক যা-ই হোক, এখানেও সে তার কৌতূহল চরিতার্থ করে এসেছে।

আমিন গাজী এক ফাঁকে আজব আলীকে ডাক দিয়ে আড়ালে নিয়ে গেল এবং উৎকণ্ঠার সাথে প্রশ্ন করলো—কি বুঝলে আজব আলী ?

আজব আলীর মাথায় এত কম ইশারা ধরে না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললো—কিসের কি চাচা ?

আমিন গাজী বললো—হুজুরের আম্মার সাথে এইযে ঐ খাস মোকানে গেলে, কি বুঝলে সেখানে গিয়ে ?

আজব আলী নেচে উঠে বললো—ও ঃ ! সে আর কি বলবো চাচা ? একদম শাহান শাহী কারবার ! একেই বলে খানদানী লোক।

ঃ মানে ?

ঃ যাকে বলে দুরমার কাণ্ড ! যেমনই আদর তেমনি যত্ন। ওদিকে আবার কি খাবেন—কোথায় বসবেন, তাল করে সাধ্য কার ?

ঃ কি রকম ?

ঃ যেটা ইচ্ছে খান, যেখানে ইচ্ছে বসেন, কোনই বাধা নেই। আমি তো একজন নগণ্য নওকর। এই আমাকেই খোদ প্রশাসক সাহেব যে খাতির করলেন, তা কোন রাজা-বাদশাহ পায় না। "আরে, দাঁড়িয়ে কেন ? বসো, বসো, আরে, থামলে কেন ? খাও-খাও—" একেবারে তুল-কালাম কাণ্ড !

আমিন গাজী ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে উঠলো। কিন্তু ধমক দিলে যেটুকু হুঁশ বুদ্ধি এখনও অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও আজব আলী গুলিয়ে ফেলবে, তার কাছে কোন খবরই পাওয়া যাবে না। বরং উৎসাহ দিয়ে তালের উপর

রাখলে, তার কথা থেকে কিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে বুঝে আমিন গাজী সায় দিয়ে বললো—করবেই তো ! করবে না কেন ? নওকর হলেও তুমি কার নওকর, সেটা দেখতে হবে না ?

আজব আলী ফুলে উঠলো। সে গর্বিত কণ্ঠে বললো—আমিও তেমনি এমন মেজাজ নিলাম যে, খাস মকানের নওকর-নফর নিজেরাই সব ছুটোছুটি করে মরলো, আমাকে কোন ফরমায়েশ করার সাহসই কেউ পেলো না।

ঃ তা পাবে কেন ? তুমি কি কোন কম মরদ। কোথায় তুমি আর কোথায় তারা ! তোমার অসাধারণ বুদ্ধির জন্যে এক ডাকে তোমাকে এই তল্লাটের লোক চেনে। ওদের তা চেনে কেউ ?

ঃ ঠিক চাচা। এইটেই যা বলেছেন ! সবাই আমাকে চেনে, আর ঐ ব্যাটারা চেনে না ! আমিও তেমনি এবার তাদের চিনিয়ে দিয়ে এসেছি। মাছের বড় মাথাটা রেখে এক ব্যাটা নওকর আমার পাতে ছোট মাথাটা দিচ্ছিল। অমনি আমি দুই চোখ গরম করে বললাম—"এই-এই বড়টা রেখে ছোটটা দিচ্ছো কেন ? বড়টা লাগাও।" সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা সায় দিলেন খোদ প্রশাসক সাহেব। তখনই তিনি হেসে উঠে বললেন—"দাও-দাও, ও যা চায় তাই দাও।" তখন ব্যাটা সুড় সুড় করে বড় মাথাটা নামিয়ে দিলে। মানুষ চেনে না ব্যাটারা !

আজব আলীর গালে একটা ঠাশ্ করে চড় মারার ইচ্ছে হলো আমিন গাজীর। নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে আবার প্রশ্ন করলো—সে তো বুঝলাম, কিন্তু এসব থেকে তুমি কি বুঝে এলে ?

ঃ কি সব চাচা ?

ঃ এই যে এত সোহাগ করে তোমাকে মাথা-মুড়ো খাওয়ালো তারা, এর অর্থটা কি মাথায় কিছু ঢুকেছে তোমার ?

ঃ অর্থ !

ঃ আরে বেয়াকুফ, তোমার মতো একটা নাদানকে খামাখাই তাঁরা এতখানি খাতির যত্ন করলেন ?

আজব আলী দীপ্ত কণ্ঠে বললো—খামাখাই কেন করবে চাচা ? নওশা পক্ষের লোকদের খাতির-যত্ন করতে তো তারা একশোবার বাধ্য।

আমিন গাজী চমকে উঠে বললো—নওশা পক্ষ !

ঃ ওদের নওকর ইজ্জত আলী নিজেই আমাকে বলেছে, আমাদের হুজুরের সাথে ঐ রওশন আরা বেগম সাহেবার শাদি দেবে ওরা। সেই জন্যেই ওরা আম্মা হুজুরকে ওদের মকানে ডেকে নিয়েছে।

ঃ বলো কি ! এ কথা বললে ?

ঃ জি চাচা। আমার সাথে তার একটু খাতির আছে তো, তাই কানে কানে হাসতে হাসতে এই কথাই সে বললো।

ঃ তুমি নিজে কিছু বুঝতে পারোনি ?

ঃ কেন পারবো না ? আমি কি বুদ্ধিহীন ? শাদির মানে কি, তা বুঝিনে ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ ওদের মকান থেকে বেরিয়ে আসার সময় আম্মা হুজুর নিজেই প্রশাসক সাহেবের বেগমকে বললেন, আবদুল আজিজ যখন পছন্দ করেছে রওশন আরাকে, তখন এ শাদি হবেই হবে ইনশাআল্লাহ। এ নিয়ে কোন তকলিফ দীলে রাখবেন না।

আমিন গাজী পেরেশান দীলে প্রশ্ন করলো—তুমি একথা কেমন করে শুনলে ?

ঃ আমি যে অন্দর মহলের ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আম্মা হুজুর তো হেসে হেসেই এসব কথা বললেন।

আমিন গাজী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁউ !

আজব আলী প্রশ্ন করলো—কি চাচা ?

ঃ আমাদের হুজুরের শাদি তাহলে ঐ রওশন আরা বেগমের সাথেই হবে ?

ঃ হবে মানে কি চাচা ? হয়ে বসে আছে। কথা একদম পাকাপাকি।

ঃ পাকাপাকি ?

ঃ ইজ্জত আলীর কাছেই শুনলাম, রওশন আরা আপাকে আমাদের হুজুরের নাকি খুব পছন্দ হয়েছে। আবার একটা পাকা খাওয়া আমরা সবাই নাকি পাবো।

আমিন গাজীর মুখমণ্ডল মলিন হয়ে গেল। ফের সে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হুঁউ !

আজব আলী নিজের ভাবেই উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো—জব্বর খাশা খবর, তাই না চাচা ? খাস মকানে হুজুরের শাদি হলে, ওখানে আমাদের কদর কত বেড়ে যাবে !

আমিন গাজী ঝাঝালো কণ্ঠে বললো—তাতো যাবে, কিন্তু শিরিবানুর কি হবে সে খেয়ালটা করেছো ?

আজব আলী থমকে গিয়ে বললো—চাচা !

ঃ এই যে এমন ফুলের মতো মেয়েটা, হুজুর নিজেই তাকে এতবড় এলেমদার করে তুলেছেন, অথচ তাকে নিজেই তিনি এভাবে ভাসিয়ে দেবেন, এটা যে চিন্তাই করা যায় না।

ভাসিয়ে দেবেন মানে ?

ঃ ওরে নাদান, হুজুর যদি রওশন আরাকে শাদি করেন তাহলে শিরিবানুর কি হবে ? ভেসে যাবে না সে ?

এতক্ষণে আজব আলী হুঁশে এলো। এযাবত সে একদিকই ভেবে আসছে, আর একদিক ভাবেনি। সেও এবার নেতিয়ে পড়লো। হতবুদ্ধির মতো সেও হতাশ কণ্ঠে বললো—তাইতো চাচা, কি হবে তাহলে ?

ঃ কি আর হবে ? গরীব বলে তার নসীব নিয়ে আমাদের হুজুরের শুধু মস্করা করাই হবে।

ঃ তাজ্জব ! তা কেন হবে চাচা ? শিরি আপাতো রওশন আপার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। জিয়াদা এলেমদারও। তাকে রেখে হুজুর আমাদের রওশন আরাকে শাদি করবেন কেন ?

ঃ করবেন না কেন ? এইটেই তো এ দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষেরই স্বভাব।

ঃ স্বভাব !

ঃ ঘরের আঙ্গিনার গোলাপ ফুলের সমারোহ বড় একটা চোখে পড়ে না মানুষের বুঝলে ? রাস্তার পাশের ঘেঁটু ফুলের বাহার দেখেই আহা-আহা করে উঠে মানুষ।

ঃ মানে !

ঃ রওশন আরাকে যদিও ঘেঁটু ফুল বলা যাবে না, তিনিও বেশ সুন্দরী, তবু কিসে আর কিসে ! রওশন আরাকে হঠাৎ তো মুখোমুখী এখানে দেখে ফেললাম সেদিন। যথেষ্ট সুন্দরী হলেও, টাকার পাশে আধুলী।

ঃ চাচা !

ঃ একে নয়া ফুল, তার উপর ভবিষ্যত উন্নতির হাতছানী ! এ দুনিয়ার মানুষগুলো বড়ই স্বার্থপর !

ঃ কি বলছেন চাচা ?

ঃ এসব তোমার মাথায় ঢুকবে না। তুমি তোমার কাজে যাও—

আমিন গাজী পেরেশান দীলে সেখান থেকে সরে গেলেন।

আবদুল আজিজের আম্মা কামরুন নাহার বেগম ছেলেকেও আর অধিক সময় ধাঁধাঁর মধ্যে রাখলেন না। খাস মকান থেকে ফিরে আসার পরের দিন ছেলের এক অবসর ওয়াক্তে তিনি ছেলের ঘরে এলেন। ছেলেকে পাশে বসিয়ে তাঁর এই হুগলীতে আসার আসল উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলেন। জিন্দা মালিক সাহেবের ঢাকা যাওয়া থেকে শুরু করে হুগলীর ঐ খাস মকানে তাঁর দাওয়াত খেয়ে আসাতক্ তামাম ঘটনা ছেলেকে হেসে হেসে শুনালেন। পাকা কথা না হলেও প্রশাসক দম্পতিকে তিনি মোটামুটি আশ্বাস একটা দিয়ে এসেছেন, একথাও ছেলেকে জানিয়ে দিলেন।

তামাম কথা শুনার পর আবদুল আজিজ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর মতামতের কোন তোয়াক্কা না রেখেই তাঁর আব্বা-আম্মা তলে তলে

এতদূর এগুবেন, এটা তিনি ভাবতেও পারলেন না। ছেলেকে নীরব দেখে কামরুন নাহার বেগম হাসি মুখে বললেন—কি বাপজান ! কিছুই বলছো না যে ? এতে শরম পাওয়ার কি আছে ?

এর জবাবে আবদুল আজিজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কাজটা আপনি ঠিক করেননি, আম্মাজান !

আম্মাজান বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—ঠিক করিনি মানে ?

ঃ এটা আমার কর্মস্থল। এখানে এসে এমন একটা নাজুক পরিস্থিতি পয়দা আপনি না করলেও পারতেন।

ঃ নাজুক হবে কেন ? কর্মস্থলে কি কেউ বিয়ে শাদি করে না ? শাদিটা হয়ে গেলেই নাজুক বলে কিছুই আর থাকবে না। তামাম সংকোচ কেটে যাবে। তা ছাড়া যে কয়দিন শাদিটা না হয়, সে কয়দিন সব কিছু গোপন রাখা হবে।

ঃ সেই শাদিটা হওয়া নিয়েই তো প্রশ্ন আছে আম্মাজান। বললেন আর অমনি তো হলো না ?

কামরুন নাহার বেগম আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি চমকে উঠে বললেন—সেকি ! এ শাদিতে তোমার মত নেই ?

ঃ আম্মাজান !

ঃ রওশন আরাকে পছন্দ করো না তুমি ?

ঃ পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা আলাদা ব্যাপার আম্মাজান। তাঁকে অপছন্দ করার আমার কিছুই নেই। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি বাপজান ?

ঃ শাদির জন্যে মানসিকভাবে আদৌ আমি তৈয়ার নই এখন। ও চিন্তা ভাবনাই এখন আমার মাথায় নেই। আপনারা জোর করেই শাদি দেবেন আমাকে ?

আম্মাজানের বুক থেকে পাথর নেমে গেল। তিনি সহাস্যে বললেন—ও, এই কথা ? তাতে কি হয়েছে বাপজান ? তুমি যখন তৈয়ার হবে, মানে তুমি যখন বলবে, তখনই তোমার শাদির আনযাম করবো। তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কিছুই আমরা করবো না।

ঃ কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে আম্মাজান। নকরীর কাজ নিয়ে, মানে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি খুবই ব্যস্ত আছি। দীলও আমার খুবই বিক্ষিপ্ত আছে এখন। এ দীলকে শাদির জন্যে তৈয়ার করা বেশ একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

ঃ তা হোক–তা হোক। তোমার ইচ্ছেই ইচ্ছে।

আম্মাজান ঝটমুট জবাব দিলেন। আবদুল আজিজও এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে গেলেন না।

কামরুন নাহার বেগম আরো কয়দিন ছেলের মকানে থাকলেন। ছেলের যে এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে না, সর্বদিক দিয়েই যে ছেলে তাঁর এখানে সর্বোতভাবে যত্নের মধ্যে আছে, তা দেখে তিনি বড়ই তৃপ্তি লাভ করলেন। ছেলের আহার-বিহার, আদর-আপ্যায়ন, সেবা-যত্ন, সহায়-সঙ্গী—কোথাও কোন ঘাটতি নেই। মকানটাও নদীর ধারে মনোরম এক মকান। চাকর-নফর, দাস-দাসী সকলেই তাঁর ছেলের পরম হিতাকাঙ্খী ও অনুগত। সব কিছুই ভাল লাগলো কামরুন নাহার বেগমের। মকানের শৃঙ্খলাটাও বড়ই ভাল লাগলো তাঁর। কিন্তু একটামাত্র বিষয় তাঁর খুবই দৃষ্টি কটু লাগলো বলা যায়, এ নিয়ে তিনি বড়ই বিরক্ত হলেন মনে মনে। সেটা হলো, শিরিবানুর এলেম শিক্ষার নিরন্তর সাধনা আর সেই এলেম শিক্ষার পেছনে বিপুল আনযাম। গৃহশিক্ষক, কুতুবখানা, শিক্ষা কক্ষ, সাজ-সরঞ্জাম, শিরিবানুর মনোনিবেশ, আবদুল আজিজের তদারকি, চাকর-নফরের ব্যস্ততা—সবই যেন মশা মারতে কামান দাগার ব্যাপার বলেই মনে হলো তাঁর কাছে। কোন শাহজাদী-নবাবজাদীর এলেম শিক্ষার ব্যাপারটাও এতটা তোড়জোড়ের বলে তিনি মনে করতে পারলেন না।

দেখতে দেখতে একদিন তিনি হঠাৎ তাঁর এই পুঞ্জিভূত বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ফেললেন। নওকর আজব আলীকে তিনি বাইরে থেকে একটা জিনিস আনতে পাঠিয়েছিলেন। অনেক বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও আজব আলী ফিরে না আসায়, তিনি কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে যা দেখলেন, তাতেই তাঁর মন মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি দেখলেন, অন্দরের এক বারান্দায় শিরিবানু দাঁড়িয়ে আছে আর আজব আলী একখানা কিতাব হাতে তার দিকে ছুটে আসছে। আম্মা হুজুরকে দেখেই আজব আলী চমকে উঠে বললো—যাচ্ছি আম্মা হুজুর, এই এক্ষুণি যাচ্ছি। আপনার জিনিসটা আনতে বাইরের দিকে যেতেই আপা মনি এই কিতাবখানা তাঁর হুজুরের মকান থেকে এনে দিতে বললেন। হুজুর একটা কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন। কিতাবখানা দিতে তিনি দেরী করলেন বলে আমারও দেরী হলো। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি—

বলেই সে কিতাবখানা শিরিবানুর হাতে দিয়ে বাইরের দিকে দৌড় দিলো।

জিনিসটা কামরুন নাহার বেগম সাহেবার অতিশয় প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। সেই কারণে তিনি খুবই আগ্রহভরে আজব আলীর পথ চেয়ে ছিলেন। এক্ষুণে এসে দেখলেন আজব আলী তাঁর জিনিস আনতে না গিয়ে কিতাব আনছে শিরিবানুর।

কসুরটা শিরিবানুর নয়। আম্মা হুজুরের হুকুমের কথা শিরিবানু জানেও না। কসুরটা আজব আলীর বুদ্ধির। আম্মা হুজুরের জিনিসটা এনে দেয়ার পর সে কিতাব আনতে যেতে পারতো। কিন্তু বুদ্ধির গোলমালে আগেই সে কিতাব আনতে গিয়েছিল। কিন্তু কামরুন নাহার বেগম সাহেবার এতটা তলিয়ে

দেখার অবকাশ ছিল না। আজব আলীর কথায় মাথায় তাঁর দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে কয়েক কদম শিরিবানুর দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘটনা চক্রে এই সময় আবদুল আজিজ ও মদিনা বিবি উভয়েই ঐ বারান্দার কাছেই ছিলেন। এদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি শিরিবানুকে বললেন—দেখো, তোমাকে কিছু নসিহত করা আমি খুবই জরুরী মনে করছি। এলেম শিক্ষা করছো, করো। কিন্তু তাই বলে ঐ নিয়েই দিনরাত মশগুল হয়ে থেকো না। সেই সাথে ঘর সংসারের কাজ-কামগুলোও সবই শিক্ষা করো। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা যে যতই তদবির করিনে কেন, যেখানে গিয়ে শেষমেশ তোমাকে পড়তে হবে, সেটা একটা সেরেফ সাদা-মাটা সংসার বৈ কোন উঁচু জায়গা হবে না। সেখানে তোমার এই এলেমের কদরও কেউ দেবে না আর ঘর-সংসারের কাজের জন্যে কোন দাসদাসীও থাকবে না। রান্না-বান্না, ধোয়া মোছা, বর্তন ঠেলা—মানে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তোমাকে নিজেই করতে হবে। বাস্তবকে অস্বীকার করলে আখেরে পোস্তাতে হবে, বলে দিলাম।

কারো কোন জবাবের অপেক্ষা না করে কামরুন নাহার বেগম গোস্বাভরে হন হন করে নিজ কামরায় ফিরে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আবদুল আজিজ, মদিনা বিবি ও শিরিবানু তিনজনই কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর দিন দু'য়েক ছেলের মকানে থাকার পর কামরুন নাহার বেগম ঢাকায় ফিরে গেলেন। ঢাকায় আসার হপ্তাখানেক অন্তর তিনি গুলশান আরা বেগমকে জানিয়ে দিলেন—আবদুল আজিজের আব্বার সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেছি। তাঁর মতামত নিয়েই জানাচ্ছি, আপনাদের সাথে আমার কথাবার্তা সবই ঠিক আছে। আপনাদের সাথে সম্পর্ক অবশ্যই আমরা গড়ে তুলবো। তবে বিশেষ এক কারণে, শুভকাজ সম্পন্ন করতে আমাদের কিছুটা বিলম্ব হবে। এই সময়টা অনুগ্রহ করে দিতে হবে আপনাদের।

জবাবে গুলশান আরা বেগম খুশী হয়ে জানিয়ে দিলেন—ও ভি আচ্ছা !

৭

দিন যতই গড়াচ্ছে শিরিবানুর বয়স ততই বাড়ছে। ফৌজদার আবদুল আজিজ এ ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও, শিরিবানুর আম্মা মদিনা বিবি আর চুপ থাকতে পারেননি। বাতেনে ও জাহিরে একে ওকে তিনি চারদিকে লোক লাগিয়ে দিয়ে রেখেছেন। তাঁর তৎপরতার প্রেক্ষিতে শিরিবানুর শাদির তিন-চারটে প্রস্তাবও ইতিমধ্যেই এসেছে। তবে, দুলহীনের আব্বা নেই, বাড়ীঘর

বিষয় সম্পত্তি নেই, মা-বেটি উভয়েই ফৌজদার সাহেবের আশ্রিতা, দূর সম্পর্ক একটা থাকলেও ফৌজদার সাহেবের বাড়ীর তারা আসলে ঝি-চাকরানী—এ ধরনের কথাবার্তা কানে পড়ায় কোন উঁচু তলা থেকে কোন প্রস্তাব আসেনি। প্রস্তাব যারা পাঠিয়েছে, সবাই তারা নিম্ন মধ্যবিত্তের খেটে খাওয়া মানুষ। কেউ কিঞ্চিৎ ক্ষেতখামারের মালিক, কেউ হাট বাজারের দোকানদার, কেউ বা ক্ষুদে কারবারী। ঘোর সংসারী সকলেই। অল্প কিছু বিদ্যার সাথে গৃহকর্মে পারদর্শিণী পাত্রীই এসব বরপক্ষের কাম্য। শিরিবানুর অতিরিক্ত এলেম হাসিলের খবরে তারাও আবার ভড়কে গেছে। পাত্রীটি অতিশয় রূপবতী হওয়ায় একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে তারা দোটানায় ভুগছে।

এতে করে মদিনা বিবি শক্ত হয়ে গেছেন। শিরিবানুর এলেম শিক্ষার ব্যাপারে তিনি এখন অত্যধিক নারাজ। আবদুল আজিজ নাখোশ হবেন ভয়ে প্রকাশ্যে এই এলেম শিক্ষা বন্ধ করতে না পারলেও, তিনি পরোক্ষভাবে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। কারণে অকারণে তিনি এখন হর-ওয়াক্ত শিরিবানুকে নিজের কাছে আটকিয়ে রাখতে চাইছেন এবং গৃহকর্মে ব্যাপৃত রাখার কোশেশ করছেন। কারণটা যা-ই হোক, গৃহকর্মের প্রতি শিরিবানুরও আগ্রহ ইদানিং কিছু বেড়েছে দেখে মদিনা বিবি মনে মনে খুশী হয়েছেন। এলেম শিক্ষাটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারলেই তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হন।

কিন্তু তাঁর এই নিশ্চিন্ত হওয়ার সম্ভাবনা যে একেবারেই এক সুদূর পরাহত ব্যাপার, সাদামাটা অল্প বুদ্ধির সংসারী মানুষ মদিনা বিবি এ খবরটা জানেন না বা সে বিষয়টি উপলব্ধি করার মতো পরিমিত জ্ঞানও তাঁর ছিল না। তিনি যখন ভাবছেন, মেয়ে তাঁর সাধারণ হিসাব-নিকাশ পঠন-পাঠন ও ধর্মীয় নীতি-নিষ্ঠা সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু জ্ঞান অর্জন করছে, তাঁর মেয়ে তখন তার অনেক উপরের অনেক স্তর পেরিয়ে গিয়ে গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, দেওয়ান, মসনবী ও রুবাইয়াতের মধ্যে ডুবে গেছে এবং সেই সাথে আবু রুশদ্, ইবনে সিনা, সক্রেটিস্, টলেমী ও গেলেন-এ ছবক নেয়া শুরু করেছে। জ্ঞান বৃদ্ধ গৃহশিক্ষক হাফিজ আসাদ-বিন নোমানী সাহেবও অতিশয় মেধাবী আর আগ্রহী ছাত্রী পেয়ে পেটের বিদ্যা তামামই ঢেলে দেয়ার আগ্রহে আত্মহারা হয়ে গেছেন। ছাত্রীটি তাঁর গৃহকর্মে অনভিজ্ঞ থাকুক, এটা উস্তাদ আসাদ-বিন নোমানী সাহেব চান না, বরং তিনি এ ব্যাপারে যথযথ উৎসাহই দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন ছবক দিতে বসেন তখন তিনি বিলকুল ভুলে যান যে, মাদ্রাসার প্রধান মুদাররেস বা দরবারের সভাকবি হওয়ার বাইরে ছাত্রীটিকে তাঁর অন্য কোন জীবনে প্রবেশ করতে হবে।

হাফিজ আসাদ-বিন নোমানী সাহেব তৎকালীন হুগলীর সর্ববৃহৎ মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মুদাররেস। হুগলী অঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। অবসর

জীবনটা তিনি এই শহরেই অতিবাহিত করছেন। ফৌজদার আবদুল আজিজের মকানের কয়েকটা মকান পরেই তাঁর আবাস। আগেকার মাইনে করা গৃহশিক্ষক স্থানান্তরে চলে গেলে শিরিবানুর এলেম শিক্ষায় বিঘ্ন ঘটে। আবদুল আজিজ নিজেও এলেমদার হওয়ায় আসাদ-বিন নোমানী সাহেবের সাথে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ ছিল। কথায় কথায় একদিন এই প্রসঙ্গ উঠলো আবদুল আজিজ তাঁকে একজন ভাল শিক্ষকের সন্ধান দেয়ার অনুরোধ করেন। শিরিবানুর বিদ্যার পর্যায় শুনে এবং হাতের কাছে আপাততঃ তেমন লোক না থাকায়, অবসরে ক্লান্ত হাফিজ আসাদ-বিন নোমানী সাহেব নিজেই তাকে কয়েকদিন ছবক দিতে আগ্রহী হন। ছবক দিতে এসে শিরিবানুর মেধা ও আগ্রহে তিনি এতটাই বিমুগ্ধ হন যে, শেষ অবধি নিজেই তিনি একাজে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হন। মাহিনা তো নয়ই, কোন প্রকার সম্মানী বা উপহারও আবদুল আজিজ দিতে তাঁকে পারেননি। শিরিবানুর শাদির দিনে ঠাসা একপেট দাওয়াত খাওয়ার দাবীটাই আসাদ-বিন নোমানী সাহেব করে রেখেছেন শুধু। সেই সাথে তিনি হাসতে হাসতে আবদুল আজিজকে বলেছেন, অখণ্ড অবসরে তাঁর মরচে পড়া এলেমটা পুনরায় ঝালাই করার মওকা দেয়ার জন্যে চাইলে আবদুল আজিজকেই তিনি বরং মাসে কিছু নজরানা দিতে তৈয়ার।

শিরিবানু সুস্থ হয়ে উঠার পরে পরেই এ ঘটনা ঘটে। ফলে, শিরিবানুর এলেম শিক্ষার গতি এখন দুর্বার বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে সর্বোতভাবে উপযুক্ত করে তোলার লক্ষ্যে ফাঁকে ও অবসরে গৃহকর্মগুলিও শিরিবানু এখন মোটামুটি আয়ত্ব করে নিচ্ছে। বিশেষ করে যে রান্নার কাজটি করতে গিয়ে হাতখানা সে পুড়িয়েছে, সেই রান্নাটাকে সে এখন দস্তুর মতোভাবে আয়ত্বে আনতে আগ্রহী।

হাফিজ আসাদ-বিন নোমানী সাহেব আজ আসবেন না বলেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু যে প্রয়োজনটির জন্যে তিনি আসবেন না বলে জানিয়েছিলেন, সে প্রয়োজনটি না পড়ায় মকানে তিনি চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না। একপা দু'পা করে তিনি আবদুল আজিজের আবাসে এসে হাজির হলেন।

দহলীজের সাথে সংলগ্ন অন্দর মুখী কামরাটাই আবদুল আজিজের কুতুবখানা বা পাঠাগার। পরিচ্ছন্ন ও মোটামুটি বড়সড় এক কক্ষ। চারপাশের দেয়ালের গায়ে সারি সারি তাক ভর্তি অসংখ্য কিতাব থরে থরে সাজানো। এক পাশে পড়াশুনার প্রশস্ত আনযাম। নোমানী সাহেব এসে এই স্থানটিই পছন্দ করেন। তিনি এখানে বসেই শিরিবানুকে এলেম শিক্ষা দেন। শিরিবানুর বিদ্যার পর্যায় এখন অনেক উপরে। কুতুবখানার জরুরত এখন হরহামেশাই

পড়ে। ফলে, এই পাঠাগারেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দহলীজে যেদিন দরবার বৈঠক থাকে সেদিনই তাদের কেবল অন্যত্র গিয়ে বসতে হয়। অন্যথায় সবদিন এখানেই তাঁরা বসেন।

দহলীজ থেকে কুতুবখানায় যাওয়ার একটি সংযোগ দুয়ার আছে। আবদুল আজিজ দহলীজেই ছিলেন। আসাদ-বিন নোমানী সাহেব হাজির হলে সালাম বিনিময় করে আবদুল আজিজ তাঁকে নিয়ে কুতুবখানায় ঢুকলেন। কিন্তু শিরিবানু তখন কুতুবখানায় ছিল না। প্রতিদিন এই সময় শিরিবানু আগেই এসে অপেক্ষা করতে থাকে। হুজুর যে আসবেন না বলেছিলেন, তা শুধু শিরিবানুকেই বলেছিলেন। আবদুল আজিজ তা জানতেন না। কুতুবখানা শূন্য দেখে আবদুল আজিজ নোমানী সাহেবকে দহলীজেই বসতে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং ডাক হাঁক শুরু করলেন। নওকর আজব আলী আশেপাশেই ছিল। সে ছুটে এলে আবদুল আজিজ ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—শিরিবানু কোথায়—শিরিবানু ?

আজব আলী চটপট জবাব দিলো—আপা ? আপা তো পাকঘরে।

আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে বললেন—পাকঘরে !

ঃ জি। হুজুর নাকি আজ আসবেন না, তাই পাকঘরে ঢুকেছেন।

ঃ কেন, কি করছে সেখানে ?

ঃ পাক করছে।

ঃ পাক করছে ! চাচী আম্মা, আতরজান—এঁরা সব কোথায় গেছেন ?

ঃ তাঁরাও সেখানেই আছেন।

ঃ তাজ্জব !

ঃ আপাকে ডেকে দেবো হুজুর ?

চকিতে একটু চিন্তা করে আবদুল আজিজ বললেন—না। তুমি হুজুরকে একটু বাতাস করো, আমি দেখছি।

বলেই আবদুল আজিজ দ্রুতপদে অন্দরের দিকে রওয়ানা হলেন এবং পাকঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। পাকঘরের দুয়ারটা পুরোপুরি খোলা ছিল। কিছুটা দূর থেকে আবদুল আজিজ দেখলেন, ওড়নার একপ্রান্তে বুকপিঠ ঢেকে অন্যপ্রান্ত কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে শিরিবানু পাকের কাজে মগ্ন। তার সুদীর্ঘ কেশদাম চূড়ার আকারে মাথার উপর হাত খোঁপা করে বাঁধা। কামিজের আস্তিনগুলো পুরুষের আস্তিনের মতো কনুই তক্ গুটানো। দুই হাতের চারগাছি সরু সরু সোনার চুড়ি চুলার আগুনের আলোকে থেকে থেকেই ঝিলিক দিয়ে উঠছে। ঝিলিমিলি করে উঠছে দুইকানে হাল্কা-পাতলা দুই পাতি সোনার দুল। ঘাড়ের পাশে চিকচিক করছে সূতা-সরু একছড়া

রূপার মালা। আগুনের আঁচ লেগে কপাল জুড়ে ঘাম জমেছে বিন্দু বিন্দু। দুধে আলতায় মেশানো অনুপম মুখশ্রী তাপে তাপে লালচে হয়ে গেছে। আবদুল আজিজ উপলব্ধি করলেন, রন্ধনের যুদ্ধে সে এখন এক অক্লান্ত সৈনিক।

আনন্দে ও ক্ষোভে তিনি এ দৃশ্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। সেই সাথে আরো তিনি লক্ষ্য করলেন, খাসপাকানী হয়ে চামচ হাতে শিরিবানু একাই হাঁড়ি-চুলো আগলে নিয়ে আছে আর তার উভয় পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মদিনা বিবি, আতরজান ও অন্যান্যরা যোগানদারের ভূমিকা পালন করছে। রান্না নিয়ে এতই সবাই মশ্‌গুল যে, আবদুল আজিজের উপস্থিতি কারো নজরেই পড়লো না।

দুয়ারের কাছে আরো কিঞ্চিৎ এগিয়ে এসে জানান দেয়ার উদ্দেশ্যে আবদুল আজিজ কাশির আওয়াজ তুললেন। আওয়াজ শুনে দরজার বাইরে তাকিয়েই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে আব্রু করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ আব্রু করবে, শিরিবানুর সে অবস্থা ছিল না। আবদুল আজিজকে দেখেই সে মুখ চেপে হাসির আওয়াজ বন্ধ করতে করতে আড়ালে সরে গেল। আঁচলখানা মাথার উপর তুলে দিয়েই মদিনা বিবি দরজার নীচে নেমে এলেন এবং ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি বাপজান, কিছু বলবে ?

আবদুল আজিজ ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, বলবো বলেই তো এলাম। এসব কি চাচী আম্মা ? শিরিবানু এ সময়ে পাক নিয়ে ব্যস্ত কেন ?

মদিনা বিবি হাসি মুখে বললেন—ও, এই কথা ? তা কিছুদিন হলো ও-ই তো এখন পাক করছে বাপজান। বিশেষ করে তোমার সালুনটা বেশীর ভাগ ও-ই এখন পাক করে।

ঃ সেকি !

আবদুল আজিজ খুশী হয়েছে ভেবে মদিনা বিবি উৎসাহ ভরে বললেন—পাকের হাত শিরিবানুর এখন যা খুলেছে বাপজান, তা এক রকম তাজ্জবই একটা ব্যাপার। এত উমদা খানা পাকানোর হিম্মত আমারই এখন নেই। আমাকে সে অনেকগুণে ছাড়িয়ে গেছে।

মদিনা বিবি হাসতে লাগলেন। আবদুল আজিজ নারাজ কণ্ঠে বললেন—বলেন কি ?

ঃ বাপজান কি ইদানিং খানা খেতে বসে কিছুই বুঝতে পারছে না ? আগের চেয়ে পাকটা যে স্বাদে-গন্ধে অনেকখানি মজাদার আর মুখরোচক হয়েছে—

আবদুল আজিজ অবশ্য এটা খেয়াল করেছেন। যাবার সময় শিরিবানুকে অদূরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসতেও তিনি দেখেছেন। করবো করবো করেও তাঁর

এ প্রশ্নটা করাই হয়ে উঠেনি। কিন্তু এই স্বাদ-গন্ধের পেছনে যে তামাম হাত শিরিবানুর, তিনি এতটা খেয়াল করেননি। মদিনা বিবির কথার মধ্যেই তাই তিনি বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাতো ঠিকই বুঝতে পেরেছি। শিরিবানুর যে পাকের দিকে আবার কিছুটা ঝোঁক বেড়েছে, তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু—

ঃ ও-ই এখন পাক করে বাপজান। ঐ উমদা খানাগুলো বিলকুলই শিরিবানুর পাকানো।

ঃ সে এখন এইভাবে হররোজ পাকায় ?

ঃ হররোজই বাপজান। বলতে গেলে প্রায় হর-রোজই। আর শুধু পাকের কাজে কেন ? ঘর-সংসার গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজেও ওর এখন মন ঘুরেছে খুবই। আসলে তো বয়সটা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে ! কতদিন আর সে আসল কাজ ফেলে রেখে ছেলেমী করে কাটাবে ?

মদিনা বিবির মুখমণ্ডলে খুশীর আমেজ গাঢ় হলো। তাঁর এই মানসিকতায় আবদুল আজিজ ক্রমশঃই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এবার তিনি রীতিমতো রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—কিন্তু আমি তো দেখছি. ছেলেমী তার বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন ! নিছক বাঁদরামী ! এসব কি ?

মদিনা বিবির আমেজে ছন্দ পতন ঘটলো। তিনি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—বাপজান !

ঃ এলেম শিক্ষা রেখে এসব ফালতু কাজে সে এভাবে ঝুঁকে পড়েছে কেন, আর আপনিই বা এতে এত উৎসাহ দিচ্ছেন কেন ?

মদিনা বিবি সবিস্ময়ে বললেন—ফালতু কাজ ! ফালতু কাজ কাকে বলছো বাপজান ?

ঃ এলেম শিক্ষার তুলনায় এসব তো কুল্লে ফালতু কাজ। অথচ এসব কাজই আপনার কাছে বড় হলো ? এলেম শিক্ষা করাটা হলো ছেলেমী ?

ঃ বাপজান !

ঃ ওর জিন্দেগীটা বরবাদ কি না করলেই নয় আপনার ?

আবদুল আজিজের কণ্ঠস্বরে মদিনা বিবি চমকে গেলেন। সেই সাথে তাঁর অন্তরটাও বিষিয়ে গেল। যে এলেম শিক্ষার আদৌ তিনি পক্ষপাতি নন, যা তিনি তাঁর মেয়ের জন্যে একদম আর চান না, আবদুল আজিজ সেইটেই জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় দেখে তিনি মনে মনে যারপরনেই ক্ষুব্ধ হলেন। এই অতিরিক্ত এলেম শিক্ষার জন্যেই যে মেয়ের ভবিষ্যতটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, গতিটা তার হতে গিয়েও হচ্ছে না, মায়ের ঘাড়ে সে ক্রমেই একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—এটা তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝেছেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। এ নিয়ে তিনি আবদুল আজিজের সাথে কলহ করতে পারেন না। তাই মনের ব্যথা মনে চেপে তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন—বরবাদ কেন বলছো বাপজান ? এতে বরং

ওর আখেরটা মজবুতই হবে। আমি ওর মা। যা করলে আখেরে ও সুখী হবে, সেটা করা ছাড়া ওর আখের আমি বরবাদ করতে পারি ?

এর জবাবে আবদুল আজিজ শক্ত কণ্ঠে বললেন—আপনি যা করছেন, তা ওর আখেরটা মজবুত করা নয়, হাত-পা বেঁধে ওকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয়া।

মদিনা বিবি আহত কণ্ঠে বললেন—সেকি বাপজান ! আমি মা হয়ে—

ঃ হ্যাঁ, আপনি মা হয়েই তাই করছেন। আপনার বর্তমান কার্যকলাপ আমাকে দিন দিন স্তম্ভিতই করে তুলছে শুধু। দীলে আপনি আঘাত পাবেন বলে আমি প্রতিবাদ করতে আসিনি। শেষ পর্যন্ত আপনি যদি জিদ ধরেই মেয়েকে আপনার কামিন-ময়দুরের ঘরে হাঁড়ি ঠেলতে পাঠিয়ে দেন, আমি তাহলে প্রতিবাদ করতে আসবোও না। আপনাদের ভালাই আপনারা বুঝবেন, আমি সেখানে নাক গলাবার কে ?

ঃ বাপজান !

ঃ কিন্তু বড় আফসোস্, আপনি এই যে এতদূর তক্ এগিয়েছেন, শিরিবানুর শাদির একের পর এক প্রস্তাব ডেকে আনছেন, এ নিয়ে আগে আমার সাথে আলাপ করা বা আমার উপর কিছুটা ভরসা রাখা উচিত ছিল আপনার !

ঃ তা-মানে—

আবদুল আজিজ অভিমান ভরে বললেন—এসব কথা থাক চাচী আম্মা। আপনারা যা চাইবেন, সেইটেই হবে। শেষ পর্যন্ত আমিও এ নিয়ে জিদ ধরতে যাবো না। কিন্তু আপাততঃ শিরিবানুকে পাঠিয়ে দিন এখন। ওর উস্তাদ এসে বসে আছেন—

আবদুল আজিজ ঘুরে দাঁড়িয়ে ওখান থেকে সরে আসতে লাগলেন। মদিনা বিবি ঘাবড়ে গিয়ে বাক হারিয়ে ফেললেন। কি করবেন, কি বলবেন, কিছুই স্থির করতে না পেরে তিনি নিশ্চল হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। আঙ্গিনা পেরিয়ে কিছুদূর এগুতেই আজব আলী আবদুল আজিজের সামনে এসে বললো—হুজুর, উস্তাদ সাহেব এইমাত্র কি এক কাজে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তিনি আপনাকে সালাম দিয়ে জানিয়েছেন, অল্প একটু পরেই তিনি ফিরে আসবেন। এজন্যে আপনি যেন নারাজ-নাখোশ না হন।

আবদুল আজিজ দাঁড়িয়ে গেলেন। দীল তাঁর এ সময় অশান্ত ছিল খুব। ভালই হলো মনে করে তিনি আজব আলীকে বললেন—ঠিক আছে, তুমি যাও। তুমি গিয়ে হুজুরের এন্তেজারে থাকো। তাঁর যেন অসম্মান না হয়। একটু পরেই আমি আসছি।

আজব আলী বাইরে গেল। আবদুল আজিজ পেরেশান দীলে সামনের এক কামরায় এসে ঢুকলেন এবং একটা কুরসীর উপর থপ্ করে বসে পড়লেন। আবদুল আজিজ মজবুত হয়ে না বসতেই ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হলো শিরিবানু। এবার তার কামিজের আস্তিনগুলো, নামিয়ে দেয়া এবং ওড়না দিয়ে শরীর ও মুখমণ্ডল আব্রু করা। সে এসেই ব্যস্ত কণ্ঠে বললো কি বললেন— ছোট সাহেব ? হুজুর এসেছেন নাকি ?

আবদুল আজিজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁ।

ঃ তিনি কি আমাকে পড়াতে এসেছেন ?

ঃ হ্যাঁ, তাই এসেছেন। তবে তুমি ইচ্ছে করলে যেতেও পারো, নাও পারো। সেটা তোমার খুশী।

শিরিবানু আবদারের কণ্ঠে বললো—বাপ্‌রে ! ছোট সাহেব যে আজ ক্ষেপেই আছেন সর্বক্ষণ। রাগ আর পড়ছে না।

ঃ মানে ?

ঃ আম্মার সাথে তো কথাগুলো শুনলাম ? কি গরম গরম কথা !

ঃ বটে !

ঃ আমি কি আর জানি যে, হুজুর আসবেন না বলে জানিয়ে দেয়ার পর আবার আসবেন ? তা জানলে কি আর ঐ সব ফালতু কাজে থাকি আমি ?

আবদুল আজিজ ঠেশ দিয়ে বললেন—ফালতু হবে কেন ? ঐগুলোই তো পরম কাজ তোমাদের।

ঃ পরম কাজ।

ঃ জরুর। ওসব নিয়েই থাকতে চাও তোমরা। আমিও কেবল মাঝখান থেকে বাদ সাধতে যাই।

শিরিবানু ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—সেকি কথা ছোট সাহেব ? ওসব নিয়েই থাকতে চাই আমরা, এটা বলছেন কেন ? আমার আম্মা কি চান, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমিও কি চাই যে, এলেম শিক্ষা ফেলে রেখে ওসব আমি করি ? এলেম শিক্ষার প্রতি এতটুকু গাফলতি ছোট সাহেব কখনোও আমার দেখেছেন ?

ঃ আগে না দেখলেও ইদানিং তা দেখছি।

ঃ ইদানিং তা দেখছেন ?

ঃ কেন, মিথ্যা বলছি আমি ?

ঃ ছোট সাহেব !

ঃ এর চেয়ে কেমন করে দেখলে আর দেখা হবে আমার ? আজকেই শুধু নয়, প্রতিদিন এখন ঐ পাকশাক আর গৃহস্থালীর কাজকর্ম নিয়েই তুমি অধিক সময় থাকো। ওসব কাজের প্রতিই যে এখন তোমার টান-আকর্ষণ বেশী, এটা আর কতদিন নজর এড়াবে আমার ?

ঃ তাজ্জব ! এলেম শিক্ষার চেয়েও আমার ঐদিকেই টান আকর্ষণ বেশী ছোট সাহেবের এই বিশ্বাসই হয়েছে ?

ঃ হয়েছে বলেই তো বলছি।

ঃ কি জানি কি কারণে ছোট সাহেবের এই বিশ্বাস হলো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

শিরিবানু মুখ ভারী করলো। আবদুল আজিজ ক্ষোভের আধিক্যে বললেন—খামাখা ভান করাটা মোটেই আমার পছন্দ নয়। যারা তা করে তাদের কদর আমার কাছে কমে যায় বৈ বাড়ে না।

শিরিবানু আহত কণ্ঠে বললো—ছোট সাহেব !

আবদুল আজিজ বললেন—এ জ্ঞানটাও লোপ পেয়েছে দেখে আমি তাজ্জব হচ্ছি।

ঃ উঃ ! দীল চায় মাথায় আমার দু'চার ঘা পয়জার মারুন ছোট সাহেব তবু দোহাই আপনার ঐ হীন অপবাদটা আমার মাথায় চাপাবেন না।

শিরিবানুর মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেল। আবদুল আজিজ ফের আক্রমণ করে বললেন—অপবাদ ! অপবাদ হবে কেন ? অপ্রিয় সত্যটা যারা ঢাকতে চায়, তারা তখন ঐ রকমই বলে।

শিরিবানুর দুই চোখ ছলছল করে উঠলো। সে বললো—তার মানে ? আমি ভান করছি ? জেনে শুনে ভান করছি ?

ঃ আলবত। যেসব জায়গা থেকে তোমার শাদির প্রস্তাব এসেছে, তারা এলেমদার মেয়ে চায় না, সংসারী মেয়ে চায়। ঐ সব পাত্রদের মন জয় করার জন্যেই যে তুমি সংসারের কাজে ঝুঁকে পড়েছো, এটা অস্বীকার করতে পারো ?

ঃ ছোট সাহেব, দোহাই—

আবদুল আজিজের তখন আর কোন দিকে খেয়াল নেই। নেশাগ্রস্তের মতো তিনি বলেই চললেন—নীচু মন নীচের দিকেই ধায়। টেনে তুলতে চাইলেও, উপরে তোলা যায় না। ঐসব পাত্রদের দু'একজনকে হয়তো মনেও ধরেছে ইতিমধ্যে। তলে তলে হয়তো বা—

শিরিবানু চীৎকার করে বললো—দোহাই ছোট সাহেব। দোহাই আপনার !

নবীব যে আমার টলেছে তা আগেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এভাবে আমাকে—

শিরিবানুর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়লো। তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। সে আর সহ্য করতে পারলো না। এক পাশে ছিটকে গিয়ে সে সশব্দে কেঁদে উঠলো এবং আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

আবদুল আজিজ চমকে উঠলেন। তিনি এতক্ষণে সম্বিতে ফিরে এলেন। এতক্ষণে তিনি উপলব্ধি করলেন, ঝোঁকের মাথায় শিরিবানুর সাথে অত্যন্ত নির্মম আচরণ করে ফেলেছেন তিনি। বুঝতে পারলেন, মদিনা বিবির উপর আক্রোশের ঝালটা শিরিবানুর উপর এভাবে তাঁর ঝাড়তে যাওয়া আদৌ উচিত হয়নি। এতক্ষণ তিনি শিরিবানুর দিকে ভাল করে তাকাননি। এবার চমকে উঠে চোখ তুললেন। লহমা খানেক হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থাকার পর তিনি কুরসী থেকে উঠলেন এবং ধীরে ধীরে শিরিবানুর কাছে গিয়ে অপেক্ষাকৃত মোলায়েম কণ্ঠে বললেন—শিরিবানু !

শিরিবানু আরো জোরে ফুঁপিয়ে উঠলো। একটু থেমে আবদুল আজিজ ধীর কণ্ঠে বললেন—আমি বুঝতে পারছি, আমি অনেক অন্যায় কথা বলে ফেলেছি তোমাকে। কিন্তু সবগুলোই ইচ্ছে করে বলিনি। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে গেছে।

শিরিবানু তবুও মুখে কাপড় চেপে কাঁদতে লাগলো। আবদুল আজিজ আবার বললেন—আমার অন্যায় হয়েছে। এ জন্যে আমি লজ্জিত। তুমি এটা মনে নিও না।

কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে শিরিবানু বললো—কিতাব নিয়ে মসগুল থাকলে আম্মাজান গোস্বা হন, ফাঁকে-ফুরসুতে ঘর-সংসারের কাজে এলে ছোট সাহেব এইভাবে আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলেন। আমি এখন কোন্ দিকে যাই !

আবদুল আজিজ বললেন—গোলমালটা তো ওখানেই। চাচী আম্মার এই আচরণই তো মাথায় আমার আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তোমার শাদির ব্যাপারে তাঁর তৎপরতা দেখে বেশ কিছুদিন থেকেই আমি অশান্তিতে ভুগছি। আজকে বলতে পারো সেই অশান্তিটা তীব্র ক্ষোভের আকারে বেরিয়ে গেছে। তোমাকে অপমান করা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়।

শিরিবানু চোখ মুছে বললো—কিন্তু তাই বলে এইভাবে—

ঃ বলছিই তো, যা বলেছি তা অকস্মাৎই বলে ফেলেছি। তুমি আমার ততটা লক্ষ্য বস্তু নও। আসল লক্ষ্য বস্তু চাচী আম্মা। তাঁর মানসিকতার কোন পরিবর্তনই হলো না। আমার এত আশ্বাস, এত সমঝানো, কোন কাজেই এলো না।

আবদুল আজিজের কণ্ঠস্বর বিষণ্ন হলো। শিরিবানু চোখ তুলে বললো—ছোট সাহেব !

ঃ আর তুমিও বা কি ? এর কোন প্রতিবাদ না করে তুমিও খুশীতে হাঁড়ি ঠেলতে লেগেছো। রাগটা আমার হবে আর না হবে।

শিরিবানু আস্তে আস্তে নিজেকে শক্ত করে নিলো এবং স্বচ্ছ কণ্ঠে বললো—তাই দেখেই ছোট সাহেব ভাবলেন, আম্মা যা চান আমিও তা চাই বলেই আমি হাঁড়ি ঠেলতে লেগেছি !

ঃ তা মানে—

ঃ যারা এলেম শিক্ষা করে সংসারের মোটামুটি কাজগুলো শিক্ষা করা কি তাদের জন্যে নিষেধ ? বরং আমার হুজুর তো বলেছেন, অবসর সময়ে সংসারের মোটামুটি কাজগুলো জরুর কিন্তু শিক্ষা করা চাই। ওসব শিক্ষা মোটামুটি না থাকলে, মেয়েছেলের এলেম শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর নসিহত কি করে আমি ফেলে দেই।

আবদুল আজিজ শরমিন্দা হয়ে বললেন—সেকি ! জনাব নোমানী সাহেব এই নসিহত করেছেন ?

ঃ জি, করেছেনই তো। আমি তাঁর নসিহত মেনে চলছি কিনা, উনি তো যাচাই করে দেখবেন বলেও হুঁশিয়ারী দিয়ে রেখেছেন।

ঃ সোবহান আল্লাহ ! তাই নাকি ? ছিঃ ছিঃ । কি ফালতুই না আমার ভুলটা ! তোমার আম্মার ঐ ইচ্ছে-আগ্রহের সাথে তোমার কাজের মিল দেখে ভাবলাম—

শিরিবানুও এবার একটু ঠেশ্ দিয়ে বললো—আমি শাদির জন্যে পাগল হয়ে গেছি, আর ঐসব বরেরা যাতে করে পছন্দ করে আমাকে, সেই উদ্দেশ্যে আমি হাঁড়ি ঠেলতে লেগেছি।

আবদুল আজিজ ঈষৎ হেসে বললেন—শিরিবানু !

ঃ তলে তলে ওদের কারো প্রেমেও আমি পড়ে গেছি, ছোট সাহেব এই ভাবনাটাই ভাবলেন ।

আবদুল আজিজ বাধা দিয়ে হাসি মুখে বললেন—না-না, ওগুলো সবই আমার রাগের কথা। আমার খুব রাগ হয়েছিল তো তাই ?

আঁড় চোখে চেয়ে শিরিবানু বললো—এত রাগের কারণ কি ছোট সাহেব ? ঈর্ষা বুঝি ?

ঃ ঈর্ষা !

ঃ তাইতো মনে হয়। নিজেরা যত ইনকার আর অপদস্থই করুক, অন্য কারো দিকে কোন জেনানার নজর গেলে, অমনি নাকি পুরুষ মানুষদের রাগ হয়।

হাসি চেপে কপট গাম্ভীর্যে আবদুল আজিজ বললেন—বটে ? তা এ এলেমটা শিরিবানু কোত্থেকে পেলেন ? কাব্য কবিতায় বুঝি ?

ঃ সেরেফ কাব্য কবিতায় হবে কেন ? কিছু মেয়েদের সাথে আমারও তো দেখা সাক্ষাৎ আর কথাবার্তা হয়। যারা ভুক্তভোগী তারাই এসব বলে।

ঃ আচ্ছা। এলেমটা তো তাহলে পোক্ত এলেমই হয়েছে, না কি বলো ?

ঃ শিরিবানু লজ্জিত কণ্ঠে বললো—আমি জানিনে !

নিমেষ খানেক নীরব থেকে আবদুল আজিজ নড়েচড়ে উঠে বললেন—আচ্ছা, কথা যখন উঠলোই, আজ তোমাকে আমি একটা শক্ত প্রশ্ন করবো। একেবারেই নির্লিপ্ত থাকা ঠিক নয়। উত্তরে তোমাকে কিন্তু সত্যি কথা বলতে হবে।

শিরিবানুর সর্বাঙ্গ অলক্ষ্যে কেঁপে উঠলো। সে অস্ফুট কণ্ঠে বললো—ছোট সাহেব !

ঃ তোমার আম্মা যা শুরু করেছেন, তাতে যদি তোমার শাদিটা ওদিকেই কোথাও বন্দোবস্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে তোমার করণীয় কি হবে ?

শিরিবানু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সে মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগলো। আবদুল আজিজ তাকিদ দিয়ে বললেন—না-না, তোমাকে এটা এভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমি যখন তোমাদের অভিভাবক, তখন আমারও একটা দায়িত্ব আছে। এটা আমার জানা প্রয়োজন। তুমি এর জবাব দাও।

শিরিবানু কম্পিত কণ্ঠে বললো—জি ?

ঃ তুমি কি মত দেবে সে শাদিতে ? মানে, মেনে নেবে সেটা ? আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই।

অনেকক্ষণ দম ধরে থাকার পর একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে শিরিবানু বললো—না মেনে নিয়েই বা আমার কি করার আছে ছোট সাহেব ? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি, তখন এইভাবে তো সারাজীবন কাটাতে আমি পারবো না ? কারো না কারো ঘরে যেতেই হবে আমাকে।

ঃ যে কারো ঘর হলেই তুমি রাজী ? তোমার কোন পছন্দ নেই ?

ঃ গরীবের আবার পছন্দ কি ছোট সাহেব ? দেখছেন না, গরীব বলে যত সব গরীবের ঘর থেকেই শাদির পয়গাম এসেছে, কোন বড় ঘর থেকে আসেনি।

ঃ বড় ঘর থেকে এলে তুমি খুশী হয়ে রাজী হবে ?

ঃ সে কথা আলাদা কথা ছোট সাহেব। কিন্তু বড় ঘর থেকে যে আসেনি, এইটেই বিবেচনা করার বিষয়।

ঃ শিরিবানু !

ঃ বড় আম্মা তো সেবার এই কথাই বলেছিলেন। আপনার সামনেই তো বললেন যে, যেখানে আমাকে যেতে হবে, সেটা বড় ঘর হবে না, সেখানে আমাকে সংসারের কাজ করেই খেতে হবে। এখন তো দেখছি, মিছে বলেননি তিনি। সংসারের কাজ করেই যদি খেতে হয়, তাহলে সংসারের কাজ শিখতে দেখলে ছোট সাহেব এত নারাজ হবেন কেন, এটার তো মানে কিছু দেখিনে।

শিরিবানু আবার একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেললো। আবদুল আজিজ সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—মানে তো জরুর আছেই। আর নানাভাবে বার বার এ কথা তোমাদের জানিয়েও আমি আসছি। সে মানেটা হলো, তোমার ছোট সাহেব তোমাকে এমন জায়গায় ফেলতে চায়, যেখানে তোমাকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে না।

শিরিবানু ম্লান কণ্ঠে বললো—চেষ্টা করলেই কি ছোট সাহেব তা পারবেন ?

ঃ কেন পারবো না। সে নিয়াত আর সদেচ্ছা থাকলে আমার না পারার কি আছে ?

ঃ কিন্তু বড় আম্মাতো বলেছেন, যে যতই চেষ্টা করুন, আমাকে ঐ সব গরীব ঘরেই যেতে হবে। এমন কথার পর আর আমি কোন্ আশায়—

ঃ আরে আম্মাজান যা বলেছেন, তা তিনি নিজে যা ভাবেন আর বোঝেন, সেই কথাই বলেছেন। ওতে এত গুরুত্ব দিচ্ছো কেন ? সেটা কি চরম সত্য কিছু, না আমার কথা সেটা ? আমার উপর যদি কিছু বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমার উপর ভরসা রেখে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

কি জানি কি খেয়ালে শিরিবানুও বলে ফেললো—আমার কথাও তো সেইটেই ছোট সাহেব। আমার সত্যিকারের মতামত তো সেইটেই যে, আমার আম্মাজান যা ভাবছেন আর করছেন, ছোট সাহেব তার উপর এতো গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন ? আমিতো ছোট সাহেবের উপরই ভরসা করে আছি। আগুনে-পানিতে যেখানেই তিনি ফেলে দেন, সেইটেই আমি খোশদীলে মেনে নেবো। এ নিয়ে এত দ্বন্দ্ব-কলহ কেন ?

আবদুল আজিজ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন—সাব্বাস্ ! এইতো এতক্ষণে শিরিবানু শিরিবানুর মতো কথা বলেছে। ঠিক হ্যায় ! তুমি মনোযোগ দিয়ে এলেম শিক্ষা করতে থাকো, তোমার সব দায়িত্ব আমার। তোমার আদৌ পেরেশান হওয়ার কারণ নেই।

ঃ ছোট সাহেব !

ঃ এরপর আর কথা আছে ?

শিরিবানু স্মিতহাস্যে বললো—জিনা। আর কি কথা থাকবে। তবে—

ঃ তবে ?

ঃ না থাক।

ঃ থাকবে কেন, বলো ?

ঃ অধিক দিন এভাবে ঝুলে থাকলে হয়তো ভবিষ্যত—

ঃ ভবিষ্যত ?

ঃ মানে রওশন আরা আপা ঘরে আসার পর, ছোট সাহেব আমাকে নিয়ে কতটা ভাবতে পারবেন—

ঃ রওশন আরা আপা !

ঃ জি। তিনি এলে আমাকে নিয়ে ছোট সাহেবের ব্যস্ত হওয়াটা তিনি কতখানি মেনে নিতে পারবেন—

আবদুল আজিজের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো। তিরসা নজরে চেয়ে তিনি বললেন—হুঁউ ! ঈর্ষা বুঝি ?

ঃ ঈর্ষা !

আবদুল আজিজ হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন—জরুর। তাহলে দেখো, ঈর্ষা শুধু পুরুষেরই থাকে না, জেনানারও থাকে।

ঃ ছোট সাহেব !

ঃ নইলে কোথাকার কে রওশন আরা তাকে কেন এর মধ্যে টানতে গেলে হঠাৎ ?

শিরিবানুর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে নত মস্তকে বললো—না-মানে—

ঠিক এই মুহূর্তে আবার এলো আজব আলী। সে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো হুজুর-হুজুর, একজন সাহেব এসেছেন আপনার সাথে মোলাকাত করতে। আপনাকে সালাম পৌঁছানোর জন্যে সাহেব আমাকে জব্বোর তাকিদ দিচ্ছেন।

আবদুল আজিজ বিব্রত কণ্ঠে বললেন—সাহেব !

ঃ জি হুজুর, বিদেশী সাহেব। খাস বিদেশী।

ঃ খাস বিদেশী !

ঃ জি-জি। কোন কুঠিয়াল নয়।

ঃ কুঠিয়াল নয় ? তার নামটা কি, তা শুনেছো ?

ঃ জি হুজুর। তার নামটা হলো—মানে কি যেন বললো—ও হ্যাঁ, ডেভিল-ডেভিল।

ঃ ডেভিল !

ঃ মিথ্-মিথ্।

আবদুল আজিজের তৎক্ষণাৎ খেয়াল হলো ডেভিড্ স্মিথের কথা। তিনি ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন—ডেভিড্ স্মিথ্ ?

ঃ জি হুজুর, জি-জি। ঐ নাম।

ঃ ঠিক খেয়াল আছে তো ?

ঃ জি, বিলকুল ঐ নাম।

চঞ্চল হয়ে উঠে আবদুল আজিজ বললেন—কি তাজ্জব ! স্মিথ্ সাহেব এসেছেন ? কোথায় তিনি ?

ঃ আমাদের ঐ দহলীজের সামনে। ওখানেই তাঁকে দাঁড় করে রেখে এসেছি।

ঃ দাঁড় করে রেখেছো ? সেকি ! চলো-চলো—

আবদুল আজিজ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি শিরিবানুকে বললেন—যাও, হাত মুখ ধুয়ে লেবাসটা পাল্টিয়ে নিয়ে কুতুবখানায় এসো। তোমার হুজুর একটু বাইরে গিয়েছিলেন, এতক্ষণে হয়তো আবার এসে গেছেন। আমি যাই, আমার এক বিশেষ মেহমান এসে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে—

আজব আলীকে সঙ্গে নিয়ে আবদুল আজিজ দ্রুত পদে বেরিয়ে এলেন। এসেই তিনি দেখলেন, ঘটনা ঠিক। দহলীজের বারান্দার নীচে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর আমন্ত্রিত মেহমান মিঃ ডেভিড স্মিথ। দেখা মাত্রই আবদুল আজিজ সোল্লাসে বলে উঠলেন—আরে স্মিথ সাহেব যে ! কেয়া তাজ্জব-কেয়া তাজ্জব।

আবদুল আজিজ ছুটে এসে স্মিথ সাহেবের সাথে করমর্দন করতে লাগলেন। মিঃ স্মিথও উদ্বেলিত হয়ে উঠে বলতে লাগলেন—ও মাই ডিয়ার ! ও মাই ইয়ং ফ্রেন্ড ! গুড্ মর্নিং ! সুপ্রভাট্-সুপ্রভাট্

আবদুল আজিজ হেসে বললেন—সুপ্রভাত। তা কেমন আছেন সাহেব ?

ডেভিড স্মিথ খোশদীলে জবাব দিলেন—বহুট আচ্ছা আছে। পারফেকট্লী ওয়েল। লেকেন আপ ? আপকা হালট্ কেয়সা আছে ?

ঃ ভাল সাহেব। ইনশাআল্লাহ খুব ভাল।

ঃ ভেরী গুড্।

ঃ আপনি কখন এলেন এখানে ?

মিঃ স্মিথ এবার কপট গাম্ভীর্য টেনে বললেন—এখানে ? ঠোরা জিয়াডা টাইম হোবে। উও আডমী হামার সাঠে বহুট্ ফাইট করিয়াছে।

আজব আলীর প্রতি ইংগিত করেই স্মিথ সাহেব হেসে ফেললেন। আবদুল আজিজ থতমত করে বললেন—তার মানে ! এই আদমী আপনার সাথে—

ঃ ইয়েস-ইয়েস। উও আডমী হামার সাঠে বহুট্ টামাসা করিয়াছে।

ঃ কি রকম ?

ঃ উও আড্মী হামাকে সওয়াল করিল—টুমি কোন্ আছে ? হামি বলিল, টুমি চিনিবে না। হামি এক নিউ কামার আছে। আগন্টুক আছে। উও আডমী খাপ্পা হইল। কহিল, নেহি-নেহি-টুমি নিমুকামার না আছে। নিমু কামার হামাকে হাটিয়ার বানাইয়া ডিয়াছে। উহাকে জরুর হামি চেনে। টুমি আডমী ঠগ্ আছে। বজ্জট আছে। নিকাল যাও, টুমি নিকাল যাও হিঁয়াছে—আভি—

সাহেব হো হো করে হেসে উঠলো। আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে বললেন—বলেন কি ! আপনাকে এই কথা সে বলেছে ?

ঃ হাঁ-হাঁ, বলিল। হামার উপর জব্বোর গোস্বা হইল।

ঃ সেকি !

আবদুল আজিজ গরম চোখে আজব আলীর দিকে তাকালেন। আজব আলী ভয়ে ভয়ে বললো—জিনা হুজুর, জিনা। আমি অমনি অমনি গোস্বা হইনি। সাহেব আপনাকে কামিন ময়দুর বলে গাল দিলেন, তাই। বললেন—আপনি নাকি কামিনদার, ভেড়ির মাঠের কামিনদার !

আবদুল আজিজ ব্যাপারটা বুঝে উঠার আগেই সাহেব ফের হেসে উঠে বললেন—ডেখিয়ে-ডেখিয়ে, গজব কেয়া ডেখিয়ে। হামি কহিল, টোমার মালেক কমাণ্ডার আডমী আছে, ভেরী স্মার্ট কমাণ্ডার। উও আডমী কিয়া সমঝিয়ে লইল, ডেখিয়ে।

মিঃ স্মিথ পূর্ববৎ হাসতে লাগলেন। ঘটনাটা বুঝতে পেরে আবদুল আজিজও হেসে ফেললেন। বললেন—আচ্ছা, এই ব্যাপার ? তা কিছু মনে নেবেন না সাহেব। এই নাদানের কথায় কিছু মনে নেবেন না। এটা একটা আস্ত উল্লুক।

ঃ উল্লুক !

ঃ বুরবক। মাথায় ওর মগজ বলে বিশেষ কিছু নেই। একটা বললে আর একটা বোঝে।

আজব আলী ঘাবড়ে গিয়ে বললো—আমার কসুর হয়েছে হুজুর। আমি ঠিক—

কথার মাঝেই আবদুল আজিজ ধমক দিয়ে বললেন—চোপ্‌রও। কসুর হয়েছে। কসুর তো হবেই। মাথায় দৈনিক কয়েক বালতি পানি ঢালতে পারো না ? মগজটা যে বিলকুল শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন, সে হুঁশটা আছে ?

ঃ হুজুর !

ঃ মাথায় যখন কিছুই তোমার ধরে না, তখন মাতবরী করার এত সখটা কেন ? চুপ থাকতে পারো না ?

ঃ জি-মানে—

ঃ ভাগো ভাগো এখান থেকে বজ্জাত কাঁহাকার—

আজব আলী মলিন মুখে সরে গেল। তা দেখে ডেভিড স্মিথ আপত্তি তুলে বললেন—ও নো-নো। হাপনি ঠিক বাট্ বোলে নাই জনাব। উও আড্মী ঠোড়া বুড্ডিহীন আছে, লেকেন বজ্জাট্ না আছে। উহাকে ইনসাল্ট করা ঠিক হইলো না।

ঃ সাহেব।

ঃ উহাকে সমঝাইটে হামার টাইম লাগিল, ইয়ে বাট্ ঠিক। কিন্টু যখন কুছু সমঝিয়া লইল, টখন কুয়ী গোলমাল করিল না। সিটা জনাবকে হামার সালাম জানাইটে চলিয়া গেল। আস্‌লী বাট্, কসুর ওস্‌কো ডিমাগ্ কা জনাব। আডমীর কুয়ী কসুর না আছে। গড্ উহাকে বুড্ডি ডিটে কমটি করিল, টো উও আডমী কি করিবে?

—আবদুল আজিজ হেসে বললেন—তা যা বলেছেন সাহেব। আসলেই ছেলেটা খুব সৎ আর সরল। খুবই বাধ্যগত। আবার আমাকে বহুত পেয়ারও করে। তাই কিছুটা বেয়াকুফ জেনেও ওকে আমি ছাড়তে পারিনে।

ঃ উও কোন্ আছে জনাব?

ঃ আমার নওকর। নাম আজব আলী।

ঃ কেয়া নাম?

ঃ আজব আলী।

ঃ কেয়া আজাব আলী?

সশব্দে হেসে উঠে সাহেব ফের বললেন—সাব্বাস! বিলকুল সাচ্চা নাম আছে। বহুট আজাব ডিটে জানে।

আবদুল আজিজও হেসে উঠলেন। এরপর খেয়াল হতেই তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—আরে-আরে সেকি! এখনও আপনাকে দাঁড় করেই রেখেছি? তওবা-তওবা। আসুন, মেহেরবানী করে আসুন—

ঃ জনাব—

ঃ ঐ দহলীজে গিয়ে বসি আগে, আসুন—

সাহেবকে দহলীজে নিয়ে এসে আবদুল আজিজ মুখোমুখী বসলেন। অলক্ষ্যে ফিরে এসে আজব আলী আড়াল থেকে আড়ানী টানতে লাগলো। গায়ে বাতাস লাগতেই আবদুল আজিজ সজাগ হয়ে আওয়াজ দিলেন—কে? পাখা টানে কে?

আজব আলী ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে—আমি হুজুর। বন্ধ করবো?

আবদুল আজিজ মুচকি হেসে বললেন—না টানো।

ভেভিড স্মিথ্ আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করলেন—কোন্ আছে? উও পাংখা পুলার কোন্ আছে?

আবদুল আজিজ স্মিতহাস্যে বললেন—আজব আলী।

ঃ জনাব কি উহাকে টানিটে হুকুম করিয়াছে?

ঃ না। আমাদের কষ্ট হচ্ছে বুঝে, ও নিজ গরজেই টানছে।

সাহেব আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন—ও মাই গড্। হামার বহুট্ গলটি হইয়াছে। উও আডমী কভভি আজাব আলী না আছে। উও একঠো টাজ্জব আলী আছে। রিয়ালী এ চার্মিং আলী, এ গ্রেট আলী! বিউটি ফুল—বিউটি ফুল।

সাহেব অভিভূত হয়ে দুলতে লাগলেন। আবদুল আজিজ হাসি মুখে বললেন—তা ঐ পাগলের কথা থাক সাহেব। এবার আপনার কথা বলুন।

ঃ হামার কঠা?

ঃ হ্যাঁ। আমি তো ভাবলাম, আর আপনি এলেন না। বহুৎ দিন গুজরান হয়ে গেল, জরুর আপনি আপনার নিজ মুলুকে ফিরে গেছেন।

ঃ রাইট-রাইট। হাপনার ঢারণার যুক্‌টি আছে। এটো জিয়াডা ডিন হামাকে পাটনা বন্ডরে আটক ঠাকিটে হোবে, হামি বিলকুল ভাবে নাই।

ঃ সে কি! পাটনার বন্দরে আটক মানে?

ঃ হামার টিম, আইমিন ডলের আঢাভাগ হামাকে ছাড়িয়ে হোমল্যান্ডে চলিয়া গেল। হামি উহাডের সাক্ষাট পাইল না। ডুসরা ভাগ হামাকে লইয়া পাটনায় হাজির হইল। পাটনায় কোম্পানীর কোঠিতে হামাকে বসাইয়া ডিয়া কহিল, হাপনি এখানে আরাম করুন। হামাডের টডন্টের কাম ঠোড়া বাকী আছে। উহা খটম করিয়া জলডি জলডি হামরা ওয়াপস্ আসিবে আওর হাপনাকে লইয়া স্বডেশ চলিয়া যাইবে। ব্যস্! উসকি বাড বিলকুল লা-পাট্টা। হামি পাটনাটে আটক হইয়া গেল আওর ডিন মাস গুজরান হইটে লাগিল।

ঃ বলেন কি!

ঃ উহারা ঢাকাটে গেল। উসকি বাড বালাসোর মাড্‌রাজ, বোম্বে, গুজরাট, আইমিন টামাম হিন্দুস্টান টডন্টের নামে মজাছে ঘুরিয়া বেড়াইটে লাগিল।

ঃ সেরেফ ঘুরে বেড়াতে লাগলো?

ঃ মালুম, ঠোড়া টংকার মুখ ভি ডেখিল। কুঠিয়ালডের কুছ-কুছ ডোশ লোকাল হুকুমাটের ঘাড়ে গড়াইয়া ডিয়া বকশিশ খাইটে লাগিল, হামার মালুম।

ঃ সাহেব।

ঃ হামি বাই দিবাই, রঘু পোড্ডারের টামাম স্টোরী শুনিয়াছে। লেকেন, টডন্টে উহার ঠিক ঠিক লিখা হইল বলিয়া হামার মালুম হইল না। উহাডের বাট্‌চিট্ বহুট উল্টা পাল্টা শুনিল।

ঃ সে কি!

ঃ কোম্পানীর আড্‌মীদের ক্যারেকটার মজবুট না আছে, হামি নিজে টাহা বুঝিল। কিনটু ইহা কোম্পানীর আভান্টরীণ ম্যাটার। হামার আপনার ইহাটে কুছু বলার না আছে।

ঃ কিন্তু—

ঃ ও মাই ডিয়ার! হামি টো বলিটেছে উহা আমি আন্ডাজ করিল। কারেক্ট ভি নাও হইটে পারে। উহা ছাড়িয়া ডিন, বিলকুল ছাড়িয়া ডিন।

গায়ে পড়লে গায়ে পড়ে দেখে সাহেব যে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইছেন, আবদুল আজিজ তা বুঝতে পারলেন। এ নিয়ে তাঁকে বিব্রত করা ঠিক হবে না বুঝে আবদুল আজিজ বলেন—আচ্ছা-আচ্ছা। আপনি আপনার কথা বলুন। তারপর কি হলো? উনারা ফিরে এলেন?

ঃ হাঁ। আভি ওয়াপ-ু আসিয়াছে। আভি হামরা হামাডের মুলুকে ফিরিয়া যাইটেছে। হামাডের টিমের লোকেরা আখুন হুগলীর কোঠি ডেখিটেছে, হামি হাপনার কাছে চলিয়া আসিয়াছে।

ঃ বহুত খুব-বহুত খুব। আজ তাহলে এযাজত দিন সাহেব, আপনার মেহমানদারীর কিছু আনযাম করি।

ঃ ও নো মাই ডিয়ার। কোঠিতে হামার ডাওয়াট আছে। জোর ডাওয়াট। হামার ঠাকা খাওয়া টামাম কোঠিটে করিটে হোবে। হাপনার ডাওয়াট কবুল করিলে উহারা মাইন্ড করিবে, গোস্বা হোবে।

ঃ সাহেব!

ঃ হামার টিমের ডিসিপ্লিন জরুর হামাকে মানিটে হোবে। ইস্ লিয়ে হাপনি পেরেশান না হোবে জনাব। হামি হাপনার আন্টরিকটার বহুট কডর করে।

ঃ কিন্তু—

ঃ হামি ডিলের টানে হাপনার সাঠে মোলাকাট করিটে আসিয়াছে। হামার হাটে আখুন ঠোড়া টাইম আছে। হাপনি এলেমডার আডমী। হামি হাপনাডের নীটি-ডর্শন আওর এলেমের কঠা হাপনার কাছে শুনিটে চায়।

তাঁদের কথার মাঝেই ফিরে এলেন হাফিজ আসাদ-বিন-নোমানী সাহেব। দহলীজে ঢুকতে গিয়েই একজন বিদেশী সাহেবের সাথে আবদুল আজিজকে আলাপরত দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবদুল আজিজ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আরে এই যে, হুজুর এসে গেছেন। আসুন জনাব, আসনু-আসুন। পরিচয় করিয়ে দেই।

ডেভিড স্মিথও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হুজুরের দিকে চেয়ে রইলেন। নোমানী সাহেব ভেতরে এলে মিঃ স্মিথের প্রতি ইংগিত করে আবদুল আজিজ বললেন—হুজুর, ইনিও একজন মস্তবড় আলেম। আপনার মতোই এক মস্তবড় বিদ্যালয়ের আলেম।

আসাদ-বিন-নোমানী সাহেব খোশদীলে বললেন—তাই নাকি! মারহাবা-মারহাবা!

আবদুল আজিজ ফের স্মিথ সাহেবকে উদ্দেশ করে বললেন—ইনি আমাদের হুজুর। এতদঞ্চলের একজন বিখ্যাত আলেম। এখানকার সবচেয়ে বড় মাদ্রাসার সদরুল মুদাররেসীন, মানে প্রধান মুদাররেস্। এখন অবশ্য অবসরে আছেন।

উৎফুল্ল হয়ে উঠে ডেভিড স্মিথ বললেন—ও মাই ষ্টার। হোয়াট এ গুড ফরচুন! আইমিন, হামার কেয়া জিয়াডা খোশ কিস্মটি আছে! হামি একজন জবরডষ্ট পণ্ডিট আড্মীর ডর্শনি পাইল। আসুন জনাব। হামার গুড্উইল কবুল করুন—

ডেভিড স্মিথ হাত বাড়িয়ে দিলেন। নোমানী সাহেব এসে তাঁর সাথে করমর্দন করলেন। করমর্দন করার কালে ডেভিড স্মিথ বললেন—খোশ আমডেড-খোশ আমডেড।

নোমানী সাহেব বললেন—শুকরিয়া।

শুভেচ্ছা বিনিময় অন্তে আন্তরিক পরিবেশে তিনজনই আসন গ্রহণ করলেন। নোমানী সাহেব হাসি মুখে স্মিত সাহেবকে প্রশ্ন করলেন—তা সাহেবের মকান কি ইংলন্ডে?

স্মিথ সাহেব একইভাবে জবাব দিলেন—জি জনাব, জি। হামি একজন ইংলিশ ম্যান আছে।

ঃ ওখানেই আপনি এলেম শিক্ষা দেন?

ঃ রাইট। হামি হামাডের ক্যাপিট্যাল শহরে বাস করে আওর সডরের এক স্কুলে আইমিন বিদ্যালয়ে, এলেম শিক্ষা ডেয়।

ঃ আপনাদের সদরে কি আপনার বিদ্যালয়ই বড় বিদ্যালয়?

ঃ নো, নট্ একজ্যাক্টলী। বড় বিড্যালয় হামাডের অকস্ফোর্ড বিড্যালয়। বহুট খানডানী বিড্যালয়। জিয়াডা নামডাক। হামি উও অকস্ফোর্ড বিড্যালয়ের টালেবে-এলেম আছে। আইমিন, উও বিড্যালয়ে হামি এলেম হাসিল করিয়াছে।

আত্মতৃপ্তিতে সাহেব হাসতে লাগলেন। তিনি যে, এতে কিছুটা গর্ববোধ করলেন, তা তাঁর হাসি থেকেই বোঝা গেল। নোমানী সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন—আচ্ছা!

সাহেব বললেন—অকস্ফোর্ডের বাইরে রাজধানীটে আওর কুছ জিয়াডা বিড্যালয় আছে। হামার বিড্যালয় উহাডের মধ্যে বড় বিড্যালয়। হামি ওখানে কাম করে। হামার সাবজেকট্, আইমিন হামার বিষয়ে, এলেম ডান করে।

ঃ আপনি কোন বিষয়ে এলেম দান করেন?

ঃ হিউম্যানিটি এ্যাণ্ড সিভিলাইজেশান, আইমিন, মানবিক বিড্যা আওর সভ্যটার ইটিহাস শেখায়।

ঃ বহুত খুব-বহুত খুব। তা কিছু মনে করবেন না সাহেব। আপনাদের এসব বিষয় আমরা তো তেমন জানিনে। তাই কৌতূহল বশেই এসব প্রশ্ন করলাম।

সাহেব অতিশয় সোচ্চার হয়ে উঠে বললেন—আরে-আরে ! হামি মাইন্ড্ করিবে কেনো ? হামি টো এসব লইয়াই আলোচনা করিটে চায়। হামাডের ডেশের এলেম আওর হাপনার ডেশের এলেম—এই সমষ্ট লইয়াই ভাব বিনিময় করিটে চায়।

ঃ সাহেব !

ঃ ইস্ লিয়ে হামি আপনাডের মুলুকে টুর করিটে আসিয়াছে। হাপনাডের শিক্ষা, সভ্যটা, নীটি, ডর্শন, ইট্যাডি ডিক হামি জানিটে আসিয়াছে। হামাডের যে সমষ্ট তালেবে এলেম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নোকরিটে আসিটে চায়, এ সমষ্ট এলেম উহাডের ডিটে হয়। হাপনাডের কঠা আগারী জানা ঠাকিলে এ মুলুকে উহাডের কাম করা ইজি হয়।

ঃ তা বটে-তা বটে !

ঃ হামার বহুট সৌভাগ্য, হামি আজ হাপনার মটো একজন জব্বোর এলেমডার আডমীর আওর এক বহুট বড়া টিচার আডমীর মোলাকাট পাইল। হাপনার টাইম আওর মেহেরবানী হলে, এ ডেশের এলেম সম্বন্ডে হামি বহুট কঠা জানিটে পারিবে।

সাহেব জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলেন। নোমানী সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন—আমি আর কতটুকু কি জানি সাহেব ! তবু বলুন, আমার হাতে সময় আছে, আপনি কি জানতে চান, বলুন।

ঃ হামার পহেলী কঠা হইল, হাপনারা হাপনাডের বিড্যালয়ে কি এলেম ডিয়া ঠাকে ? ঢর্মের এলেম ?

ঃ ধর্মের এলেম মানে ?

ঃ মানে আপনাদের ইসলামের এলেম ? কুরআন-হাডিসের এলেম ? হাপনাডের ঢর্মীয় রীটিনীটি আওর অনুষ্ঠানের এলেম ?

ঃ অবশ্যই। কুরআন হাদিসের এলেমই আমরা সর্বপ্রথম গুরুত্ব সহকারে দিয়ে থাকি। আল্লাহ তায়ালার হুকুম আর আল কুরআনের ও রসূল করিম (সা)-এর নির্দেশাবলী পুঙ্খনু পুঙ্খরূপে হৃদয়ঙ্গম করতেই আমরা সর্বপ্রথম শিখাই।

ঃ অঠটি ?

ঃ অর্থাৎ, ঈমান-আকিদা, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, হারাম-হালাল—ইত্যাদি এলেমের সাথে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ, হাদিসের জ্ঞান ও শরিয়তের বিধিবিধানের শিক্ষাই আমরা সযত্নে দিয়ে থাকি।

ঃ দ্যাট্স্ অল্ ? আইমিন ইহাই সেরেফ ?

ঃ সেরেফ না হলেও, ইহাই মূল। এই এলেম নেই তো কোন এলেমই

নেই। ভিত নেই তো ইমারত নেই। এই শিক্ষাই চাই আগে। ভিত না গেঁথে আমরা ইমারত গড়িনে।

ঃ জনাব !

ঃ একজন মুসলমানকে সবার আগে খাঁটি মুসলমান হওয়া চাই। মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেই মানুষ মুসলমান হয় না।

ঃ আই সি ! লেকেন হামি বলিটে চায়, এলেম বলিটে সেরেফ ইহাই হাপনাডের এলেম ? ইহার অটিক আওর কুচু না আছে ?

ঃ থাকবে না কেন ? আরো কিছু অবশ্যই আছে।

ঃ আওর কুচু মানে ?

ঃ মানে বিশ্বের এই বর্তমান সভ্যতার সব কিছু।

মিঃ স্মিথ অবিশ্বাসের সুরে বললেন—সভ্যটার সবকুচু ! সব কুচু বলিটে হাপনি কি সমঝাইটেছে ?

ঃ যা নিয়ে আমাদের এই সভ্যটা গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য—সব কিছু। কমবেশী এই সমস্ত কিছুই আমাদের তালেবে এলেমরা শিক্ষা করে।

লহমা খানেক মিঃ স্মিথ হা করে চেয়ে রইলেন। এরপর স্তম্ভিত কণ্ঠে বললেন—হাপনার বাট্ হামি বুঝিটে পারিল না। বিজ্ঞান-ডর্শন ! বিজ্ঞান ডর্শনের কোন কঠা হাপনারা শিক্ষা ডিয়া থাকে ?

নোমানী সাহেবও সবিস্ময়ে বললেন—কোন কথা মানে ? বিজ্ঞান দর্শনের মোটামুটি সব কথা। বিজ্ঞানের কথা বলতে গেলে, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা—এসবের মোটামুটি সকল দিক।

মিঃ স্মিথ একই রকম বিস্ময় পিষ্ট হয়ে বললেন—হাউ স্ট্রেঞ্জ ! সাইন্সের এটো ওয়াইড্ ফিল্ড্ এ্যাণ্ড ডিপ্‌ষ্টাডী—আইমিন এটো জিয়াডা বিষয় হাপনারা এটো গভীরভাবে ষ্টাডি করে ? প্রট্যেক বিষয়ের মোটামুটি টামাম কঠা ?

ঃ সেকি সাহেব ! আপনি তাজ্জব হচ্ছেন কেন ? আমাদের উচ্চ পর্যায়ের তালেবে এলেমদের কথা ছেড়েই দিলাম, এসব বিষয়ের একটা মোটামুটি জ্ঞান আমাদের সাধারণ তালেবে এলেমদেরও বিশেষভাবে দেয়া হয়। ইসলামের জ্ঞানের সাথে মোটামুটি এসব জ্ঞান যার নেই, আমাদের মুসলিম জাহানে তাকে এলেমদার কেউ বলে না।

ঃ ও মাই গড্। হাপনারা এটো জিয়াডা এলেমডার ! এ সমষ্ট সাব্‌জেকটের অনেক গুলোর প্রাইমারী নলেজ, আইমিন প্রাঠমিক জ্ঞানই টো হামাডের এলেমডারডের অনেকের এখোনও হয় নাই।

ঃ বলেন কি ! আপনাদের বিদ্যালয়ে এসব এলেম দেয়া হয় না ?

ঃ হয়। লেকেন ঠোড়া-ঠোড়া। সব বিড্যালয়ে হয় না। সেরেফ অকসফোর্ড বিড্যালয়ে আখুন জিয়ডা কুছু হইটেছে।

ঃ সেকি ! তাহলে আপনাদের প্রধান পাঠ বিষয় কি ?

ঃ গ্রামার। আইমিন, ব্যাকরণ। উহাই প্রঢান। উস্‌কি সাঠ লিটারেচার। ইহার পরে আছে ঢর্মীয় শিক্ষা, টর্কশাস্ত্র আওর থোরা ডর্শন। হিষ্ট্রি আওর হিউম্যানিটি ভি আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এলেম আভিটক্ বিলকুল এলিমেন্টারী।

ঃ সাহেব !

ঃ হামাডের অক্‌সফোর্ডে আখুন বিজ্ঞান চর্চা হইটেছে। লেকেন, হাপনি যাহা বলিটেছে টাহার মটো নয়। বিজ্ঞানের এটো ডিপৃষ্টাডী অক্‌সফোর্ডে ভি শুরু হয় নাই। হাপনারা ঐ সমষ্ট সাবজেক্‌ট্ কোন কোন বিজ্ঞানীডের কাছে পাইয়াছে আওর কোন কোন বিষয়ে এলেম শিক্ষা ডিটেছে—ঠোড়া বুঝাইয়া বলুন।

একটু থেমে হাফিজ আসাদ-বিন-নোমানী সাহেব বললেন—বললাম তো সাহেব, মোটামুটি দিকগুলো সবই আমাদের তালেবে এলেমদের শিক্ষা দিতে হয়। আবু মুসা জাফর বা জাবের, আল কিন্দি, আল বেরুনী, ইবনে জাওহের—এইসব গণিতবিদ্‌দের গণিত শাস্ত্রের মোটামুটি সকল দিক। আপনারা আবু মুসা জাফরের বিখ্যাত গ্রন্থ "আল জাবের আল মোকাবেনা" এর নাম শুনেননি ?

একটু চিন্তা করেই সাহেব সরবে বলে উঠলেন—হাঁ-হাঁ, শুনিয়াছে। হামাদের অকসফোর্ড আওর কুছু কুছু বিড্যালয়ে আল জাবের এর ষ্টাডী হয়। উহাকে হামরা এ্যালজাব্‌রা বলে।

ঃ এই তো ঠিক ধরেছেন। ঐ আবু জাবের এর আল জাবেরা। আল কিন্দির জ্যামিতি, ত্রিকোণোমিতি, আল বেরুনী ও আল জাওহারের গণিত, দর্শন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, আবু বকর বিন ইয়াহিয়ার গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা—মোটামুটি পুরোটাই আমাদের পাঠ্য তালিকায় আছে আর উপর পর্যায়ের তালেবে এলেমদের প্রায় পুরোটাই শিখতে হয়।

ঃ মাই গড !

ঃ আপনারা ইবনে সিনার নাম শুনেননি ?

ঃ ও ইয়েস-ইয়েস। হামাডের অকস্‌ফোর্ডে উহার বহুট নাম, বহুট কডর। উহাকে "এরিষ্টোট্‌ল্ অফ দি ইষ্ট" আইমিন পূর্ব ডেশের এরিষ্টোট্‌ল বলা হয়। কিন্টু উহার সম্বন্ডে হামার আডিটক ক্লিয়ার ঢারণা না আছে।

ঃ এই আবু সিনাকেই আমাদের এই বর্তমান সভ্যতার কেন্দ্র ব্যক্তি হিসাবে দেশ-বিদেশের সকলেই গণ্য করেন। উনি এক সাথে সব কিছু। দার্শনিক, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, কবি, সাহিত্যিক—সব কিছু। ইবনে সিনা, আবুল কাশেম আল আজহারীসহ অনেক চিকিৎসাবিদদের চিকিৎসাশাস্ত্র আল বেরুনী, ইবনে খালদুন, আল খাজামী সহ আমাদের বড় বড় বিজ্ঞানীদের পদার্থ বিদ্যা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তাপ, তরঙ্গ, ঘনত্ব, আপেক্ষিক তত্ব, দৃশ্যতত্ব—সব কিছুই আমাদের সাধারণ তালেবে এলেমদের কিছু কিছু জানতে তো হয়ই, যারা বিশেষজ্ঞ হতে চায়, তাদের এসব অত্যন্ত গভীরভাবে জানতে হয়। এ ছাড়া "আল কেমী" অর্থাৎ রসায়ন শাস্ত্রে আমাদের মুসলিম রসায়নবিদ আবু জাবের আল জাকারিয়া, আল রাজী, ইবনে সিনার তত্ব ও তথ্যগুলিও তাদের বিশেষভাবে জানতে হয়। সাথে সাথে আমাদের তালেবে এলেমরা যে যার ইচ্ছে মতো স্থাপত্য শিল্প, অংকন শিল্প, খোদাই শিল্প, চারু শিল্প, হস্ত শিল্প শেখে। কাব্য-সাহিত্য ইতিহাস-ভূগোল তো প্রথম থেকেই আবশ্যিক বিষয়।

অপরিসীম বিস্ময়ে ডেভিড স্মিথের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তাঁর চোখ মুখ ফুঠে উঠলো। কয়েক মুহূর্ত তিনি অবশ হয়ে বসে রইলেন। এরপর সম্বিতে ফিরে এসেই তিনি প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন—চাইল্ড-চাইল্ড বিলকুল চাইল্ড। হামি এখোন বুঝিটেছে, হাপনাডের এলেমের কাছে হামাডের এলেম বিলকুল শিশু আছে। আভিট্‌ক কোয়াইট ইম্‌বেসাইল অবষ্ঠায় আছে। এ কিয়া বাট্ হামি শুনিটেছে। কেয়া টাজ্জব বাট্ ! এট্‌না জব্বোর এলেমডার আডমী আছে হাপনারা !

ঃ সাহেব !

ঃ হামাকে মাফ করিয়ে ডিন। হামি না জানিয়া হাপনাডের এলেমকে বহুট আন্ডার এষ্টিমেট করিয়াছে, কমটি ভাবিয়াছে। আখুন হামি জব্বোর শরমিন্ডা হইটেছে।

ঃ কেন-কেন, এতে শরমিন্দা হওয়ার কি আছে !

ঃ ও গ্রাড স্যার। হাপনাডের এলেমের কাছে, সাইন্স আওর ফিলোসফির জ্ঞানের কাছে হামাডের ইংল্যান্ডের আওর টামাম ইউরোপের জ্ঞান কটো পুওর, ইহা ভাবিয়া হামি বহুট লজ্জা বোড করিটেছে।

ঃ কেন, আপনাদের দেশে কি এসব শিক্ষা হয় না ?

ঃ হয়-হয়। ওহি টো হামি কহিল, এটো জিয়াডা হয় না, ঠোড়া ঠোড়া হয়। টবে হামাডের ইউরোপের জিয়াডা কুছু টালেবে এলেম বহুট ডিন হইটে কর্ডোভা, আলেকজান্ড্রিয়া, বাগডাড—আইমিন, স্পেন আওর মিড্‌ল্ ইষ্টের বিড্যালয় হইটে এলেম লইয়া আসিটেছে। টাহারা আখুন সে সব এলেম

হামাডের ট্রানশ্লেট করিয়া ডিটেছে। স্পেন আওর মিড্‌ল্ ইষ্ট টো বহুট ডিন আগারী হইটে জ্ঞান বিজ্ঞানের আস্‌লী মকান ! উও মুলুক বহুট বহুট এলেমডার মুলুক।

নোমানী সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন—আচ্ছা ! আপনারা তা জানেন ?

ঃ জরুর-জরুর। স্পেন আওর মিড্‌ল্ ইষ্টের নলেজ হামাডের ইংলিশ আওর আদার ইরোপীয়ন ল্যাংগুয়েজে আখুন জোরডারভাবে অনুবাড হইটেছে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি-জি। কিন্টু এ সমষ্ট নলেজ হামাডের ষ্টুডেন্ট্‌লোগ্ আভিটক্ জিয়াডা পায় নাই। ঠোড়া ঠোড়া পাইটেছে।

ঃ আপনাদের লোকেরা এখন অনুবাদ করছে ?

ঃ জোর ট্রানশ্লেশান। গ্রীক্ ল্যাংগুয়েজ হইটে কুছ কুছ আওর আরবী-ফারসী হইটে জিয়াডা অনুবাড হইটেছে।

এবার নোমানী সাহেব হেসে বললেন—তাহলে আমাদের এলেম সম্বন্ধে আপনার ধারণা কমতি হলো কেন সাহেব ? আরবী-ফারসী আমাদের এই বাংলা মুলুকের মাতৃভাষা না হলেও মাতৃভাষার মতোই আমাদের অনেকের সড়গড়ে ভাষা। সরকারী ভাষা তো বটেই। আমাদের অনুবাদ করতে হয় না। আমরা প্রায় সরাসরি শিখতে পারি। আমাদের এলেম সম্বন্ধে আপনার ধারণা নিম্নমানের হলো কেন ?

ঃ ও স্যার, হামি ভাবিল, মিড্‌ল্ ইষ্ট ঠোড়া ডুরের কান্ট্রি। হাপনাডের এই বাংলা মুলুক হইটে বহুট টফাটে আছে।

ঃ আরে সাহেব, তাতে কি ? সারাজাহানের মুসলমানেরা সবাই এক। "কুল্ল মুস্‌লিমিনা ওয়াহেদুন"। আরব মুলুকের লোকেরাও মুসলমান আমরাও মুসলমান। আমাদের জ্ঞান-বিদ্যা, নীতি-ধর্ম, শিল্প-শিক্ষা শিক্ষা, ধ্যান-ধারণা—তামামই এক এবং একই রকম। কিছুই জুদা নয়। যদিও ঐসব মুলুকের সেই ঐতিহ্য আর আগের মতো নেই, দুশমনেরা এসে অনেকটা ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, তবু ঐ সবস্থানে যে শিক্ষা দেয়া হয়, এখানেও প্রায় সেই শিক্ষাই দেয়া হয়।

ঃ সাচ্ ?

ঃ বিলকুল। আমাদের এই মুঘল আমলে অনেকটা ভাটা পড়ে গেছে। নইলে এর আগে ঐসব অঞ্চল থেকে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত এলেমদার ইনসান স্বইচ্ছায় এ মুলুকে আসতেন আর তাঁরা নিজেরাই আমাদের ওসব এলেম শেখাতেন।

ঃ ওয়াডার ফুল-ওয়াডর ফুল ! হামি বিলকুল লা-জবাব হইয়া যাইটেছে !

ঃ আচ্ছা সাহেব, গ্রীক ভাষা থেকে আপনাদের দেশের লোক কোন কোন বিষয় অনুবাদ করছেন ?

ঃ টর্ক শাস্ট্র আওর ঠোড়া ডর্শন। সক্রেটিস্ আওর এরিষ্টোটলের কুছ কুছ ফিলোসফি টাহারা অনুবাড করিটেছে। টবে ইবনে সিনা হইটেই জিয়াডা ফিলোসফি ট্রানশ্লেট হইটেছে।

ঃ আচ্ছা। এই ব্যাপার ?

ঃ জি-জি, এয়সা।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। শিরিবানু ইতিমধ্যেই কুতুবখানায় এসে এঁদের আলাপ আলোচনা শুনছিলো। শুনতে শুনতে ক্রমেই সে কৌতুহলী হয়ে উঠছিল। সবাইকে নীরব দেখে সে কৌতুহলবশেই বলে উঠলো—হুজুর, এযাজত দিলে সাহেবকে আমি দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমার কিছু জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

আবদুল আজিজ ও নোমানী সাহেব এক সঙ্গে কুতুবখানার দিকে তাকালেন। নোমানী সাহেব হাসতে হাসতে বললেন—জানার ইচ্ছে হচ্ছে ? বেশ-বেশ, করো—

মিঃ স্মিথ সবিস্ময়ে বললেন—কৌন ? কৌন কঠা কহিটেছে ? জেনানা আডমী মালুম হইটেছে। একঠো ইয়ং লেডী, আইমিন, বালিকা আডমী মনে হইটেছে ?

আবদুল আজিজ এতক্ষণ নীরব থেকে পুলক বিস্ময়ে সাহেবের কথাবার্তা শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন—জি-জি। আপনি ঠিক ধরেছেন মিঃ স্মিথ্। ও একজন কম বয়সের জেনানা। আমাদের এই হুজুরের তালেবে এলেম। ও আপনাকে কিছু বলতে চায়।

সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন—ইজ ইট ? বহুট খুব বহুট খুব। বলিয়ে ম্যাডাম—

শিরিবানু সসংকোচে বললো—না-মানে আমি বলতে চাচ্ছি, সক্রেটিস্ আর এরিষ্টোটলের দর্শন আপনারা গ্রীকভাষা থেকে অনুবাদ করেন ?

ঃ ও ইয়েস। ঠোড়া ঠোড়া গ্রীক হইটে আওর আরবী ফারসী হইটে জিয়াডা।

ঃ আর অন্যের গুলো ? মানে, প্লেটো, জেনোফোন, ইউরিপিডাস্ হিপোক্রিটিস্—এঁদের বিজ্ঞান-দর্শন আপনারা কোন্ ভাষা থেকে পান জনাব ? গ্রীক না আরবী-ফারসী থেকে ? এ ছাড়া, গেলেন, টলেমী—এঁদের অনুবাদ কোন ভাষা থেকে করেন ?

সাহেব আবার হতভম্ব হয়ে গেলেন। জবাব দেয়ার বদলে নোমানী সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলেন—কেয়া

তাজ্জব-কেয়া তাজ্জব ! একঠো মেয়ার চাইল্ড, আইমিন, লেড়কী আডমী উহাডের নাম জানে ?

নোমানী সাহেব হেসে বললেন—জানে বৈকি সাহেব ? ওদের বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে বেশী কিছু না জানলেও, ওসব নামের সাথে ও বেশ পরিচিত। টলেমীর জ্যোতির্বিদ্যা, এরিষ্টোটলের ন্যায়শাস্ত্র, হিপোক্রিটিস্ ও গেলেন এর ভাবধারা সম্বন্ধে ওকে এখন অল্প অল্প ছবক দেয়া হচ্ছে। ইবনে সিনার বদৌলতে ওঁরা তো আমাদের কাছে না জানা লোক নন কিছু ? এছাড়া ঐ লেড়কীটাও খুব মেধাবী আর ওর স্মরণ শক্তিও খুব প্রখর।

ঃ কেয়া তাজ্জব ! একঠো লেড়কী আডমী ভি বিজ্ঞান-ডর্শন পড়ে ?

ঃ পড়ে বৈকি ?

ঃ লিটারেচার ? আইমিন, সাহিত্য চর্চা করে না ?

ঃ জরুর করে। সাহিত্যে তো ওর আগ্রহ আরো দুর্বার।

সাহেব এবার শিরিবানুকে উদ্দেশ করে বললেন—হাপনার প্রশ্নের কারেকট জবাব হামি জানে না ম্যাডাম। তবে গ্রীক আওর আরবী-ফারসী হইটেই অনুবাড করে, ইহাই হামার ঢারণা। লেকেন, হামি হাপনাকে আভি কুছু প্রশ্ন করিটে চায় ?

শিরিবানু স্মিতহাস্যে বললো—জি জনাব, করুন—

ঃ হাপনি কোন কোন লিটারেচার, আইমিন, সাহিট্য পড়িয়া থাকে ? হাপনি সেক্সপীয়ার পড়িয়াছে ?

জবাবে শিরিবানু বললো—জিনা সাহেব। আমার বিদ্যা খুবই কম। আমি অন্য সাহিত্য পড়ি।

ঃ অন্য সাহিট্য ? কোন সাহিত্য ?

ঃ সেগুলো হলো—শেখ শাদীর গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ, ফেরদৌসীর শাহনামা, হাফিজের দেওয়ান, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মসনবী—এইসব। এগুলো পড়তে আমার খুব ভাল লাগে।

ঃ আচ্ছা ! এটো আডমীর সাহিট্য !

ঃ আলেফ-লায়লা—মানে আরব্য উপন্যাস পড়তেও আমার ভাল লাগে। ওসব তামাম কিতাব আমাদের এই কুতুবখানায় আছে।

ঃ আই সি ! টা হাপনি কুয়ী ইউরোপীয়ান লিটারেচার আইমিন ইউরোপীয়ন সাহিট্যিকের সাহিট্য পড়ে না ?

ঃ ওসব কিতাব তো আমাদের কাছে নেই। আরবী-ফারসীতে ওসবের অনুবাদ হয়েছে কিনা, তাও জানিনে। তবে হোমারের ওডেসী আর

সোফোক্লিসের সাহিত্যের কিছু ফারসী অনুবাদ হুজুর আমাকে দিয়েছেন। অবশ্য আমি এখনো ওগুলোর ভেতরে যেতে পারিনি।

সাহেব আবার লাফিয়ে উঠলেন। আবার তিনি বিপুল বিস্ময়ে বললেন—হোয়াট এ ফ্যান্টাসী ! হোমারের নাম ভি আপনি জানে ?

জবাব দিলেন নোমানী সাহেব। বললেন—কেন জানবে না সাহেব ? এতবড় একজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম জানবে না কেন ?

ঃ ষ্ট্রেঞ্জ ! একজন বালিকা আডমী উহা জানিলো ? কটোডিন ঢরিয়া ইয়ে লেড়কী এলেম শিক্ষা করিটেছে ?

জবাব দিলেন আবদুল আজিজ। তিনি বললেন—তা বেশ দিনই হবে সাহেব। কমছে কম সাত-আট বছর বা তারও কিছু বেশী।

ঃ অন্লী সাট-আট বছর ? এ কেয়া তাজ্জব বাট্ হামি শুনিটেছে। হামাডের অকসফোর্ডের টালেবে এলেম টুয়েলভ্ টু ফরটিন ইয়ার্স, বারো-চৌড্ডো বছর ঢরিয়া সেখানে এলেম শিক্ষা করে। লেকেন, উও আডমীডের অনেকেই এটো খবর জানে না। এটো সাহিট্য পড়ে না।

ঃ তাই ?

ঃ উহারা শেক্সপীয়ার ভাল জানে। সাহিট্যে এখোন শেক্সপীয়ার হামাডের ডেশে বহুট নাম করিয়াছে।

নোমানী সাহেব বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাঁর কথা ইদানিং কিছু শুনছি। তবে তাঁর সাথে এখনও আমরা পরিচিত হতে পারিনি।

সাহেব অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে বললেন—হইয়া যাইবেন-হইয়া যাইবেন। হাপনাডের এডুকেশানের যা লেভেল, টাটে কুছু হাপনাডের না-জানা ঠাকিবে না।

ঃ সাহেব !

ঃ হাপনাডের এলেমের টুলনায় হামাডের এলেম এটো লিট্ল্ যে, চিন্টা করিয়া হামি আখুন সেরেফ হেল্পলেস বোড করিটেছে, শরমিন্ডা হইয়া যাইটেছে।

এই সময় সেপাই আমিন গাজী এসে আবদুল আজিজকে সালাম দিয়ে বললো—হুজুর, আমাদের এই হুগলীর কুঠি থেকে এক কুঠিয়াল এই সাহেবের তালাশ করতে করতে এখানে এসে পৌছেছে। সে বলছে, এই সাহেবের জন্যে কুঠিতে সবাই নাকি খানার আনযাম নিয়ে অপেক্ষা করছে।

একথায় স্মিথ সাহেব শংকিত হয়ে উঠে বললেন—হামার টালাশ করিটেছে ?

আমিন গাজী বললে—জি-জি।

ঃ কোঠায় ?

ঃ ঐতো আমাদের ফটকের ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে খেতে যেতে বলছেন।

সাহেব অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ও গডেজ অফ মিস্ ফরচুন। লাঞ্চের টাইম চলিয়া যাইটেছে, লেকেন হামি বিলকুল খেয়াল করিল না ! হামি আভি যাইটে চায় জনাব ! হামাকে এযাজট্ ডিন।

সাহেব আবদুল আজিজের মুখের দিকে তাকালেন। আবদুল আজিজ বললেন—এখনই যাবেন সাহেব ?

ঃ অফকোর্স-অফকোর্স। হামার জন্যে টামাম আডমী এন্টেজার আছে। হামার কার্টসীর আইমিন, ভদ্রটার বহুট বর খেলাপ হইয়া গিয়াছে। আভি হামি যাইবে। টাইম পাইলে ইভনিং ওয়াকটে হামি ফের জরুর আসিবে। গুড্ বাঈ-গুড্ বাঈ—

মিঃ ডেভিড স্মিথ হন্তদন্তভাবে বেরিয়ে এলেন। আবদুল আজিজ ও নোমানী সাহেব সাথে সাথে বেরিয়ে এসে তাঁকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

৮

কুঠি স্থাপন করে এ মুলুকে ব্যবসা করার অনুমতি পাওয়ার ফলে, গঞ্জ-বন্দর হাটবাজারে ইংরেজ কুঠিয়ালদের আধিপত্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে, কেনা-বেচার বাজারগুলো ক্রমে ক্রমে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। ইংরেজদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে এ মুলুকের সরকার ব্যর্থ হওয়ার দরুন, অন্য দেশের কুঠিয়ালরা ইংরেজদের সংশ্রব ছেড়ে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে আর ইংরেজরাই সেখানে সর্বেসর্বা হয়ে উঠছে। মাঝে মধ্যে দু'একবার বড় ধরনের ঝড়ঝঞ্ঝা উঠলে সাময়িকভাবে তারা কিছুটা মাথা গুঁজে থাকছে, ঝড়ঝঞ্ঝা কেটে গেলেই আবার তাদের প্রভুত্ব দুর্বার আকার ধারণ করছে। স্থানীয় একটা প্রশাসন সেখানে থাকলেও কেনা-বেচা ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া প্রায়শঃই তারা প্রয়োজন বোধ করে না, আর এতে করে ইংরেজ কুঠিয়ালরা সেখানে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে বসছে।

জন বায়্যামের প্রসঙ্গ নিয়ে হৈ চৈ আর ভয়ভীতি বিদূরিত হওয়ার পর কুঠিয়ালদের স্তিমিত দৌরাত্ম ফের বাড়তে শুরু করেছে। হাট-বাজার, বন্দরে কুঠির ক্রেতারা স্থানীয় ব্যবসায়ী-বেপারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, তাতী ও দাদন

ভোগী পাইকার ঠিকাদারদের আবার নানাভাবে নির্যাতন করা শুরু করেছে। দাদনের ব্যবসার নামে পাইকার তাঁতী ও মাল সরবরাহকারীদের তারা হয়রান পেরেশানী সহ হুমকি, হামলা, আটক, এমনকি মারধোরও শুরু করেছে আবার। বরাবরের মতো কাশিম বাজার এলাকাতেই এই প্রবণতা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানীর প্রতিনিধি ম্যাথুস ভিনসেন্টের ছত্রছায়ায় ও উস্কানীতে কুঠিয়ালদের সাথে কোম্পানীর পেটুয়া কিছু অসৎ দালালেরাও আবার মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে।

ইদানিং এই ধরনের নানা অভিযোগ প্রায় দিনই হুগলীতে এসে পড়ছে। অভিযোগ শুনতে শুনতে হুগলীর প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা জরুরী মনে করলেন। ঘটনাগুলি সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে কাশিম বাজারে অবস্থিত এই হুকুমাতের কর্মচারীদের সেই মোতাবেক হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যে তিনি ফৌজদার আবদুল আজিজকে পাঠালেন। খাস সেপাই আমিন গাজী ও অন্য কয়জন সেপাই সহ এবার আবদুল আজিজের সঙ্গে গেল তাঁর ঘনিষ্ঠ দোস্ত্ উমিদ আলী। প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেবই উমিদ আলীকে উৎসাহ দিয়ে পাঠালেন। গাঁয়ে যাওয়া বাতিল করে হুগলীতে থাকলেও, উমিদ আলীর মধ্যে সেই আগের সজীবতার অনেকখানি অভাব রয়ে গেছে। তা লক্ষ্য করে জিন্দা মালিক সাহেব তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—যাও হে দার্শনিক, কাজটা তো এমন কোন শক্ত কাজ নয়, ঘুরে বেড়ানোর মতোই সহজ সরল কাজ। বাইরে থেকে খানিকটা ঘোরাফেরা করে এসো। এতে তোমার দীলটাও তাজা হবে আর সেই সাথে তোমার মরচে পড়া ঘোড় সওয়ারী অভ্যাসটাও কিছুটা ঝালিয়ে নেয়া হবে। এক ঘেঁয়ে জীবন যাপন করে করে দিন দিন তুমি বড়ো কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছো।

উমিদ আলীর মধ্যে একটা ভাবান্তর এসেছে। তার ছন্দহীন জিন্দেগীর মাঝে সে এখন কিছুটা পরিবর্তনের প্রত্যাশী হয়ে উঠেছে। গতানুগতিক জীবন যাত্রার বাইরে ভিন্নতর কাজের প্রতি তার এখন অনেকটা আগ্রহ পয়দা হয়েছে। সে এখন বাইরে আসতে চায়। জনসংযোগ চায়। নির্দিষ্ট একটা দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সে এখন তার জিন্দেগীর ধারাটাকে ভিনখাতে প্রবাহিত করতে চায়। দেশ ও জাতির ভবিষ্যত চিন্তা করে আর সে একা একাই গৃহকোণে বিক্ষত হতে চায় না। তাই, জিন্দা মালিকের প্রস্তাবে সে সাগ্রহেই সাড়া দিয়ে আবদুল আজিজের সফর সঙ্গী হলো। আবদুল আজিজও বহুৎ দিন পর তাঁর এই বন্ধুটির নিবিড় সঙ্গলাভে অত্যন্ত খুশী হলেন।

ছোট একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে দুই দোস্ত্ বেরুলেন। কাজ তাঁদের আসলেই হালকা-পাতলা মামুলী কাজ। বাজার গঞ্জে কুঠিয়ালদের আচরণ

জরিপ করা আর সেই প্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসনকে নসিহত ও হুঁশিয়ারীর মাধ্যমে চাঙ্গা করে দিয়ে আসা। অন্য কথায়, কাশিম বাজারের সরকারী মেহমানখানার মেহমান হয়ে দু'চারদিন সেখানে অবস্থান করা আর হাটবাজার দেখে দেখে চারদিকে ভ্রমণ করা। তাঁদের জন্যে এটা অনেকটা আনন্দ সফরই ছিল।

দল নিয়ে দুই দোস্ত গল্পালাপে ও ঢিলে ঢালাভাবে কাশিম বাজারের দিকে অশ্ব চালনা করতে লাগলেন। লক্ষ্য তাদের কাশিম বাজার এলাকার হাট-বাজার আর গঞ্জ-বন্দর হলেও, তাঁরা তাঁদের গমন পথের দুই পাশের হাট বাজারগুলোরও মোটামুটি খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। সেই সাথে চারপাশের জনগণের সুখ-দুঃখ ও হাল-হকিকত সম্বন্ধে অবহিত হতে হতে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে সামরিক লেবাস পাল্টিয়ে সকলেই তাঁরা বেসামরিক লেবাসে মুসাফিরের রূপ ধারণ করলেন। রাস্তার মাঝে পছন্দ মতো লোক পেলে তাঁরা থেমে থেমে তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, লোক না পেলে, চার পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে অগ্রসর হতে লাগলেন।

পথ চলতে চলতে এক সময় আবদুল আজিজ উমিদ আলীকে প্রশ্ন করলেন—কি বুঝতে পারছো দোস্ত ?

উমিদ আলী পাল্টা প্রশ্ন করলো—কি বুঝতে পারছি মানে ?

ঃ মানে, ঘরের মধ্যে বসে বসে দেশের দুর্ভাবনায় এই যে এত পেরেশান হও, আসলে কি দেশটা তেমন দুরবস্থায় আছে ? চারপাশের খবরাখবর শুনে কি তোমার মনে হচ্ছে এখন ?

ঃ তার মানে ! আমার পেরেশানীর বিষয় তো দেশের লোকের অবস্থা নয় দোস্ত ? পেরেশানী আমার তামামই এই ইংরেজ বেনিয়াদের নিয়ে। এদের দাপট খাটো করতে না পারলে, দেশের আভ্যন্তরীণ সুখ শান্তিতে কি এমন এসে যায় ? এ দিয়ে তো বিপর্যয় ঠেকানো যায় না ?

ঃ কথা তোমার পুরোপুরি ঠিক হলো না দোস্ত । দেশের লোক সুখে থাকলে বিপর্যয়ের দিনে এদেরকেও পাশে পাওয়া যায়। দুরবস্থায় থাকলে এরা শত ডাকেও সাড়া দেয় না। দেশের নিরাপত্তা বিধানের এও একটা দিক।

ঃ হতে পারে। তবে সেই ডাক দেয়ার আর ডাকে সাড়া দেয়ার মওকাটা থাকিলে তো ?

ঃ কি রকম ?

ঃ রক্ষকদের নিদারুণ আহম্মকীর কারণে দেশের লোক বুঝে উঠার আগেই যদি তেলেসমাতি খেলার মতো দেশের পট পালটে যায় তখন আর দেশের লোকের করার বেশী থাকে না।

ঃ দোস্ত !

ঃ গৃহস্ত জেগে উঠার আগেই যদি চৌকিদারের অবহেলার কারণে ঘরে চোর ঢুকে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়, পরে জেগে উঠে আর গৃহস্থের করার থাকে কি ? ব্যর্থ দোষারোপ আর বিলাপ করা বৈতো নয়।

আবদুল আজিজ বাধা দিয়ে সরবে বললেন—আহহা ! সেই চোরটাকে ঢুকতে দিচ্ছে কে ? চৌকিদারেরা আসলেই কি ঘুমিয়ে আছে বিলকুল ? চোরের উপর তাদের তো হরওয়াক্ত নজর আছে শানদার।

ঃ কেমন ?

ঃ এই যে আজ আমরা যে কাজে বেরিয়েছি, এটাওকি সেই শানদার নজর রাখার অংশবিশেষ নয় ?

ঃ হ্যাঁ, তা কিঞ্চিৎ ধরা যায় বটে। তবে আমার কথা দোস্ত, এগুলো সবই অশথ গাছের পাতা-ডগা ছেঁড়া গোড়া কাটা নয়। গোড়া যদ্দিন মূল সমেত কেটে ফেলতে না পারছো, ততদিন আর আমাকে সাত-পাঁচ বুঝ দিয়ে লাভ নেই।

আবদুল আজিজ নারাজ কণ্ঠে বললেন—নাঃ ! তোমার এই অতিশয় হতাশাবাদ কিছুতেই আর গেল না।

ঃ দোস্ত !

ঃ নাম তোমার উমিদ আলী। অন্য কোন ব্যাপারেই না-উম্মিদ তুমি নও। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে না-উম্মিদ ভাবটা তোমার মজ্জাগত। আরে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেই তাদের অন্য দাপট আপছে আপ কমজোর হয়ে যাবে।

ঃ নিয়ন্ত্রণে রাখতে তা পারছো কি তোমরা আদৌ ?

ঃ পারছিনে, এমনই বা কি দেখলে ? শুনতে তো অনেক কথাই শোনা যায়। কুঠিয়ালদের জুলুমে হাটবাজারে কেউ আর কেনাবেচা কিছুই করতে পারছে না। কৈ, পেলে তেমন হদিস কিছু ? এই যে একের পর এক হাট ঘাট পেরিয়ে এলাম, কুঠিয়ালদের জুলুমের কথা শুনলে কিছু ?

ম্লান হাসি হেসে উমিদ আলী বললো—ডোবা খুলিয়ে তুমি হাঙ্গর কুমীর তালাশ করছো দোস্ত ? ব্যাঙ-ব্যাঙাচি খাওয়ার জন্যে হাঙ্গর-কুমীর খানা ডোবায় আসে না। বড় আহার ধরার জন্যে তারা বড় পানিতে ঘুরে।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ যেসব হাট বাজার পেরিয়ে এলাম আমরা, গাঁয়ের লোকেরা সে সবকে গিন্নী হাট বলে। এইসব ক্ষুদে হাটে কুঠিয়ালদের তৎপরতা নেই বলেই কি বলতে চাও, তারা খামুশ হয়ে গেছে !

ঃ তা বলবো কেন ? যেখানে তারা সোচ্চার আছে, সেই খানেই তো যাচ্ছি। তাদের খামুশ করার জন্যেই তো আমাদের এই অভিযান !

ঃ আংশিক খামুশ করা মানে সার্বিক খামুশ করা নয়। এই হুকুমাতের সবাই যদি সব জায়গায় এই একইভাবে তৎপর হতো, তবেই সত্যিকারের সুফলটা পাওয়া যেতো। কিন্তু এই হুকুমাতের সে উদ্যোগটা কোথায় ?

আবদুল আজিজ এবার বিরক্ত হয়ে বললেন—না দোস্ত্ তোমার সাথে তর্ক করে আর অশান্তি বৃদ্ধি করতে চাইনে। তোমার ধারণায়, এই বাংলার হুকুমাতটা একেবারেই নাদান এক হুকুমাত। এর দ্বারা দেশের কোন ভালাই সাধন হয়নি, হতেও পারে না।

এর জবাবে উমিদ আলী বললো—তাও আমি বলছিনে। যদিও নিজে বেশী বাইরের খবর জানিনে, তবু আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে এই হুকুমাতের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার ভয় এদেশের ভবিষ্যত নিয়ে।

ঃ ভবিষ্যত ভবিষ্যতই। সেখানে কি আছে আর না আছে, তা তুমিও ঠিক জানো না। আমিও জানিনে। সেই অজ্ঞাত ভবিষ্যত নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় থেকে তুমি জাজ্জিল্যমান বর্তমানটাকে উপেক্ষা করতে চাও ? হুকুমাতের বর্তমান এই সাফল্যের কোনই মূল্য নেই ?

ঃ দোস্ত্ !

ঃ দীর্ঘ কাল যাবত এ মুলুককে কেউ যা দিতে পারেনি, এই হুকুমাত কানায় কানায় ভরে দিয়েছে তা দিয়ে। এ জন্যেও কি এই হুকুমাতের তারিফ করার কিছুই তোমার নেই ?

ঃ সব তুমি জড়িয়ে ফেলছো দোস্ত। এই হুকুমাতের আভ্যন্তরীণ সাফল্যের কথা শুনেই তো আমি ছুটে এসেছি তোমাদের মাঝে আর ছটফট করছি এত। এই সাফল্যের কথা না শুনলে কি আমি ছুটে এখানে আসতাম ? শুধুই শুনেছো ? নিজে কিছু অদ্যতক মালুম করতে পারোনি ? আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা, দেশের সমৃদ্ধি, মানুষের সুখশান্তি—এসব ?

ঃ দোস্ত, বহুৎ দিন যাবত বাইরে তো তেমন আমি বেরুইনে। হুগলী শহরের বাইরে, গ্রামে-গঞ্জে বা অন্যত্র কোথায় কি অবস্থা এখন, সেটা তো পুরোপুরি জানার কথা নয় আমার ?

ঃ আজ তো বাইরে এসেছো ? দেখে শুনে জেনে বুঝে নাও আজ। যাচাই করে দেখো।

উমিদ আলী হেসে বললো—একা আর আমি কি যাচাই করবো দোস্ত্ ! তুমি যাচাই করে দেখাও।

যাচাই করে দেখানোর মওকাও আবদুল আজিজ হাতের কাছেই পেয়ে গেলেন। কথা বলতে বলতে তাঁরা যেখানে এসে পৌঁছেছিলেন, সেটা একটা লোকালয়। দুই ধারে জনবসতি, মাঝ দিয়ে রাস্তা। জনবসতির ভেতরে এসেই তাঁরা দেখলেন, তাঁদের হাতের ডান পাশের জনবসতির দিকে অনেক লোক যাওয়া আসা করছে। প্রত্যেকের হাতেই কিছু কিছু পণ্য বা বাজার সওদা। খোঁজ নিয়ে জানলেন, নিকটেই একটা ছোট খাট হাট বসেছে আর এরা সবাই হাটুরে।

অশ্বের গতি থামিয়ে দিলেন তাঁরা। হাটটার কি হালত তা জানার জন্যে উপযুক্ত লোক খুজতে লাগলেন। হাটুরেদের কাকে ডেকে এসব প্রশ্ন করা যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা এই কথা ভাবতেই তাঁদের কিছুটা সামনে দুই তিন জনের কণ্ঠে একটা হৈ চৈ আওয়াজ উঠলো। আওয়াজটা উঠেই আবার থেমে গেল। এরপরেই আওয়াজকারীদের একজন আপন আবেগে বলে উঠলো—হায়রে আল্লাহ হায়রে হায়—

কালের গতি বুঝা দায়—
ফকিরের গোস্ কুকুরে খায়—

মন্তব্যকারী এই মন্তব্য একবার করেই থেমে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অনুকরণ প্রিয় কয়েকজন বালবাচ্চা বক্তার অনুকরণে বার বার ঐ একই আওয়াজ দিতে লাগলো। কয়েকবার এলোপাতাড়ি আওয়াজ দেয়ার পরেই তারা খেই হারিয়ে ফেললো এবং "ফকিরের গোস্ কুকুরে খায়" বলতে বলতে "ফকিরে কুকুর খায়" বলে তার স্বরে আওয়াজ দিতে লাগলো।

আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী কিছুটা আওয়াজ শুনতে পেলেও, তাদের লক্ষ্য অন্য দিকে থাকায় এদিকে তাঁরা কান দিলেন না। কিন্তু তাদের একজন সেপাই এতে আতংকিত হয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—খেয়ে ফেললো হুজুর, মানুষে কুকুর খেয়ে ফেললো।

আবদুল আজিজ পেছন ফিরে সবিস্ময়ে বললেন—কুকুর খেয়ে ফেললো মানে ?

সেপাইটি ঐ একইভাবে বললো—ঐ শুনুন, একটা ফকির বোধ হয় আস্ত একটা কুকুরই খেয়ে ফেললো ! এটা তো হতে দেয়া যায় না !

বালবাচ্চারা তখনও এস্তার আওয়াজ দিয়ে চলেছে—

"হায়রে আল্লাহ হায়রে হায়—
ফকিরে কুকুর খায়"—

এতক্ষণে সকলেই কান দিলেন সেইদিকে। বালবাচ্চাদের সপুলক ঐ হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে আবদুল আজিজ সাহেবেরা আতংকের কিছু পেলেন না। তবে ঘটনাটা জানার জন্যে তাঁরা কিছুটা উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং অশ্বের লাগাম টেনে সেইদিকে এগিয়ে গেলেন।

ঘটনাস্থলে এসে দেখলেন, একেবারেই মামুলী এক ব্যাপার। কালু ফকির নামের এক হাটুরে দুই ধামা ভর্তি সওদা পাতির এক ভার রাস্তার পাশে রেখে পাশবর্তী জলাশয়ের ধারে প্রস্রাব করতে গেছে। ফাঁক পেয়ে একটা কুকুর এসে কালু ফকিরের ধামা থেকে কলার পাতায় বাঁধা একটা বড়ো সড়ো গোস্তের পোঁটলা তুলে নিয়ে দৌড় দিলে নিকটবর্তী দুই তিন জন লোক হৈ হৈ করে কুকুরকে তাড়া করেছে। তাড়া খেয়ে কুকুরটি পোঁটলা ফেলে পালিয়ে গেছে। এ প্রেক্ষিতে তাদের একজন আপন খেয়ালে যে মন্তব্যটি করেছে, তারই উল্টা পাল্টা জের ধরে বালবাচ্চারা হৈ হুল্লোড় করছে।

তামামই বালবাচ্চাদের কাণ্ড। জনৈক ব্যক্তির কাছে আবদুল আজিজ ঘটনাটি শুনলেন ও আপন মনে হাসলেন। আবদুল আজিজের অশ্বারোহী দল দেখেই বালবাচ্চারা সভয়ে পালিয়ে গেল। অন্যান্য লোকেরাও সরে গেল একে একে। হাটুরে কালু ফকির ইতিমধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে এসে গোস্তের পোঁটলা কুড়িয়ে নিয়ে ভারটি সাজিয়ে নিলো। অতপর সেও ভার কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা হওয়ার উদ্যোগ করলো। আবদুল আজিজ একটু চিন্তা করে হাটের খবর নেয়ার জন্যে তারই শরণাপন্ন হলেন এবং ডাক দিয়ে বললেন—আরে ও মুরুব্বী শুনুন-শুনুন—

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে কালু ফকির থতমত করে বললো—আমাকে কিছু বলছেন?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনাকেই। আপানার কি খুব তাড়া আছে?

সম্ভ্রান্ত লেবাসের এই অশ্বারোহী দল দেখে কালু ফকির হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে নীরবেই সেখান থেকে চলে যেতে চাইছিল। কিন্তু সেই সম্ভ্রান্ত লোকদেরই একজন তাকে এক্ষণে সম্মানসূচক সম্বোধন করায়, সে আর তা এড়িয়ে যেতে পারলো না। কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে সে বললো—জিনা, এমন আর তাড়া কি! এখন বাড়ীতে যাবো শুধু।

আবদুল আজিজ খুশী হয়ে বললেন—তাহলে দু'টো কথা বলতাম আপনার সাথে।

ভারটা নামিয়ে রেখে কালু ফকির বললো—জি বলুন—

আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী অশ্ব থেকে নেমে কালু ফকিরের কাছে এগিয়ে এলেন। কালু ফকির একজন সাদামাটা প্রৌঢ় গোছের গ্রামবাসী। পোশাক আশাক অনেকটা দীন। কাছে এসে আবদুল আজিজ বললেন—হাট থেকে সওদা করে এলেন?

ঃ জি-জি।

ঃ মকান কোথায় আপনার? এ আশেপাশেই?

ঃ জি হুজুর, ঐ তো ঐ ফকির পাড়ায়।

ঃ আপনার নামটা কি কালু ফকির?

ঃ জি। নামতো আমার আবুল কালাম। কিন্তু সবাই কালু ফকিরই বলে।

ঃ আচ্ছা। তা কি কাজ করেন আপনি? কৃষি কাজ?

ঃ জিনা হুজুর।

ঃ কেনা বেচা? মানে, দোকানদারী ব্যবসাপাতি—এসব করেন?

ঃ জিনা।

ঃ তাহলে? আপনার পেশা কি? কি করে খান আপনি?

শরমিন্দা হওয়ার বদলে কালু ফকির এবার খোশদীলে বললো—আমি দিন মজুর হুজুর। আমি মজুর খেটে খাই।

ঃ মজুর খেটে? ও, তাহলে এই যে এই ধামা ভর্তি বাজার সওদা, এগুলো আপনার মনিবের, মানে যার আজ মজুর খাটছেন, তাঁর?

কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে কালু ফকির বললো—তা হবে কেন হুজুর? এগুলো সবই আমার নিজের বাজার সওদা।

আবদুল আজিজও কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আপনার নিজের?

ঃ জি হুজুর। সাতদিন মজুর খেটে একদিন বাজার-সওদা করি। এগুলো আমার পরিবারের এক হপ্তার খরচ পাতি। এই যে, এই ধামায় আধা মণ চাল আর এই ধামায় অন্যসব বাজার-সওদা।

ঃ সাতদিন মজুর খাটলেই এত সওদা হয়?

ঃ হয় বৈকি হুজুর। হয়ে বরং দু'এক পয়সা বেঁচেই যায় হর হপ্তা।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এই জন্যেই তো এখন আমরা মজুর খাটি হুজুর। আমাদের ঐ ফকির পাড়ার সবাই এখন মজুর খাটে।

ঃ আগে কি করতো?

ঃ ভিক্ষে করতো।

আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী উভয়েই খুব তাজ্জব হলেন। আবদুল আজিজ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—ভিক্ষে করতো? সবাই?

ঃ জি হুজুর। দশ বারো বছর আগে ঐ ফকির পাড়ার সবাই আমরা ভিক্ষুক ছিলাম। আশেপাশের গাঁয়েরও হিন্দু মুসলমান অনেক লোক ভিক্ষে করে খেতো।

ঃ চিরকাল ?

ঃ জিনা, চিরকাল নয়। তবে মাঝখানে বেশ কিছুদিন ধরেই ভিক্ষে করে খেতাম আমরা।

ঃ কেন, ভিক্ষে করে খেতেন কেন ?

ঃ কি করবো হুজুর ? বিষয় সম্পত্তি নেই, খাবো কি করে আমরা ?

ঃ এই আজ যেমন মজুর খাটছেন, এই রকম মজুর খেটে খেতেন ?

ঃ মুজুর নেয়ার লোকটা কে ছিল হুজুর, মুজুর আমরা খাটবো কোথায় ?

ঃ কেন ? আজ যেখানে খাটছেন ?

কালু ফকির হেসে বললো—কি যে বলেন হুজুর ! সেদিনের অবস্থা আর আজকের অবস্থা কি এক রকম কিছু ?

ঃ এক রকম নয় ?

ঃ জিনা। সেদিন ধু ধু করতো মাঠ ময়দান। ফসল মোটেই হতো না। যা কিছু হতো, তাতে কার ফসল জোর করেই কে তুলে নিয়ে যেতো, তার কি ঠিক ঠিকানা ছিল কিছু ? একেবারেই অরাজক অবস্থা। সে অবস্থায় কৃষিকাজ করবে কারা, আর মজুর খাটাবে কে ?

ঃ আচ্ছা !

ঃ ওদিকে আবার বাজার-বন্দরের অবস্থাও দুরবস্থা। কেনা-বেচা নেই, মাল চলাচল নেই, ব্যবসাপাতি বন্ধ। মজুর নেবে কে ?

ঃ ব্যবসাপাতি বন্ধ কেন ?

ঃ ও-ব্বাবা ! হুজুরেরা কোন্ মুলুকের লোক ? তখন মালমাত্তা নিয়ে কারো খোলা মেলাভাবে কারবার করার উপায় ছিল ? মালের সন্ধান পেলে কি আর চোর-ডাকু-লুটেরারা রাখতো সেসব মাল ? মাল-জান দু'টোই তারা নিয়ে নিতো। ব্যবসা করতে গিয়ে জান হারাতে চায় কে ?

ঃ কালু মিয়া ?

ঃ নিজেই তো আমি দেখলাম, দেশী বিদেশী লুটেরা আর মগ-ফিরিঙ্গী দস্যুরাই বাজার গঞ্জে হর ওয়াক্ত হল্লা করে বেড়াচ্ছে। ওদের ভয়ে ওখানে ক্রেতা বিক্রেতা কেউ কি গা-মেলে চলতে পারতো ?

ঃ তাই ?

ঃ সেরেফ কি ঐ টুকুই হুজুর ? নসীব গুণে কোনদিন মজুর কেউ নিলেও, মজুরী যা পাওয়া যেতো, তা দিয়ে নিজেরই এক বেলার পেটের ভাত হতো না। পোষ্যদের তো কথাই কিছু উঠে না।

ঃ কেন, মজুরী খুব কম দিতো ?

ঃ জিনা। এখনকার চেয়ে বরং কিছুটা বেশী মজুরী দিতো। কিন্তু তাহলে কি হবে ? জিনিসের যা দুর্মূল্য ছিল, তাতে তা দিয়ে পোয়াটেক চাউল কেনাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়তো। তার চেয়ে সারাদিন দূর দূরান্তে ঘুরলে আধাসের বা তারও বেশী চাউল যোগাড় হতো। শাকপাতা মিশ করে পরিবারের সবাই মুখে দিতে পারতো কিছু। মজুর খাটতে যায় কে ?

লহমা খানেক সকলেই নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর আবদুল আজিজ আবার প্রশ্ন করলেন—তাহলে ভিক্ষে করা ছেড়ে দিয়ে মজুর খাটতে এসেছেন কেন আজ ?

কালু ফকিরের চোখে আবার বিস্ময় ফুটে উঠলো। সে বললো—সেকি হুজুর ! ভিক্ষে করলে আজ অবশ্য বেশী ভিক্ষে পাওয়া যায়। দুই-আড়াই সের চাউলও দিনান্তে জুটতে পারে। কিন্তু একদিন মজুর খাটলে তা দিয়ে আজ যে অনায়াসে পাঁচ সের চাউল কেনা যায়। ভাগে-বরাতে পড়লে, সাত-আট কি দশ সেরও। দিন মান হন্যে হয়ে ঐ দুই আড়াই সেরের পেছনে আজ ছুটতে যাবে কে ?

ঃ বলেন কি ! মজুর খাটলে আজ এত পয়সা পাওয়া যায় ?

ঃ পয়সা বেশী নয় হুজুর ! আগের চেয়ে হিসাবে বরং কমই। কিন্তু জিনিস পত্রের দামতো খুব সস্তা। ঐ কম মজুরী দিয়েই আজ আগের চেয়ে কমছে কম বিশগুণে বেশী জিনিস পাওয়া যায়।

ঃ ও আচ্ছা। তা মজুর খাটতে চাইলেই এখন কাজ হররোজ পাওয়া যায় ?

ঃ পাওয়া যায় মানে ? সেকি বলছেন হুজুর ! চার দিকে তো এখন গিজ গিজ করছে কাজ। মজুর নিয়ে এখন রীতিমতো কাড়াকাড়ি করে সবাই। এ বলে আমার কাজে এসো, ও বলে আমার কাজে এসো।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ মাঠে ময়দানে এখন ঢেউ খেলছে ফসল। সরকার এদিকে নজর দেয়ায়, কৃষকেরা সবাই এখন ঝুঁকে পড়েছে ফসলের দিকে। একটুকরো জমিনও আর ফাঁকা নেই। সবাই এখন মজুর চায়। ওদিকে আবার শক্ত লাঠি পিঠে পড়ায় চোর-ডাকু সব বাপ্ বাপ্ করে পালিয়েছে। গঞ্জ-বাজার-বন্দর তেজারতির ছড়াছড়ি এখন। দেশী-বিদেশী লোকেরা চুটে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। তারাও হন্যে হয়ে কুলি মজুর তালাশ করে। কুলি মজুর ছাড়া মালপত্র চলাচল আর উঠা নামা করে কিভাবে ? এর উপর আছে আবার দুরমার সরকারী কাজ। রাস্তাঘাট হচ্ছে, বাগান-বাগিচা করছে, দিঘী পুকুর খুঁড়ছে, দালান ইমারত উঠছে, আরো কত কি ! সরকারী বেসরকারী হরেক রকম আনযাম হুজুর ! দেশে তো কেউ গরীব তেমন নেই আর ? সকলেরই সুখী-সচ্ছল অবস্থা। মজুর নেয়ার কি অভাব আছে লোকের ?

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আবদুল আজিজ একবার উমিদ আলীর মুখের দিকে তাকালেন। উমিদ আলীর দুই চোখ তখন প্রায় স্থির। কালু ফকিরের দিকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে আবদুল আজিজ পুনরায় হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা ! তাই আপনারা সবাই ভিক্ষে করা ছেড়ে দিয়েছেন ?

ঃ সবাই হুজুর, সবাই। ধর্মকর্ম করার জন্যে কেউ এখন ফকির খাওয়াতে চাইলে, দশ গাঁ খুঁজে দু'টো ফকিরও যোগাড় করা তার মুস্কিল হবে।

ঃ বহুৎ খুব ! তা মজুর খেটে দৈনিক এখন কত রোজগার করেন আপনারা?

ঃ হিসেবের দিক দিয়ে খুব বেশী পয়সা নয় হুজুর। দৈনিক একদেড় পয়সা পাই। কিন্তু পয়সার মূল্য তো এখন অনেক বেশী।

ঃ বেশী ?

ঃ এইতো, হুজুর, এক হপ্তা মজুর খেটে দশ পয়সা পেয়েছি। কিন্তু এই পয়সাই কি কম পয়সা ? দুই পয়সা এখনও খরচ করতেই পারিনি। চার পয়সায় আধা মণ চাউল কনেছি আর চার পয়সাতেই এই যে, এই ধামা ভরে বাজার সওদা করেছি।

আবদুল আজিজ সেদিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন—দেখি-দেখি, কি কি সওদা করেছেন ?

ঃ এই যে হুজুর এই আধাভাও ঘি, আধা ভাও সরিষার তেল, এক তাড়ি জ্বালানো তেল, এক ভাও দৈ, এক ঠোঙ্গা মিঠাই, সের দেড়েক গোস্ আর এইযে লবণ, আর মশ্‌লাপাতি। তরিতরকারী, পেয়াজ-মরিচ এখন ভিটেতেই হয় হুজুর, ওসব আর কিনতে হয় না। আগে তো ওসব করা যায়নি ভিটেতে !

ঃ কেন, করা যায়নি কেন ?

ঃ রাখতো কেউ ? লুট পাট করে গাছ সমেত নিয়ে যেতো। কিন্তু এখন ? সোনার জিনিস পড়ে থাকলে হাত দেয়ার সাহস কি আর আছে কোন ব্যাটার ? শাসন কাকে বলে ব্যাটারা দ্যাখ !

কালু ফকিরের চোখে মুখে তৃপ্তি ফুটে উঠলো। আবদুল আজিজ খোশ দীলে বললেন—বেশ বেশ ! শুনে খুব খুশী হলাম।

কালু ফকির মুখ তুলে হাসি মুখে বললো—সত্যি কথা বলতে কি, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের এই নবাবকে, মানে আমাদের এই সরকারকে অনেকদিন টিকিয়ে রাখে, তাহলে আমরা এই ফকিরেরাও মজুর খেটেই জমি জমা আর শক্ত-মজবুত ঘরদোরের মালিক হয়ে যাবো হুজুর। আপনারা দোআ করবেন আমাদের জন্যে।

ঃ আল হামদুলিল্লাহ। আপনারাও দোআ করবেন আপনাদের নবাব আর এই হুকুমাতের জন্যে।

কালু ফকির নড়ে চড়ে উঠে বললো—জি হুজুর, জি। তা অবশ্যই করবো। আমি এখন যাই হুজুর। বেলা একদম পড়ে এলো।

খেয়াল হতেই আবদুল আজিজও ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—ও আচ্ছা, আচ্ছা। আর একটা কথা। আপনাদের এই হাটে কি কোন বিদেশী কুঠিয়াল মাল কিনতে এসেছে ?

ঃ জিনা হুজুর। আজ কেউ আসেনি। ওরা হঠাৎ দুই এক রোজ আসে।

ঃ হঠাৎ আসে ?

ঃ জি, মাঝে মধ্যে। লবণের গাড়ী নিয়ে পাইকারী দরে লবন বিক্রি করতে আসে। কিন্তু লবণ তো ওদের ভাল নয় হুজুর, তাই বেশী পাইকার ওদের কাছে ভিড়ে না।

ঃ ওরা কি তা নিয়ে কোন জোর জুলুম করে ? কোন দুর্ব্যবহার ?

ঃ আমি তো এত খবর বলতে পারবো না হুজুর। আমি ওদিকে তেমন একটা যাই-ইনে। বাজারটা করে নিয়েই চলে আসি।

ঃ ও।

ঃ আমি এখন যাই হুজুর ?

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা, যান—

ভার নিয়ে কালু ফকির চলে গেল। আবদুল আজিজ উমিদ আলীকে প্রশ্ন করলো—কি দোস্ত, কি বুঝলে এবার ?

উমিদ আলী বিমুগ্ধ কণ্ঠে বললো—সোবহান আল্লাহ ! এত নিখুঁত খবর আগে কখনও রাখিনি। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হায়াত দারাজ করুন দোস্ত। এই হুকুমাতের এদিকটার তারিফ করতেই হবে আমাকে।

ঃ ওদিকটারও তারিফ তুমি করবে একদিন জরুর। নবাব শায়েস্তা খানকে বিলকুল কমজোর মনে করো না।

ঃ না, তা মনে করিনে। কিন্তু নবাবের সব কাজের মাথা যদি সম্রাট আগেই কেটে দেন, তাহলে সে তারিফ করার মওকা কখনো আসবে কিনা, ঐ একজনই জানেন। তবে আমি একীন দীলে প্রার্থনা করি, সে তারিফ করার মওকা যেন, রহমানুর রহিম দেন আমাদের।

ঃ আমিন ! আল্লাহ তায়ালা আরজ তোমার কবুল করুন। এবার চলো দোস্ত, বেলা সত্যিই শেষ হয়ে এসেছে। কাশিম বাজার পৌঁছতে আমাদের রাত হবে।

ঃ রাত হবে ?

ঃ ঘাবড়াইয়ে মাৎ ! খবর আগেই কাশিম বাজার পৌছে দেয়া হয়েছে। সরকারী মেহমানখানার দরওয়াজা সারারাত আমাদের জন্যে খোলা থাকবে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ আলবাত্।

কাশিম বাজারে পৌছতে তাদের রাতই হলো না, ঢের রাত হলো। এই রাত্রিকালেও রাস্তার চার পাশের যা তারা দেখলেন, তাতেও উমিদ আলী খুশী হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। কাশিম বাজার পৌছার পথে দেখলেন, বড় বড় হাট বাজারকে কেন্দ্র করে হাট বাজার থেকে বহুদূর এলাকাব্যাপী মাঠে ঘাটে ময়দানে যত্রতত্র ক্রেতা বিক্রেতা ব্যবসায়ীদের আস্তানা পড়েছে প্রচুর। মিটি মিটি আলো জ্বেলে যেখানে খুশী সেখানেই রাত কাটাচ্ছে হাট বাজার গামী লোকেরা। এক আস্তানা থেকে আর এক আস্তানার দূরত্ব অনেক এবং একের সাথে অন্যের কিছু মাত্র যোগসূত্র নেই। অন্য কথায়, লুটেরাদের ভয়ে এক সাথে জোট বেঁধে আস্তানা গাড়ার কোন গরজই কারো এদের নেই। প্রচুর অর্থের মালমাত্তা নিয়ে তিন চারজন লোকও বিরাণ ময়দানে পাক শাক ও যাপনের আনযাম করে নিয়েছে। দীলে কারো চোর ডাকু বা রাহাজান নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। এসব দৃশ্য দেখে দেখে উমিদ আলী বুঝলো, মজুর হলেও কালু ফকিরের উপলব্ধি আয়নার মতো স্বচ্ছ। বেনিয়াদের বাদ দিলে, দেশের আইন শৃঙ্খলা সত্যিই বড় মজবুত।

হাটবাজার গঞ্জ বন্দর তদন্ত করে করে আবদুল আজিজ সদলবলে পর পর কয়েকদিন কাশিম বাজারে কাটালেন। কাশিম বাজারের উপকণ্ঠে বড় একটা নদী বন্দর আছে। স্বাভাবিক বেচাকেনার অতিরিক্ত বিশেষ বিশেষ দিনে হাট বসে এই বন্দরে আর সেই হাটের দিনে এখানে তুঙ্গে উঠে বেচাকেনা। আজ সেই হাট বার, এখানের তদন্ত কাজ শেষ হলে আবদুল আজিজ হুগলীতে ফিরে যাবেন, এই সিদ্ধান্ত নিলেন।

তদন্তে নেমে আবদুল আজিজ দেখলেন, অভিযোগগুলো জারুরামাত্র অতিরঞ্জিত নয়, মিথ্যা তো নয়ই। বাজার বন্দর সর্বত্রই কুঠিয়াল দৌরাত্ম আর দুর্নীতি সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। ক্রয়-বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই তারা এদেশের ক্রেতাবিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের চরমভাবে প্রতারণা আর হয়রান পেরেশান করছে। বিদেশী বণিকেরাই বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র বিন্দু। তাই, এদের কাছে আসতেই হচ্ছে তাদের আর এদের খপ্পড়ে পড়লেই তাদের পেরেশানীর সীমাঅন্ত থাকছে না। অন্য বণিকদের বিরুদ্ধে তেমন কোন অভিযোগ নেই। থাকলেও তা নগণ্য। কিন্তু এই ইংরেজ কুঠিয়ালদের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করার

বাইরে চলে গেছে। তারা নিজেরা যে মাল কিনে, তার ন্যায্য মূল্য বিক্রেতাদের দেয় না। নগদ মূল্যও প্রায় ক্ষেত্রেই দেয় না। আংশিক মূল্য হাতে দিয়ে জোর করেই তারা বিক্রেতাদের বিদেয় করে এবং বাঁকী আদায় করতে এলে হুমকি নিয়ে তেড়ে আসে। সহজে ও সুষ্ঠুভাবে বাঁকী পরিশোধ করে না। এদেশের পণ্যের এরাই যেহেতু সর্ববৃহৎ ক্রেতা আর বেচাকেনার স্থানগুলিতে এরাই যেহেতু সংখ্যা গরিষ্ঠ ও সংঘবদ্ধ, সেইহেতু এদেশের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা এদের বিরুদ্ধে জোর কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে পারে না। ব্যবসায়ের খাতিরেও অনেকে আবার এদেরকে রুষ্ট করতে চায় না। ইংরেজ কুঠিয়ালরা এই সুযোগ তলানীতক্ কাজে লাগায়। মূল্যের দিকটা ছাড়াও বেচাকেনার সময় মাপ গণনায় কারচুপি, হাত সাফাই এমন কি ফাঁক পেলে চুরি করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না।

এর উপর আছে আবার দাদনের কারবার। বিদেশী বণিকেরা এদেশের সূতা, সিল্ক, কাপড় উৎপন্ন দ্রব্য ও নানা বিধ মূল্যবান পণ্য জাহাজ ভর্তি করে নিজ দেশে নিয়ে যায় আর আসার সময় খালি জাহাজ নিম্নমানের লবণ ও অন্যান্য ফালতু পণ্য দিয়ে ভর্তি করে নিয়ে আসে। ইংরেজ বেনিয়াদের এই কারবার বেশী করে আর লবণের কারবার তাদের অন্যতম বড় কারবার। এদেশের মাল কিনে মূল্য দেয়ার বদলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই ঐ নিম্নমানের লবণ ও নিম্নমানের মালামাল বেপারী, পাইকার এবং মাল সরবরাহকারীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মূল্য শোধ করে।

তাদের অসততার এর চেয়েও আহামরি দিকটা হলো, তাদের মালের গ্রাহক বেশী জোটে না বলে বদান্যতার সাগর সেজে তারা আংশিক মূল্য নিয়ে ঐ লবণ ও মালামাল এদেশের পাইকার ব্যবসায়ীদের কাছে হৃদ্যতার সাথে বিক্রি করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনে মূল্যে দাদন দেয়। মূল্য পরিশোধের জন্যে তারা তখন হাসি মুখে প্রশস্ত সময়ের অঙ্গিকার দান করে। অল্প বা বিনে পুঁজিতে ব্যবসা করার লোভে পাইকার-ব্যবসায়ীরাও এই টোপ গিলে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়, বাঁকী পরিশোধের সেই অঙ্গিকারকৃত সময়ের খানিকটা পার হতে না হতেই এই কুঠিয়ালরা বাঁকী আদায়ের জন্যে জুলুম শুরু করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্রেতাকে কুঠিতে ডেকে এনে মারধোর করে বাঁকী মূল্য আদায় করে। ইংরেজদের পেটুয়া কিছু এদেশীয় দালালেরা প্রলোভন, প্রতারণা ও স্তোক বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিভ্রান্ত করার ফলে, এদেশের সহজ সরল ব্যবসায়ীরা পনুঃ পুনঃ এসে এদের এই খপ্পড়ে পড়ে।

মাল দাদন ছাড়াও আছে, অর্থ দাদন। অর্থদাদনের নির্যাতনটা অধিকটাই ভোগ করে এদেশের তাঁতীরা। কাপড় সরবরাহের চুক্তিতে ইংরেজ কুঠিয়ালরা

গরীব তাঁতী ও স্বল্প পুঁজির কাপড় ব্যবসায়ীদের কিছু নগদ অর্থ দীর্ঘ মেয়াদে দাদন দেয়। কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তো কথাই নেই, মেয়াদ উত্তীর্ণ না হলেও অনেক ক্ষেত্রে কুঠিয়ালরা অমানুষিক জুলুম করে চুক্তির কাপড় আদায় করে। বিশেষ করে তাদের পণ্যবাহী জাহাজ যখন স্বদেশে যাওয়ার উদ্যোগ করে, তখন তারা হন্যে হয়ে উঠে এবং মেয়াদের কোন তোয়াক্কাই না রেখে তারা তাঁতী ও কাপড় ব্যবসায়ীদের মারপিট করে কাপড় আদায় করে। এই কিসিমের নির্যাতন ও মারপিটের ফলে অতীতে অনেকেরই প্রাণহানী হয়েছে এবং বর্তমানেও সে আশংকা আবার দেখা দিয়েছে।

কর শুল্ক আদায়ের প্রশ্ন ছাড়া, স্থানীয় প্রশাসন কুঠিয়ালদের ব্যবসা সংক্রান্ত আচরণকে তাদের এক্তিয়ার ভুক্ত বলে গণ্য করতে চায় না। ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে কুঠিয়ালরা সরকারীভাবে ছাড়প্রাপ্ত, এই অজুহাত তুলে অনেকেই কাজ এড়িয়ে চলে। কেউ কেউ আবার কুঠিয়ালদের নজরানার বিনিময়ে উদাস-উদাসীন থাকে। কুঠিয়ালদের আর আটকায় কে ?

কেনাবেচার স্থানগুলো তদন্ত করার কালে ফৌজদার আবদুল আজিজ যুগপৎ স্তম্ভিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। কুঠিয়ালদের শাসন করার ব্যাপারে তিনি কানুন সম্মত সকল পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। অধিক অপরাধে অপরাধী কয়েকজন কুঠিয়ালকে তিনি আটক করে জরিমানা আদায় করলেন। অন্যান্যদের হুমকি ধমকের মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্ত করলেন এবং ভবিষ্যতে এই সমস্ত হীনকাজ থেকে বিরত থাকার নিশ্চয়তা স্বরূপ অনেকের নিকট থেকে ওয়াদানামাও লিখে নিলেন।

অতপর তিনি স্থানীয় প্রশাসনের লোকজনদের ধরে বসলেন এবং এখানেও তিনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেন। কয়েকজন অসৎ কর্মচারীকে তখনই তিনি নকরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করলেন। উদাসীনদের নানাভাবে ধিক্কার আর ধমক দিয়ে কুঠিয়ালদের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় নসিহত দান করলেন। অবশেষে ভবিষ্যতের গাফিলতি ও দুর্নীতির শাস্তি স্বরূপ নকরীর সাথে জান দেয়ার প্রশ্নটা প্রকট করে তুলে তিনি সবাইকে হুশিয়ার করে দিলেন।

ঐ দিনেই আবদুল আজিজ তাঁর নিজের দল ও স্থানীয় প্রশাসনের লোক-লস্করসহ কাশিম বাজারের উপকণ্ঠে সেই নদী বন্দরটি তদন্ত করতে বেরুলেন। অন্য স্থানের মতো এখানেও তিনি বেসামরিক লেবাসে ও সকলের অজান্তে এসে হাজির হলেন।

বিশাল এক নদী বন্দর। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এর অবস্থান। লাখো মানুষের সমাবেশ। হরেক রকম পণ্য। কয়েকটি জাহাজ-বজরাসহ ছোটবড়

অসংখ্য নৌকা ও ব্যবসায়ী নৌবহরে নদী তীর আচ্ছন্ন। মহাজনী আড়ত আর স্থায়ী দোকানীর সারি সারি দোকান ঘর ছাড়াও বাজার জুড়ে বিরাজ করছে কেনাবেচার বেশুমার স্থায়ী ও অস্থায়ী চালাছাউনি। এর বাইরে খোলা ময়দানে পাইকারদের মাল কেনার অগণিত চাটাই (চট মাদুর বিছিয়ে মাল কিনে স্তূপীকৃত করার জায়গা)। চীৎকার, হৈ হুল্লোড় আর নানাবিধ শব্দ-আওয়াজে গম গম করছে গোটা বন্দরের বিস্তীর্ণ চত্বর।

বন্দরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে কুঠিয়ালদের ছোট বড় নানা রকম দুর্নীতির মোকাবেলা করতে করতে বিকেল বেলায় আবদুল আজিজ কাপড় পট্টিতে এলেন। এও আর এক পৃথিবী। ঘরে বাইরে সর্বত্র কেনাবেচার দুর্বার হিড়িক। তবে ঘরের চেয়ে বাইরেই এই হিড়িকটা অধিক জমজমাট। এখানেও যত্রতত্র বেশুমার চাটাই পড়েছে পাইকারের। চট-মাদুর-পাটি বিছিয়ে মাল কিনছে পাইকারেরা আর তাঁতী, কারিকর ও খুদে ব্যবসায়ীরা এদের কাছে খুচরোদরে কাপড় বিক্রি করছে। স্থানীয় দূর দূরান্তের পল্লী অঞ্চল থেকে কাপড় বেচতে এসেছে অগণিত তন্তুবায়। পাটের স্তূপের মতো প্রতিটি চাটাইয়ে কাপড়ের গাঁইটের স্তূপ জমে উঠেছে পাহাড় টিলার আকারে।

ছদ্মবেশী সেপাইয়ের দল কিঞ্চিৎ দূরে দূরে রেখে আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী কাপড়ের বাজারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদেই কতিপয় কুঠিয়ালদের কণ্ঠে বিপুল গর্জন আর অন্যান্যদের কণ্ঠে মৃদু প্রতিবাদ ও জনৈকের আর্তনাদ আবদুল আজিজ ও উমিদ আলীর মনোযোগ আকর্ষণ করলো। উমিদ আলীকে ইশারা করেই আবদুল আজিজ দ্রুত পদে সেখানে এসে হাজির হলেন। তাঁর ছদ্মবেশী সেপাই ও লোক লস্করের দলও তাঁকে অনুসরণ করে এসে একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঘটনা স্থলে এসে আবদুল আজিজ দেখলেন, চাটাই বিছানো একজন পাইকারকে একদল কুঠিয়াল পাকড়াও করার চেষ্টা করছে আর কুঠিয়ালদের কুলিরা চাটাইয়ের পাশেই গাদা করে রাখা অন্য একজনের কাপড়ের গাইট জোর করে তুলে নেয়ার উদ্যোগ করছে। এতে করে কাপড়ওয়ালা লোকটি কুলিদের সাথে হাতাহাতি করছে আর আর্তনাদ করে বলছে—দোহাই হুজুর ! সেকি হুজুর ! আমার মাল নিচ্ছেন কেন ? আমার মালের দাম কে দেবে ?

তাদের ঘিরে ধরা পাইকারটিকে দেখিয়ে দিয়ে কুঠিয়ালরা বলছে—ইয়ে বডমায়েশ ডাম ডেবে। টুম হট্ যাও–

কাপড় ওয়ালা ফের বলছে—সেকি হুজুর ! মাল নিচ্ছেন আপনারা, উনি দাম দেবেন কেন ?

কুঠিয়ালরা বলছে—ওর বাপ ডাম ডেবে। টুম ভাগো হিঁয়াছে—

কথার মাঝে কুলিরা বার বার লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে আর লোকটা অসহায়ের মতো আর্তনাদ করে চলেছে। আবদুল আজিজ লক্ষ্য করলেন, পাশের আর পাঁচজন পাইকারের চাটাইয়ের কাপড়ের স্তূপ জমে উঠেছে, কিন্তু আক্রান্ত এই পাইকারটির চাটাই বিলকুল ফাঁকা। কোন কাপড় সে এখনও কিনেনি বা কিনতে হয়তো পারেনি। সেই সাথে আবদুল আজিজ আরো লক্ষ্য করলেন, আক্রান্ত পাইকারটি একজন সৌম্যদর্শন মুরুব্বী। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, তিনি একজন পরহেজগার আদমী। তাঁকে নিয়ে কুঠিয়ালরা ধস্তাধস্তি করছে, পাশেই আর একজন কুলিদের ধাক্কা খাচ্ছে, অথচ চার পাশের পাইকার ও বিক্রেতারা মৃদু আফসোস করা ছাড়া প্রতিবাদী হয়ে কেউ এগিয়ে আসছে না।

দাঁড়িয়ে থেকে নিমেষ কয়েক এ দৃশ্য দেখার পর আবদুল আজিজ কুঠিয়ালদের লক্ষ্য করে বললেন—আরে এই-এই, কেয়া হুয়া ? এই মুরুব্বী লোকটাকে নিয়ে তোমরা এত টানা হেঁচড়া করছো কেন ? ঐ লোকটারই বা মাল কেড়ে নিচ্ছো কেন ?

কুঠিয়ালরা তাঁর কথায় কর্ণপাতই করলো না। তারা আরো জোরে শোরে পাইকারটিকে পাকড়াও করতে উদ্যত হলো। আবদুল আজিজ গর্জে উঠে বললেন—খবরদার !

এতক্ষণে কুঠিয়ালরা নজর দিলো তাঁর দিকে। কুঠিয়ালদের দলপতি ব্যক্তিটি বিরক্তির সাথে বললো—হোয়াইট ! টুম কোন্ হো ?

আবদুল আজিজ শক্ত কণ্ঠে বললেন—আমি যে-ই হই, তোমরা ওঁকে ধরছো কেন ?

দলপতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে চোখ গরম করে বললো—কেয়া কাহা ? টাহার জবাব টোমাকে ডিটে হোবে ?

ঃ আলবাত দিতে হবে। ঐ লোকটাকে পাকড়াও করছো কেন তোমরা ?

ঃ দ্যাট ইজ আওয়ার উইশ্। হামাডের খোশ হইয়াছে পাকড়াও করিটেছে।

ঃ খোশ হইয়াছে, পাকড়াও করিটেছে ? এত খোশ্ তোমাদের ?

ঃ টবেরে নাডান, ফের ডিষ্টার্ব করিবে টো টোমাকে ভি পাকড়াও করিবে। গেট্ আউট ! ভাগ্ যাও হিয়াছে—

আবদুল আজিজ ফেটে পড়লেন। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন—খামুশ ইবলিছ কা বাচ্চা ! কেন তাকে ধরছো, তার জবাব না দিয়ে ফের ওঁর গায়ে হাত দিলে, তোমাদের হাত আমি ভেংগে দেবো।

এ কথায় দলপতি সহকারে কুঠিয়ালরা সবাই ক্রোধে লাফিয়ে উঠলো। দলপতি চীৎকার করে হুকুম দিলো—ক্যাচ হিম্ ! পাকড়ো উস্ক স্কাউন্ড্রেল কো—

কয়েকজন কুঠিয়াল সক্রোধে আবদুল আজিজের দিকে অগ্রসর হতেই আবদুল আজিজ তাঁর ছদ্মবেশী সেপাইদের ইশারা দিলেন। উমিদ আলী তার আগেই গাত্রাবরণের তলে থেকে তলোয়ার টেনে বের করলো। ইশারা পেয়েই সেপাইরাও তলোয়ার টেনে নিয়ে মার মার রবে কুঠিয়ালদের ঘিরে ফেললো। অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতো এত লোকের হাতে মুক্ত তলোয়ার দেখে কুঠিয়ালরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কুঠিয়ালদের কুলিরা এতক্ষণ মাল রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের বাদ-প্রতিবাদ শুনছিল। এবার তারা "ওরে বাপ্‌রে" বলে আতকে উঠে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল। আবদুল আজিজ তাঁর সেপাইদের হুকুম দিয়ে বললেন—ঐ বদমায়েশদের সব ক'টাকে বেঁধে ফেলো। ওদের ঐ আচরণের যোগ্য কারণ না থাকলে, ওদের আমি পঙ্গু করে ছেড়ে দেবো।

সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরা হুকুম তামিল করলো। তারা কুঠিয়ালদের সবাইকে পাকড়াও করে পিঠ মোড়া দিয়ে বেঁধে ফেললো। চারদিকে এতে করে হুলুস্থুল পড়ে গেল। কিছু লোক ইতিমধ্যেই আওয়াজ তুললো—সেপাই-সেপাই, নবাবের সেপাই—

অন্য একজন বলে উঠলো—একি ! এতো আমাদের ফৌজদার হুজুর ! হুগলীর ফৌজদার হুজুর ! ঠিক হয়েছে-ঠিক হয়েছে। এবার ব্যাটারা দ্যাখ্ ঠ্যালা !

এসব কথা কানে পড়তেই কুঠিয়ালরা অত্যন্ত ভীত হয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। তারা বুঝে নিলো, আর কিছু না হলেও গারদে তাদের পচতে হবে নির্ঘাত। কুঠিয়ালদের দলপতির প্রতি ইংগিত করে আবদুল আজিজ তাঁর সেপাইদের বললেন—ঐ শয়তানটাকে এখানে নিয়ে এসো—

দলপতিকে টেনে আবদুল আজিজের সামনে এনে দাঁড় করানো হলে, আবদুল আজিজ ফের সেপাইদের বললেন—এর হাতের বাঁধন খুলে দাও—

হাতের বাঁধন খুলে দিতেই দলপতিটি হুড়মুড় করে আবদুল আজিজের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গেল এবং দুইহাত জোড় করে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলো—গল্‌টি হইয়াছে হুজুর-জব্বোর গল্‌টি হইয়াছে। হামরা হাপনাকে চিনিটে পারে নাই। হামরা অনুটাপ করিটেছে। কাইণ্ডলী হামাডের মাফ করিয়ে ডিন !

আবদুল আজিজ তিক্ত কণ্ঠে বললেন—বটে !

ঃ এয়সা কাম কভ্‌ভি আওর করিবে না হুজুর। নেভার-নেভার। বাই দি নেম অফ গড্ আইমিন, ঈশ্বরের নামে হামরা শপট্ করিটেছে। হামাডের ছাড়িয়া ডিন—

আবদুল আজিজ ধমক দিয়ে বললেন—থামো ! ছেড়ে দেয়া না দেয়া বিচার সাপেক্ষ ব্যাপার। আগে ঘটনাটা কি দেখি—

বলেই তিনি পাশে দণ্ডায়মান ঐ আক্রান্ত পাইকারটিকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনিও এদিকে আসুন—

আচানকভাবে এই মদদ আসায় পাইকারটি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। নিকটে এসে তিনি কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন—হুজুর—

আবদুল আজিজ বললেন—কি ঘটনা বলুন। এই কুঠিয়ালরা আপনার উপর চড়াও হলো কেন?

পাইকারটি নত মস্তকে বললেন—হুজুর, এরা আমার কাছে মাল পাবে।

ঃ মাল পাবে মানে?

ঃ এরা আমাকে দাদনে লবণ দিয়েছে হুজুর। বিনিময়ে আমাকে কাপড় দিতে হবে। কাপড় দিতে পারিনি বলে এরা আমার উপর জুলুম শুরু করেছে, যদিও এ জুলুম তাদের ন্যায্য নয়।

ঃ কেন, ন্যায্য নয় কেন? কাপড় তো আপনি দেননি?

ঃ কি করে দেবো হুজুর! লবণ যে বিক্রি হয়নি। ঐ দেখুন, লবণের গাড়ী আমার ঐভাবেই পড়ে আছে।

আবদুল আজিজ দেখলেন, অদূরে লবণের বস্তাভর্তি একটি গরুর গাড়ী নামিয়ে রাখা। তা দেখে আবদুল আজিজ বললেন—লবণ বিক্রি হয়নি?

ঃ জিনা হুজুর। মহাজনেরা কেউ এ হাটে এ লবণ কিনলেন না। তাঁরা বললেন, বর্তমানে দেশী লবণের আমদানী আছে খুব। দেশী লবণ পেতে আর ক্ষুদে দোকানীরা কোম্পানীর লবণ নেয় না। দুই হাট পরে আনলে এ লবণ তাঁরা নেবেন বলে মহাজনেরা জানিয়েছেন।

ঃ আচ্ছা। তা লবণ যখন বিক্রি হবে তখন আপনি কাপড় দেবেন এদের, এই চুক্তি কি ছিল?

ঃ জিনা হুজুর, তা নেই। তবে কাপড় দেয়ার যে মেয়াদ চুক্তিতে আছে, অর্থাৎ যতদিনের মধ্যে আমাকে কাপড় দিতে হবে, সে সময়ের অর্ধেকটাই তো পার হয়নি হুজুর। আরো দেড় মাহিনা পর আমার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এই দেড় মাহিনার মধ্যেও যদি লবণ বিক্রি না হয়, তখন যেখান থেকেই পারি, এদের চুক্তির কাপড় আমি অবশ্যই শোধ করবো। কিন্তু আজই এরা সেজন্যে জুলুম শুরু করেছে।

আবদুল আজিজ এবার কুঠিয়ালদের দলপতিকে প্রশ্ন করলেন—ঘটনা কি সত্য? চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়নি?

দলপতিটি আমতা আমতা করে বললো—হাঁ, সট্য আছে হুজুর!

ঃ তাহলে আজই এসে তোমরা জুলুম শুরু করেছো কেন?

ঃ হামাডের কাপড়ের শিপ, আইমিন জাহাজ, আখুন ইংল্যান্ডে চলিয়া যাইটেছে। হামরা আখুন কাপড় চায়। ইস্ লিয়ে হামরা উহাকে টাকিড ডিলো। উও আডমী বলিল, আজ হাটে হামাডের কাপড় ডেবে। লেকেন, আখুন না করিটেছে।

আবদুল আজিজ জিজ্ঞাসুনেত্রে পাইকারটির দিকে চাইলে পাইকারটি বললেন—জিনা, কথাটা ঠিক এ রকম নয় হুজুর। তাদের আমি বলেছিলাম, পারলে আমি এ হাটেই তাদের চুক্তির কাপড় দিয়ে দেবো, না পারলে নয়। আজকে আমি দেবোই, এমন ওয়াদা করিনি।

আবদুল আজিজ বললেন—তা এ হাটে দিতে পারলেন না কেন? ঐ লবণ বিক্রি হওয়ার উপর ভরসা করেই এদের সে আশ্বাস দিয়েছিলেন?

ঃ জি হুজুর, এটাও একটা দিক বটে। তবে এটা ছাড়াও আর একজনের নিকট থেকে আজ আমার টাকা পাওয়ার ধরাবাঁধা কথা ছিল।

ঃ কি রকম?

ঃ আমার মতো সেও একজন লবণের দাদন নেয়া ব্যবসায়ী হুজুর। তার কাপড় দেয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সে বিপদে পড়ে আমার কাছে টাকা ধার নিয়েছে আর এই কুঠিয়ালদের চুক্তির কাপড় শোধ করে দিয়েছে। তার লবণও গড়িয়ে গড়িয়ে এসে এই গত হাটে বিক্রি হয়েছে, কিন্তু সে টাকা পায়নি। এই হাটে মহাজন তাকে টাকা দেবে, ওয়াদা করা কথা। সে টাকা পেলেই আমার দেনা শোধ করবে, এই ভরসাতেও আমি এদের কাপড় দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নন্দলাল, মানে সেই টাকা ধার নেয়া ব্যবসায়ীটি টাকা নিয়ে এখনও এলো না। সে এলে আজই আমি এদের চুক্তির কাপড় শোধ করে দিতে পারতাম।

ঃ আচ্ছা। তাহলে তো এদের এই জুলুম করা নিতান্তই অন্যায়।

—বলেই আবদুল আজিজ কুঠিয়ালদের দলপতির দিকে নজর ফিরিয়ে বললেন—এ অবস্থায় তোমরা এঁর উপর জুলুম করতে গেলে কেন?

জবাবে দলপতি বললো—জুলুম টো ফর নাথিং করে নাই হুজুর। হামাডের ডেয়ার জন্যে এ আডমী কাপড় আনিয়াছে, লেকেন আভি ডিটেছে না।

ঃ কাপড় এনেছে মানে! কি ব্যাপার?

জবাবে পাইকারটি বললেন—এটাও ঠিক কথা নয় হুজুর।

আবদুল আজিজ বললেন—নয়?

অদূরে দণ্ডায়মান সেই কাপড়ওয়ালা ব্যক্তিটির প্রতি ইংগিত করে পাইকারটি বললেন—ঐ হারাধন দাস একজন কাপড়ের বেপারী হুজুর। ছোট ব্যবসায়ী। ওকে আমি এই মর্মে কাপড় আনতে বলেছিলাম যে, আমি দাম

দিতে পারলে তার এ হাটের সব কাপড় আমিই নিয়ে নেবো। দাম দিতে না পারলে সে অন্যত্র নগদ দামে বেচবে। সেই মোতাবেক সে কাপড় নিয়ে আমার কাছে জানতে এসেছে নগদ দামে আমি তার কাপড় নিতে সক্ষম কিনা। আমি দাম দিতে পারছিনে। সে এখন অন্যত্র নগদ দামে বিক্রি করবে। অথচ জুলুমটা দেখুন, আমার কাছে কাপড় আনা দেখেই সেগুলো তারা জোর করে তুলে নিতে শুরু করেছে।

কুঠিয়ালদের দলপতির দিকে চেয়ে আবদুল আজিজ রোষ ভরে বললেন—তাজ্জব ! তোমরা তা করতে গেলে কেন ? এ বেচারা দাম দিতে পারছে না দেখেও তোমরা অন্যের কাপড় জোর করে তুলে নিতে চাও কোন্ সাহসে ? অরাজকতা পেয়েছো ?

দলপতি কুঠিয়াল এবার জোরদার কণ্ঠে বললো—অন্যের কাপড় না আছে হুজুর। ডাম ডিয়া ডিলে ও কাপড় জরুর উহার হোবে। ও ডাম ডেবে না কেন ?

আবদুল আজিজ বললেন—টাকা না থাকলে দাম দেবেন কোত্থেকে ?

দুই চোখ বিস্ফারিত করে দলপতি বললো—ও মাই গড্ ! টংকা ঠাকিলনা মানে ? উহার কাছে বিস্তর টংকা আছে।

ঃ টংকা আছে !

ঃ আলবট্ হুজুর। ঠোড়া টাইম আগারী এক আডমী আসিয়া উহাকে বিস্তর টংকা ডিয়া গেলো। হামি ডেখিয়াছে। টংকা নেই, ইয়ে বাট্ ঠিক নেহি।

ঃ সেকি !

ঃ উহার টহবিল চেক করিয়া দেখুন হুজুর। ওহি টংকা হারাধনকে ডিলে হারাধন মালের ডাম পায়, হামরা ভি হামাডের চুক্তির ক্লথ পায়।

আবদুল আজিজের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। তিনি পাইকারটিকে প্রশ্ন করলেন—এ কথা কি সত্য ?

পাইকারটির মাথা কিছুটা নত হলো। তিনি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—জি হুজুর, সত্য।

ঃ সেকি ! তাহলে আপনি ঐ হারাধনের কাপড়ের দাম দিতে পারলেন না কেন ?

ঃ এ টাকা খরচ করার টাকা নয় হুজুর।

ঃ খরচ করার টাকা নয় ?

ঃ জিনা। এ টাকা খরচ করার মওকা আমার নেই। এ টাকার দিকে চেয়ে আমি কুঠিয়ালদের মাল দিতে চাইনি।

ঃ তার মানে ! ও টাকা আপনার নয় ?

ঃ আমারই হুজুর। তবে বিশেষ এক কাজে নিয়াতে এ টাকা আমি অন্য

খান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। সেই কাজে ছাড়া অন্য কোন খাতেই এ টাকা আমি খরচ করতে পারিনে।

ঃ কুঠিয়ালদের হাতে অপদস্থ হওয়া সত্ত্বেও পারেন না ?

ঃ ওরা আমাকে কেটে ফেললেও আমি তা পারিনে।

ঃ ওরা জোর করে নিয়ে নিতো যদি ?

ঃ তা ওরা নেবে কেন ? চুক্তির মেয়াদ তো শেষ হয়নি যে, এর চেয়ে হাজার গুণে আমার দুর্নিবার প্রয়োজন থাকলেও, ওদের চাহিদাই আগে পূরণ করতে হবে ? এ নিয়েই তো ওদের সাথে কলহ হচ্ছে আমার ?

ঃ ওরা তো নিতেই উদ্যত হয়েছিল। ওরা যদি নিয়েই নিতো ?

ঃ তাহলে আর যা-ই হোক, আমার বিবেকের কাছে দায়ী হতে হতো না আমাকে। লুটেরারা লুট করলে আমার কি করার থাকে ?

ঃ বলেন কি !

ঃ আমি আমার নিয়াত ভেংগে ঈমান খোয়াতে পারিনে হুজুর। এ নিয়ে আর প্রশ্ন করলে আমার কোন জবাব নেই।

ঃ তাজ্জব ! নাম কি আপনার ?

ঃ আমার নাম আজিম উদ্দীন হুজুর, আজিম উদ্দীন শাহ।

ঃ মকান ?

ঃ এখান থেকে অল্প এক দূরে এক গাঁয়ে।

ঃ কি করেন আপনি ? এই ব্যবসাই হররোজ করেন ?

ঃ হররোজ আমি করিনে হুজুর। আমার ছেলেই এটা করে। আমি মাঝে মাঝে করি।

ঃ মাঝে মাঝে করেন ?

ঃ জি। ছেলে যখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে তখন এ ব্যবসা আমাকেই চালাতে হয়। অবশ্য শুক্রবার বাদ দিয়ে।

ঃ শুক্রবার বাদ দিয়ে ? কি করেন আপনি শুক্রবারে ?

ঃ আমি একটা মসজিদে ইমামতি করি হুজুর।

আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী দুইজনই চমকে গেলেন। উমিদ আলী এবার অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন—ইমাম !

আজিম উদ্দীন শাহ বললেন—জি হুজুর, লোকে তাই বলে আমাকে। আমি শুধু শুক্রবারের জুমআর নামাজটাই পড়াই। ওয়াক্তিয়া নামাজগুলো অন্যজন পড়ান।

আবদুল আজিজ বিপুল বিস্ময়ে বললেন—আপনি তাহলে এসব কাজে এসেছেন কেন ? এসব না-ফরমান আর ঝুটা পরিবেশের মধ্যে আসা কি আপনার ঠিক হয়েছে ?

ঃ নিজে সাচ্চা থাকলে কোন না-ফরমানীই কাউকে স্পর্শ করতে পারে না হুজুর।

ঃ তবু ইমামতি করেন আপনি, এসব কি আপনি না করলেই পারেন না ?

আজিম উদ্দীন শাহ ম্লান হেসে বললেন—হুজুর, পেটতো আছে সবারই। ইমামতি কোন পেশা নয় যে, সেখান থেকে পয়সা আসবে। পেট চালানোর জন্যে পয়সা রোজগারের কাজ তো একটা করতেই হবে সবাইকে।

ঃ কিন্তু—

ঃ তেজারতি করা তো উত্তম কাজ হুজুর। মাল কিনে মাল বেচার কারবার ভাল কারবার। আসলে সবই ঈমানের ব্যাপার। ঈমান না খোয়ালে কোন কাজই দোষের নয়।

ঃ তবু এইসব জিল্লতি—

ঃ নসীবের দোষে আজকেই এই জিল্লতিতে পড়েছি হুজুর। নইলে আল্লাহর রহমে কোন রকম গজব-বালাই ইতিপূর্বে আর আসেনি। আল্লাহ কাকে কখন কিভাবে পরীক্ষা করেন—

ঃ ইমাম সাহেব—

ঃ আজও হয়তো এ জিল্লতি হতো না। লবণ বিক্রি না হোক, আশ্বাস যখন কুঠিয়ালদের দিয়েই ছিলাম একটা, নন্দলাল তার হাওলাতি টাকা দিয়ে গেলেই এদের পাওনাটা মিটিয়ে দিতাম। এসব কোনই ফ্যাসাদ হতো না। কিন্তু সেই নন্দলালটাই শেষ পর্যন্ত আর এলো না। হয়তো, মহাজন তাকে আজও—

আজিমুদ্দীন শাহ মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না। ইতিমধ্যেই নন্দলাল ছুটতে ছুটতে এসে বললো—দেরী হয়ে গেল শাহ সাহেব। মহাজন টাকা দিতে বিস্তর দেরী করলো। আমি খুব লজ্জিত। এই নিন আপনার সেই টাকা।

এক পলকে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। হারাধন দাস তার কাপড়ের দাম পেলো, কুঠিয়ালরাও পেলো তাদের চুক্তির কাপড়। আবদুল আজিজ নিজে উদ্যোগ নিয়ে সকলের লেনদেন মিটিয়ে দিলেন। সেই সাথে আবদুল আজিজ কুঠিয়ালদের কিছুক্ষণ দস্তুর মতো ধমকালেন। অতপর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তারা ভবিষ্যতে এই ধরনের আচরণ আর কারো সাথেই করবে না, এই মর্মে ওয়াদাপত্র লিখে দিলে, আবদুল আজিজ তাদের রেহাই দিয়ে চলে গেলেন। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত আজিম উদ্দীন শাহ কায়মনো প্রাণে আবদুল আজিজদের ভালাই কামনা করতে লাগলেন।

কাপড় পট্টি থেকে বেরিয়ে আবদুল আজিজ সদলবলে নদীর তীরে চলে এলেন। এখানেও অল্প-বিস্তর কেনাবেচা চলছে। তবে কেনাবেচার চেয়ে নৌকায় আর জাহাজ-বজরায় মাল তোলার হুটপিটই এখানে বেশী। অসংখ্য কুলি-কামিন আর ব্যবসায়ীদের লোক-জন মাল নিয়ে হুলুস্থুল টানাটানি ও ছুটোছুটি করছে। পাশাপাশি অগণিত নৌকা যোগে আগত ও বিদায়ী হাটুরেরা অবিরাম নৌকা থেকে নামছে আর উঠছে। যাত্রীবাহী নৌকা-পান্সীর মাঝিরা যাত্রী ধরার উদ্দেশ্যে নানা কায়দায় এস্তার ডাক হাঁক করছে আর কাকে ঠেলে কে আগে তীরে ভেড়াবে নৌকা, তারই প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। কেনাবেচা শেষ হলো বা যাত্রীর নাও ফুরিয়ে গেল—এই আতংকে তীরবর্তী লোকেরাও হন্যে হয়ে সামনে পিছে ছুটছে। যেন ভূতের বাপের ফয়তায় ভূতুরে তৎপরতা। বিরাম নেই কারো। যেন মানুষেরা মানুষ নয়, চাবি আটা কল। চাবির পাকের পেরেশানীতে ছটপট করছে সবাই। জটলা করে হেথা হোথা বসে আছে যারা, তারাও স্থির নেই। সমানে হাত-পা ছুড়ে রাজা-উজির মারছে। অজ্ঞাত আক্রোশে কেউ বা বসে ফুঁশছে, কেউবা হঠাৎ বিকট শব্দে হেসে উঠে অন্যের কলিজা কমজোর করে দিচ্ছে।

বেত্তমার মানুষের ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে আবদুল আজিজ দল নিয়ে নদীর তীর বরাবর সামনে এগুতে লাগলেন। অপেক্ষাকৃত কিছুটা ফাঁকা জায়গায় এসে তিনি দাঁড়াতেই এক ব্যক্তি ছুটে এসে সরবে বলে উঠলেন—আদাব জনাব আদাব ! আপনি এখানে ? অনেকক্ষণ ধরে আমি আপনারই তালাশ করছি।

চোখ তুলে চেয়েই আবদুল আজিজ খোশ দীলে বললেন—আরে পোদ্দার বাবু যে ! আপনি ? মাল নিয়ে এসেছেন বুঝি ?

ইনি কেষ্টলাল পোদ্দার। ডেভিড স্মিথের সেই "কেষ্টার ওয়েল পাউডার বা পাড্ডার বাবু।" ব্যবসায়ী লোক। বেশ কিছুটা দানাদার ব্যক্তি। ফৌজদার আবদুল আজিজের সবিশেষ চেনাজানা মানুষ। জবাবে পোদ্দার বাবু বললেন—জিনা জনাব, মাল নিয়ে আসিনি। আমি এখানে এসেছি এক বিয়েতে।

ঃ বিয়ে ? কোথায় সে বিয়ে বাড়ী ?

ঃ এই তো জনাব, এই নদীর অল্প একটু ভাটিতে এক গাঁয়ে।

ঃ ও-আচ্ছা। তা আমাকে তালাশ করছিলেন মানে ? আমি এখানে এসেছি, আপনি কি করে জানলেন ?

কেষ্টলাল পোদ্দার হাসি মুখে বললেন—কি যে বলেন জনাব ! জনাবের তারিফে গোটা বন্দর এখন গরম আর আমি তা জানতে পারবো না ? আপনার নাম তো এখন সকলের মুখে মুখে।

আবদুল আজিজও ঈষৎ হেসে বললেন—তাই নাকি ?

ঃ জি জনাব। বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলটা জব্বোর খুশী। সবাই তারা বলছে, এই রকম শক্ত শক্ত ধাক্কা যদি ঐ বদমায়েশ কুঠিয়ালরা মাঝে মাঝেই পেতো, তাহলে ব্যাটাদের তামাম বদমায়েশী আপছে আপ্ চুটে যেতো আর ব্যবসায়ীরাও ব্যবসা করে আরাম পেতো।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এক ঠ্যালাতেই এই বন্দরের তামাম কুঠিয়াল খামুশ হয়ে গেছে। গায়ে ধাক্কা লাগলেও তারা এখন মাথা তুলে চাইছে না।

ঃ মাথা তোলার মওকা তাদের আর দেয়া হবে না। এমন এলেম এখন তাদের মাঝে মধ্যেই দেয়া হবে।

ঃ জি জনাব। তাহলে বড়ই উপকার হয় এদেশের ব্যবসায়ীদের। এই এক ঠ্যালাতেই বেশ কিছুদিন চলবে। এরপর বেশী নয়, বছরে বার দুইয়েক এমনইভাবে তাড়া খেলে, দাপট ওদের বিলকুল পানি হয়ে যাবে।

ঃ আপনারা পেরেশান হবেন না। সে ব্যবস্থা করার কোশেশ আমরা অবশ্যই করবো। ওদের বাড়াবাড়ি আর বরদাস্ত করা হবে না।

ঃ বড়ই খোশ খবর। এই সাথে ওদের পা-চাটা দালালদের দাপটটাও যদি কমানো যেতো খানিক, তাহলে একদম সোনায় সোহাগা হয়ে যেতো।

ঃ দালাল ?

ঃ জি-জি, দালাল। কুঠিয়ালদের উচ্ছিষ্ট ভোগী দালাল। ওরাই তো কুঠিয়ালদের ডান হাত। ওরাই তোয়াজ করে করে কুঠিয়ালদের সাহস আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঃ হ্যাঁ, এ আভাসও পাচ্ছি কিছু।

ঃ পেঁচার চেয়ে চামচিকের লাফ বেশী জনাব। পেঁচা তো গর্তে বসে কুমতলব আঁটে। কিন্তু এরা সর্বত্র অবিরাম লাথি ছুড়ে বেড়ায়। কুঠিয়ালরা লোকজনদের যতটা জ্বালাচ্ছে, ওদের চারপাশে বেড়ার মতো দাঁড়িয়ে থেকে এবং লেলিয়ে দেয়া কুকুরের মতো গ্রাম গঞ্জ ঘুরে ঘুরে ঐ দালালেরা তার চেয়ে কম জ্বালানো জ্বালাচ্ছে না !

ঃ পোদ্দার বাবু !

ঃ প্রতিকার না থাকায় অনেকেই বাধ্য হয়ে এই দালালদের মন যুগিয়ে চলেছে। বাঘ ঠেকানোর জন্যে ফেউ এর পূজা আর কি !

ঃ বলেন কি !

ঃ এমনই এক ফেউ এর পূজা আমরাও করতে বসেছি জনাব। এমনই এক ফেউয়ের হাতে আমরা একজন জান দেয়ার পরও সেই ফেউয়ের খপ্পর

থেকে মুক্তি আজও পেলাম না। বোধ হয় আবার জোরেশোরেই তার খপ্পড়ে পড়ে গেলাম।

কেষ্টলাল পোদ্দার একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেললেন। তা দেখে আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে বললেন—তার মানে ?

ঃ ঐ যে হুজুর বললাম, আমি এক বিয়েতে এসেছি ? আমার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে। এখন এসে দেখছি, মেয়ের বিয়েতো নয়, ঐ বদমায়েশ ফেউটারই চক্রান্তের ফের শিকার হয়েছি আমরা।

আবদুল আজিজ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—আসুন-আসুন, একটু ফাঁকে আসুন। ঘটনা কি শুনিতো—

কেষ্টলাল পোদ্দারকে সঙ্গে নিয়ে আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী আরো একটু ফাঁকে এসে দাঁড়ালেন। আবদুল আজিজ ফের বললেন—কি ঘটনা বলুন তো—

জবাবে কেষ্টলাল বললেন—রঘুনাথ পোদ্দারের কথা কি কিছু কানে পড়েছে জনাব ? সেই যে কুঠিয়ালরা যাকে কুঠিতে নিয়ে গিয়ে খুন করলো ?

আবদুল আজিজ সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, পড়েছে-পড়েছে। উড়ো উড়োভাবে তাঁর কথাটা মাঝে মাঝেই শুনি। আমি তো দেখিনি। নকরী নিয়ে এই এলাকায় আমি তখন আসিওনি। এখানে আসার পর কিছু কিছু শুনতে পাই কথাটা।

ঃ কতটা শুনেছেন জনাব ?

ঃ শুনেছি, আপনারই নাকি কি রকম এক রিস্তেদার হতেন ঐ রঘুনাথ পোদ্দার। কুঠিয়ালরা তাঁকে খুন করায় আপনি নাকি সে জন্যে কুঠিয়ালদের উপর অত্যন্ত নাখোশ আছেন, আর ওদের আপনি মনে প্রাণে ঘৃণা করেন।

ঃ জি জনাব, এটা ঠিকই শুনেছেন। তবে কিভাবে রঘুনাথ খুন হলো, তাকি কিছু শুনেছেন ?

ঃ না, সব কথা শুনার মওকা হয়নি। শুধু শুনেছি, দেনাপাওনার কি এক ব্যাপার নিয়ে লোকটাকে কুঠিয়ালরা খুন করে। খুনের ঘটনাটা প্রশাসনের কানে কেউ দেয় না বা বাদীও কেউ হয় না বলে ও ঘটনা ঐ ভাবেই চাপা পড়ে। মানে, বাদী বিবাদী নিজেরাই মিটমাট করে নেয়।

ঃ হ্যাঁ, মোখতাছার ঘটনাটা ঐ রকমই।

ঃ আচ্ছা। তা এ কথা তুললেন কেন ?

ঃ ঐ রঘুনাথ পোদ্দারের মেয়ের বিয়েতেই আমি এসেছি জনাব।

ঃ এ্যাঁ ! তাই নাকি ?

ঃ জি ! রঘুনাথ আমার জ্ঞাতি ভাই। আমরা সমবয়সী। উভয়ের মধ্যে আমাদের প্রীতিও ছিল খুব। বিধবা বৌদি নাছোড় বান্দা হওয়ায়, এ বিয়ের

তদারকিটা আমাকেই করতে হচ্ছে। এখন এসে খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি, ঘুরে ফিরে ঐ ফেউটারই মন যোগাতে বসেছি আমরা।

আবদুল আজিজ অত্যন্ত আগ্রহভরে বললেন—ব্যাপারটা কি বলুন তো ! কে ঐ ফেউ আর রঘুনাথের খুন হওয়ার ঘটনাটাই বা কি ?

ঃ ফেউটার নাম অনন্তরাম জনাব। এই অঞ্চলের ধুরন্ধর এক দালাল।

অতপর কেষ্টলাল পোদ্দার সে কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন—

রঘুনাথ পোদ্দার একজন ক্ষুদ্র বস্ত্রব্যবসায়ী। তার নিজেরও তাঁতের ব্যবসা ছিল, অন্যের বুনানো কাপড়ও সে ঘুরে ঘুরে কিনতো। এরপর সমস্ত কাপড় এনে কুঠিয়ালদের কাছে বিক্রয় করতো। এতে তার মোটামুটি ভাল লাভ হতো আর স্ত্রী পরিবার নিয়ে সুখেই তার দিন কেটে যেতো। এরপরেই তার পিছু নিলো কুঠিয়ালদের দালাল ঐ অনন্তরাম। ব্যবসা জোরদার করে অধিক লাভের লোভ মোহ দেখিয়ে সে অল্প পুঁজির রঘুনাথকে কোম্পানীর দাদন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলো এবং শেষ পর্যন্ত ফুসলিয়ে এনে রঘুনাথকে কুঠিয়ালদের অর্থ দাদন গ্রহণ করালো। এ পর্যন্ত সংঘাত কিছু ছিল না। দাদন নেয়ায় রঘুনাথের তেজারতি অনেকখানি জোরদার হলো এবং লাভের অংকটাও কিছু পরিমাণ বেড়ে গেল। এরপরেই এসে পড়লো ঐ অনন্তরামের থাবা। সে ঐ লাভের অংশ দাবী করে বসলো। অন্যায় দাবী হলেও, অনন্তরামকে খুশী রাখার জন্যে রঘুনাথ মাঝে মাঝেই তাকে কিছু অর্থ দিতে লাগলো। যতই পেতে লাগলো, অনন্তরামের লালচ ততই বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে এমন অংক দাবী করে বসলো যে, তা পূরণ করতে গেলে রঘুনাথের লাভ তো কিছু থাকেই না, বরং পুঁজিতে হাত পড়ে। দেখে শুনে বিরক্ত হয়ে সে অনন্তরামকে টাকা দিতে অস্বীকার করলো এবং একদিন অনন্তরামকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলো, সে দাদন নিয়েছে কুঠিয়ালদের নিকট থেকে, অনন্তরামের নিকট থেকে নয়। অনন্তরামকে সে আর একটা পয়সাও দেবে না।

ব্যস্ ! শুরু হলো দুশমনী। রঘুনাথের নিকট থেকে আর একটা পয়সাও না পেয়ে ক্ষিপ্ত অনন্তরাম রঘুনাথকে ঘায়েল করার মওকা খুঁজতে লাগলো। মওকাটাও অতি সত্বর এসে গেল। নসীবের দোষেই হোক আর অনন্তরামের কারসাজিতেই হোক, মাঝি মাল্লাদের নিদারুণ অবহেলার কারণে রঘুনাথের মাল ভর্তি ব্যবসায়ী নৌকা একদিন মাঝ দরিয়ায় তলিয়ে গেল। রঘুনাথ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল।

এই ধাক্কার পর হাতড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে কোন মতে আবার সে নতুন করে ব্যবসা করার উদ্যোগ করতেই তার দাদনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। শুরু

হলো কুঠিয়ালদের জুলুম। তার দুরবস্থার কথা শুনে কুঠিয়ালরা যদিও বা কিছুটা নরম হতে পারতো, অনন্তরামের প্ররোচনায় তারা আর তা হলো না। অনন্তরাম কুঠিয়ালদের বুঝালো, সবই রঘুনাথের চালাকি ! ভরাডুবি আদৌ তার হয়নি। দু'খানা ছেঁড়া নেকড়া নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সে এই ভরাডুবির কাহিনী খাড়া করেছে। অনন্তরাম গোপনে সন্ধান নিয়ে তার সব চাতুরী ধরে ফেলেছে। রঘুনাথের আসল উদ্দেশ্য, কোম্পানীর দাদন মেরে দেয়া।

ওষুধ ধরে গেল। কোম্পানীর প্রতিনিধি ভিনসেন্ট তখন সেখানে উপস্থিত। সব কথা শুনে সে কুঠিয়ালদের বললো—কোম্পানীর টাকা জরুর আদায় হওয়া চাই।

কুঠিয়ালরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সংবাদ দিয়ে রঘুনাথকে কুঠিতে আনা হলো। সরল চিত্তে রঘুনাথ কুঠিতে হাজির হলে তৎক্ষণাৎ তাকে বেঁধে ফেলা হলো এবং দাদন আদায়ের জন্যে তাকে ধমকানো শুরু হলো। খানিক পরেই জনৈক কুঠিয়াল সক্রোধে বলে উঠলো—মুখের কথায় হোবে না, ডাণ্ডা হাঁকাও—

আর যায় কোথায় ? অনন্তরাম সেখানেই হাজির ছিল। কুঠিয়ালরা কেউ কিছু বলার আগেই সে লাফিয়ে উঠে লাঠি চালাতে লাগলো। অতীত আক্রোশ চরিতার্থ করার অন্ধ নেশায় সে এমন নির্মমভাবে রঘুনাথকে প্রহার করলো যে, সে যখন থামলো তখন দেখা গেল, রঘুনাথের প্রাণ অনেক আগেই দেহ ছাড়া হয়েছে।

আস্ত একটা মানুষ খুন হয়ে যাওয়ায় কুঠিয়ালরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লো। নবাব শায়েস্তা খান বাহাদুরের কড়া শাসনে চারদিক তখন তটস্থ। এ ঘটনা প্রশাসনের কানে গেলে তাদের আর রেহাই নেই। এই একটি ঘটনা নয়, এই ঘটনার সূত্র ধরে তদন্ত শুরু হলে, কুঠিয়ালদের আরো অনেক খুন-জখম ও জঘন্য অপকীর্তির কথা ফাঁশ হয়ে যাবে। তাতে তাদের পরিণাম যা হবে তা চিন্তা করে তারা শিউড়ে উঠলো। কোম্পানীর প্রতিনিধির পরামর্শে, এ ঘটনা চাপা দেয়ার জন্যে তারা হন্যে হয় উঠলো।

শুরু হলো অর্থ ব্যয়। প্রচুর অর্থ খরচ করে তারা অন্যান্য ব্যবসায়ী, পাইকার ও সংশ্লিষ্ট লোকদের হাত করলো। প্রশাসনের পাইক-পেয়াদার হাতে প্রচুর অর্থ গুঁজে দিয়ে ঘটনার প্রতি প্রশাসনের নজর পড়ার পথ বন্ধ করলো। সব শেষে রঘুনাথের বিধবা স্ত্রীসহ রঘুনাথের আত্মীয় স্বজনদের হাতেও মোটা অর্থ ঢেলে দিয়ে তাদের খামুশ করলো। তাদের বোঝানো হলো, মৃত রঘুনাথ আর ফিরে কখনো আসবে না। হৈ চৈ করে হাতে পাওয়া এই নগদ অর্থ খোয়ানো নির্বুদ্ধিতা। আসামীদের শাস্তি কিছু হোক না হোক, হৈ চৈ করলে

তারা তো ফুটো পয়সাও পাবে না, উপরন্তু আসামীরা সবাই আজীবন তাদের দুশমন হয়ে থাকবে।

নগদ অর্থ হাতে পেয়ে সকলেই থেমে যায়। থামতে চাননি দুইজন। একজন অন্যত্র বসতকারী এই কেষ্টলাল পোদ্দার আর অন্যজন রঘুনাথের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বিশ্বনাথ নামের এক এক-রোখা নওজোয়ান। এদের হাতেও অর্থ গোঁজার চেষ্টা করে আসামীরা। কিন্তু এখানে তারা ডা'ল গলাতে পারে না। এতদসত্ত্বেও চাপা পড়ে ঘটনাটা। রঘুনাথের স্ত্রী যেমন ভীতু তার চেয়েও অনেক বেশী একজন লোভী আউরাত। কিছুটা ভয়ে আর অধিকটা ঐ ক'টি টাকার লোভে এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য না করার জন্যে কেষ্টলাল আর বিশ্বনাথের পায়ে সে মাথা কুটতে শুরু করে। যার মড়া তার কান্না নেই দেখে এরাও শেষ অবধি থেমে যান। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর উৎসাহ আর পান না।

এইখানি বর্ণনা করার পর কেষ্টলাল পোদ্দার ফের বললেন—ঘটনাটা হয়তো এখানেই শেষ হতে পারতো জনাব। কিন্তু অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে কুঠিয়ালরা মোটেই বুদ্ধিহীন ছিল না। অনন্তরামই আসল খুনী হওয়ায়, এই খরচের সিংহ ভাগটাই তারা অনন্তরামের ঘাড়ে গড়িয়ে দিলো। এতে করে অনন্তরামের বিপুল অর্থ নেমে গেল। অনন্তরাম সে ব্যথা ভোলেনি। সে ব্যথার শোধ নেয়ার জন্যে অনন্তরাম আবার জাল বিস্তার করেছে।

ফৌজদার আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী উদগ্রীব হয়ে কেষ্টলালের তামাম বিবরণ শুনলেন। এরপর কেষ্টলালের শেষের কথার জের ধরে আবদুল আজিজ প্রশ্ন করলেন—আবার সে জাল বিস্তার করেছে মানে?

জবাবে কেষ্টলাল পোদ্দার বললেন—কুঠিয়ালরা চালাকী করে অনন্তরামের অনেক টাকা নামিয়েছে। আক্রোশটা তার এসে পড়েছে রঘুনাথের পরিবারের উপর। কুঠিয়ালদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে না পেরে, অনন্তরাম এখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালাতে উদ্যত হয়েছে।

ঃ মানে?

ঃ টাকার ঘা বড় ঘা জনাব। রঘুনাথের কারণেই সে ঘা'টা তার লেগেছে। সেকি আর ছাড়ে?

আবদুল আজিজ কিছুটা বিব্রত হয়ে বললেন—কিন্তু ব্যাপারটা তো এ থেকে আদৌ খোলাসা হলো না পোদ্দার বাবু? অনন্তরাম মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালাতে উদ্যত মানে?

ঃ মানে, আমার ঐ ভাইঝিটার বিয়ে হচ্ছে ঐ অনন্তরামেরই এক আত্মীয়ের সাথে জনাব। অনন্তরামই বর পক্ষের অভিভাবক।

ঃ সেকি!

ঃ যৌতুকের নামে এখন সে এমন এক অংকের সাথে বৌদিকে জড়িয়েছে যে, সর্বস্ব দিয়েও অনন্তরামের খাঁই পূরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঃ কি ব্যাপার! ওখানে আপনার বৌদি তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেন কেন?

ঃ সেই কথাই বলে কে জনাব। একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি। অনন্তরামের শেখানো ঘটক এসে বৌদিকে আমার এমন যাদু করেছে আর এমন সমঝানোই সমঝিয়েছে যে, ঐ বরের সাথে বিয়ে হলে মেয়ে তাঁর রাণীর হালে থাকবে, এই ধারণাই তাঁর এখন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। বৌদি আমার এখন দিউয়ানা হয়ে ঐ বর ধরার জন্যে সর্বস্ব পণ করে বসেছেন।

আবদুল আজিজ একটু চিন্তা করে বললেন—তা তেমন বুঝলে, ভেংগে দিন এ বিয়ে।

কেষ্টলাল পোদ্দার ক্ষোভের সাথে বললেন—উপায় নেই জনাব। আমি এখানে এই গত পরশু সন্ধ্যায় এসেছি। আমার অজ্ঞাতেই বৌদি আমার এতদূর এগিয়ে গেছেন যে, আর পিছু ফেরার উপায় নেই।

ঃ কি রকম?

ঃ এই আগামী কালই বিয়ে জনাব। সন্ধ্যার পরেই লগ্ন। কণেকে নিয়ে প্রাসঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এ বিয়ে আর ভেংগে দেয়ার উপায় নেই।

ঃ বলেন কি?

ঃ দুঃখ তো এখানেই জনাব। এই আজকেই সকালে আবার যে গোপন খবর পেলাম, তাতে আগামী কাল যে কি ঘটে, তা ভেবে আমি সারা হয়ে যাচ্ছি।

ঃ গোপন খবর!

ঃ জি। খুব গোপনভাবে যে খবর এসে কানে পড়েছে আমার, তাতে পূর্ব নির্ধারিত যৌতুকে সে বরের বিয়ে দিতে কিছুতেই রাজী হবে না। দ্বিগুণ যৌতুক দাবী করে বসবে।

ঃ কেন-কেন, তা বসবে কেন?

ঃ মূল কারণ এ পরিবারকে জব্দ করা আর তার ঐ খুনের দায়ে দেয়া টাকা সুদে মূলে আদায় করা। সেই সাথে অজুহাতও তারা একটা পেয়ে গেছে।

ঃ অজুহাত!

ঃ কণের যে এ বিয়েতে মত নেই, তার পূর্ণ অমতে এ বিয়ের অনষ্ঠান করা হয়েছে, একথা কানে পড়েছে বর পক্ষের।

ঃ মত নেই ?

ঃ কিছুমাত্র না হুজুর। জোর করেই তার বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। মেয়ে যে আবার কি কাণ্ড করে বসে শেষ পর্যন্ত, কে জানে।

আবদুল আজিজ চকিতে একবার উমিদ আলীর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর কেষ্টলালকে প্রশ্ন করলেন—মেয়ের মত নেই জেনেও তারা এ মেয়েকে বিয়ে করতে আসবে কেন ?

ঃ আসবে না ? ভাইঝিটা যে আমার অত্যন্ত সুন্দরী জনাব। তার উপর এখানে তারা যত যৌতুক পাচ্ছে, মাথা কুটলেও তো এর অর্ধেকটা আর কোথাও পাবে না। এ কারণে বরটাও এই মেয়েকে বিয়ে করতে অত্যন্ত আগ্রহী।

ঃ তাহলে আর সমস্যা কি ?

ঃ সমস্যা ঐ একটাই জনাব। আরো যৌতুক দাবী করে বেঁকে বসলেই বিপদ।

ঃ বেঁকে বসলে বিদেয় করে দেবেন তাদের। দেবেন না এ বিয়ে। তখন তো আর বিয়ে ভেঙ্গে দেয়াতে দোষ ধরতে পারবে না তারা ?

কেষ্টলাল পোদ্দার চমকে উঠে বললেন—সর্বনাশ ! তাকি করার উপায় আছে জনাব ? বিয়ের আসর থেকে বর উঠে গেলে এ মেয়ের আর কোথাও বিয়ে হবে না। সে পাতকী হয়ে যাবে।

আবদুল আজিজ হতাশ কণ্ঠে বললেন—তাজ্জব ! তাহলে তো মহা সমস্যা দেখছি।

ঃ সমস্যা বলে সমস্যা জনাব। ঐ বদমায়েশ অনন্তরাম যে আরো কি সর্বনাশ করে এই পরিবারের, কে জানে !

ইতিমধ্যে একলোক দৌড়ে এসে বললো—আরে পোদ্দার মশায়, আপনি এখনও গল্প করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? আপনার অপেক্ষায় সবাই আমরা নৌকায় বসে আছি। বিয়ের বাজার এখনও নৌকায়। এগুলো সাঁঝের আগে না পৌছলে বিয়ের অতি প্রয়োজনীয় আচারগুলোই যে অসম্পন্ন রয়ে যাবে—বিলকুল তা ভুলে গেলেন ? মেয়েটার কি অকল্যাণ করবেন শেষ পর্যন্ত ?

খেয়াল হতেই কেষ্টলাল পোদ্দার চমকে উঠে বললেন—এহ্ হে ! তাইতো ! কসুর মাফ করবেন জনাব, আমি এখন চলি। আপনারা দোআ করবেন আমাদের জন্যে—

কেষ্টলাল পোদ্দার হন্তদন্তভাবে নৌকার দিকে দৌড় দিলেন। আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী বিস্মিতভাবে লহমা খানেক সেদিকে চেয়ে রইলেন।

এরপর আবদুল আজিজ উমিদ আলীকে প্রশ্ন করলেন—কি দোস্ত, আমি বরাবরই লক্ষ্য করছি, সবসময়ই তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সব কথা কেবলই শুনছো, কোন আকর্ষণীয় বা গুরুতর প্রসঙ্গ উঠলেও, একটা কথা বলছো না। ব্যাপার কি ?

জবাবে উমিদ আলী স্মিতহাস্যে বললো—দোস্ত, সালার যখন কথা বলে তখন সেপাইকে নীরব থাকতে হয়। এইটেই আদব।

ঃ সেকি ! সেপাই মানে ? তুমি তো আমার দোস্ত ?

ঃ সেটা ভেতরে, লোকের সামনে নয়। আমি তোমার ফৌজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এসেছি। লোকের সামনে এখন তুমি সালার আমি সেপাই। তোমার কথার মাঝে আমি অপ্রয়োজনে কথা বললে, লোকের সামনে তোমাকে খাটো করা হয়। ওটা আমি কখনো করতে পারিনে।

আবদুল আজিজ নাখোশ কণ্ঠে বললেন—কি যে তোমার মানসিকতা দোস্ত, একবার যা বুঝবে, সেখান থেকে তোমাকে সরায় কে ? তা যাক সে কথা। কেষ্টলাল পোদ্দারের কথা শুনার পর তোমার দীলে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, বলো ?

উমিদ আলী সক্রোধে বললো—ব্যাটা দালালটাকে বাঁধা দরকার। জরুর দরকার।

ঃ তারপর ?

ঃ চাবুকে ওর পিঠের ছাল তুলে নেয়ার দরকার।

ঃ কারণ ?

ঃ এদের মোটেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। কুঠিয়ালদের কিছুটা ছাড় দেয়া গেলেও এদের দেয়া যায় না। কারণ, দেশের, মানে জাতীয় গাদ্দার এখান থেকেই পয়দা হয়। মুসিবতের দিনে এদেরকেই দুশমনের পক্ষে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী নামের এরা কলংক।

আবদুল আজিজ খোশদীলে বললেন—সাব্বাস্ ! তোমার মুখে এই কথাটা শোনার জন্যেই আমার এ প্রশ্নটা করা। আমি জানতাম, এই কথাই বলবে তুমি।

ঃ সেরেফ আমার মুখের কথা নয় দোস্ত। তুমি যদি আজ ওকে এখনই বাঁধতে যেতে, আমি জব্বর খুশী হতাম।

ঃ বিনা দোষেই ?

ঃ বিনাদোষেই হবে কেন ? অতীতেরটা না হয় ছেড়েই দিলাম, ওটার সঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করা এখন ভার। কিন্তু বর্তমানেরটাই বা কম কসুর কিসের ?

ঃ এটাতো এদের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ব্যাপার। অযাচিতভাবে এ ব্যাপারে তুমি আমি নাক গলাতে গেলে লোকে বদনাম দেবে যে !

ঃ দোস্ত !

ঃ বলবে, পরধর্মাবলম্বীদের সামাজিক আচার-বিধিতে হস্তক্ষেপ করছি আমরা।

উমিদ আলী চুপ্‌সে গিয়ে বললো—এ্যা, হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু—

ঃ ফের কিন্তু কি ?

ঃ এতবড় জুলুম করবে বদমায়েশটা একি বরদাস্ত করা যায় ? আর তাছাড়া—

ঃ তা ছাড়া ?

ঃ ঐ মেয়েটার কথা ভাবছি। তাকে জোর করেই—

ঃ কোন্ মেয়েটার কথা ?

ঃ ঐ যে, এ বিয়েতে নাকি আদৌ তার মত নেই ?

ঃ হ্যাঁ, মত নেই। তাতে কি হয়েছে ? এটাও ওদের ঐ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

একটু থেমে উমিদ আলী ফের প্রশ্ন করলো—মত নেই কেন দোস্ত ? তুমি কি অনুমান করো ?

আবদুল আজিজ হেসে বললেন—রমণীর মন, জানে কোন্ জন ? আমি কি অনুমান করবো ?

ঃ সবাই যেখানে আগ্রহী, সেখানে আমার মনে হয়, বাপের ঐ দুর্ঘটনার কারণেই এতটা বেঁকে সে বসেনি। মেয়েটার অন্য কোথাও দুর্বলতা আছে। হয়তো অন্য কোন ছেলের প্রতি—

ঃ কোন আচানক কথা নয়। এমনটাই স্বাভাবিক।

ঃ বোধ হয় তলে তলে ওদের মধ্যে জোর মুহাব্বত পয়দা হয়েছে।

ঃ খুবই সম্ভব।

ঃ তাহলে আমরা ওদের কোন উপকারে আসতে পারিনে ?

ঃ কিভাবে ? তারা উদ্যোগী না হলে আমরা গিয়ে কি দু'দিক থেকে দু'জনকে খুঁজে এনে শাদি পড়িয়ে দেবো ?

ঃ তারা উদ্যোগী হবে কিভাবে ? শরম নেই তাদের ?

ঃ কাদের ?

ঃ ঐ মেয়েটার আর ছেলেটার ? মেয়েদের তো শুনি বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না।

আবদুল আজিজ হাসি চেপে বললেন—আর ছেলেটার ? তার শরম কিসের ? তার মুখ ফুটে না কেন ?

ঃ সে হয়তো নগণ্য কোন লোক। গ্রাহ্যণীয় ব্যক্তি নয়। তাই হয়তো সে সাহসী হতে পারছে না।

ঃ বটে !

ঃ হাতের কাছে শক্ত কোন মদদ পেলেই তারা হয়তো তখন সোচ্চার হয়ে উঠবে।

আবদুল আজিজ আর হাসি চাপতে পারলেন না। তিনি সশব্দে হেসে উঠে বললেন—আর উমিদ আলী সাহেব গিয়ে সেই মদদ হয়ে দাঁড়াবেন ?

ঃ দোস্ত !

ঃ কখন যে তোমার চিন্তার মোড় কোন্ দিকে ঘুরে, তা ঠাহর করা দুঃসাধ্য। কি যে সব উদ্ভট তোমার কল্পনা !

ঃ উদ্ভট নয় দোস্ত, আমার মনে হয় ব্যাপারটা এই রকমই হবে।

ঃ ধীরে দোস্ত, ধীরে। ব্যাপারটা যে রকমই হোক, এ নিয়ে তোমার এত মগজ খরচের জরুরত নেই। বরং তোমার নিজের ব্যাপারে এমনটি ঘটলে, নগণ্য লোক বলে সাহস করে বলতে কিছু না পারলে, আমাকে ইংগিত দিও, আমি তোমার মদদ হয়ে দাঁড়াবো।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে উমিদ আলীর মুখের দিকে চেয়ে আবদুল আজিজ হাসতে লাগলেন। দিশে হারিয়ে ফেলে উমিদ আলী বললো—দোস্ত !

ঃ মাগরিবের ওয়াক্তের আর বিলম্ব নেই। এবার চলো দেখি। মেহমান-খানায় শুয়ে শুয়ে যত খুশী খোয়াব দেখো সারারাত। এবার চলো—

জরুরী কাজে আটকে যাওয়ায় পরের দিন আবদুল আজিজদের হুগলীতে ফিরে যাওয়া হলো না। কাজের ঝামেলা মেটাতেই দুপুর পেরিয়ে গেল। অবেলায় আর যাত্রা না করে সেদিনটাও তাঁরা মেহমানখানাতেই রয়ে গেলেন। বিকেলে আর কাজ নেই। মেহমানখানায় বসে দুই দোস্ত শেষ বেলায় গল্প জুড়ে দিলেন। গল্প কিছুটা জমে উঠতেই মেহমানখানার এক নওকর এসে বললো—হুজুর, এক সওয়ারী আপনাদের সাথে মোলাকাত করতে চান।

আবদুল আজিজ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—সওয়ারী ! কোথায় তিনি ?

নওকর বললো—এই মেহমানখানার ফটকে।

ঃ নাম কি তার, বলেছেন ?

ঃ জি। তাঁর নাম কেষ্টলাল পোদ্দার।

আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী এক সাথে চমকে উঠলেন। আবদুল আজিজ শশব্যস্তে বললেন—সেকি ! চলো-চলো, দেখি—

আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী ফটকে এসে দাঁড়াতেই কেষ্টলাল পোদ্দার

দুইহাত জোড় করে আকুল কণ্ঠে বললেন—বাঁচান জনাব, গরীবের জাত কুলটা বাঁচান।

আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে—জাত কুল বাঁচান মানে ?

কেষ্টলাল বললেন—আমার আন্দাজটাই ঠিক জনাব। অনন্তরাম এসে সত্যি সত্যিই দুইগুণ টাকা দাবী করেছে। আমরা দিতে না পারায়, সে বর নিয়ে উঠে যাচ্ছে। হাতে পায়ে ধরেও তাকে আমরা থামিয়ে রাখতে পারছিনে।

ঃ তাজ্জব !

ঃ সাঁঝের পরেই লগ্ন। বর উঠে গেলে মেয়েটার আর কোন গতি থাকবে না। সে জাতিচ্যুত হয়ে যাবে। ওকে আর কেউ নেবে না। নিরুপায় হয়ে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি জনাব। আপনারা সবাই আমাদের বাঁচান !

আবদুল আজিজ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—তা আমরা কি করে বাঁচাবো ?

ঃ মেহেরবানী করে আপনারা একটু আসুন জনাব ওখানে। সবাই বলছে, আপনাদের দেখলেই ঐ অনন্তরাম অত্যন্ত ভীতু হয়ে পড়বে। আসলে খুনী তো। আপনাদের দেখলে সে তখন আর উচ্চবাচ্য না করে বিয়ে দিতে রাজী হয়ে যাবে। ঐ দিগুণ পণ আর চাইবে না।

আবদুল আজিজ ইতস্ততঃ করে বললেন—কিন্তু আমরা সরকারী লোক। আপনাদের ঐ সামাজিক ব্যাপারে—

এবার উমিদ আলী সবেগে নড়ে উঠে বললো—এখন আমরা সেরেফ দোস্ত, সালার-সেপাই নই। এবার মুখ আমাকে খুলতেই হচ্ছে।

আবদুল আজিজ বললেন—অর্থাৎ ?

উমিদ আলী সতেজে বললো—কিসের সরকারী লোক ? পোদ্দার বাবু আমাদের দাওয়াত দিলে আমরা কি তাঁর মেহমান হতে পারিনে ? মেহমান হয়ে যেতে আমাদের বাধাটা কোথায় ?

দিশে পেয়ে কেষ্টলাল পোদ্দার আবার সঙ্গে সঙ্গে দুইহাত যুক্ত করে বললেন—জি জনাব, জি-জি। আমার মস্তবড় ভুল হয়ে গেছে। গতকালই দাওয়াত করা উচিত ছিল আমার। আমি আপনাদের দাওয়াত করছি জনাব, মেহেরবানী করে আমার দাওয়াতটা কবুল করুন আর সেই অছিলায় মেহেরবানী করে আসুন জনাব জলদি জলদি।

কেষ্টলালকে আর অধিক অনুরোধ করতে হলো না। উমিদ আলীর তাড়া খেয়ে আবদুল আজিজ রাজী হলেন। কয়েকজন সেপাইয়ের একদল নিয়ে দুইদোস্ত অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হলেন এবং কেষ্টলাল পোদ্দারকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী মৃত রঘুনাথ পোদ্দারের মকানে এসে হাজির হয়ে দেখলেন, বর ও বরযাত্রী নিয়ে অনন্তরাম উঠে যাওয়ার উদ্যোগ

করছে আর রঘুনাথের বিধবা স্ত্রী তাদের সামনে শাটপাট হয়ে পড়ে থেকে মাথা কুটে বলছে—"আপনাদের পায়ে পড়ি, অভাগীর জাত কুলটা বাঁচান।" অনন্তরাম বলছে, "মেয়ে আপনার কুলটা। কম টাকায় ও মেয়েকে নেবো কেন আমরা ?" রঘুনাথের স্ত্রী বলছে, " আর টাকা কোথায় পাবো বাবু ?" জবাবে অনন্তরাম বলছে, "যেখান থেকে আগেরগুলো যোগাড় করেছেন, সেখান থেকেই যোগাড় করুন। অতগুলো টাকা আমার কান ধরে আদায় করেছেন আপনারা, আজ টাকা নেই বললেই হলো ? হয় টাকা ফেলুন, নয় আমরা চললাম"—

বলেই সে কণে পক্ষকে ভয় দেখিয়ে বলছে—"আরে, এখনো সব বসে আছো কেনো তোমরা ? উঠো-উঠো"—

বর পক্ষের একজন তাল দিয়ে বলছে, "আহা, আর একটু দেখাই যাক না বাবু, টাকাটা দিয়ে দিতেও তো পারে ? জাতকুল বলে কথা !"

—বলেই সে লোকটি অনন্তরামের দিকে অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইছে আর অনন্তরামও তাল দিয়ে বলছে, "সে সদেচ্ছা কোথায় ? ভিটেমাটিটাতো অক্ষতই আছে শুনেছি। ওটা আমার নামে লিখে দিলেও তো টাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু সে ইচ্ছে তাদের কৈ ?"

উপস্থিত প্রতিবেশীদের কেউ কেউ এ প্রেক্ষিতে বলছে, "তাইতো —তাইতো। জাতকুলটা বড়, না ভিটে মাটিটা বড় ? শ্রীমতির মায়ের এতে আপত্তি থাকা ঠিক নয়।" উৎসাহ পেয়ে অনন্তরাম ফের বলছে, "দেবে না-দেবে না। এই, চলো সবাই, চলো-চলো"—

একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে থেকে আবদুল আজিজ তামাম ঘটনা বুঝে নিলেন। এরপর অনন্তরামের সামনে এসে বললেন—আরে-আরে কি ব্যাপার ! আমরা বিয়ের নেমতন্ন খেতে এলাম, আর আপনারা সবাই উঠে যাচ্ছেন যে ?

উমিদ আলী ও সেপাইরাও সামনে এগিয়ে এলো। অনন্তরাম আবদুল আজিজকে জরুর চিনতেন। এসব ঘড়িয়াল লোক কোথায় কোন সরকারী লোক আছে কার কি ক্ষমতা আর মেজাজ, তামাম খোঁজ রাখে। আবদুল আজিজকে সদলবলে দেখেই অনন্তরাম আঁতকে উঠে বললো—এ্যাঁ একি ! স্বয়ং হুজুর এখানে ! আদাব হুজুর-আদাব !

ভক্তিভরে অনন্তরাম আদাব ঠুকতে লাগলো। আবদুল আজিজ বললেন—আদাব। তা আপনারা চলে যাচ্ছেন কেন ? মেয়েটার জীবনটাতো তাহলে বরবাদ হয়ে যাবে ?

অনন্তরাম থমমত করে বললো—না হুজুর, যাচ্ছিনে-যাচ্ছিনে। এই একটু দেনা-পাওনার ব্যাপারে আলাপ করছি আর কি !

অতপর সে বরযাত্রীদের উদ্দেশ করে বললো—আরে এই, তোমরা সব বসে পড়ো, বসে পড়ো। আমাদের হুজুরের অসম্মান করো না। যত্তসব ছেলে ছোকড়ার কারবার ! তোমাদের মতো আমার এত অবুঝ হলে চলবে কেন ? মেয়েটার ভবিষ্যত দেখতে হবে না ? বসো-বসো। লগ্নটা প্রায় এসে গেছে। বেশী দিতে না পারে, ঐ আগের কথাই সই। শুভ কাজটা হয়ে যাক।

অনন্তরামের আচানক এই পরিবর্তন দেখে অনেকেই বিস্মিত হলেন। আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী মনে মনে হাসলেন। আবদুল আজিজ অনন্তরামকে প্রশ্ন করলেন—লগ্নটা কখন শুরু হবে ?

অনন্তরামের তখন রীতিমতো কাঁপ উঠে গেছে। রঘুনাথকে খুন করার পর থেকে এতবড় সরকারী লোকের, বিশেষ করে, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী লোকের সামনে সে কখনো পড়েনি। জবাবে সে জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললো—এই তো হুজুর, এইতো-এইতো, এই সূর্যাস্তের পরেই।

ঃ বেশ, তাহলে আপনারা স্থির হয়ে বসুন। এদের দাওয়াত রক্ষে করে এসে আমরাও আপনাদের সাথে শরিক হই—

অনন্তরাম গদ গদ কণ্ঠে বললেন—জি আচ্ছা হুজুর, জি আজ্ঞে!

দাওয়াত রক্ষে করার নামে আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী অন্দর মহলে গেলেন এবং রঘুনাথ পোদ্দারের স্ত্রী ও কেষ্টলাল পোদ্দারকে নিয়ে এক গোপন ঘরে বসলেন। রঘুনাথের স্ত্রীকে আবদুল আজিজ প্রশ্ন করলেন—ঘটনা কি বলুনতো ?

রঘুনাথের স্ত্রী বললেন—আমি নিঃসম্বল এক বিধবা হুজুর। ঘটকের কুমন্ত্রণায় পড়ে এত বেশী যৌতুক দিতে রাজী হয়েছি আমি। কিন্তু এরা এখন এতেও রাজী নয়। এর দুইগুণ দাবী করেছে।

যৌতুকের অংকের কথা শুনে আবদুল আজিজ তাজ্জব হয়ে বললেন—এত টাকার পরও আরো দাবী করেছে ?

ঃ জি হুজুর, জি। এখন আপনারা আসার ফলে রক্ষেটা যদি হয়।

ঃ এই টাকাই বা আপনি যোগাড় করলেন কি করে ? এটা আপনার হাতে ছিল ?

ঃ জি না হুজুর। একটা পয়সাও ছিল না। সামান্য কিছু গহনা ছিল মাত্র যা দিয়ে বিয়ের খরচ আর কণে সাজানো কোন মতে চলতে পারে। যৌতুক দেয়ার মতো একটা পয়সাও ছিল না।

ঃ তাহলে ?

ঃ তাহলে আর কি হুজুর ! বরটা খুব পছন্দ হওয়ায়, এই ভিটে মাটিটুকু বিক্রি করে যৌতুকের টাকা যোগাড় করার সিদ্ধান্ত নেই।

ঃ তাহলে ভিটেটা বেচে ফেলেছেন ?

রঘুনাথের স্ত্রী ঢোক চিপে বললেন—না, ঠিক এখনোও বেচিনি হুজুর। তবে না বেচলেও, এটা আমি বেচতে আর পারবো না।

ঃ কি রকম ?

ঃ সে কথা বলতে আমার নিষেধ আছে হুজুর। তবে অন্যভাবে টাকাটা পেয়েছি, এইটুকু বলতে পারি।

ঃ তাজ্জব ! বলাই যাবে না সে কথা ?

কেষ্টলাল পোদ্দার এবার জেদি কণ্ঠে বললেন—বলা যাবে না কেন ? এই জনাবকেও সে কথা বলা যাবে না, এমন কি দিব্যি দেয়া আছে ? জনাবকে সব বলুন। কিভাবে কি হচ্ছে, জনাবের সব জানা দরকার।

একটু থেমে রঘুনাথের স্ত্রী বলতে শুরু করলেন—হুজুর, ঘুরে ঘুরে গত দুইদিন আগে পর্যন্ত এই ভিটেমাটি কোথাও আমি বিক্রি করতে পারিনি। এতটাকা দিয়ে কেউ এটা কিনতে রাজী হয়নি। চোখে আমি আঁধার দেখতে লাগলাম। নিরুপায় হয়ে আমাদেরই প্রতিবেশী এক সদাশয় মুসলমানকে ধরলাম। তাঁর কাছে গিয়ে আমি আছাড় খেয়ে পড়ে বললাম—"আমার বিপদ রক্ষে করুন জনাব। আমার এই ভিটেমাটিটা কিনে নিয়ে আমাকে বিপদ থেকে বাঁচান।"

আমার তামাম কথা শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন। এরপর তিনি বললেন—"আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে আপনাকে আমি ভিটে ছাড়া করবো ?" আমার অসহায় অবস্থা আরো পরিষ্কার করে তুলে ধরে বললাম, "আমার যে আর উপায় নেই জনাব ! যেখানেই হোক, এটা তো বিক্রি করতে হবেই আমাকে। কিন্তু সময় নেই, ক্রেতা নেই, এখন যে কি করি আমি"—আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম। আমার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবলেন। এরপর তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন—! "ঠিক আছে। ভিটে আপনাকে বিক্রি করতে হবে না। আপনার ঐ যৌতুকের টাকার দায়িত্ব আমি নিলাম।"

হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর মুখের দিকে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। তা দেখে ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন"—কিছুটা সংগতি যখন আছে আমার, ধরে নীন, আমার অসহায় এক প্রতিবেশী বহিনকে আমি মুসিবতে কিছু সাহায্যই করলাম।" আমি বললাম—"সাহায্য !" উনি বললেন, "তাতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, যখন পারেন, তখন আপনি ফেরত দেবেন টাকাটা। তবে ঐ টাকার উপর আমার কোন দাবী থাকবে না।" তবু আমি প্রশ্ন করলাম—"এতটা অনুগ্রহ আপনি করবেন ?" উনি স্মিতহাস্যে বললেন, "ইনসানের মুসিবতে ইনসানই তো এগিয়ে আসবে বহিন। নইলে সে ইনসান

কিসের ?" আমি আর চোখের জল রোধ করতে পারলাম না। আমি আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলাম, "দাদা!" উনি ফের বললেন—"একটাই আমার দাবী বহিন, আর সেটা হলো, ভিটেমাটি বেচে আপনি আশ্রয়হীনা হতে পারবেন না।"

বর্ণনা শেষ করে রঘুনাথের স্ত্রী শেষে বললেন—এরপর এই ভিটেমাটি কি করে আর বেচতে পারি হুজুর ?

আবদুল আজিজ অভিভূত হয়ে বললেন—তাজ্জব !

কথা ধরে কেষ্টলাল পোদ্দার বললেন—হ্যাঁ, তাজ্জবই তো জনাব ! এই গতরাতেই আমি ঘটনাটা জানলাম। একথা আগে শুনলে তো আমি মাথায় হাত দিয়ে বসতাম। যৌতুকের টাকা এখনও হাতে আসেনি, একজন দেবেন বলে ওয়াদা করে রেখেছেন। এর উপর ভরসা করে থাকা যায় ? কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, গতরাতে সত্যি সত্যিই উনি এসে পুরো টাকাটা গুণে দিয়ে গেলেন।

ঃ আচ্ছা ! তা কে সে লোক ? তাঁর নামটা কি বলা যাবে না ?

কেষ্টলাল পোদ্দারও এবার কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন—আসলে তা বলাটা কঠিনই হুজুর। উনি চান না, একথা অন্য কেউ জানুক। তবে আপনি যখন জানতে চাচ্ছেন, তখন আপনাকেই শুধু বলি, তিনি এই বৌ দিদিদেরই একজন প্রতিবেশী। তাঁর নাম আজিমউদ্দীন শাহ। তিনিও একজন কাপড় ব্যবসায়ী আর ঐ পাশের গাঁয়ের মসজিদের ইমাম।

আবদুল আজিজ ও উমিদ আলী চমকে উঠে উভয়ের মুখের দিকে উভয়েই অপার বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকালের জন্যে তাঁরা সম্বিত হারিয়ে ফেললেন। অবশেষে আবদুল আজিজ স্বগতোক্তি করলেন—একেই বলে ঈমান !

স্বগতোক্তির মতো করেই উমিদ আলীও অস্ফুট কণ্ঠে বললো—সত্যিই তো ! কেউ কেটে ফেললেও এ টাকা উনি খরচ করতে পারেন না !

কেষ্টলাল পোদ্দার সবিস্ময়ে বললেন—আপনারা কি বলছেন জনাব ?

ঃ আবদুল আজিজ বললেন—না, মানে, আমরা ঐ আজিমউদ্দীন শাহ সাহেবের কথা বলছি। দানাদার মানুষ উনি।

ঃ জি জনাব। উনি এক অদ্ভুত মানুষ। কেউ দান ধ্যান বা মহৎকাজ করলে ঢাকঢোল পিটে সবাইকে তা জানান। সবাই তাঁর প্রশংসা করে, তাঁর খ্যাতি বাড়ে। অথচ এ লোকটি কি এক বিচিত্র লোক। ইনি এতবড় একটা দান, মানে এমন একটা মহৎকাজ করেও তা গোপন রাখতে চান। কাউকে জানতে দিতে চান না। কি অদ্ভুত তাঁর খেয়াল !

আবদুল আজিজ ঈষৎ হেসে বললেন—খেয়াল নয় পোদ্দার বাবু। এইটেই একজন ঈমানদারের চরিত্র।

ঃ মানে ?

ঃ একজন মুসলমানের ডান হাত দান করলে তাঁর বাম হাত জানবে না, এইটেই ইসলামের বিধান। এই বিধানের যে ব্যতিক্রম করে, তার ঈমান শক্ত নয়।

ঃ জনাব !

ঃ মুসলমানেরা সৎকাজ করে আল্লাহ তায়ালার তুষ্টির জন্যে, মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্যে নয়।

ঃ তাজ্জব ! আপনাদের বিধানগুলো সত্যিই বড় প্রশংসনীয়। আপনাদের প্রত্যেকটি ব্যাপারই দেখছি বড় অদ্ভুত, বড় চমৎকার !

ঃ পোদ্দার বাবু !

ঃ এখন বুঝতে পারছি, ভগবান যে আপনাদের দেশের মালিক বানিয়েছেন, তা অমনি অমনি নয়, এর যথেষ্ট কারণ আছে।

ঃ তা সে যা-ই থাক, মুসলমান নামধারী কিছু স্বার্থপর বেঈমানদের দেখে, অনেকেই মুসলমানদের সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারছেন না, এইটেই বড় আফসোস্ !

কেষ্টলাল পোদ্দার চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—তা বটে-তা বটে !

লহমা খানেক সকলেই নীরব হয়ে রইলেন। এরপর উমিদ আলী মুখ খুললো। সে কেষ্টলালকে বললো—থাক, ওসব কথা থাক। এবার এদিকে আসা যাক। আচ্ছা পোদ্দার মশায়, আপনাদের কি ধারণা ? এই যে এত যারা লোভী আর মতলববাজ, বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে তারা কি আপনাদের মেয়েকে সমাদরে রাখবে ? শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দেবে না ?

কেষ্টলাল পোদ্দার ম্লান মুখে বললেন—সে সম্ভাবনাটা তো পুরোপুরিই আছে জনাব। তাদের উদ্দেশ্য তো আসলে কিছু অর্থ হাতড়িয়ে নেয়া আর আমাদের জব্দ করা। কিন্তু তবুও—

ঃ তবুও এর কি কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া যায় না ?

নিমেষ খানেক দম ধরে থাকার পর কেষ্ট বাবু বললেন—করা তো তাই উচিত, আর বিকল্প পথও একটা আছে। কিন্তু বৌদি যে কিছুতেই রাজী নন তাতে।

আবদুল আজিজ উগ্রগ্রীব হয়ে বললেন—কি রকম ?

পোদ্দার বাবু বললেন—ঐ যে বর পক্ষ দোষ ধরেছে মেয়ের, এর কারণ তো অবশ্যই কিছু আছে। আমাদের এই বাড়ীর পাশেই বিশ্বনাথ পোদ্দার নামের এক নওজোয়ান আছে। যেমনই শরীর-স্বাস্থ্য, তেমনই দর্শনধারী।

কুলেশীলেও উত্তম। কিন্তু ওরা একেবারেই গরীব, ভাত জুটে না দুই বেলার। শ্রীমতি, মানে আমাদের এই কণে, তাকেই বিয়ে করতে চায়। এখনও শ্রীমতি সে গোঁ ছাড়েনি।

ঃ সেকি ! তাহলে আপত্তি কোথায় আপনাদের ?

এর জবাবে রঘুনাথের স্ত্রী সরবে বলে উঠলেন—না-না হুজুর, না। এ কখ্খনো হতে পারে না। ও ছেলে একদম গোঁয়ার। নিজের খেয়ে সে সারা বেলা বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়। কেউ কিছু উল্টাপাল্টা করছে দেখলেই, সে প্রতিবাদ নিয়ে ছুটে যাবে আর ফ্যাসাদ-কোন্দলে জড়িয়ে পড়বে। তুমি গরীবের ছেলে। কারোই যখন কোন মাথা ব্যাথা নেই, তোমার এত গরজ কি ? সবাই যেভাবে চলছে, সেইভাবে চলে করে-কিম্বে খাও। নাঃ ! সকলেই তাকে বুঝিয়েছে, কিন্তু ওর কোন পরিবর্তন হয়নি।

ঃ বলেন কি ?

ঃ সারাদিন সবার সাথে টক্কর লাগিয়ে বেড়ালে, সংসার করবে কখন ? একটা পয়সা উপায় করার ধান্দা নেই, এমনই লক্ষ্মী ছাড়া ! ওর হাতে দেবো মেয়ে ? ঘরে তো ভাত নেই-ই, সারাদিন একবেলা হাঁড়ি চড়ে না, তার উপর যে কোন্‌দিন ও খুন জখম হবে বা ফাটকে চলে যাবে। ওর সাথে বিয়ে দেয়া আর মেয়েকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া এক কথা হুজুর।

আবদুল আজিজ উৎসুক হয়ে কেষ্ট বাবুকে প্রশ্ন করলেন—আর কোন দোষ আছে ছেলেটার ?

কেষ্টলাল বললেন—জিনা জনাব, আর কোন দোষ নেই। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওর নৈতিক চরিত্র বেশ প্রশংসা করার মতো। দোষ বলতে ঐ একদোষ, কোথাও অন্যায় কিছু হচ্ছে শুনলেই সে হৈ হৈ করে তার পেছনে ছুটবে, বাধা নিষেধ মানবে না। এই যে, আমার দাদা খুন হওয়ার পর সবাই টাকা খেয়ে থেমে গেল, কিন্তু ঐ বিশ্বনাথটাকে কি থামিয়ে রাখা যায় ? ওর এক কথা, জরুর এর বিহিত হওয়া চাই। টাকা নিয়ে আসামীরা ওকেও সাধলো কিন্তু একটা পয়সা ছোঁয়াতে তাকে পারলো না। নালীশ নিয়ে সে একাই যাবে সরকারী দপ্তরে। শেষে বৌদি তাকে হাতে পায়ে ধরে কোন মতে থামিয়েছেন।

উমিদ আলী সানন্দে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন—সাব্বাস !

আবদুল আজিজ কেষ্টলালকে বললেন—

ঃ আপনাদের কথা থেকে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে তো দেখছি, এগুলো কোন দোষই নয়, ঐ ভাতের প্রশ্নই আপনাদের বড় প্রশ্ন।

ঃ জি জনাব, জি। ওসব আমিও ভেবে দেখেছি। ভাত থাকলে এ বর খাশা বর।

ঃ আচ্ছা, ঐ ছেলেটা, মানে বিশ্বনাথ পোদ্দার, আপনাদের শ্রীমতিকে কি শাদি করতে রাজী আছে ?

ঃ রাজী মানে কি জনাব ! শুনছি, আজ দুইদিন ধরে খাওয়া-নাওয়া ছেড়ে দিয়ে ছেলেটা নাকি টান হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। সেখেও কেউ একফোঁটা জল খাওয়াতে পারছে না।

ঃ আচ্ছা।

এরপর আবদুল আজিজ মেয়ের মাকে বললেন—আমি যদি ঐ ছেলেটার আয় উপায়ের একটা হিল্লে করে দেই, মানে আমার ফৌজে ওকে নকরী দেই, বা অন্য কোন সরকারী নকরী, তাহলেও কি আপনি ওর সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে আপত্তি করবেন ?

মেয়ের মা বিশ্বাস করতে পারলেন না। অবিশ্বাসের সুরে তিনি বললেন—ওকে আপনি নকরী দেবেন হুজুর ? সরকারী নকরী ?

ঃ হ্যাঁ, দিতেই তো চাই।

মেয়ের মায়ের মুখ রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে বললেন—আপত্তি কি বলছেন হুজুর ? তাহলে তো হাতে আমি চাঁদ পাই। কিন্তু এতটা দয়া কি সত্যিই আপনি করবেন ?

ঃ দয়া বলছেন কেন ? এই রকম জানবাজ নওজোয়ানই তো ফৌজে আমার দরকার। এই রকম ন্যায় পন্থী লোকই তো অন্যান্য সরকারী কাজের জন্যেও খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। আপনি রাজী থাকলে বলুন, আমি ছেলের সাথে কথা বলি—

বিপুল আবেগে শ্রীমতির মা বলে উঠলেন—বলতে হবে না হুজুর, কিছুই বলতে হবে না। নকরী তো দূরের কথা, শ্রীমতিকে তার সাথে বিয়ে দিতে রাজী আছি আমি, একথা শুনলেই সে পাগল হয়ে ছুটে আসবে।

হলোও ঠিক তাই। বিশ্বনাথকে একথা জানানো মাত্র সে পড়িমরি ছুটে এসে শ্রীমতির মায়ের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

ইতিমধ্যেই বাইরে বিরাট এক কোলাহল শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বাইরে এসে শুনলেন, অনন্তরাম কোন্ ফাঁকে পালিয়ে গেছে। সেটা টের পেয়ে বর ও বরযাত্রীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে এবং তারাও এখন পলায়নের পথ খুঁজছে।

আবদুল আজিজ এবার তাঁর সেপাইদের ডাক দিয়ে বললেন—ভাগাও সব ব্যাটাদের—

বিশ্বনাথের সাথে শ্রীমতির বিয়ে ঐ লগ্নেই হয়ে গেল। প্রণাম করতে এসে অপরিসীম আনন্দে ও কৃতজ্ঞতার আবেগে বর বধু উভয়েই আবদুল আজিজ ও উমিদ আলীর পায়ে পড়ে সেই যে কান্না শুরু করলো, সে কান্না থামাতে দুই দোস্তকেই রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হলো।

৯

কিছু কিছু ঘটনা মানুষকে এমনইভাবে উন্মনা করে তোলে, যার না থাকে কোন অর্থ, না থাকে কোন যুক্তি। আর এই যুক্তি-অর্থ না থাকায়, সেই উন্মনা মানুষ না পারে তা ব্যক্ত করতে, না পারে তার সঠিক আকার সনাক্ত করতে, না পারে তার উপর আস্থা স্থাপন করতে। ওদিকের আবার অবচেতন মনের এক অনর্থক আকর্ষণে সে না পারে ঐ কুহক থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে, না পারে তার দোল খাওয়া দীলটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে। বিদ্রূপাত্মকভাবে আরো যা করুণ তাহলো, তার ঐ অবাস্তব ও অস্পষ্ট খেয়ালের সাথে বাস্তব কোন ঘটনার আংশিক মিল দেখলেই, সে অতিশয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে। যতক্ষণ এই খেয়াল কোন দৈবাৎ প্রক্রিয়ায় বাস্তব রূপ না নেয় বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এই ভূৎ ঘাড় থেকে না নামে, ততক্ষণ সে মানুষের সোয়াস্তি হারাম।

উমিদ আলীর বর্তমান হালতটা এই কিসিমের। দেশের ভাবনা নিয়ে তার উৎক্ষিপ্ত ভাবটা যে আপাততঃ খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে, তা এই কারণেই। নূতন এক উপসর্গের হামলায় তার পুরাতন ব্যাধিটা ঝিমিয়ে পড়েছে। এই উপসর্গের জন্মদাত্রী রওশন আরা বেগম। আক্রান্তস্থল হৃদয়।

হৃদয়ের বিকিকিনির বাজারে ঘুমিয়ে ছিল উমিদ আলী। গভীর নিদে অচেতন। এ বাজারের হাল হকিকত জানাও তার ছিল না, এ বাজারে সওদা করার তাকিদও সে কখনও অনুভব করেনি। রৌদ্রদগ্ধ শস্যবীজের বিশুষ্ক দানার মতো খোলসের আবরণে সে এখানে ঘুমিয়ে ছিল মুর্দাবৎ। কিন্তু রওশন আরা বেগমের সহৃদয় আচরণ দীর্ঘদিন ধরে বিন্দু বিন্দু আকারে পানির প্রলেপ দিতে থাকে বিশুষ্ক এই বীজদানায়। বীজদানা অলক্ষ্যে সরস হয়ে উঠতে থাকে। সেদিনের সেই প্রবলতর বর্ষণে এই বীজদানার অংকুরোদগম ঘটে। ঘুম ভেংগে যায় উমিদ আলীর। রওশন আরা বেগম তাকে খাস মকানে আটকে রাখতে চায়। তার সহায় হতে চায়। তার অনুভূতির দোসর হয়ে অনুক্ষণ তার আশে-পাশেই থাকতে চায়। তার ধরার খুঁটি হতে চায়। কূলহীন সাগরে পোতাশ্রয় খুঁজে পায় উমিদ আলী। রওশন আরাকে নিয়ে তার অবচেতন অন্তর খোয়াব দেখতে শুরু করে।

কিন্তু উমিদ আলী বাতুল নয়। খোয়াব যে খোয়াবই, অলীক এক পদার্থ, বাস্তব কিছুই নয়—উমিদ আলী তা বোঝে। তবুও অবাধ্য দীল তার খোয়াব দেখতে ভালবাসে। খোয়াব দেখে তৃপ্তি পায়। উমিদ আলী বোঝে, রওশন আরা বেগম তার ধরা-ছোঁওয়ার অনেক উর্ধের পদার্থ। বামন আর চাঁদের মতো মাঝে তাদের সীমাহীন ব্যবধান। সে বোঝে, রওশন আরার আন্তরিকতা চাঁদের

কিরণদানের মতো বদান্যতাই শুধু, আসমান থেকে ছুটে হাতের মধ্যে আসার কোন আকুলতা নয় সেটা। তবু দীল তার সেই থেকে সেইদিকে ঝুঁকে পড়ে। যুক্তি অর্থ ছাড়াই আর অবচেতন অন্তর চাঁদকে নিয়ে খোয়াব দেখতে শুরু করে। সচেতন উমিদ আলীও এতিমের সান্ত্বনার মতো তৃপ্তির আস্বাদ লাভ করে এর মাঝে। ভাবে, হাতে পাওয়া না গেলেও, কাছে পাওয়ার মূল্যই বা কম কি?

এক্ষণে এ সান্ত্বনাও উবে গেছে উমিদ আলীর। রওশন আরাকে কাছে-নিকটে পাওয়ার আশাও তার নস্যাৎ হয়ে গেছে। তার অনুভূতির দোসর হওয়ার আর কোন অবকাশ রওশন আরার নেই। আবদুল আজিজের আম্মা খাস মকানে আসার দিন বাইরে থাকার কারণে সে রওশন আরার শাদির খবর সঙ্গে সঙ্গে না জানলেও, বাইরে থেকে ফিরে এসে সবই সে জেনেছে। সে জেনে গেছে, আবদুল আজিজের সাথে রওশন আরার শাদির কথা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, যে কোনদিন এখন সে শুভ কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

এতে করে তাজ্জব সে হয়নি। এমনটি হওয়াই যে স্বাভাবিক আর এমন হওয়ার ব্যাপারই যে বরাবর ছিল এটা, উমিদ আলী তা জানে। শুধু রওশন আরার আচরণই মাঝে মাঝে তাকে এই বাস্তব থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বাস্তব আজ নিজ রূপ পরিগ্রহণ করেছে। উমিদ আলীর এতে তাজ্জব হবার কিছু নেই। বরং সে একদিন নিজেই চেয়েছে, মিলন ঘটুক এ জুটির। আজও সে চাওয়াটা বিলকুল অপ্রিয় নয় তার কাছে। তারই প্রিয় বন্ধুর শাদি হবে রওশন আরার সাথে, এটা তাঁর নিজেরও আনন্দেরই ব্যাপার। তবু এই আনন্দের মাঝে উমিদ আলী উন্মনা হয়ে গেছে। অযৌক্তিকভাবে সে উন্মনা। বলাও যায় না, বলার মতো ব্যাপারও নয়, এমনই এক নাজুকভাবে উমিদ আলী উন্মনা।

এই উন্মনাভাব থেকেই উমিদ আলীর মধ্যে ভাবান্তর এসেছে। জিন্দেগীর গতানুগতিক ধারাটা সে এখন বদল করার প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। এই উন্মনাভাব নিয়েই সে আবদুল আজিজের সাথে কাশিম বাজার পরিভ্রমণ করেছে এবং মৃত রঘুনাথ পোদ্দারের মকানে গিয়ে শ্রীমতি ও বিশ্বনাথের ঘটনার পরশে সে তার ভাবান্তরটা আরো অধিক প্রকট করে এনেছে।

এখন আর উমিদ আলী অন্দরে বেশী থাকে না। গুলশান আরা বেগমের ফায়-ফরমায়েশ খেটে দিয়েই সে বাইরে বেরিয়ে আসে আর বাইরে বাইরে ঘুরে। এ আবর্তের বাইরে নতুন এক অবলম্বন তালাশ করে ফিরে সে। চায় নতুন এক জিন্দেগী। কিন্তু সে জিন্দেগীটা কি, তার রকম-কিসিম কেমন, তার ফায়সালা সে এখনও করতে পারেনি। সে বুঝে উঠতে পারছে না, কি বা কোন্

কাজ তার মানসিকতার পরিপূরক হবে এবং একটা স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে নিজের ইরাদামাফিক কোন কিছু করতে পারবে। তাই অনিশ্চিতভাবে সে এখন কেবলই ঘুরে বেড়ায়।

রওশন আরার দৃষ্টি এটা এড়ায়নি। উমিদ আলীর এই পরিবর্তন অনেক আগেই তাঁর নজরে পড়েছে। কিছুটা আন্দাজ-কিয়াস করলেও, গোলমালটা ফের বাধলো কোথায়, এ ব্যাপারে তিনি একদম নিশ্চিত হতে পারেননি। বেশ কিছুদিন থেকেই এটা জানার কোশেশ করছেন তিনি। কিন্তু মওকা ফুরসৎ পাচ্ছেন না। বলা যায়, উমিদ আলীই সে মওকা তাঁকে দিচ্ছে না। পয়লা পয়লা জানার চেষ্টা করতেই সে কাশিম বাজার চলে যায়। হপ্তাকাল অন্তর ফিরে আসার পরও উমিদ আলী আর আগের মতো রওশন আরা বেগমের নাগালের মধ্যে আসছে না। অধিক সময় এখন তার বাইরে বাইরেই কাটে। যে স্বল্প সময়টুকু সে এখন অন্দর মহলে থাকে, গুলশান আরার ফরমায়েশ খাটা নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে আর যথাসম্ভব রওশান আরাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। রওশন আরা তাকে আর ফাঁকে আড়ালে পাচ্ছেন না।

আপছে আপ নাগালের মধ্যে না পেয়ে রওশন আরা বেগম একদিন নিজ উদ্যোগেই উমিদ আলীকে আটকালেন। অন্দরের কাজ শেষ করে উমিদ আলী বাইরে বেরিয়ে যেতেই রওশন আরা বেগম তাকে এক আড়াল কক্ষে ডেকে নিলেন এবং মুখের নেকাব টেনে দিয়ে প্রশ্ন করলেন—কি হলো, আবার আপনার পাখা গোজালো নাকি?

আচমকা এই পরিস্থিতিতে পড়ে উমিদ আলী সংকুচিত হয়ে গেল। সে থতমত করে বললো—জি?

রওশন আরা বললেন—আবার এমন উড়ু উড়ু ভাবটা পয়দা হলো কি কারণে? উড়াল দেয়ার খাহেশ জেগেছে নাকি আবার?

উমিদ আলী বললো—উড়াল দেয়ার খাহেশ!

ঃ মানে এই খাস মকান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার খাহেশ।

ঃ সেকি! খাস মকান ত্যাগ করে কোথায় যাবো আমি?

ঃ আপনার নিজ গাঁয়ে বা অন্য কোথায়ও? সেটা আমি বলবো কি করে?

ঃ তার মানে? তা আমি যাবো কেন?

ঃ যাবেন কেন, সেটাও আপনারই ব্যাপার। হয়তো এই মকান আর ভাল লাগছে না আপনার।

মকানটা যে তেমন ভাল লাগছে না আর, এটা ঠিক। কিন্তু তাই বলে মকানটা ত্যাগ করে একেবারেই চলে যাওয়ার সেই আগের ইরাদা উমিদ আলীর এখন আর নেই। সে ইতস্ততঃ করে বললো—ভাল লাগছে না মানে?

ঃ তাই যদি লাগবে, তাহলে এত বাইরে বাইরে থাকেন কেন? অন্দরে তো আজকাল আর পাওয়াই যায় না আপনাকে?

উমিদ আলী এবার সহজ হয়ে বললো—ও, এই কথা? তা আপনি ঠিক ধরেছেন। আমি একটা কাজের তালাশ করছি। মানে কোন একটা কাজের সাথে জড়িত হতে চাচ্ছি।

ঃ কাজ?

ঃ জি-জি। অন্দর মহলে এভাবে আর কতদিন কাটে বলুন? ভবিষ্যতের চিন্তা তো একটা করতে হয়।

ঃ ভবিষ্যতের চিন্তা!

ঃ জি তাই। নামেই আমি সৈনিক। কিন্তু কাজে আমি কিছুই নই। নির্দিষ্ট কাজ একটা না থাকলে ভবিষ্যতে আমি তো পঙ্গু হয়ে যাবো। আমার দ্বারা কোন কিছুই হবে না বা আমার দাঁড়ানোর স্থানও থাকবে না।

ঃ বলেন কি! হঠাৎ করে নিজেকে নিয়ে এতটাই ভাবতে শুরু করেছেন? কৈ? আগে তো এমন উৎসাহ একটুও দেখিনি?

ঃ সে কথা ঠিক। আগে এসব একটুও ভাবিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ভাসমান মানুষের আখের বলে কোন কিছুই থাকে না, আর তার দ্বারা কোন কাজই হয় না। সে নোঙরহীন কিস্তি।

ঃ বটে! তাই কাজের তালাশ করছেন?

ঃ জি। দাঁড়াবার মতো একটা অবস্থান চাই আমার। মানে, আপনাদের মকানের একজন হয়ে থাকলেও আমার এমন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চাই, যা আমার আগামীর জিন্দেগীর অবলম্বন হতে পারে।

ঃ ও, আপনি আপনার আগামী জিন্দেগীটা মজবুত করতে চান?

ঃ চাইলেই তো আর সব কিছু হয় না। তবে উম্মিদ আমার সেইটেই।

রওশন আরা বেগম এবার আহত কণ্ঠে বললেন—তাহলে দেশোদ্ধার শ্যাষ?

ঃ দেশোদ্ধার!

ঃ এই যে দেশের ভাবনায় এত আপনার হাহুতাশ, দেশের লোকদের হুশিয়ার করে দেয়ার কাজে এত আপনার আগ্রহ, বিলকুলই তা খতম?

উমিদ আলী সবিস্ময়ে বললো—কেন-কেন, খতম হবে কেন? সেই জন্যেই তো আমি একটা অবলম্বন খুঁজে বেড়াচ্ছি। একটা এমন অবস্থান চাচ্ছি, যেখান থেকে ঐ কাজটা করার আমার পরিবেশ পয়দা হয় আর উৎসাহ উদাম

আসে। প্রেরণা-উৎসাহ ছাড়া সেরেফ একক উদ্যম কে কতক্ষণ ধরে রাখতে পারে, বলুন ?

ঃ হুঁউ ! তা তেমন কোন অবস্থানের সন্ধান কি কিছু পেয়েছেন ?

জবাবে উমিদ আলী ঝট্‌পট্‌ করে বললো—সেই হয়েছে মুস্কিল ! কাজতো এই প্রশাসনে হাজারটা আছে। যোগ্যতা মতো এর যে কোন একটা চাইলে ভাইজানও হয়তো সেটা দিয়ে দেবেন আমাকে। কিন্তু কোন্ কাজে গেলে আমি সেই পরিবেশটা পাবো, মানে স্বচ্ছন্দে আমার সেই হুঁশিয়ারীটা দিয়ে বেড়াতে পারবো, কারা তা বুঝবে, কে গ্রহণ করবে, কে আমার এই কাজের দোসর-বান্ধব হবে, আমার প্রেরণারজন হয়ে কে বা কারা আমার পাশে এসে দাঁড়াবে, এমন কোন অবস্থান আর মানুষ আমি কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে।

উমিদ আলী হতাশভাবে তাকালো। রওশন আরা বেগম শক্ত কণ্ঠে বললেন—পাবেন না।

ঃ জি ?

ঃ এ দুনিয়ার সবাই আপনার মতো পাগল নয়। নিজের খেয়ে পরের ভিটেয় মাটি কাটার গরজ সব মানুষের থাকে না। ভূতের বেগার খাটার মানুষ এ দুনিয়ায় কম।

ঃ সেকি ! ভূতের বেগার বলছেন কেন ? এটাতো মস্তবড় কাজ। দেশ ও জাতির প্রভূত হিত সাধনের কাজ ?

ঃ দেশ-জাতির সেই হিত সাধনের সখ আপনার মতো অন্য লোকের থাকলে তো ?

নিমেষ খানেক চুপ থাকার পর উমিদ আলী বললো—তা হয়তো তাই-ই। তবে আপনি তো জানেনই, আমার তো আর অন্যকোন সখ আগ্রহ নেই, পাগলামী বলেন—নেশা বা সখ বলেন—আমার তামাম উৎসাহ এখানেই। এটাও আপনি জানেন যে, আমি ইতিহাসের ভক্ত, ইতিহাসই আমার জগৎ। পড়াশুনাও যা কিছু আমার, তামামই তা ঐ নিয়েই। দেশের অতীত বিপর্যয় পর্যালোচনা করে করে আমার মানসিক অবস্থা এমনই এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, দেশের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখলেই, আমি আর স্থির থাকতে পারিনে। বিপর্যয় ঠেকানোর এতটুকু কাজে লাগার মধ্যে আমি যে আনন্দ পাই, তা আর অন্য কোন কিছুতেই পাইনে।

ঃ একথা আমাকে নতুন করে বলতে হবে কেন ? ওটা কি আর আমি জানিনে ?

ঃ না মানে, ঐ যে আপনি জানতে চাইলেন—দেশ নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা খতম হয়ে গেছে কি না, সেই প্রেক্ষিতে বলছি। খতম হবার নয়

বুঝলেন ? ওটা আমার এমনই একটা নেশা, যা আমার রক্তের সাথে মিশে আছে।

রওশন আরা বেগম গম্ভীর হয়ে গেলেন। এই লোকটার প্রতি তাঁর যত মমতা যত আকর্ষণ তা তার এই মহৎ গুণের জন্যেই। তদুপরি, জ্ঞানগুণ ও প্রতিভার উজ্জ্বল এক নক্ষত্র হওয়া সত্ত্বেও লোকটা এত অসহায় যে, রওশন আরা তার প্রতি সদয় না হয়ে পারেননি। পারেননি ভান্ডার রিক্ত করে দরদ ঢেলে না দিয়ে। আর এই দরদ ঢেলে দিয়েই তিনি পড়ে গেছেন মুসিবতে। কখন যে কোন্ কারণে বিগড়ে যায় লোকটা, তার তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাল করতে পারেন না। আজও তা পারছেন না বলেই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বেশ, তা থাকলেই ভাল।

উমিদ আলী আপনভাবেই বলে চললো—কিন্তু আমার আসসোস্, আমার এই ধ্যান ধারণা নিয়ে আমি যে একা সেই একাই। দোসর-বান্ধব পড়ে মরুক, ন্যূনতম উৎসাহ দেয়ার লোকও আমি তালাশ করে পাচ্ছিনে !

রওশন আরা বেগম এবার বিগড়ে গেলেন। তিনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন—পাবেন না। পেতে আপনি পারেন না। পাগলের সাথে পাগলামী করার এত সখ-আহলাদ কার আছে যে, সে আপনাকে উৎসাহ দিতে আসবে ?

ঃ কেমন ?

ঃ মুহূর্তে মুহূর্তে মত পাল্‌টে যায় যে লোকের, কারো উপরই যে লোক আস্থা রাখতে পারে না, তার ধ্যান ধারণা আর আদর্শের সমর্থক হতে যাবে কে ?

ঃ একি বলছেন ? আমি আবার আস্থা হারালাম কার উপর।

রওশন আরা সক্রোধে বললেন—কার উপর ? আপনি জানেন না, আমি আপনার ঐ অনুভূতির একজন আন্তরিক সমর্থক ? আমি আপনাকে বলিনি, আপনার যত প্রেরণা যত উৎসাহ দরকার আমিই তা জোগাবো ? আপনার তামাম ব্যর্থতার সান্ত্বনা আমার কাছেই পাবেন আপনি ? পুনঃ পুনঃ একথা বলিনি আমি আপনাকে ?

উমিদ আলীর মাথাটা নুয়ে পড়লো। সে ম্লান কণ্ঠে বললো—জি, বলেছিলেন।

ঃ তবু আপনি ভিন্ন অবস্থান, ভিন্ন পরিবেশ তালাশ করছেন কেন ? এ মকান আর আপনার ভাল লাগছে না কেন ?

ঃ তা-মানে—

ঃ আমাকেই বা এভাবে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন কেন ? আমার উপর কোন আস্থাই রাখতে পারলেন না আপনি ?

এর জবাবে উমিদ আলী ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—না-না, তা হবে কেন ? আপনার চেয়ে বেশী উৎসাহ বেশী দরদ যে আর কারো কাছেই আমি পাবো না, সেটা তো নিশ্চিতভাবেই জানি। কিন্তু—

ঃ তাহলে আর কিন্তু কি ?

ঃ ঐ তো আগেই আমি বলেছিলাম, আপনি স্থায়ীভাবে সে উৎসাহ দিতে পারবেন না আমাকে ! অন্যের ঘরে চলে যাবেন আপনি ! আপনার ভরসাটা ক্ষণিকের ভরসা। কাজেই ও প্রশ্ন আর টেনে লাভ কি ?

ঃ ব্যস্ ! ঐ চিন্তা করেই আপনি এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন আমাকে ? আমার আশেপাশেও আসতে আর চাচ্ছেন না ?

পুনরায় সংকুচিত হয়ে উমিদ আলী বললো—তা আসা কি আর উচিত আমার, বলুন ?

রওশন আরা বেগম সবিস্ময়ে বললেন—উচিত নয় মানে ?

ঃ মানে, আজ বাদে কাল আপনার শাদি হবে, অন্যজনের ঘরণী হচ্ছেন আপনি, আমি কি করে আগের মতো আপনার আশেপাশে আসি ?

রওশন আরা বেগম চমকে উঠে বললেন—আমার শাদি হবে মানে ?

ঃ সেকি ! আপনার শাদি আর আপনি তা জানেন না ? আমার দোস্ত আবদুল আজিজের সাথেই তো আপনার শাদির কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে ?

রওশন আরা বেগম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। নিমেষ কয়েকের জন্যে তিনি বাক হারিয়ে ফেললেন। এরপর আস্তে আস্তে সহজ হয়ে বললেন—তাই বলুন ! এই ঘটনা তাহলে ?

ঃ জি ?

ঃ ফ্যাসাদটা এখানেই তাহলে বেধেছে ?

ঃ হ্যাঁ, মানে—

রওশন আরা তিক্ত কণ্ঠে বললেন—আমার শাদির কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে শুনেই আপনি এড়িয়ে চলা শুরু করেছেন আমাকে ?

ঃ জি-জি। তাই চলাই কি উচিত নয় আমার ? এছাড়া আমার ঘনিষ্ঠ দোস্তের সাথে শাদি। তিনি শুনলেই বা ভাববেন কি ?

ফেটে পড়লেন রওশন আরা বেগম। তিনি আক্রমণ করে বললেন—কোথায় শুনলেন একথা ? কে বললে আপনাকে যে আমার শাদির কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে ?

উমিদ আলী থতমত করে বললো—সেকি ! একথা তো অনেকেই জানে।

ঃ অনেকেই জানে মানে ?

ঃ কেন, আমার দোস্তের আব্বাজান নিজে আপনাদের মকানে এসে আপনাকে দেখে গেলেন আর শাদির কথা পাকাপাকি করে গেলেন, একথা তো খুব একটা গোপন কথা নয় ?

ঃ না, গোপন কথা হবে কেন ? তিনি এসে যে কিছুটা কায়দা করেই দেখে গেলেন আমাকে, মানে আমার বহিন আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়েই দেখালেন, ওটা আমি একটু পরেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে ? তার মানেই কি শাদির কথা পাকাপাকি হয়ে যাওয়া ?

ঃ কিন্তু কেউ কেউ তো বলছে, ভাইজান আর ভাবী সাহেবার সাথে আবদুল আজিজের আম্মা শাদির কথা বিলকুলই পাকাপাকি করে গেছেন। কথাটা গোপন রাখা হয়েছে, এই যা।

ঃ কেউ কেউ বলছে মানে ? আমার শাদি আর আমি তা জানবো না ?

ঃ তাজ্জব ! আপনি তা কিছুই জানেন না।

ঃ কিছুই জানিনে এটা আমি বলবো না। আমি অনুমান করতে পেরেছি যে, এমন কথাবার্তাই তাদের মধ্যে হচ্ছে। তার মানেই কি শাদি ?

ঃ শাদি নয় ?

ঃ আরে ! গাছে পাকা ফল দেখলে তো অনেকেই ঢিল ছুড়ে ! এসব ঢিল ঠেকাবে কে ? শাদির প্রস্তাব আনতে কারো মানা আছে ?

ঃ কি আশ্চর্য ! আমি শুনছি, শাদির কথা পাকা আর আপনি তা জানেন না !

ঃ না, জানিনে। কেউ আমাকে তা বলেনি।

ঃ না বললেও একদিন তা জরুর বলবেন। তখন তো আর আপনার না-জানা থাকবে না ?

ঃ তার মানে ? বললেন আর অমনি আমি রাজী হয়ে গেলাম ? আমি গরু না ছাগল যে আমার অজ্ঞাতেই আমার শাদির কথা পাকাপাকি হয়ে যাবে ?

ঃ অন্য কোথাও হলে হয়তো আপনার এ কথার যুক্তি আছে। কিন্তু আবদুল আজিজের সাথে যেখানে শাদি, সেখানে তো নিশ্চয়ই আপনার নারাজ হওয়ার কথা নেই। এসব কথা ভেবেই হয়তো আপনার অভিভাবকেরা আপনাকে আগে কিছু বলেননি ?

ঃ নারাজ হওয়ার কথা যে কিছু থাকবেই না, এটা আপনি নিশ্চিত হলেন কি করে ?

উমিদ আলী সবিস্ময়ে বললেন—সেকি ! নারাজ হওয়ার সত্যিই কোন প্রশ্ন -প্রসঙ্গ আছে নাকি ?

ঃ না থাকলে কি আর অমনি বলছি ?

উমিদ আলী হতবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দুই চোখ ফুটিয়ে তুলে বললো—কি গজব ! আবদুল আজিজকে পছন্দ করেন না আপনি ?

ঃ পছন্দ করবো না কেন ? কিন্তু একজনকে পছন্দ করা আর শাদি করা কি এক কথা ?

ঃ কি আশ্চর্য ! আবদুল আজিজ তো বর হিসাবে তোফা বর। চেহারা, চরিত্র, পদ, বংশ—সবই উমদা। তদুপরি, আপনাদের সকলের সে প্রিয়জন !

ঃ এমন প্রিয়জন মানুষের অনেক থাকে। ব্যবহার, চেহারা, পদ, বংশ—অনেকেরই উমদা হয়। তাই বলেকি তাঁদের সবাইকে শাদি করতে হবে নাকি ?

উমিদ আলী আবার লা-জবাব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ দম ধরে থাকার পর সে বললো—তাজ্জব মেয়ে আপনি তো !

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জি-জি, তাই তো দেখছি।

এরপর কিছুটা ইতস্ততঃ করে উমিদ আলী ফের বললো—আচ্ছা একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে ? কসুর নেবেন না তো ?

ঃ তা করতে চান করুন। ইতস্ততঃ করছেন কেন ?

ঃ না, বেয়াদবী হয়ে যায় কিনা, এই ভয় করছি।

ঃ সেটা পরে দেখা যাবে। আগে প্রশ্নটা তো করুন।

ঃ আপনি কি তাহলে অন্য কাউকে পছন্দ করেন ?

রওশন আরার নেকাব ঢাকা ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি ঠোঁট চেপে টেনে টেনে বললেন—অন্য কাউকে ? তা-মানে—

উমিদ আলী সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—না-না, নাম পরিচয় বলতে আপনাকে বলবো না। এটা জানার এখন খুবই আমার আগ্রহ হচ্ছে তো, এ কারণেই এ প্রশ্ন করছি।

ঃ তাই ?

ঃ জি-জি। আপনার আপত্তি থাকলে এ প্রশ্নের জবাব দিতেও আপনাকে বলবো না। প্রশ্নটা তো আসলে বেয়াড়া প্রশ্ন আমার !

এই হলো উমিদ আলী। এমনই পরিষ্কার তার অন্তর। রওশন আরা তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—না, আপত্তি আর কি ? মেয়েদের কারো কারো নিজের কিছুটা পছন্দ করা লোক তো কেউ থাকতেই পারে ?

বেখেয়ালেই উমিদ আলী আবার ফস্ করে প্রশ্ন করলো—আপনার কি তা আছে ?

ঃ থাকাই তো স্বাভাবিক।

নেকাবের তলে রওশন আরা ফের হাসলেন। উমিদ আলী সোল্লাসে বলে উঠলো—সোবহানআল্লাহ ! তাই বলুন ? তাইতো আবদুল আজিজ দোস্তের মতো মানুষকে আপনি নাকোচ করে দিলেন। তা সে লোক বুঝি আবদুল আজিজের চেয়েও সবদিক দিয়ে শানদার ? মানে চেহারা-চলন, পদ-পদবী, বংশ-বুনিয়াদ—

কপটরোষে রওশন আরা বললেন—আরে থামুন-থামুন। আপনি কিন্তু আপনার ওয়াদার বাইরে চলে যাচ্ছেন। এতকিছু জানতে কিন্তু চাননি আপনি ?

উমিদ আলী শরমিন্দা হয়ে বললো—এ্যাঁ ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো। আচ্ছা থাক তাহলে ওসব কথা।

ঃ হ্যাঁ থাক। তবে ইতিহাসের নীরস ছবকই তো জিন্দেগীভর এস্তেমাল করেছেন। মানুষের দীলের ব্যাপারে কোন ছবকই পাননি আপনি। পেলে বুঝতে পারতেন, যেসব দিক বড় বলে মনে করছেন আপনি, দীলের বাজারে অনেক সময় সেগুলো কোন বিবেচ্য দিকই নয়। পদ সম্পদ বংশ বুনিয়াদ—কিছুই বিবেচ্য বিষয় নয়। সেখানে এমন দিকও চরম বিবেচ্য হয়, যা বেচাকেনার বাজারে একেবারেই ফালতু বস্তু। কানাকড়ির দামেও তা বিকোয় না।

উমিদ আলী তন্ময় হয়ে বললো—বলেন কি ?

ঃ সেখানে রাজপ্রাসাদের চেয়ে পর্ণ কুটিরের দামও অনেক সময় ঢের ঢের বেশী হয়। অনেক রাজ কন্যাও পাতার ঘরে যাওয়ার জন্যে জান দেয়, রাজার ঘরে যেতে চায় না।

উমিদ আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এসব কথা কিছু কিছু কাব্য-কবিতায় পড়েছি।

রওশন আরা শক্ত কণ্ঠে বললেন—কাব্য কবিতার কথা নয়। এটাও বাস্তব। ঈমান, বিবেক আর মহৎ অনুভূতিকে প্রাধান্য দিলে বাস্তবের রূপ এই রকম হয়। বিবেক, মনুষত্ব আর মহৎ অনুভূতির সাথে বেঈমানী করে স্বার্থকে প্রাধান্য দিলে বাস্তবের রূপ, আমরা যাকে বাস্তব বলি, সেই রকম হয়। অবশ্য এই পরের বাস্তবটাই আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত বাস্তব। কারণ, স্বার্থই এ সমাজের একমাত্র উৎস ও প্রাণ শক্তি। প্রথমটা উৎস অভাবে কদাচিৎ ঘটে বলে ওটাকে আমরা কাব্য কবিতায় ঠেলে দেই।

উমিদ আলীর চকিতে একবার মনে হলো শ্রীমতি ও বিশ্বনাথের কথা। সম্পদ-স্বার্থের দিকে ওদের কারো নজর ছিল না। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে উমিদ আলী বললো—কি তাজ্জব-কি তাজ্জব ! এ জ্ঞান আপনি কোথায় থেকে পেলেন ?

ঃ এ জ্ঞান সবসময়ই অর্জন করতে হয় না। ভুক্তভোগী হলে এ জ্ঞান আপছে আপ্ এসে যায়।

ঃ আচ্ছা !

ঃ যাকে সাপে কাটে সে একজন আদ্‌না আদমী হলেও, বিষের জ্বালার ব্যাখ্যা অনেক বিশেষজ্ঞের চেয়েও অনেক ভাল করে দিতে পারে।

ঃ মারহাবা-মারহাবা ! এটাও তো তাজ্জব আর এক জ্ঞানের কথা। কার মধ্যে কি জ্ঞান আছে, বাইরে থেকে দেখে তো তা মোটেই আন্দাজ করার উপায় নেই দেখছি। আসল সময় এলে তবেই তা বোঝা যায়।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে রওশন আরা বললেন—এসব কথা থাক। যা বলছিলাম, তাই বলি। আপনাকে প্রেরণা দিতে আমি যেখানে আগ্রহী, সেখানে আমাকে নাকোচ করে আপনি ভিন্ন উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন ?

জবাবে উমিদ আলী ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—না-না, আপনাকে সহায় পেলে তো আর কোন সহায়ই আমার জরুরত নেই। কিন্তু—

ঃ ফের কিন্তু !

ঃ কথা তো ঘুরে ফিরে ঐ একটাই। আবদুল আজিজের ঘরে আপনি যাবেন না, বুঝলাম। কিন্তু যাকে আপনার পছন্দ তার ঘরে যাবেন যখন, তখন কে আমার সহায় হবে, বলুন ?

ঠিক এই সময়ই প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবদুল আজিজের ঘরে রওশন আরা যাবে না, একথা কানে পড়তেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কথা শুনতে লাগলেন।

উমিদ আলীর প্রশ্নের জবাবে রওশন আরা বললেন—কি তাজ্জব ! সেইদিন থেকেই তো আমি আপনাকে বলে আসছি, আপনার সহায় হতে পারবো না, এমন ঘরে কখনো আমি যাবো না ! এই সহজ কথাটা আর কতভাবে বোঝাবো আমি আপনাকে ?

ঃ কোথাও যাবেন না ?

ঃ কি করে যাবো ? এ দুনিয়ায় আপনার তো 'আহা' বলার বান্ধব নেই। দুলাভাই আর কয়দিন আগ্‌লে রাখবেন আপনাকে ? এত সময়ও তাঁর নেই। এ অবস্থায় আমিও সরে গেলে আপনার হালতটা কি হবে তা কি কিছু ভেবেছেন ? বিলকুল এক আলাভোলা মানুষ আপনি। এত জ্ঞানগুণ আর ঐ অতবড় মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু একটু হাল ধরার লোকের অভাবে কোন্‌দিন যে কোথায় আপনি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবেন, তার ঠিক ঠিকানা আছে কিছু ?

ঃ জি ?

ঃ আপনাকে দেখবে কে ? আপনার মতো এমন একটা বিরল মানুষ আর আপনার ঐ বিরল আদর্শটা অলক্ষ্যে ঝরে যাবে, আপনার বিরাট খেদমত থেকে

দেশ ও জাতি বঞ্চিত হবে, এযাবত আমাদের এত সেবা করার পর বিনা তদবিরে আপনি পথেঘাটে পড়ে থেকে ধুঁকে ধুঁকে মরবেন আর আপনার কাজে লাগার অবকাশ আমার থাকতেও, আমি অন্যত্র সরে গিয়ে দিব্যিহালে রং তামাসা করবো, এতটাই স্বার্থপর আর বে-দীল আমাকে ঠাওড়ালেন ?

ঃ তা মানে—

ঃ আপনাকে না জানলে না চিনলে বা আপনার দুর্গতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে, এ দায়িত্ব আমার ঘাড়ে আসতো না। কিন্তু সব জেনেশুনে কি করে আমি সড়ে পড়ি, বলুন ? এতদিন এক সাথে থেকেও আপনি চিনতে পারলেন না আমাকে ?

উমিদ আলীর পরিতৃপ্তির অবধি রইলো না। তবে, রওশন আরা বেগম কি বলতে চান, এটা অনুমান করতে পারলেও, এতটা বিশ্বাস বা আশা করার সামর্থ না থাকায় সে ইতস্ততঃ করে বললো—কিন্তু আপনার শাদি ?

ঃ আগে আপনার আদর্শটা আপনি কাজে লাগাতে সক্ষম হোন, আপনার দ্বারা দেশটা উপকৃত হওয়া শুরু করুক, আপনার অপরিসীম জ্ঞান বুদ্ধির একটা সদ্‌গতি হোক, শাদির কথা তার পরে ভাববো।

উৎফুল্ল হয়ে উঠে উমিদ আলী বললো—কেয়া খোশ্‌-কেয়া খোশ্‌ ! তাহলে আর আমাকে পায় কে ? এমন হলে কি আর আমার ভাবনা আছে ? কিন্তু—

ঃ তবুও কিন্তু ?

ঃ কিন্তুর কি আর শেষ আছে ? এরপরও যদি আমার দ্বারা এদেশ উপকৃত না হয়, মানে আমি ব্যর্থ হই, তাহলে তো খামাখা আপনার শাদিটা আটকিয়ে দেয়া হবে !

ঃ আটকে থাকবে কেন ? ব্যর্থই যদি হোন, তাহলে আপনার ঐ ব্যর্থতাকেই তখন শাদি করবো আমি।

গভীরে ঢুকতে না গিয়ে উমিদ আলী তৎক্ষণাৎ বললো—সেকি ! তাহলে আপনার সেই পছন্দ করা লোকটার কি হবে ?

ঃ সে জাহান্নামে যাবে।

উমিদ আলী নির্বাক হয়ে গেল। একবার সে ভাবলো, রওশন আরা বেগম তার সাথে মশ্‌করা করছেন না তো ? তাই একটু পরে দিশেহারা কণ্ঠে সে বললো—মানেটাতো ঠিক বুঝলাম না ?

রওশন আরা কিছুটা উষ্ণ কণ্ঠে বললেন—এত তাড়াতাড়ি বুঝতে ওটা পারবেন না। আপনি তো এখন সেরেফ একটা ইতিহাসের স্তূপ ! মানুষ কোনদিন হোন যদি, তখন বুঝতে পারবেন।

জটিলতায় না থেকে উমিদ আলী সোজা পথ ধরলো। দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করার জন্যে সে সরল বুঝ নিয়ে সরাসরি বললো—সে যা হয় হবে। কিন্তু সমস্যার

সমাধান কোনভাবেই হচ্ছে না। আপনার সাথে আমার তো শাদি হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব যদি হতো, একমাত্র তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।

রওশন আরা বেগম শিহরিত হয়ে উঠলেন। মুহূর্তেই নিজেকে তিনি সামলিয়ে নিয়ে বললেন—সমস্যা মানে ?

ঃ কত সমস্যা ! এতদিন আপনাকে শাদি না দিয়ে আপনাকে রাখবেন আপনার অভিভাবকেরা ? আপনি না চাইলেও তারা জোর করেই শাদি দেবেন আপনার। সমাজ বলে তো একটা কথা আছে। দীর্ঘদিন এইভাবে থাকলে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে যে !

ঃ তাই নাকি ?

ঃ ওদিকে আবার বেশী বয়স হয়ে গেলে, হয়তো কেউ আর আপনাকে শাদি করতেই চাইবে না।

মুখ টিপে হেসে রওশন আরা বললেন—না চায়, আপনি তো রইলেনই। নাকি আপনিও তখন চাইবেন না ?

উমিদ আলী চমকে উঠে বললো—এ্যাঁ ! আমি ? আরে ধ্যাৎ ! আমার সাথে তাই তাঁরা শাদি দেন আপনাকে ? কিযে বলেন ?

একইভাবে রওশন আরা বললেন—তা ঠিক। আপনার মতো একজন বদ্ধ পাগলের সাথে কাউকে শাদি দেয়া ঠিকও নয়।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে উমিদ আলী বললো—পাগল ! আপনিও তাহলে পাগলই ভাবেন আমাকে ?

ঃ ভাবতে কি আর চাচ্ছি ? আপনিই তো বার বার তা ভাবিয়ে আমাকে ছাড়ছেন।

ঃ কি রকম ?

ঃ আর রকম কিসিম নেই। ওসব পরের ভাবনা পরে। চলুক কথা হলো, আপনি সবসময়ই আমাকে আপনার পেছনে পাবেন।

ঃ সত্যি ?

ঃ হ্যাঁ সত্যি। এখন যা বলি, তাই শুনুন।

ঃ জি আচ্ছা, বলুন—

ঃ পাগলের মতো ওভাবে আর বাইরে বাইরে না ঘুরে, যেভাবে এখন চলতে বলি আমি, সেইভাবে চলতে হবে আপনাকে । রাজী ?

ঃ জি-জি, রাজী।

ঃ কোন উড়ো কথা শুনে আর এভাবে পাগল হওয়া চলবে না। খট্‌কা লাগলে, সরাসরি আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করবেন সে কথা।

ঃ জি-জি, জরুর করবো।

ঃ এখন কাজের কথা বলি শুনুন। আপনার নসিহত আর হুঁশিয়ারী নিয়ে যার তার পিছে আন্দাজে আর ঘুরে বেড়িয়ে কাজ নেই। আপনি একটা কাজের সাথে জড়িত হতে চাচ্ছিলেন না ? এখন থেকে শিক্ষাদানের কাজে লাগতে হবে আপনাকে।

উমিদ আলী উদগ্রীব হয়ে বললো—এ্যাঁ ! শিক্ষাদান ?

রওশন আরা বললেন—হ্যাঁ। আপনার যা যোগ্যতা তাতে যেকোন বড় মাদ্রাসায় মুদাররেস্-মোহাদ্দেস হিসাবে সবাই আপনাকে লুফে নেবে। আপনি হবেন ইতিহাসের মুদাররেস্। রাস্তার লোক ধরে ধরে ইতিহাসের কথা বলে বেড়ানোর চেয়ে মাদ্রাসার তালেবে এলেমদের আপনি ইতিহাস পড়াবেন, আপনার উপলব্ধির কথা তাদের বোঝাবেন আর দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাদের সজাগ করে তুলবেন।

উদ্বেলিত হয়ে উঠে উমিদ আলী বললো—আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো ! ওটা তো আমি করতে পারি আর হিম্মতের সাথে করতে পারি !

ঃ করতে পারি নয়, করবেন। তাতে দেখবেন, অল্পদিনেই আপনার অনুভূতির কদর দেয়ার জন্যে আর আপনার উপলব্ধির সমর্থনে শত শত নওজোয়ান তৈয়ার হয়ে গেছে। এ ছাড়া, এতে আপনার সামাজিক মর্যাদাও বেড়ে যাবে অনেকগুণে !

ঃ মা-শা আল্লাহ ! এতবড় দিকটা এযাবত আমার নজরেই পড়লো না ! আমি কেবল সামরিক আর প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনা নিয়েই পড়ে রইলাম ? তাহলেই বুঝুন, একজন সঙ্গী-দোসর থাকার মাজেজাটা কি ? যেকোন দুই মাথা এক মাথার চেয়ে কতগুণে বেহতর ? আপনি খেয়াল করিয়ে না দিলে তো এ দিকটা জিন্দেগীতে ভাবতে আমি পারতাম না ?

ঃ পারবেন কি করে ? সারাদিন আমার বহিনের ফরমায়েশ খেটে বেড়াবেন আর সারারাত ইতিহাসের কিতাবের স্তূপের সাথে কুস্তি লড়বেন। এ দিকটা ভাবার আপনার সময় কোথায় ?

ঃ ঠিক-ঠিক। ভাইজানকে তাহলে আপনিই একটু বলুন। বলুন, সেপাইয়ের খাতা থেকে নামটা আমার কেটে দিয়ে, এই হুগলীর বড় মাদ্রাসায় ঢুকিয়ে দিন আমাকে। উনাকে আরো বলবেন, সেপাই হিসাবে কোন যোগ্যতার পরিচয় উনি আমার কাছে পাননি। কিন্তু একাজে যদি তাঁর মুখটা আমি উজ্জ্বল করতে না পারি, তাহলে যেন উনি আমাকে তাড়িয়ে দেন হুগলী থেকে।

ঃ তা যে আপনি পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

ঃ থাকতেই হবে। ঐ বড় মাদ্রাসার এক ইতিহাসের মুদাররেসের সাথে কথা বলে দেখেছি। ইতিহাসের যে জ্ঞান নিয়ে উনি শিক্ষাদান করছেন, ও জ্ঞান

আমি আমার তালেবে এলেম জিন্দেগীর আউয়াল ওয়াক্তেই হাসিল করে ফেলেছি। আপনি ভাইজানকে বলুন। আমার বিশ্বাস, ভাইজানও এখানে না করতে পারবেন না। উনি তো সব খবরই জানেন আমার।

প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে এদের কথা-বার্তা শুনলেন এবং উমিদ আলী তলিয়ে দেখতে না গেলেও, রওশন আরার ইচ্ছা-ইরাদার ব্যাপারটা তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। তাঁর শিশুর মতো সরল এই ভাইটির প্রতি রওশন আরার এই আত্মনিবেদন দেখে তিনি যারপর নেই খুশী হলেন। যে রকম একটা অবলম্বন উমিদ আলীর প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই রকমই একটা অবলম্বন তার জুটে যাচ্ছে দেখে, তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। অবচেতন মনে এমন একটা আকাঙ্খা প্রশাসক সাহেবের দীলেও ছিল। কিন্তু রওশন আরা এটা কখনো মেনে নেবে না ভেবে এ প্রসঙ্গই তিনি তোলেননি। আজ সে ভুলটা তাঁর আচানকভাবে ভেংগে গেল। এ খবর আগে জানলে গুলশান আরা বেগমের শত অনুরোধেও আবদুল আজিজের আব্বার সাথে তিনি মোলাকাত করতে যেতেন না।

অধিকক্ষণ আর এভাবে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয় বোধে, তিনি যেমন যাচ্ছিলেন তেমনই স্বাভাবিকভাবে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। কক্ষের দুয়ার খোলাই ছিল। তাঁদের সামনে দিয়ে প্রশাসক সাহেবকে যেতে দেখে উমিদ আলী ও রওশন আরা উভয়েই কিছুটা শংকিত ও সংকুচিত হয়ে গেলেন। এ প্রসঙ্গে পরে কথা হবে বলে তাঁরাও উভয়ে উভয় দিকে চলে গেলেন।

পরের দিন উভয়কে চমকিয়ে দিয়ে প্রশাসক জিন্দা মালিক উমিদ আলীকে নিজ দপ্তরে ডেকে নিলেন এবং হুগলীর বড় মদ্রাসায় আর একজন ইতিহাসের মুদাররেস্ প্রয়োজন জানিয়ে তিনি উমিদ আলীকে সেই পদে নিয়োগ দান করলেন।

আগামী কাল ঈদুল আযহা। গত ঈদুল ফেতরে গুলশান আরা বেগম বেশ খচর করেই আবদুল আজিজকে ঈদ উপহার দিয়েছেন। সময় না থাকায় আবদুল আজিজ তার বিনিময় দিতে পারেননি। এবারও সময়টা যায় যায় করতে করতে আবদুল আজিজ ঈদের আগের দিন ঢাকা থেকে ফেরত এলেন। হাতে করে নিয়ে এলেন তিন মোড়ক মসলিন কাপড়ের সুদৃশ্য লেবাস। রওশন আরা, গুলশান আরা আর শিরিবানু—এই তিনজনের জন্যে তিন প্রস্থ উম্দা মানের পোশাক। মানগত দিক দিয়ে এর দুই প্রস্থ পোশাক সম্ভ্রান্ত ও মূল্যবান হলেও, এর তৃতীয় প্রস্থ পোশাকটি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উচ্চ মূল্যের।

ঢাকার বাজার ঘুরে ঘুরে এই পোশাক খরিদ করেছেন তিনি। আগামী কাল সকালেই ঈদের নামাজ। আজকের বিকেলের মধ্যেই ঈদ উপহার খাস মকানে পৌছানোর ইরাদা নিয়ে আবদুল আজিজ তড়িঘড়ি ঢাকা থেকে ফিরলেন।

ঈদ উপহার কেনার জন্যেই আবদুল আজিজ ঢাকা সফরে যাননি। হপ্তাকাল আগে তিনি এক অপ্রীতিকর অভিযোগ নিয়ে ঢাকায় যান আর সেই অভিযোগের সুরাহা কাজে তাঁকে প্রায় এই হপ্তাকাল ধরে ঢাকাতেই আটকে থাকতে হয়। অভিযোগটা ফের ঐ ইংরেজদের আর এক শয়তানীর বিরুদ্ধেই।

সম্রাটের দরবার থেকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার ফরমান তারা অচিরেই লাভ করছে, তার তামাম ব্যবস্থা হয়ে গেছে, অচিরেই এই ফরমান এনে তারা বাংলার নবাবকে দেখাবে—এই টালবাহানা করে ইংরেজ বণিকেরা দীর্ঘদিন যাবত শুল্ক ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে এবং নামমাত্র ঐ তিন হাজার টাকা বাৎসরিক কর দিয়েই তারা বাংলা মুলুকে দেদারছে বাণিজ্য করে যাচ্ছে। নবাব শায়েস্তা খান সবিশেষ জানেন, শুল্ক দেয়ার কোন ইচ্ছেই এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিক গোষ্ঠীর নেই। একমাত্র এই মুলুক থেকে এদের উচ্ছেদ করার পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া এদের নিকট থেকে সহজে শুল্ক আদায় সম্ভব নয়। কিন্তু দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার খাতিরে আর সম্রাটের সর্বশেষ অভিপ্রায় জানার অপেক্ষায় নবাবও এদের বিরুদ্ধে কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ইংরেজদের সাথে সময়ে নরম সময়ে গরম—এই আচরণ করে কাল কাটিয়ে যাচ্ছেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের সেই অভিপ্রায় নবাবের কাছে এসে গেছে। বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার কোন ফরমান নয়, এসেছে ইংরেজদের নিকট থেকে শুল্ক আদায়ের কড়া নির্দেশ।

উত্তর ভারত বিজয় ও বিদ্রোহ দমন এবং সেই সাথে দাক্ষিণাত্যের ঝুট ঝামেলা থেকে কিঞ্চিৎ ফাঁক-ফুরসুৎ পেয়েই বাদশাহ আওরঙ্গজেব রাজধানী দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ইংরেজদের বাণিজ্যের ব্যাপারে তিনি খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন, পাটনার সুবাদার পাটনায় বাণিজ্যরত আর পাঁচটা বণিক গোষ্ঠীর মতো ইংরেজ বণিকদের নিকট থেকেও বাৎসরিক খাজনা সহ শতকরা সাড়ে তিন টাকা হাড়ে শুল্ক আদায় করছেন এবং তা নিয়মিতভাবে রাজকোষে জমা দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলা আর পাঁচটা বিদেশী বণিকের নিকট থেকে খাজনার সাথে নিয়মিতভাবে শুল্ক আদায় হলেও, ইংরেজ বণিকদের নিকট থেকে কোন শুল্ক আদায় হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে পাটনার সুবাদার সম্রাটকে জানান, বিদেশী তামাম ব্যবসায়ীদের চেয়ে ইংজেরদের ব্যবসাই এখন তুঙ্গে ও বেশী

লাভজনক। তারা এখন প্রচুর অর্থ কামাচ্ছে। সেই সাথে পাটনার সুবাদার আরো জানান, পাটনার চেয়ে বাংলা মুলুকে ইংরেজদের বাণিজ্য আরো অধিক জমজমাট। তামাম হিন্দুস্তানের মধ্যে বাংলা মুলুকেই তাদের ব্যবসা এখন সর্বাধিক লাভজনক। ইংরেজরা এখন ওখানেই অধিক ঝুঁকে পড়েছে এবং দুইহাতে মুনাফা লুটে নিচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে তদন্ত করে সম্রাট দেখলেন, পাটনার সুবাদার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য। ইংরেজদের আগের সেই দুর্দিন তো আর নেই-ই, বরং এখন তারা এদেশের প্রভূত অর্থ-সম্পদ সমানে কামাই করে নিয়ে যাচ্ছে আর তা দিয়ে নিজ দেশ ভরে তুলছে। অথচ চালাকী করেই বরাবর তারা শুল্ক ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। অতএব, শাহান শাহ আওরঙ্গজেব বাংলার নবাবকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন যে, কমপক্ষে শতকরা দুই টাকা হারে শুল্ক প্রদান না করে ইংরেজদের মাল বোঝাই একখানা নৌকাও যেন আর বাংলার বাইরে না যায়। যে মুহূর্তে এই নির্দেশ নবাব সাহেবের হস্তগত হবে, সেই মুহূর্ত থেকেই এই নির্দেশ বলবত হওয়া চাই।

সম্রাটের দরবারে ইংরেজদের উকিল ও চর আগে থেকেই ছিল। সম্রাটের এ আদেশনামা বাংলার নবাব বাহাদুর পাওয়ার আগেই এই আদেশের খবর বাংলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিদের কাছে এসে পৌছলো। তারা মাথায় হাত দিয়ে বসলো। সারাবছর ধরে মাল কিনে কিনে প্রতিটি কুঠিতে এই সময় তারা এত মাল জমা করেছিল যে, এই মালের উপর শুল্ক দিতে গেলে, কয়েক বছর ধরে তাদের যে শুল্ক দিতে হতো, এই একবারেই প্রায় সেই শুল্ক তাদের প্রদান করতে হবে। সারা বছরের এই মাল এখন তারা একটানা জাহাজ ভর্তি করে বাংলার বাইরে বালাসোরে ও মাদ্রাজে পার করার উদ্যোগ আয়োজন করছিল। এই সময় এলো সম্রাটের এই আদেশ।

কোম্পানীর প্রতিনিধিরা দিশেহারা হয়ে গেল। তারা জানে, সম্রাটের আদেশের একচুল নড়চড় বাংলার নবাব করবেন না। এ আদেশ তাঁর হাতে পড়ার সাথে সাথেই হুগলীর প্রশাসকের কাছে এ আদেশ চলে যাবে এবং বাংলাদেশ থেকে মাল পার করার একমাত্র পথ—হুগলীর নদী তাদের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে। তারা তৎক্ষণাৎ ঢাকার কুঠিয়াল প্রধান ফীচ্ নেদহ্যামের কাছে ছুটলো এবং তাকে বললো—ঘুষ লাগাও, ঢালাও ঘুষ। কমপক্ষে একপক্ষকাল পর্যন্ত হুগলীর প্রশাসকের প্রতি এ প্রেক্ষিতে নবাবের আদেশপত্র ঢাকাতেই আটকে থাকা চাই।

হলোও ঠিক তাই। ফীচ্ নেদহ্যামের নিপুণ চেষ্টায় নবাবের আদেশপত্র সেরেস্তার কিছু অসৎ কর্মচারীদের কারসাজিতে সেরেস্তাতেই আটকে রইলো।

নবাব জানলেন, সম্রাটের নির্দেশ সম্বলিত তাঁর আদেশপত্র হুগলীতে সংগে সংগেই পৌছে গেছে। কিন্তু হুগলীতে তা পৌছালো না।

এদিকে শুরু হলো মাল পার করার তুলকালাম তৎপরতা। দিনরাত সমানে ইংরেজদের মালবোঝাই জাহাজ ও নৌবহর হুগলী নদী বেয়ে বালাসোর ও মদ্রাজের দিকে ছুটতে লাগলো। মাল চললো ইংলণ্ডে। বেচাকেনা বা অন্যান্য তামাম কাজ বাদ দিয়ে ইংরেজদের এই হন্যে হয়ে জাহাজ নৌকায় মাল তোলা আর সেই মাল বাংলার বাইরে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে যাওয়ার তৎপরতা দেখে হুগলীর প্রশাসক, ফৌজদারগণ ও অন্যান্য আমলা-অমাত্য সকলেই তাজ্জব হলেন। কিন্তু ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক না থাকায়, তাঁরা বেয়াকুফ হয়ে বসে বসে কেবলই দেখতে লাগলেন। এর কারণ কিছু উদঘাটন করতে পারলেন না।

কারণটি উদঘাটিত হলো নবাবের আদেশপত্র প্রশাসক সাহেবের হাতে এসে পড়ার পর। আদেশপত্রে নবাবের স্বাক্ষরযুক্ত তারিখ দেখেই তাঁরা বুঝতে পারলেন, পত্রটি যেদিন প্রশাসক সাহেবের পাওয়ার কথা, সেদিন থেকে ইতিমধ্যে গোটা পনের ষোলটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইংরেজদের ঐ তৎপরতার কারণ সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আদেশপত্র পেয়েই সবাই ইংরেজদের জাহাজ নৌকা আটক করতে বেরুলেন। কিন্তু নদীতে এসে দেখলেন, হুগলী নদী সাফ। মাল নিয়ে ইংরেজদের আর একখানা ভেলাও হুগলী নদীতে ভাসছে না। তাদের কুঠিতে গিয়ে দেখলেন, ছেঁড়া কিছু চট-মাদুর আর ভাঙ্গাচুড়া বাক্সো-ট্যাক্সোই পড়ে আছে কুঠির মাল গুদামে। সেই সাথে আছে কিছু ইঁদুর, তেলা পোকা আর চামচিকের দুর্গন্ধ, কিন্তু মালের কোন নাম গন্ধও নেই।

পত্রের এই কারচুপির অভিযোগ নিয়েই আবদুল আজিজ ঢাকাতে ছুটে যান। ঘটনা-শুনেই নবাব শায়েস্তা খান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কারচুপির তদন্ত শুরু করলেন। তদন্ত কাজে সহায়তা করার জন্যেই নবাব বাহাদুর আবদুল আজিজকে কয়েকদিন ঢাকাতে আটকিয়ে রাখলেন। চুলচেরা ও দুর্নিবার তদন্ত প্রক্রিয়ার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই নবাবের চিঠিপত্র আদানপ্রদান সেরেস্তার একজন হিন্দু কারণিক ও একজন মুসলমান হুকুমবরদার ধরা পড়লো। এদের পিঠে চাবুক ফেলাতে এরা শুধু ফীচ্ নেদহ্যামের কথাটাই ফাঁশ করলো, কিন্তু সেরেস্তার আর কারো নাম এদের কাছে পাওয়া গেল না। এতবড় দুঃসাহসিকতার কাজ এই দুইজন চুনোপুঁটি কর্মচারীর দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না, সেরেস্তার কিছু রুই কাতলাও এর মধ্যে আছে, এই বিবেচনায়

তদন্তকাজ অব্যাহত রইলো। ধৃত আসামীদ্বয়কে আপাততঃ কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিয়ে নবাব বাহাদুর ফীচ্ নেদহ্যামকে কয়েদ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু ফীচ্ নেদহ্যাম তখন বাংলার ত্রিসীমানায় নেই।

ইতিমধ্যেই ঈদুল আযহা একেবারে দরওয়াজায় এসে হাজির হওয়ায় তদন্তের কাজ আপততঃ বন্ধ হলো এবং আবদুল আজিজও ছুটি পেলেন। আবদুল আজিজের আব্বা-আম্মা চাইলেন আবদুল আজিজ এবার তাঁদের সাথেই ঈদ করুক। কিন্তু তাঁর মকানে তাঁর অধীনস্ত ও আশ্রিত লোকদের ঈদ উদযাপন তাহলে চরমভাবে ব্যহত ও নিরানন্দ হয়ে যাবে—এই প্রসঙ্গ তুলে আবদুল আজিজ তাঁর আব্বা-আম্মার হাত এড়ালেন। পরের দিনই ঈদ উপহার কিনে নিয়ে তিনি হুগলীর দিকে রওনা হলেন।

হুগলীর মকানে এসে আবদুল আজিজ দেখলেন—তাঁর নিজ কক্ষের বারান্দায় বসে শিরিবানু এক অপরিচিতা যুবতীর সাথে গল্পালাপে মগ্ন হয়ে আছে। বিকল্প পথ থাকলে আবদুল আজিজ তাদের এই গল্পালাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু ঘরে ঢোকার পথ তাঁর এই একটাই। তাই তিনি দূরে থেকে জানান দেয়ার জন্যে জোরে কাশলেন। সে দিকে নজর দিয়েই শিরিবানু ও যুবতীটি চমকে উঠে দাঁড়ালো। অতপর ওড়না দিয়ে আব্রু করেই শিরিবানু সোল্লাসে বললো—আরে ছোট সাহেব ফিরে এসেছেন ? কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! তা দূরে দাঁড়িয়ে কেন ? আসুন-আসুন। এ মেয়ে আপনার অপরিচিতা নন। ইনি শ্রীমতি। শ্রীমতি রাণী। ঐ নয়া সেপাই বিশ্বনাথ বাবুর স্ত্রী।

আবদুল আজিজ কথা রেখেছেন। কাশিম বাজার থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরেই তিনি বিশ্বনাথ পোদ্দারকে ফৌজে ভর্তি করেছেন। বিশ্বনাথ এখন হুগলীতেই থাকে। শিরিবানুর কথা শুনে আবদুল আজিজ সহাস্যে বললেন—এ্যাঁ ! তাই নাকি ? বিশ্বনাথ তাহলে—

শিরিবানু বললো—জি-জি। এখানে ছোট্ট একটা বাড়ী নিয়ে পোদ্দার সাহেব গতকাল এই শ্রীমতি বহিন আর তাঁর মাকে হুগলীতে নিয়ে এসেছেন।

ঃ বহুত খুব-বহুত খুব। বিশ্বনাথ এ একটা খুব ভাল কাজ করেছে।

ঃ শ্রীমতি আপনাকে প্রণাম করতে এসেছে। গতকালই নাকি আসতে চায়। কিন্তু বিশ্বনাথ বাবু বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোন মতে রাতটুকু পার করেছেন।

আবদুল আজিজ এগিয়ে আসতেই শ্রীমতি গিয়ে ঢিপ করে আবদুল আজিজকে প্রণাম করলো। আবদুল আজিজ প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন—ভাল থাকো, সুখে থাকো, তোমাদের জীবন সুখের হোক, আমি এই দোআই করি।

আবদুল আজিজের ঈদ উপহারের থলেটি তাঁর এক সেপাইয়ের হাত থেকে ইতিমধ্যেই আজব আলীর হাতে এসে পড়েছিল। থলে হাতে আজব

আলী এসে শিরিবানুকে বললো—আপামণি, পোদ্দার বাবু ঐ বহিনকে এখন যেতে বলছেন। হুজুর ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, এখন আর তাঁকে পেরেশান না করে তাঁরা অন্য একদিন আসবেন, এই কথা বলছেন।

জবাবে আবদুল আজিজ বললেন—সেকি ! বিশ্বনাথ এসেছে ? কোথায় সে ?

আজব আলী বললো—ঐ ফটকের বাইরে আছেন হুজুর। এখন দেখা করতে এসে তিনিও আর হুজুরকে বিরক্ত করতে চাচ্ছেন না। বলছেন, অন্যদিন আসবেন।

একটু চিন্তা করে আবদুল আজিজ বললেন—সেই ভাল। তাহলে শ্রীমতিকে তুমি বিশ্বনাথের কাছে পৌছে দিয়ে এসো।

—বলেই তিনি শ্রীমতিকে বললেন—আসবে কিন্তু আর একদিন। আমি সত্যিই একটু ক্লান্ত আর ব্যস্ত আছি। আর একদিন অবশ্যই কিন্তু আসা চাই ?

মাথাটা কাত করে শ্রীমতি রাণী বললো—জি আচ্ছা।

ঈদ উপহারের থলেটা শিরিবানুর হাতে দিয়ে আজব আলী শ্রীমতিকে নিয়ে চলে গেল। থলেটা হাতে নিয়ে শিরিবানু আবদুল আজিজকে বললো—বাপ্‌রে ! এতবড় থলে ! এতে কি আছে ছোট সাহেব ?

আবদুল আজিজ সহাস্যে বললেন—কি আছে নিয়ে এসে দেখো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি বলবো ?

আবদুল আজিজ ঘরে ঢুকে জুতা মোজা খুলতে লাগলেন। আবদুল আজিজের নির্দেশে শিরিবানু থলে থেকে বড় বড় তিন মোড়ক পোশাক বের করে একে একে মোড়ক খুলে দেখতে লাগলেন। পয়লা মোড়ক খুলে পোশাক দেখেই শিরিবানু বিমোহিত হয়ে গেল। সে উচ্ছাসভরে বলে উঠলো—ওমা—কি চমৎকার ! কি সুন্দর লেবাস ! এত উমদা লেবাস কি করবেন ছোট সাহেব ? এতো বহুত দামী জিনিস !

আবদুল আজিজ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন—উপহারের জিনিস দামী না হলে চলবে কেন ?

ঃ উপহারের জিনিস !

ঃ মনে নেই, গত ঈদে ওঁরা আমাকে কতদামী ঈদের পোশাক দিয়েছিলেন ? এ ঈদে আমি কিছু না দিলে, মান থাকে আমার ?

ঃ ও, তাই বলুন ! তা তিন মোড়ক কেন ছোট সাহেব ? একটা বুঝি প্রশাসক সাহেবের জন্যে ?

ঃ জিনা। তামামগুলোই আউরাতের লেবাস। দেখোইনা সবগুলো ! দুই মোড়ক খাস মকানের ঐ দুই বহিনের জন্যে আর একটা এই মকানের একজনের।

শিরিবানু উৎসুক ভাবে বললো—এই মকানের একজনের মানে ?

ঃ সেটা জেনে তোমার কাজ নেই। তোমার দেখার কথা, আগে খুলে খুলে দেখো সব।

এরপর দ্বিতীয় মোড়কটি খুলে দেখতে লাগলো শিরিবানু। দ্বিতীয়টার লেবাসও ঐ একই সমান উমদা ছিল। তৃতীয় মোড়কটি খুলে লেবাস দেখে শিরিবানু একদম হতবাক হয়ে গেল। এ লেবাসটা উমদাই শুধু নয়, এটা প্রায়-রাজা-বাদশাহর ঘরের লেবাস। একমাত্র শাহজাদী বা নবাবজাদীকেই এ পোষাক মানায়। যেমনই জৌলুসদার, তেমনই মূল্যবান। শিরিবানুর বুঝতে কোন বেগ পেতে হলো না যে, এ লেবাসটি রওশন আরার জন্যেই পছন্দ করে কেনা হয়েছে। চকিতে সে একটু আনমনা হয়ে গেল।

তৃতীয় মোড়কের পোশাকের দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে আবদুল আজিজ স্মিতহাস্যে বললেন—কি ? পছন্দ হয় ?

শিরিবানু অলক্ষ্যে একটু চমকে উঠলো। এরপরেই ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—এ্যাঁ ! হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে না মানে ? বলেন কি ? এমন সব লেবাস তো চোখেই অনেকে দেখেনি। আমিও তেমন দেখিনি। আর এইটা, এ পোষাকটা রওশন আপাকে যা মানাবে ছোট সাহেব, তা বলে বোঝানো যাবে না। বিলকুল উনি নবাবজাদী বনে যাবেন।

ঃ গেলেই ভাল। রওশন আরা হোক বা অন্য কেউ হোক, এটা পরে কেউ যদি নবাবজাদী-রাজকুমারী না-ই হলো, তাহলে আর সারাবেলা ঘুরে ঘুরে কিনলাম কি ?

আবদুল আজিজ মুচকি হাসলেন। শিরিবানু তা লক্ষ্য না করে বললো—

ঃ ছোট সাহেব !

ঃ এখন মোড়কগুলো আবার ঠিক ঠিক যেমন ছিল তেমন করে বেঁধে ফেলো। আজ বিকেলেই দুটো মোড়ক খাস মকানে পৌছে দিতে হবে আমাকে। আগামী কালই ঈদ। ভুলে গেলে কিছুতেই আমার চলবে না।

মোড়কগুলো বাঁধতে বাঁধতে শিরিবানু বললো—এতে আবার ভুল হবার কি আছে ? ছোট সাহেব ভুলে গেলে আমিই তা খেয়াল করিয়ে দেবো।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই দিও। অনেক ঝামেলা মাথায় আমার এখন। আগামী কালই ঈদ। এদিকের আনযামটা কি হলো, না হলো এগুলো সব দেখতে হবে।

ঃ খেয়াল করিয়ে ঠিকই দেবো। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি ?

জাররা অভিমান ভরে শিরিবানু বললো—অবশিষ্ট মোড়কটা এ মকানের কার জন্যে আনলেন, তা কিন্তু ছোট সাহেব বললেন না।

আবদুল আজিজ হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন—এ মকানে একটা বেয়াড়া আউরাত আছে। জব্বোর এলেমদার।

বিদেশীরাও হার মানে। কিন্তু বড়ই বেত্তমিজ। ডাইনে বললে বাঁয়ে যায়। ওটা ঐ আউরাতের জন্যে।

শিরিবানু আগেই অনুমান করেছিল। এবার সে তৃপ্ত হলো। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে বললো—তার মানেটা কি হলো ছোট সাহেব ? যে বেয়াড়া আর বেত্তমিজ, তাকে আবার ঈদ উপহার দেয়া কেন ?

ঃ না দিলে, আমাকে সালুন রেঁধে খাওয়াবে কে ? আমার কি আখেরের চিন্তা নেই ?

শিরিবানু কপট রোষে বললো—ভাল হচ্ছে না কিন্তু ছোট সাহেব !

আফসোসের ভান করে আবদুল আজিজ বললেন—ভাল কি আমার হওয়ার কোন আশা ভরসা আছে কিছু ? আমার কথা এ মকানের কেউ যেখানে বুঝতে চায় না, সেখানে আর আমার ভাল হওয়ার সম্ভাবনা কি ?

ঃ এ আবার কোন্ কথা !

ঃ কোন্ কথা আবার ? গুলিস্তাঁ-বোস্তাঁ, দেওয়ান-রুবাইয়াৎ সবইতো মুখস্ত। এত কবিতা পড়েছো আর এ কবিতাটা পড়োনি—

যাহারে বুঝাতে চাই
সেজন বোঝে না, বোঝার গরজ নাই,
বুঝিলেও বুঝে, উল্টা অর্থটাই,
সান্ত্বনা নয়, গঞ্জনা শুধু,
ধিককার রূপে পাই।

ঃ ওটা কার কবিতা ছোট সাহেব ?

ঃ কারো নয়। এটা এই অধম আবদুল আজিজের কবিতা। তার একান্তই নিজস্ব মর্মব্যথা।

আবদুল আজিজ মুখ চেপে হাসতে লাগলেন। শিরিবানু ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—এটা তো বিলকুলই একটা উল্টা গীত গাইলেন ছোট সাহেব। গ না-ধিক্কার ছোট সাহেব আর ভোগ করলেন কখন ? ওটা ভোগ করার এই শিরিবানুই তো কুল্লে হকদার।

আবদুল আজিজ ভ্রূকুটি করে বললেন—এ্যাঁ ! তাই নাকি ? বেশ-বেশ ! তাহলে ওগুলো যার জিনিস তার জন্যেই থাক। হকদারের হক মারা ঠিক নয়। এবার বলো, শ্রীমতির সাথে বসে বসে এত কি আলাপ করছিলে ?

অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন হওয়ায় শিরিবানু খেই হারিয়ে বললো—

—শ্রীমতি !

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, শ্রীমতি। তার সাথে যে রকম মসগুল ছিলে আলাপ নিয়ে, তাতে তো মনে হলো—বারান্দায় একটা বাঘ উঠে এলেও নজরে কারো পড়বে না।

খেই পেয়ে শিরিবানু সোচ্চার কণ্ঠে বললো—তা মসগুল হওয়ার ব্যাপারই তো ছোট সাহেব ! ওদের জিন্দেগীটা যেভাবে বিরাণ হয়ে যাচ্ছিল আর ছোট সাহেবেরা হাত লাগিয়ে যেভাবে আবার তা ঠিকঠাক করে দিলেন, এটা কি কোন ছোটখাটো ব্যাপার ? নিতান্তই নসীবের বরকত ছাড়া ডুবা কিস্তি কারো এমনভাবে জেগে উঠে ?

ঃ নসীবের বরকত ?

ঃ বিলকুল নসীবের। শ্রীমতি যা বললো, তাতে এমনটি কখনো হতে পারতো না। জীবিতকালে শ্রীমতির বাপ ছিলেন দৌলতমান্দ মানুষ। বড় ঘর। সে তুলনায় বিশ্বনাথ বাবু তো একেবারেই কাঙাল আর এতিম। দুই বেলার আহারটাই জোটে না। তাগড়া নসীব না হলে এতটা উঁচুনীচুর মিল গড়িয়ে গড়িয়ে এসে শেষ পর্যন্ত হয়েই যায় এভাবে ? একদম তো গায়েবী ব্যাপার।

ঃ হুঁউ ! উঁচুনীচুর মিল ঘটতে তাহলে তাগড়া নসীব লাগে বুঝি ?

ঃ লাগে না ? নসীব সদয় না হলে এমনটি কি এ দুনিয়ায় কেউ আশা করতে পারে ?

ঃ তা ঠিক। এখন শিরিবানুর নসীবটা বা কেমন, না-না মানে, আমার নসীবটা বা কেমন ?

শিরিবানু চমকে উঠে বললো—জি ?

আবদুল আজিজ চেপে গিয়ে স্মিতহাস্যে বললেন—কিছু নয়-কিছু নয়। এসব কথা থাক। তা শ্রীমতি রাণী ঐসব কথাই বললো ?

শিরিবানু উদাস কণ্ঠে জবাব দিলো—জি-জি।

ঃ আমাদের কথা কি বললো ? মানে, আমার আর আমার দোস্তের কথা ?

পুনরায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে শিরিবানু বললো—দেবদূত-দেবদূত। শ্রীমতির ভাষায়, ছোট সাহেবরা এক একজন এক একটা দেবদূত। স্বর্গ থেকে নেমে এসে ওদের ভাঙ্গা নসীব জোড়া লাগিয়ে দিয়েছেন।

ঃ আচ্ছা !

ঃ ছোট সাহেবদের প্রতি ওদের যে কৃতজ্ঞতা দেখলাম, তার সীমামাত্রা নেই। সে বললো—"আমাদের স্বজাতির কেউ আমাদের জন্যে একটু 'আহা' পর্যন্ত করেনি। অথচ এই ভিন জাতির মানুষগুলো এসে এমন সেধেযেচে আমাদের ঝামেলা আর আমাদের দায় দায়িত্ব তুলে নেবেন, এটা কি কখনোও কল্পনা করা যায় ? এঁরা মানুষ নন, দেবদূত।

ঃ বলো কি !

ঃ শ্রীমতি বলে—"মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু কিছু ভাল কথা মাঝে মাঝে

শুনতাম। আমাদের স্বজাতির কেউ স্বইচ্ছায় না বললেও, যারা উপকৃত হতো, তারা ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলতো। কিন্তু মুসলমানেরা এত ভাল মানুষ, তা আগে বুঝতে পারিনি।"

ঃ তাই নাকি ? শ্রীমতি তাই বললো ?

ঃ শ্রীমতি আরো বললো, "সত্যি কথা বলতে কি দিদি, খারাপ লোকও যে মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু নেই, আমি তা বলতে চাইনে। কুসুমেও কীট থাকে যখন, এখানেও থাকা তা স্বাভাবিক। কিন্তু এদের প্রায় জনকেই এখন আমি যতই দেখছি, ততই তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। ভিনজাতির মেয়ের বিয়ের জন্যে গোপনে কেউ টাকা দেয়, মুসলমান জাতির মধ্যে এটাও দেখলাম। একি এক দুর্লভ জনগোষ্ঠী আপনারা দিদি !"

ঃ তাজ্জব ! এত কথাই বললে সে ?

ঃ শুধু এইটুকু ? আরো যা বললো, তা গুছিয়ে বলার সাধ্য আমার নেই। মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তারা নাকি এক চরম স্বস্তির মাঝে এসে গেছে। বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। এমন মুক্ত হাওয়ার পরশ বিন্দুমাত্র নাকি তারা, তাদের সমাজে পায়নি।

ঃ বেশ-বেশ। তারা স্বস্তির মাঝে থাকলেই আমি খুশী।

ঃ এ কারণেই বিশ্বনাথ বাবু নাকি এখন ইসলাম কবুল করার ইচ্ছে জোরদারভাবে পোষণ করতে শুরু করেছেন।

আবদুল আজিজ চমকে উঠে বললেন—সেকি ! তার মানে ?

ঃ ফৌজে ঢুকে উনি নাকি আরো অধিক মোহিত হয়ে গেছেন। প্রতিটি মুসলমান সেপাইয়ের কাছে উনি যে ইজ্জত-কদর পাচ্ছেন, এটা নাকি তিনি আশা করতেই পারেননি। উঁচু জাতের হিন্দুর কাছে আজীবন তিনি তাচ্ছিল্যই পেয়েছেন, এমন ইজ্জতের নামমাত্রও তাঁর সমাজে পাননি। এছাড়া মুসলমানদের মধ্যে অপূর্ব সমতা দেখে, উঁচুনীচুর ভেদ বা শুচিবাইয়ের বালাই নেই দেখে, উনি যারপর নেই অভিভূত হয়ে গেছেন। মনুষত্বের এত দাম আর কোন জাতির মধ্যেই উনি নাকি দেখেননি।

ঃ মানে ?

ঃ তাঁর স্বজাতি ছাড়াও, এই সব বিদেশী বণিকেরাও নাকি কালা-ধলা স্বদেশী-বিদেশী, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল—এসব ফারাগ করে চলে। তাই জাত-বর্ণ নিয়ে ওসব ঠেলাঠেলির মধ্যে না থেকে উনি ইসলাম কবুল করে স্বস্তি পেতে চান ?

ঃ সর্বনাশ ! এ ব্যাপারে শ্রীমতিকে তুমি উৎসাহ কিছু দিয়েছো নাকি ?

ঃ না-না ছোট সাহেব। আমি শুধু তার কথা শুনে গেছি, হ্যাঁ-না, কিছুই বলিনি।

ঃ খবরদার-খবরদার। এখনও ওরা উপকার আর কৃতজ্ঞতার ধকে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কোন উপকারের কারণে বা লোভেটোপের আকর্ষণে কেউ ইসলাম কবুল করুক, এটা কখনও হতে দেয়া যাবে না। ইসলাম এর ঘোর বিরোধী।

ঃ ছোট সাহেব !

ঃ আবেগের বশে বা উপকারের বিনিময়ে নয়, ইসলামের সার্বিক মাহাত্ম হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে কেউ যদি ইসলাম আঁকড়ে ধরে, তখন আমরা আপত্তি করবো না। বরং তাতে খোশ আমদেদই জানাবো। কিন্তু এভাবে কস্মিনকালেও নয়।

ঃ হ্যাঁ, সেতো বটেই।

ঃ এ ব্যাপারে ওদের একবিন্দু উৎসাহও কখনো দেবে না। ওরা ছেলে মানুষ। আবেগ এদের বেশী, উপলব্ধি কম। এ অবস্থায় উৎসাহ দিলে ঈমানদারীর বরখেলাপ করা হবে।

ঃ কিযে বলেন ছোট সাহেব ! আমি কি তাই দিই ? এত পড়াশুনা করে তাহলে কি জ্ঞানটা হলো আমার ?

ঃ সাব্বাস ! উপকার পেয়ে যারা আবেগাপ্লুত হয়নি, মানে একেবারেই যারা আনকা, অন্য ধর্মের সে সব লোকের কাছে আমরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাবো, ইসলামের মাহাত্ম বুঝাবো। বুঝে তারা ইসলাম কবুল করুক এটা মনে প্রাণে চাইবো, কিন্তু কোন কায়দায় ফেলে নয়। শ্রীমতি বারেক এসে এসব কথা তুললে, তার কথায় মোটেই কান দেবে না।

ঃ জি-জি। বলছিই তো, এটা আমাকে মোটেই বোঝাতে হবে না।

ঃ বেশ। তাহলে এবার এসো। এখন আমি লেবাস বদল করবো।

আবদুল আজিজ হাসতে লাগলেন। সচকিত হয়ে শিরিবানু বললো—ওমা তাইতো ! এতক্ষণ তা বলেননি কেন ? ঘামে আর ধূলোবালীতে লেপ্‌টে যাওয়া ঐ লেবাসেই তত্ত্ব-আলাপ চলছে ? ছিঃ ! ছিঃ ! আমিও খেয়াল করিনি। নিন-নিন, শিগ্গির লেবাস পাল্টে ফেলুন আর হাত মুখ ধুয়ে নিন। আমি খাওয়ার আনযাম দেখি—

শিরিবানু দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল।

বিকেল বেলা আবদুল আজিজ খাস মকানে চললেন। সেজেগুজে দুই মোড়ক ঈদ উপহার নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং অবশিষ্ট

মোড়কটি শিরিবানুকে তুলে রাখতে বললেন। মোড়কটা পালংকের উপর কিছুটা খোলা অবস্থায় ছিল। শিরিবানু ঘরে ঢুকে মোড়কটি মেলে ধরেই চমকে উঠলেন। এই মোড়ক সেই মোড়ক যার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম পোষাকটি আছে এবং যে পোষাক রওশন আরার জন্যেই কেনা হয়েছে বলে শিরিবানুর ধারণা।

আবদুল আজিজ মস্তবড় ভুল করেছেন, এই ভুলের জন্যে সেখানে গিয়ে তিনি যারপর নেই অনুতপ্ত হবেন, এটা বুঝতে পেরেই শিরিবানু মোড়কটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। আবদুল আজিজ তখন অন্দর মহলের দেউটির কাছে পৌছেছেন। শিরিবানু দৌড়ের উপর তাঁর দিকে আসতে লাগলো এবং উচ্চস্বরে বলতে লাগলো—ছোট সাহেব-ছোট সাহেব, থামুন-থামুন। আপনি মস্তবড় ভুল করেছেন-বিলকুল গোলমাল করে ফেলেছেন—

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে আবদুল আজিজ বললেন—গোলমাল করে ফেলেছি !

হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে শিরিবানু বললো—কি গজবটা করে ফেলছেন দেখুন তো ? ভুল করে আসলটা ফেলে রেখেই যাচ্ছেন ?

শিরিবানু মোড়কটা বাড়িয়ে ধরলো। আবদুল আজিজ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আসলটা !

ঃ জি-জি, আসলটা। এত পছন্দ করে রওশন আপার জন্যে যে লেবাসটা কিনলেন, সেইটেই ফেলে রেখে যাচ্ছেন ?

ঘটনাটা বুঝতে পেরে আবদুল আজিজ গম্ভীরভাবে শিরিবানুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। শিরিবানু ফের একইভাবে বললো—এতবড় ভুলটাই শেষে করলেন আপনি ছোট সাহেব ?

আবদুল আজিজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কে বললে ভুল করেছি আমি ?

ঃ বলতে হবে কেন ? এইতো রওশন আরা আপার জন্যে কেনা সেই লেবাসটা !

আবদুল আজিজ এবার ধমক দিয়ে বললেন—থামো ! কে বললে ওটা আমি রওশন আরা আপার জন্যে কিনেছি ?

হকচকিয়ে গিয়ে শিরিবানু বললো—এ্যাঁ ! তাঁর জন্যে নয় ?

আবদুল আজিজ বললেন—সারাবেলা ঢাকার বাজার ঘুরে ঘুরে ঐ পোষাকটা আমি কিনলাম, তা কি ঐ রওশন আরার জন্যে ?

হতভম্ব হয়ে শিরিবানু বললো—তাহলে ?

নিদারুণ মর্মদাহে আবদুল আজিজ বললেন—তখনও তুমি রওশন আরার কথাই বললে। আমি ভাবলাম ঠাট্টা করে বলছো। আসলেই তুমি কি কিছু বোঝো না ? না, বুঝেও বুঝতে চাও না !

শিরিবানু সম্বিতে ফিরে এলো। বিষয়টি উপলব্ধি করেই সে আনন্দে ও শংকায় থর থর কাঁপতে লাগলো। আবদুল আজিজ বলেই চললেন—এত এলেম, এত জ্ঞান তোমার ! তবু তোমার এই না বুঝার ভান করার অর্থ কি ?

ঃ ছোট সাহেব !

ঃ এখনই এর ফয়সালা হওয়া চাই। তোমার প্রতি আমার কোন মুহাব্বত থাকুক, এটা তুমি চাওনা বলেই কি ঐ না বুঝার ভান করো ?

শিরিবানু চমকে উঠে বললো—দোহাই ছোট সাহেব, ভুল বুঝবেন না আমাকে !

আবদুল আজিজ মরিয়া হয়ে বললেন—ভুল ? আমার দীল কি চায়, এতদিনেও এটা না বুঝতে চাওয়ার হেতুটা কি তোমার ? কার মুখ চেয়ে এতদিন বসে আছি আমি ?

আনন্দে ও শরমে শিরিবানুর কম্পন আরো বৃদ্ধি পেলো। মাথাটা তার জমিনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। সেও মরিয়া হয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললো—বুঝি ছোট সাহেব, আমিও তা দীল দিয়েই বুঝি। কিন্তু—

ঃ কিন্তু ?

ঃ আমি সাহস পাইনে। আমার নসীব যে সত্যিই এতটা উজালা। এটা বিশ্বাস করতে সাহস পাইনে আমি ?

ঃ কেন পাওনা ?

ঃ আমার ভয় করে। আমার সন্দেহ জাগে ছোট সাহেব। কোন্ পুণ্যের বলে এতটা সৌভাগ্য আশা করবো আমি ?

ঃ শিরিবানু !

ঃ অথচ আবার এই সৌভাগ্যের আশাতেই আমি চাতকের মতো চেয়ে আছি জিন্দেগীভর।

ঃ শিরিবানু !

ঃ আমি যাই ছোট সাহেব।

আবদুল আজিজ এতক্ষণে লক্ষ্য করলেন, শিরিবানু প্রবল বেগে কাঁপছে। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে সে। এটা লক্ষ্য করেই তিনি চমকে উঠে বললেন—এ্যাঁ ! একি ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাও। ও পোশাক তোমার জন্যেই এনেছি। এখন ওটা আপাততঃ তুলে রাখো। খাস মকান থেকে ফিরে এসে এ মকানের সবাইকে যখন কিছু কিছু ঈদ উপহার দেবো তখন সবার সামনে তোমাকে ওটা দেবো আমি।

আবদুল আজিজ বেরিয়ে গেলেন। শিরিবানু কম্পিত হস্তে লেবাসের মোড়কটা বুকের সাথে চেপে ধরলো বিপুল আবেগে।

১০

অকস্মাৎ বাংলা মুলুকের আবহাওয়াটা একেবারেই বদলে গেল। শহর-নগর গঞ্জ-বন্দর সর্বত্রই সকলে সচকিত হয়ে উঠলেন। বাংলা মুলুকের শুভাকাঙ্খীরা মুষড়ে পড়লেন আফসোসে। দুষ্টজনের ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠলো হাসি।

বাংলার নবাব শায়েস্তা খান বাংলা থেকে বদলী হয়ে গেছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজ্য জয়, বিদ্রোহ দমন ও দাক্ষিণাত্যের ঝামেলা নিয়ে অধিক সময় ব্যস্ত থাকায় দিল্লীর প্রশাসনকে সহায়তা করার কাজে তিনি তাঁর প্রবীণ ও দূরদর্শী মাতুল শায়েস্তা খানকে দিল্লীতে পার করে নিয়েছেন। বাংলার সুবাদার হয়ে তাঁর স্থানে এসেছেন দিল্লীর এক সভাসদ ফিদাই খান "নবাব আজম খান" উপাধি নিয়ে। তিনি আরো বেশী বয়সী ও বাংলার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ লোক। ফলে, শায়েস্তা খানের গড়ে তোলা বাংলার সুদৃঢ় শাসনযন্ত্র নড়বড়ে হয়ে গেল। কিছু অসৎ ও উদ্দেশ্য প্রবণ লোক সংগে সংগে ঘিরে ধরলো ফিদাই খানকে। বন্ধ হলো পত্রের ঐ কারচুপির তদন্ত। ফটক থেকে বেরিয়ে এলো ধৃত আসামীদ্বয়। ফীচ্ নেদহ্যাম পুনরায় ফিরে এলো খোশহালে। ঢাকার কুঠিতে সে জেঁকে বসলো আবার। সেই সাথে হাঁফ ছাড়লো ইংরেজ বণিকেরা। সকলই তারা নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করতে লাগলো।

মাথায় হাত দিলেন ফৌজদার আবদুল আজিজ, প্রশাসক জিন্দা মালিক ও হুগলীসহ অন্যান্য সকল স্থানের বাংলা মুলুকের শুভাকাঙ্খী প্রশাসক, ফৌজদার এবং পদস্থ কর্মকর্তারা। বেসামাল কিস্তির দাঁড়ি মাল্লার মতো তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে যদিও শায়েস্তা খান সাহেব আবদুল আজিজ সহ আরো অনেককে অনেক সাহস-উৎসাহ জুগিয়ে গেলেন, অনেক নসিহত-নির্দেশদান করলেন, প্রয়োজনে দিল্লীতে গিয়ে তাঁর সাথে মোলাকাত করতে বললেন, তবুও তামামই তা সান্ত্বনা বই সুরাহা কিছু নয়। সৃষ্ট এই পরিস্থিতির সমাধানে সে সবের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ।

চারটে মাসও পেরুলো না। নবাব আজম খান ওরফে ফিদাই খান এন্তেকাল করলেন। সুবাদার হয়ে আবার এলেন সম্রাটের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা সুলতান মুহাম্মাদ আজম শাহ। তিনি ছিলেন বিলাসী ও শিকার প্রিয়। প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ দপ্তরে পড়ে থাকার মানসিকতা তাঁর ছিল না। ফলে, বাংলার প্রশাসন আরো অধিক কমজোর হয়ে গেল। বৃদ্ধি পেলো অসাধু আমলা অমাত্যের স্বার্থপর তৎপরতা। শুল্ককর প্রদানে ইংরেজদের টালবাহানা খোশহালে দীর্ঘায়িত হলো। কুঠিয়ালরা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তাদের দৌরাত্ম বাড়তে লাগলো গঞ্জ-বন্দর-বাজারে।

এমনই অবস্থার মধ্যে আবদুল আজিজের আম্মা ও গুলশান আরা বেগম আবদুল আজিজ ও রওশন আরার শাদির ব্যাপার নিয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁদের যুক্তি হলো, দেশের অবস্থা যা-ই হোক, তার জন্যে কারো বিয়েশাদি বা সংসার ধর্ম আটকে থাকতে পারে না, বিশেষ করে, এদের শাদির ব্যাপারটা যেখানে বহুৎদিন আগের স্থিরীকৃত ব্যাপার।

আবদুল আজিজের আম্মা এই সময় একদিন আবদুল আজিজের আব্বা আবদুল খালেক সাহেবকে জোরদারভাবে ধরে বসলেন। বললেন—তা ব্যাপারটা কেমন হলো ? হুগলীর প্রশাসক সাহেবের বেগমকে সেই কবে আমি জানিয়ে দিলাম যে, কিছুদিন বিলম্বও যদি হয়, তবু আমরা আবদুল আজিজের শাদি তাঁর বহিনের সাথেই দেবো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কতদিন পেরিয়ে গেল, তবু আপনি এ ব্যাপারে কিছুই বলছেন না যে ?

আবদুল খালেক সাহেব একজন দায়িত্বশীল আমলা ও বাংলা মুলুকের একজন প্রকৃত শুভাকাঙ্খী। প্রশাসনিক অবস্থার এই অবনতি শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি খুব মনমরা। খুব পেরেশান হয়ে আছেন তিনি। কোন কিছুতেই তাঁর আর তেমন উৎসাহ আগ্রহ নেই। শাসনদণ্ডের তেজ এই সেইদিন কি দেখলেন আর আজ কি দেখছেন ! পান থেকে চুন খসার উপায় ছিল না যেখানে, সেখানে আজ ইমারত থেকে আস্তর খসে যাচ্ছে। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। তাঁর নিজের কিছু করার নেই। তাই ধরাবাঁধা নিয়মে তিনি এখন দপ্তরের কাজ করেন আর অবসর সময়ে গুম্ হয়ে বসে থাকেন। এমত অবস্থায় আবদুল আজিজের আম্মা কামরুন নাহার বেগম এসে ঐ প্রসঙ্গ তোলায় তিনি বিব্রতবোধ করলেন। তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন—কি বলবো ?

কামরুন নাহার বেগম আক্রমণ করে বললেন—কি বলবো মানে ? হপ্তা নয়, মাস নয়, গোটা বছর পার হয়ে আর এক বছর চললো, তবু বলছেন কি বলবো ? তিনি তাকিদের পর তাকিদ দিয়ে চলেছেন আর আমি ধরাবাঙ্কা কথা দেয়ার পর তাঁর তাকিদের কোনই জবাব দিচ্ছিনে। এভাবে কি মুখটা আমার না পোড়ালেই নয় ?

ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু এই নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে কি করতে চান আপনি ?

কামরুন নাহার বেগম দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—আবদুল আজিজের শাদিটা আমি অতিসত্বর দিয়ে ফেলতে চাই। গতকালও আবার আমি তাকিদ পেয়েছি প্রশাসক গিন্নী গুলশান আরা বেগমের। বোনের বয়সটা তাঁর বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন। এ নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। আমাদের মুখ চেয়ে থেকেই তাঁরা এতদিন কাটিয়েছেন। আর তাঁরা চুপ থাকতে রাজী নন। মেহেরবানী করে জনাব এখনই শাদির আনযাম শুরু করুন।

আবদুল খালেক সাহেব সবিস্ময়ে বললেন—সেকি ! তাকি করে হয় ?

ঃ কি করে হয় মানে ? না করলে আর হবে কেন ? আবদুল আজিজের শাদিটা ধুমধাম করে দেবো, সেই কতদিনের সাধ আমার। জনাব দয়া করে সেই মোতাবেক আনযাম শুরু করুন। হপ্তা দেড়েকের মধ্যেই শাদির অনুষ্ঠান হয়ে যাক।

ঃ সর্বনাশ ! এ কখ্খনো সম্ভব নয়।

আবদুল আজিজের আম্মা হোঁচট খেয়ে বললেন—সম্ভব নয় !

আবদুল আজিজের আব্বা শক্ত কণ্ঠে বললেন—না, কখ্খনো নয়। ঘন ঘন প্রশাসনিক রদবদল আর সার্বিক অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতির কারণে এখন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেরই মন খারাপ। এর মধ্যে আমি ধুম ধাম বা উৎসব-উল্লাস কিছুই করতে পারিনে।

ঃ কেন পারিনে ? প্রশাসনিক অবস্থা যা হয় হোগ্‌গে। তাতে আমাদের কি এসে যায় ?

ঃ অনেক অনেক এসে যায়। যার শাদি সেও এই প্রশাসনের লোক, যাকে ধুমধাম করতে বেগম সাহেবা বলছেন, সেও এই প্রশাসনেরই লোক। প্রশাসনিক শান্তিতেই তাদের শান্তি, প্রশাসনিক অশান্তিতেই অশান্তি তাদের। এই অস্থির প্রশাসনিক অবস্থার মাঝে কিছুটা স্থিরতা না এলে, আমরা কেউই উৎসব নিয়ে মেতে উঠতে পারিনে।

ঃ তাজ্জব ! তাই বলে মানুষের ঘরসংসার আর সামাজিক কর্মকাণ্ড আটকে থাকবে সব ?

ঃ আটকে থাকবে না ঠিকই। কিন্তু কর্মকাণ্ডটি এমন হওয়া চলবে না যার ফলে পাঁচজনের সামনে কারো ভাবমূর্তি মিস্‌মার হয়ে যায় বা নিজেকে খেলো হতে হয়। বর্তমান অবস্থা নিয়ে দেশের সৎ আর ঈমানদার মানুষের কারো মনে ফূর্তি নেই। আমাকে তাঁরা অনেকেই মুরুব্বী বলে মানেন আর আমাকে ঘিরে দুঃখ আফসোস্ করেন। সেই আমিই ছেলের শাদির নামে ঘটা করে ফূর্তি আহলাদে লিপ্ত হই কি করে ? আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন। দেখা যাক, অবস্থা কি দাঁড়ায়।

কামরুন নাহার বেগম উৎকণ্ঠার সাথে বললেন—সেকি ! তাহলে কি হবে এখন ? আমি যে তাঁদের জানিয়ে দিলাম, এখনই আমরা শাদির আনযাম শুরু করছি, কয়দিনের মধ্যেই শাদির তারিখ ধার্য করতে লোক যাবে সেখানে, তাঁরাও সেই মোতাবেক তৈরী হতে শুরু করুন ! এখন কি হবে ?

ঃ এই কথাই জানিয়ে দিলেন তাঁদের ? আমাকে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই ?

ঃ জিজ্ঞাসা করবো কখন ? জনাবকে তো আজকাল আর তালাশ করেও পাওয়া যায় না ! ওদের পত্রবাহক ফিরে যাওয়ার সময় পত্রের জবাব চেয়ে বসলো। জনাবকে তখন হাতের কাছে না পেয়ে, ঐ কথাই আমি জানিয়ে দিলাম।

ঃ বেশ করেছেন। উত্তর পেয়ে তারা শাদির আনযাম শুরু করলে কেলেংকারীটা জমবে ভাল।

ঃ জনাব !

ঃ আবদুল আজিজের মতামত কি বেগম সাহেবা নিয়েছেন কিছু ?

কামরুন নাহার বেগম এবার কলকণ্ঠে বললেন—নিতে হবে না, নিতে হবে না ! সেতো একদম এক পায়ে খাড়া আছে। তার নিজের পছন্দ করা পাত্রী। এই দেরীটাযে তার কাছে কি কষ্টকর ব্যাপার হয়ে আছে, ওটা আমি এখান থেকেই বুঝতে পারছি।

ঃ তা পারো। তবু আমার এ অবস্থায় ফূর্তি করা সম্ভব নয়। মাথা কুটে কেউ মরলেও নয়।

কামরুন নাহার বেগম এবার হতাশ কণ্ঠে বললেন—আমি আর কিছুই ভাবতে পারছিনে। আমি এখন কি করবো বলুন ? কি আবার বলে পাঠাবো তাদের ?

কামরুন নাহার বেগম একদম নেতিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবদুল খালেক সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আর বলে পাঠিয়ে কাজ নেই। ছেলের শাদির ব্যাপারে এতই যখন অস্থিরতা, তখন আবার আপনি যান ওখানে। এবার গিয়ে শাদির আসল কাজটা সেরে ফেলেই আসুন গে।

ঃ কি রকম ?

ঃ এখানে কোন উৎসব আনযাম হবে না। ওখানেও হোক এটা আমি চাইনে। আগের মতোই আবার ওখানে গিয়ে আবদুল আজিজের মকানে উঠে সেরেফ ওদের শাদির 'আকদ'টা সেরে আসুন। একেবারেই অনাড়ম্বরভাবে শাদিটা ওদের হয়ে যাক। পরে পরিস্থিতি অনুকূলে এলে, যতটা আপনার খুশী, ততটাই ধুমধাম করে ছেলে-বউকে ঘরে নিয়ে আসবো আমি।

কামরুন নাহার বেগম অকূলে কূল পেলেন। কোন উপায় আর না দেখে খসমের এই প্রস্তাবই তিনি গ্রহণ করলেন এবং আবদুল আজিজ ও গুলশান আরা বেগমকে পত্র মারফত এই মর্মে খবর পাঠিয়ে দিয়েই তিনি মোটামুটি তৈরী হয়ে হুগলীতে রওনা হলেন। আবদুল খালেক সাহেব এবারও বেগমকে সঙ্গ দিতে পারলেন না। অন্য কথায়, বেগমের অতি উৎসাহের সাথে তিনি তাল রাখতে পারলেন না।

পত্র পেয়ে আবদুল আজিজ এবার আর মাথায় হাত দিলেন না। বরং তিনি রীতিমতো শক্ত হয়ে গেলেন। তিনি এখন খুবই ব্যস্ত। ঠিক মতো তার নাওয়া খাওয়াও নেই। উদ্ভূত এই প্রশাসনিক পরিস্থিতির কারণে তাঁকে এখন অধিক সময় বাইরে বাইরেই থাকতে হচ্ছে। প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব তাঁর সাথে এই মর্মে একমতে পৌছেছেন যে, দেশের অন্য স্থানের অবস্থা আর যে রকমই হোক, হুগলীর প্রশাসন আগের মতোই মজবুত থাকা চাই। এতে করে তাঁর দৌড় ঝাঁপের মাত্রা আগের চেয়ে অনেক গুণে বেড়ে গেছে।

এই অবস্থার মাঝে তাঁর আম্মার এই উদ্ভট ইরাদার কথা জেনে তিনি বিদ্রোহী হয়ে গেলেন। তাঁর আব্বাকে তিনি জানেন। এ পাগলামী তাঁর দ্বারা কখনও হতে পারে না। তাঁর আম্মাজানের বল্গাহীন আগ্রহের কারণেই আবার এই প্রহসনটা ঘটতে যাচ্ছে। আবদুল আজিজের অনুপস্থিতিতে তার দপ্তরে এই পত্র এসে পৌছেছে। পত্রবাহক নাকি তাঁর দপ্তরীকে এ কথাও বলে গেছে যে, সাহেবের এই শাদির ব্যাপারে সাহেবের আব্বাজান একেবারেই নির্লিপ্ত আছেন। কিন্তু সাহেবের আম্মাজানকে কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছে না।

আবদুল আজিজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর আম্মাজানের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন আতিশয্য বরদাস্ত করার ধৈর্য আর তাঁর রইলো না। তিনি যে সাবালক এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আম্মাজান একথা ভাবতেই কখনো চান না। আউরাতী বুদ্ধি নিয়ে তাঁর নকরীগত সুবিধে-অসুবিধের ব্যাপারটাও তাঁর আম্মাজানের চিন্তার মধ্যেই আসে না। সর্বোপরি, এতবড় একটা ব্যাপারে তাঁর মতামতের তোয়াক্কাও তাঁর আম্মাজান করেন না। আবদুল আজিজ স্থির করলেন, আম্মাজানের এই নিছক খেয়ালকে আর মুখ বুজে ছাড় দেয়া যায় না। যা-ই মনে করুন, আর নিজের দোষে যত দুঃখই পান, আম্মাজান এবার এলে, শাদি তিনি করবেন না, এই চরম সত্য কথাটা মুখের উপর জানিয়ে দিয়ে আম্মাজানকে ফেরত পাঠাতে হবে, এতে যা ঘটে ঘটুক।

পত্র প্রাপ্তির পর থেকেই তিনি মর্মদাহে অবিরাম ছটপট করতে লাগলেন। এরই মাঝে কাশিম বাজার থেকে আবার এক গোলমালের খবর আসায়, তিনি সেখানে চলে গেলেন।

ওদিকে গুলশান আরা বেগম কামরুন নাহার বেগমের ইরাদার খবর পেয়েই আনন্দে নেচে উঠলেন এবং যোগাড়যন্ত্রে লেগে গেলেন। খসম জিন্দা মালিক সাহেবের সাথে এ নিয়ে আলাপ করার আগেই তিনি "এটা আনো, ওটা করো" বলে মকানের চাকর-নফর, দাসী-বাঁদীদের অস্থির করে তুললেন।

ঘটনাটা সবিস্তারে শুনে আর কামরুন নাহার বেগমের পত্রখানা পড়ে প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব 'থ' মেরে গেলেন। রওশন আরার মনোভাব তিনি জানেন। অনিচ্ছায় হলেও সেদিন আড়াল থেকে উমিদ আলীর সাথে তার কথাবার্তা তিনি শুনেছেন। সেই সাথে রওশন আরার মেজাজও তিনি জানেন। জোর করে তাকে শাদি কবুল করাবে, এমন তাকত গুলশান আরার নেই। এর উপর ও পক্ষের পদক্ষেপটাও ঘোলাটে। বর একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। অথচ তার কোন ভূমিকাই এখানে নেই। এ নিয়ে কোন আভাস ইংগিতও তিনি বরের মধ্যে পাননি। সবকিছু মিলে অঘটন যে একটা ঘটতে যাচ্ছে নির্ঘাত, এটা আন্দাজ করে প্রশাসক সাহেব লা-জবাব হয়ে গেলেন।

ঘটনার কথা সবিস্তারে জানানোর পরও জিন্দা মালিক সাহেব এ ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত রয়ে গেলেন দেখে গুলশান আরা বেগম প্রথম প্রথম তাজ্জব ও পরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে তিনি এক সময় উষ্ণ কণ্ঠে বললেন—জনাবের মতলবটা কি শুনি ? আমার বহিনের শাদিটা যে আর ধরে রাখা ঠিক নয়, এটা কি মোটেই তাঁর চিন্তা-ভাবনায় নেই ? নাকি এটাকে তিনি বিলকুলই বাড়তি ঝঞ্ঝাট মনে করছেন ?

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিন্দা মালিক সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন—বটে ?

ঃ জনাবের ভাব দেখে তো তাই আমার মনে হচ্ছে।

ঃ তা যা মনে হয় হোক। যার শাদি সে আদৌ রাজী আছে কিনা, আগে সেই খবরটা করাই কি বেগম সাহেবার উচিত নয় ?

গুলশান আরা বেগম বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—তার মানে ?

প্রশাসক সাহেব বললেন—আমি যা বুঝেছি, বেগম সাহেবা আগে সেইটেই বুঝার কোশেশ করুন। শাদির ব্যাপারে রওশন আরার মেজাজ মর্জি মোটেই আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। তার মধ্যে কেমন একটা গুমোটভাব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে আমার।

ঃ গুমোট ভাব !

ঃ হ্যাঁ। ঝড় উঠার আগে মেঘের যে ভাব হয়, তেমনই একটা ভাব। একটু খেয়াল করলেই বেগম সাহেবা দেখতে পাবেন সেটা।

ঃ ওসব খেয়াল করার গরজ আমার নেই। আবদুল আজিজের মতো একটা ছেলেকে না-পছন্দ করার কোন কারণই থাকতে পারে না তার।

জিন্দা মালিক সাহেব হালকা কণ্ঠে বললেন—কি জানি, রমণীর মন নাকি কোন কেউই বুঝে উঠতে পারে না—এসব কথাই লোকে বলে।

গুলশান আরা বেগম অধৈর্য হয়ে বললেন—লোকে যা বলে বলুক। ঐ সব ফালতু কথা শুনার জন্যে আমি জনাবের কাছে আসিনি। এসব কি কোন কাজের কথা হলো ?

ঃ কিন্তু—

ঃ কেন এসব ফালতু কথা তুলে জনাব পাশ কাটিয়ে যেতে চান, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, রওশন আরার ঘাড়ে যদি সত্যিই কোন ভূৎ চেপে থাকে, ঝেটিয়ে আমি তার ঘাড় থেকে তা নামিয়ে দেবো। এসব ভাবনা জনাবকে এত কে ভাবতে বলেছে ?

ঃ নামাতে পারলেই ভাল। তা বেগম সাহেবা আমাকে কি করতে বলছেন ?

ঃ কি করতে মানে ? আজকালের মধ্যেই এসে যাবেন তাঁরা। উৎসব-আয়োজন যা কিছু করার, তা জনাব করবেন না তো কি জেনানা হয়ে আমি করবো ?

জিন্দা মালিক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন—উৎসব ! কিন্তু পত্রে তো স্পষ্ট দেখলাম, কোন উৎসব উল্লাস হোক, এটা তাঁরা এই মুহূর্তে চান না।

ঃ তাঁরা না চাইলে কি হবে ? তাঁদের সব কথাই শুনতে হবে আমাদের এর কি কোন অর্থ আছে ?

জিন্দা মালিক সাহেব এবার অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তা না থাক, কিন্তু বেগম সাহেবার কথাও যে আমি শুনতে পারিনে, তার যথেষ্ট অর্থ আছে। আগে পরিস্থিতিটা ভাল করে যাচাই করে দেখুন তিনি। অযথা হৈ চৈ করে আমি লোক হাসাতে রাজী নই।

গুলশান আরা বেগম সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—জনাবের কথাটা তো ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিনে আমি ?

জিন্দা মালিক সাহেব অটল কণ্ঠে বললেন—অধিক বুঝে কাজ নেই। আমি যা বলি হয় বেগম সাহেবা তা শুনবেন, না হয় যা খুশী নিজেই তিনি করবেন। আমাকে এ নিয়ে বিরক্ত করতে পারবেন না।

ঃ মানে ?

ঃ এর কোন মানে নেই। জেনানার তালে পড়ে কোন রকম আহম্মকীই আমি করতে পারিনে।

ঃ তাজ্জব ! জনাব তাহলে কি বলছেন ?

ঃ আমার কথা হলো, আনযাম-অনুষ্ঠান নিয়ে আগেই অস্থির হয়ে কাজ নেই। সেরেফ 'আকদ' করতে আসছেন তাঁরা। এর জন্যে এখন থেকেই হৈ হুল্লোড় না করলেও চলবে। যেভাবে আছেন চুপচাপ ঐ ভাবে থাকুন আর পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় তা দেখুন।

ঃ পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়। জনাব ঐ একই কথা বার বার তুলছেন কেন ? রওশন আরার মধ্যে কি এমন পেলেন, যার জন্যে এতটা না-উম্মিদ হচ্ছেন তিনি ?

ঃ সেরেফ রওশন আরার একার কথাই নয়। এখানে আরো কথা আছে। খানদানী হলেও, শুধু একজন আউরাতের কথার উপর আমরা এত নাচন-কুঁদন করছি। যেন আম্মাটাই আবদুল আজিজের একমাত্র অভিভাবক।

ঃ জনাব !

ঃ আবদুল আজিজের আব্বার কোন জোরদার উপস্থিতিই এর মধ্যে দেখছিনে। "তার আপত্তি নেই," এইটুকুই কেবল পত্র মারফত জেনেছি আমরা। এর বাইরে তাঁর কোন ভূমিকাই দেখছিনে।

ঃ তা কথা হলো—

ঃ অত্যন্ত দানাদার লোক তিনি। অথচ তাঁর নিজের ছেলের শাদিতে তিনি প্রায় নীরব। তাঁর স্ত্রীর এই একক উদ্যোগ আমি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনে। আমারও একটা আত্মসম্মানবোধ আছে ?

ঃ একি বলছেন ?

ঃ এছাড়া, আবদুল আজিজও এ শাদিতে কতখানি আগ্রহী, এ নিয়েও আমার সন্দেহ আছে। এক সাথে প্রতিদিন কাজ করছি। কিন্তু রওশন আরার সাথে যে তার শাদি হতে যাচ্ছে, এমন কোন ভাবই তার মধ্যে লক্ষ্য করিনি আমি।

অবিশ্বাসের সুরে গুলশান আরা বললেন—সেকি কথা ! তা হবে কেন ? না-না, এসব কোন কথাই নয়।

ঃ কথা না হয়, না হোক। পরিস্থিতি আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ না করে আউরাতের মতো আমি কিছুতেই উতলা হতে পারিনে।

তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে গুলশান আরা বললেন—ফালতু অজুহাত, একদম ফালতু অজুহাত ! দায় এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে জনাবের তামামই ফালতু অজুহাত।

জিন্দা মালিক সাহেবও এবার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তাই যদি মনে করেন, তাহলে বেগম সাহেবা যা খুশী তাই করুন। আমি এসব রং-এর মধ্যে নেই—

গুলশান আরা ফের কিছু বলার আগেই প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব অত্যন্ত শক্ত মেজাজে সেখান থেকে চলে গেলেন।

নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর গুলশান আরা বেগম গোস্বাভরে মুখ ঝামটা মারলেন এবং ফিরে এসে পুনরায় আনযাম করতে লেগে গেলেন।

গুলশান আরা বেগমকে এককভাবে শাদির আয়োজন করতে দেখে দাসী-বাঁদীরা দুই একদিন মুখ চাওয়া-চায়ী করলো। অতপর এক ফাঁকে একদাসী ইতস্ততঃ করে বললো—এটা কেমন হলো হুজরাইন ? হুজুরকে কেমন যেন উদাসীন মনে হচ্ছে ! হরওয়াক্ত তিনি কেবল দপ্তর নিয়েই পড়ে থাকছেন, এ ব্যাপারে তাঁকে তেমন কিছুই তো বলতে শুনছিনে ?

গুলশান আরা বেগম ক্ষোভের সাথে বললেন—শুনবে কেন ? বহিনটা কি তাঁর ? বহিনটা তো আমার।

ঃ হুজুরাইন !

ঃ সারাঘর লেপে এসে একেই বলে দুয়ারের কাছে আছাড়। যতসব ফালতু অজুহাত।

ঃ তার মানে কি হুজুরাইন ?

ঃ উনি এসব রং এর মধ্যে নেই। তা না থাকেন, না থাকুক। আমার কি কিছু নেই ? খরচের জন্যে তাঁর কাছে হাত পাততে না গেলেই তো হলো ?

ঃ হুজুরাইন !

ঃ ভাই আর ভগ্নিপতির মধ্যে ফারাগটা এখানেই।

ঃ সেকি কথা হুজুরাইন ! এ নিয়ে আপনাদের মধ্যে তাহলে কি কোন ঝগড়া-ফ্যাসাদ হয়েছে ?

সম্বিতে ফিরে এসে গুলশান আরা বেগম গরম কণ্ঠে বললেন—এত কথার মধ্যে তোমার থাকার গরজ কি ? যাও-যাও, যা করতে বলেছি তাই তুমি করগে—

বলেই গুলশান আরা বেগম দাসীর আগে নিজেই সেখান থেকে সরে গেলেন।

শিক্ষাদানের কাজে উমিদ আলীর ইতিমধ্যেই বেশ নাম যশ হয়েছে। তাঁর তালেবে এলেমরা তাঁকে যথার্থ ভক্তি করতে শুরু করেছে। সহকর্মীরাও তাঁকে প্রীতির চোখে দেখেন এবং সে যে একজন মস্তবড় জ্ঞানী লোক, এটাও তাঁরা অকপটে স্বীকার করেন। মাদ্রাসার সদরুল মুদাররেসীন অর্থাৎ অধ্যক্ষ এসে এরই মাঝে একদিন প্রশাসক সাহেবের কাছে উমিদ আলীর ভূয়সী তারিফ করে গেছেন। এসব কথা গুলশান আরা বেগমেরও কানে কিছু পড়েছে।

উমিদ আলী আগের মতোই এই খাস মকানে থাকে। তবে শিক্ষাদান করার কাজে খুবই পড়াশুনা করতে হয় বলে, আগের মতো সে আর ফায়-ফরমায়েশ খাটার সময় পায় না। তার বর্তমান কাজের প্রেক্ষিতে গুলশান আরা বেগমও তাকে যখন তখন সে কাজে ডেকে পাঠাতে পারেন না। সেজন্যে দীলে তাঁর জিয়াদা ক্ষোভ থাকলেও, অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি সেটা হজম করে যাচ্ছেন। উমিদ আলী মাদ্রাসা থেকে আসে, খায়দায় আর দু'একটা পাতলা ধরনের ফায়-ফরমায়েশ খেটে দিয়েই ঘরে গিয়ে কিতাব খুলে বসে। প্রয়োজনের সময় গুলশান আরা বেগম আর তাকে হাতের কাছে পান না।

এ যাবত এইভাবেই সবকিছু চলছিল। কিন্তু রওশন আরার শাদির আনযাম করতে গিয়ে গুলশান আরা বেগম লক্ষ্য করলেন, এর আগে উমিদ আলীকে যা কিছু বা হাতের কাছে পেতেন তিনি, এখন আর সেটুকুও পাচ্ছেন না। উমিদ আলী অন্দরে আর তেমন একটা আসেই না। গুলশান আরার দীলে অনেক ক্ষোভ আগে থেকে ছিলই, এবার তিনি ফেটে পড়লেন। লোক পাঠিয়ে উমিদ আলীকে ডেকে এনে তিনি আক্রমণ করে বললেন—তোমরা দুইভাই ভেবেছো কি ? আজ বাদে কাল রওশন আরার শাদি আর তোমরা দুইভাই এ ব্যাপারে একেবারেই বেখবর ! যেন ভিন মকানের লোক তোমরা ?

উমিদ আলী ঢোক চিপে বললো—তা মানে, আমার এখানে কি করার আছে ভাবী সাহেবা ?

ঃ কি করার আছে মানে ?

ঃ মানে, ভাবী সাহেবা বা অন্য কেউ এ সম্বন্ধে আমাকে তো কিছু বলেননি।

ঃ বলতে হবে কেন ? তোমরা কি এ মকানের কেউ নও ? তোমাদের নিজেদের কি এখানে কোন দায় দায়িত্ব নেই ? একা আমি পাগলের মতো ছুটোছুটি করে মরছি আর বসে বসে মজা করে রঙ্গ দেখছো তোমরা ?

ঃ ভাবী সাহেবা !

ঃ মুদার্‌রেসই হও আর মহামন্ত্রীই হও, নিজের মকানে কারো বিয়ে শাদি লাগলে, মন্ত্রীরা কেউ মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিলকুলই ফাঁকে থাকতে পারে ? এ মকানের এত নুন খেলে তুমি, সে জন্যে অন্ততঃ কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধ তো থাকবে তোমার ?

উমিদ আলী ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—কি করতে হবে, তাই আমাকে বলুন ভাবী সাহেবা ! আমি কি কখনও আপনার কোন হুকুম অমান্য করেছি ?

ঃ করার এখন কত কাজ ! কেনাকাটা, ডাকাহাঁকা, হাঁড়িবর্তন, ঝড়-খড়ি—মানে হাজারটা কাজ সামনে পড়ে আছে। ঘরদোর ঝাড়ামোছা, ময়লা-মাটি সাফ করা, আসবাব পত্র সাজানো—কোন্ কথা বলবো আমি ? নিজের লোক কেউ এসবে হাত না লাগালে সেরেফ নওকর নফর দিয়েই কি সব হয় ? মাদ্রাসা থেকে কয়দিনের ছুটি নিয়ে এসে এসবে হাত লাগাও না তুমি ?

জবাবে উমিদ আলী নিষ্প্রভ কণ্ঠে বললো—জি আচ্ছা ভাবী সাহেবা। তাই হবে।

উমিদ আলী তাই করতে লেগে গেল। মাদ্রাসা থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে এসে উমিদ আলী আগের মতোই গুলশান আরা বেগমের ফরমায়েশ খাটতে শুরু করলো। দীলে তার যত দুঃখই থাক, আর কাজটা যত অনভিপ্রেতই হোক, উমিদ আলী মুখ বুজে তা করে যেতে লাগলো।

কেলেংকারী যে ঘটতে যাচ্ছে একটা, 'আকদ' এর খবর কানে পড়ার পর থেকেই, প্রশাসক সাহেবের মতো, রওশন আরা বেগমও তা ভাবছেন। তার সাথে তাঁর বহিনের এই দুর্বার আনযাম-উদ্যোগ দেখে তিনি বুঝতে পারছেন, কেলেংকারীটা বড় রকমেরই হতে চলেছে জরুর। কিন্তু এখানে তাঁর ভূমিকাটা কি হওয়া উচিত এখন, এইটেই কেবল তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। শাদি যে তাঁর হবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত তিনি। নিজে তিনি শাদি করতে গররাজী হলে, শাদি তাঁকে করায় কে ? এ নিয়ে তাঁর ভাবনা নেই। তাঁর ভাবনা শুধু

এই কেলেংকারীটা রোধ করা যায় কিভাবে ? নওশা এসে সশরীরে হাজির হওয়ার আগেই কিভাবে এই শাদিটা ঠেকিয়ে দেয়া যায় ?

এখানেই তিনি রাহা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর বহিনকে যে বলবেন, বিলকুলই তা অর্থহীন। শাদির ব্যাপারে তাঁর বহিন এখন সকল চিকিৎসার বাইরে। শাদি শাদি করে এই যে এতদিন ধরে নাচছেন তিনি, এক সাথে থেকেও সে প্রসঙ্গে একটা কথা যার শাদি সেই রওশন আরাকে জিজ্ঞাসা তিনি করেননি বা করছেন না। আবদুল আজিজ সাহেব ঈদ উপহার দিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাঁকে ধরে রাখা দায় হয়ে পড়েছে। আবদুল আজিজের সাথে রওশন আরার শাদিটা হয়েই গেছে এক রকম, এই ভেবেই তিনি জার জার হয়ে আছেন। এর বিপরীত কোন কথাই আকার-ইংগিত, কোনভাবেই রওশন আরা তাঁর কানে দিতে পারেননি। আনযাম-উদ্যোগ নিয়ে তাঁর এই খুশী আহলাদের মাঝেও যে রওশন আরা একদম গুম হয়ে বসে আছেন, এ নিয়ে তিনি ভাবছেন না। বরং এ নিয়ে একবার এসে তিনি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটাই দিয়ে গেছেন জোশের সাথে। রওশন আরাকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে তিনি তিক্ত কণ্ঠে বলেছেন—"ঢং দেখে আর বাঁচিনে। যেন শাদি আর এ দুনিয়ায় কখনও কারো হয়নি, কেবল একাই তার হচ্ছে। উপযুক্ত দাওয়াই পড়ার আগে যে ওসব ঢং-মক্কর অনেক আউরাতের ভাঙ্গে না, ভূৎপ্রেত ঘাড়ে কিছু থাকলেও যে তারা নামে না—ও আমার ঢের দেখা আছে। ও নিয়ে সাধাসাধি করার কোন দায়ই আমার পড়েনি।

মুখ বাঁকা করে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে গেছেন গুলশান আরা বেগম। তাঁকে কোন কিছুই বলার মওকা দেননি বা তার পর থেকে শাদির ব্যাপারে তাঁর সাথে আর একটা কথাও বলেননি।

রওশন আরা বেগম সেই থেকেই ভাবছেন, কেলেংকারীটা ঠেকানো যায় কিভাবে ? কার সাহায্য নেবেন তিনি, সেই কথাই ভেবে চলেছেন। একবার তিনি ভাবলেন, আবদুল আজিজকেই গোপনে ডেকে খুলে বলেন সব কথা। কিন্তু পরক্ষণেই শরমে তাঁর ঢেকে এসেছে দুই চোখ। আবদুল আজিজের সাথে আর তাঁর আগের সম্পর্ক নেই। তাঁর সাথেই শাদির কথা চলছে এখন। এতটা নির্লজ্জ হতে কিছুতেই তিনি পারলেন না। ভেবে চিন্তে শেষে তিনি ঠিক করলেন, পারলে একমাত্র তাঁর দুলাহ ভাই-ই এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। দানেশমান্দ লোক তিনি। সাহস করে বিষয়টা একবার তাঁর কাছে তুলে ধরতে পারলেই, জরুর তিনি ফয়সালা তার করবেন।

রওশন আরা বেগম জিন্দা মালিক সাহেবেরই শরণাপন্ন হলেন। দপ্তর থেকে ফিরে এসে জিন্দা মালিক সাহেব তাঁর শয়ন কক্ষে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন,

এই সময় ভয়ে ভয়ে তার কক্ষে ঢুকলেন রওশন আরা বেগম। রওশন আরার চোখ মুখ বিশুষ্ক ও মলিন। তা দেখেই জিন্দা মালিক সাহেব ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলেন এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার ! রওশন আরা বহিন এমন অসময়ে এখানে ?

হুড়মুড় করে জিন্দা মালিকের পায়ের কাছে পড়ে রওশন আরা উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—আমাকে বাঁচান দুলাহ ভাই, এই শরম থেকে আপনি আমাকে বাঁচান ! এই কেলেংকারীটা রোধ করুন।

সংগে সংগে ঘটনাটা অনুমান করলেন জিন্দা মালিক সাহেব। রওশন আরাকে স্থির হয়ে বসতে বলে ফের তিনি প্রশ্ন করলেন—কেলেংকারী! কিসের কেলেংকারী ?

সোজা হয়ে বসতে বসতে রওশন আরা বেগম বললো—আমি মুখ ফুটে সব কথা বলতে পারবো না দুলাহ ভাই। আপনি এই শাদির আনযাম বন্ধ করে দিন।

ক্ষণকাল নীরব থেকে জিন্দা মালিক বললেন—কেন, এই শাদিতে তুমি রাজী নও ?

ঃ জিনা দুলাহ ভাই, জার্‌রা মাত্র নই।

ঃ ভাল করে নিজের সাথে বোঝাপড়া করে দেখেছো ?

ঃ আমার বোঝাপড়া সব শেষ। এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। শাদিটা এখনই বন্ধ না করলে শেষে যে কেলেংকারীটা ঘটে যাবে, তাতে হয়তো এ মকান আমার জন্যে হারাম হয়ে যাবে। আমার বহিন আমাকে চুল ধরে এ মকান থেকে বের করে দেবেন। কাজেই, এমন একটা অঘটন ঘটার আগে যেভাবে হোক, এ শাদিটা ভেংগে দিন দুলাহ ভাই।

পুনরায় কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করে জিন্দা মালিক সাহেব একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—হুঁউ ! ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এখানেই গড়াবে, তা আমি জানতাম।

রওশন আরা বেগম ফের আকুল হয়ে উঠলেন এবং আকুল কণ্ঠে বললেন—দয়া করুন দুলাহ ভাই, আমার উপর একটু সদয় হোন। মেহেরবানী করে—

জিন্দা মালিক সাহেব বাধা দিয়ে বললেন—আরে থামো-থামো। এত মিনতি করতে হবে না। ঘটনাটা আগে থেকেই আঁচ করা আছে আমার।

ঃ জি ?

ঃ তোমাদের সব কথাই সেদিন আমি শুনেছি। উমিদ আলী যে না চাইতেই তাকে মাদ্রাসার মুদাররেস্ বানিয়ে দিলাম, এ থেকে কিছুই বুঝতে পারোনি ?

অন্য সময় হলে রওশন আরা শরমে এতটুকু হয়ে যেতেন। কিন্তু এখন তার সে অবস্থা ছিল না। তাই এ প্রশ্নের জবাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—জি-জি তা পেরেছি।

ঃ তোমার তরফ থেকে কোন সাড়া শব্দ না পেয়েই আমি এখনও চুপচাপ আছি। এ প্রশ্ন নিয়ে এর আগেই তুমি আসবে, এই ধারণাই ছিল আমার।

ঃ দুলাহ ভাই !

ঃ কাজটা খুব শক্ত। এ নিয়ে ঘরে আমার বেশ কিছুটা অশান্তি পয়দা হবে। তোমার বহিনকে তো চেনোই। তবু দুলাহ-দুলহীন—এই দুয়ের যে কোন একজনের বিশেষ আপত্তি থাকলে সে শাদি হতে দেয়া ঠিক নয়। এটা আমার দেখা উচিত আর আমি তা দেখবো।

বিপুল আবেগে রওশন আরা ফের বললো—দুলাহ ভাই !

ঃ আবদুল আজিজকে নিজেই আমার বলতে হবে। অত্যন্ত জ্ঞানী ছেলে আবদুল আজিজ। আমার বিশ্বাস, একথা শুনলেই সে খামুশ হয়ে যাবে।

ঃ তাহলে তাই করুন দুলাহ ভাই। যত জলদি সম্ভব—

জিন্দা মালিক হেসে বললেন—হবে-হবে। এখন সে কাশিম বাজারে আছে। সে ফিরে এলেই সব বলবো আমি। এ নিয়ে তোমার আর পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। তোমার দায়িত্ব আমি নিলাম।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আপনার অশেষ ভালাই করুন। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি ?

ঃ দেরী হলে যে আপা আরো অধিক আয়োজন করে ফেলবেন।

জিন্দা মালিক এবার আক্রোশের সাথে বললেন—করুন তিনি। তাঁর একটু শিক্ষা হওয়ার দরকার আর এটা আমি প্রথম থেকেই চাচ্ছি। মোক্ষম এসিম কানে এসে পড়বে যখন, তখন আপছে আপ্ নেতিয়ে পড়তে পথ খুঁজে পাবে না। এ আক্কেলটা জরুর তার হওয়ার দরকার।

অদম্য উল্লাসে রওশন আরা বেগম আওয়াজ দিয়ে বললেন—দুলাহ ভাই, আপনি মানুষ নন ! সত্যিই আপনি একটা—

ঃ মস্তবড় দুলাহ ভাই—

রওশন আরার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে একথা বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন হুগলীর প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব।

উমিদ আলী সেই থেকেই মামুলী নওকরের মতো কোমর বেঁধে গুলশান আরা বেগমের হুকুম খেটে চলেছে। নওকর নফরের সাথে এক হয়ে মিশে গিয়ে সে হাঁড়িকুঁড়ি, লাকড়ী-নড়ি আর আসবাবপত্র টানছে এবং কেনাকাটার

নামে বস্তা ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে বাজার-গঞ্জে ছুটোছুটি করছে। অবিরাম সে ব্যস্ত। আরামটা প্রায় হারাম হয়ে গেছে।

তা লক্ষ্য করে রওশন আরা বেগম উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। উমিদ আলীর উপরই গিয়ে তার তামাম ক্রোধ পড়লো। তাঁর বহিনের কথা আর তুলতে তিনি চান না। তাঁর বহিন এক ভিন্ন জাতের মানুষ। কেবল নিজের দিকটাই বোঝেন তিনি, অন্যের দিকটা নিয়ে আদৌ ভাবতে চান না। কিন্তু এই উমিদ আলীটা কি ? তার নিজের কি কোন আত্মসম্মান বোধ নেই ? হুঁশবুদ্ধি কি কোনদিনই এ লোকটার হবে না ? ভাল মানুষ হওয়ার অর্থটা কি এই যে, পরের দিকটা দেখতে গিয়ে নিজের সুখ-দুঃখ মান-সম্মান তামামই কোরবান করে দিতে হবে ?

সহ্য করতে না পেরে রওশন আরা বেগম অন্দর থেকে বেরুলেন। অন্দরের বাইরে অন্দরের কাছাকাছি এক কক্ষে উমিদ আলী বাস করে। কাজের চাপে মসজিদে গিয়ে জামাত ধরতে না পেরে উমিদ আলী জোহরের নামাজ আদায় করতে তার কক্ষে এসে ঢুকেছিল এবং নামাজ আদায় করার পর খাটে বসে পেরেশান দীলে আকাশ পাতাল ভাবছিল। তার নজর ছিল মেঝের দিকে। মুখের নেকাব নামিয়ে দিয়ে এই সময় রওশন আরা বেগম তার কক্ষে এসে ঢুকলেন এবং সরাসরি উমিদ আলীর খাটে এসে বসলেন। মাথা তুলেই উমিদ আলী চমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, এবং আব্রু করা থাকলেও রওশন আরাকে চিনতে পেরে শসব্যস্তে বলে উঠলো—একি আপনি ! আপনি এভাবে এখানে এলেন যে ?

রওশন আরা বেগম ক্ষোভের সাথে বললেন—আমার গরজ পড়লো বলেই এলাম। না এসে কি আর উপায় থাকলো আমার ?

ঃ সেকি ! তাহলে ডেকে পাঠালেই পারতেন। এভাবে আপনার কি এখানে আসা ঠিক হলো ?

ঃ কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক, সেটা আমার ব্যাপার। ও নিয়ে আপনার ভাবার গরজ নেই।

উমিদ আলী ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললো—নেই কেন ? আপনারা খানদানী লোক, আপনাদের সব সয়। আমার তা সইবে কেন ?

ঃ কি রকম ?

ঃ আমার তো নিজের একটা দিক আছে। আমার খ্যাতি অখ্যাতি মান-সম্মান—

ঃ মান সম্মান ! মান সম্মান বলে কি কিছু আছে নাকি আপনার ?

ঃ নেই ?

ঃ তিল পরিমাণও আছে বলে মনে করিনে আমি।

উমিদ আলী আহত কণ্ঠে বললো—আজ তা মনে না করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর আগে এমনটি বলতে কখনোও শুনিনি। আপনারা সবই পারেন।

ঃ বটে।

ঃ সে যা-ই হোক, মেহেরবানী করে আপনি অন্দর মহলে চলে যান। আপনার যা হুকুম-ফরমায়েশ আছে, আমি সেখানে এসে শুনছি। এখানে আপনি আর একদণ্ডও থাকবেন না।

ঃ থাকবো না ?

ঃ না। এইযে আপনি এলেন, এ নিয়েই হয়তো অনেক মুসিবত হবে আমার। দয়া করে আপনি যান।

উমিদ আলীর মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে রওশন আরা ক্ষোভের মাঝেও কিঞ্চিৎ রসিকতা করে বললেন—যদি না যাই ?

ঃ তাহলে আমাকেই বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যাবেন না কেন আপনি ? আপনার কি ক্ষতি করেছি যে, এভাবে আপনি আমাকে বদনামীর ভাগী করছেন ? আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন ? কি ক্ষতি করেছি আপনার ?

ঃ অনেক ক্ষতি করেছেন। আমার উঁচু মুখ নীচু করে দিয়েছেন।

ঃ তার মানে ?

ঃ আপনার শরম নেই। কামিন-ময়দুরের মতো যেভাবে আপনি ঘরদোর ঝাড়ছেন আর বস্তা ঝুড়ি টানছেন, তাতে তো যে কেউ দেখলে আপনাকে এ বাড়ীর চাকর নফরই মনে করবে ?

ঃ তা করে করুক, তাতে আপনার কি ?

ঃ আমার অনেক। হুগলীর ঐ সেরা মাদ্রাসার কোন মুদাররেস্ মোহাদ্দেস কারো মকানে ময়দুরের কাজ করুন, বা কোনখানে নওকর হয়ে থাকুন, এটা ঐ মাদ্রাসার সাথে এই পরিবারের তথা আমার ইজ্জতে এসে লাগে। বিশেষ করে আপনি যেখানে আমার দুলাহ ভাইয়ের ভাই।

ঃ সে আমি যে-ই হই, আমি নুন খেয়েছি, নুনের দাম শোধ করছি।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আমি কি ভাইয়ের মকানে থাকি ? আমি তো ভাবীর মকানে থাকি। তিনি আমাকে নুন দেন। আমি তাঁর নুন খাই আর নুনের দাম শোধ করি।

ঃ লজ্জা করে না আপনার ?

ঃ কিসের লজ্জা ? যার চারটে পয়সা দাম নেই, যে একজন পথের মানুষ, সবারই উপেক্ষার পাত্র, তার বেশী লজ্জা থাকলে চলবে কেন ?

ঃ আচ্ছা ?

ঃ লজ্জাই যদি থাকবে আমার, তাহলে বার বার প্রতারিত হওয়ার পরও এখানে আমি থাকি ?

রওশন আরা বুঝলেন, উমিদ আলী কি বলতে চায় আর ব্যথাটা তার কোথায়। সেই সাথে বুঝলেন, এই মকানের উপর উমিদ আলীর দীলে কি এক অন্তর্নিহিত ক্ষোভ চাপা পড়ে আছে। তিনি বুঝতে পারলেন, উমিদ আলীর অনুভূতি আদৌ মুর্দা নয়। সর্বত্রই তা সজাগ। অন্যের মতো সব কিছুতেই হাউ কাউ সে করে না, এই যা ফারাগ। এসব কিছু বুঝে তিনি অতিশয় প্রীত হলেন। মনের ভাব গোপন করে বললেন—তাই নাকি ? কিন্তু আপনাকে এত লজ্জাহীন দেখলে আপনার তালেবে এলেমরা কি ভাববে ?

ঃ কিছুই ভাববে না। ভাগ্যাহত মানুষ বুঝে তারা কিছুটা আফসোস্ করবে। কিন্তু আপনার তাতে কি ?

ঃ আমারই তো সব। আপনার অসম্মান আর দুর্ভোগ হলে দীলে আমার বাজবে না ?

তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে উমিদ আলী বললো—বটে ! আবার দরদ দেখাতে এসেছেন ? মেহেরবানী করে যান আপনি। না গেলে আমিই চললাম—

উমিদ আলী বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো। রওশন আরা ধমক দিয়ে বললেন—দাঁড়ান, আমার কথা আছে। আমার কথা না শুনে বেরিয়ে গেলে আপনি যেখানে যাবেন, আপনার পেছনে পেছনে আমিও সেখানে যাবো। দুনিয়ার তামাম লোক তা দেখবে।

উমিদ আলী ঘাবড়ে গিয়ে বললো—তাজ্জব ! আমাকে নিয়ে তো অনেক খেলা খেলেছেন আপনি দীর্ঘদিন। এই শেষ সময়ে আর কেন ?

ঃ খেলেছি ?

ঃ জরুর খেলেছেন। অনেক মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন। অনেক আজগুবী খোয়াব দেখিয়েছেন। এরপরও সখ আপনার মেটেনি ?

ঃ কি রকম ? মিথ্যা আশ্বাস দিলাম মানে ?.

ঃ দিলেন না ? "যেখানে গেলে আপনার কাজের সঙ্গী হতে পারবো না, সেখানে আমি কখনই যাবো না," এমন ঢং-এর কথা এই কয়দিন আগেও তো আপনি আমাকে শুনিয়েছেন। আপনাকে চিনতে আমার বাকী আছে ? ঢের আক্কেল হয়েছে আমার।

ঃ তা হয়ে থাকে হোক। কিন্তু আমার আশ্বাসটা মিথ্যা আশ্বাস হবে কেন ?

ঃ ফের ঐ একই কথা ? আমি বার বার আপনাকে বলেছি, ওটা হবার নয়, হতে পারে না। আপনাকে যেতেই হবে অন্যের ঘরে। এসব কথা বার বার

আপনাকে বলার পরও ঐ একই কথা বার বার আমাকে বলেছেন। আপনার কি কথার কোন দাম আছে ?

উমিদ আলীকে আরো একটু রাগিয়ে দিতে রওশন আরা বললেন দাম নেই ?

ঃ এক পয়সাও নয়। থাকলো কি আপনার কথা ? আমি যা বলেছিলাম আর ভেবেছিলাম, সেইটেই তো ফললো ? আমাকে নিয়ে ওসব রঙ্গ না করলেই কি চলতো না আপনার ?

ঃ রঙ্গ করলাম ?

ঃ আবার ঐ রঙ্গ করতেই এসেছেন। ভুল একটা মস্তবড় করেছিলাম বলেই, সেই সুযোগটা বার বার আপনি নিচ্ছেন।

ঃ ভুল ?

ঃ আপনার এই আসল রূপটা ধরতে যদি পারতাম সেদিন, আপনার অনুরোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এ মকানে আর এক লহমাও থাকতাম না। পোঁটলা পুঁটলী তামামই বাঁধা আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঐভাবে সেদিনই আমার গাঁয়ে আমি চলে যেতাম। সেই না যাওয়ার ভুলেই এত সুযোগ পেলেন আপনি।

নেকাবের তলে রওশন আরা মুখটিপে হাসলেন। এরপর বললেন—আর কি আপনার কিছু বলার আছে ?

ঃ আছেই তো। আপনারা খানদানী আউরাত বলে দাবী করেন নিজেদের। আপনাদের কি রুচি-অরুচি তা আপনারাই জানেন। শাদির একদম পূর্ব মুহূর্তে একজন বেগানা আদমীর ঘরে আসাটা আবদুল আজিজ সাহেব কিভাবে নেবেন, আমি জানিনে। কিন্তু আমাকে কেন আমার দোস্তের কাছে হেয় করছেন এভাবে ? কেন আমাদের দোস্তীর মাঝে ফাটল ধরাতে চাচ্ছেন ?

ঃ চাচ্ছি এই কারণে যে, আজ হোক কাল হোক, সে ফাটলটা আপনাদের মধ্যে ধরবেই। ওটা আর অটুট থাকবে না।

উমিদ আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো—কারণ ?

ঃ কারণ, আমি শাদি তাকে করবো না আর আপনারই জন্যে করবো না। এরপর দোস্তী আপনাদের থাকবে ?

উমিদ আলী অসহ্য কণ্ঠে বললো—উঃ ! আপনি আমাকে কি পেয়েছেন বলুন তো ? আজ বাদে কাল শাদি, শাদির তামাম আয়োজন সারা, তবু আপনি আমাকে ফের ঐ একই কথা বলতে চান ? এতটাই নির্বোধ ভাবেন আমাকে ?

ঃ নির্বোধ তো আপনাকে ভাবিই। নির্বোধ না হলে, এত শিগ্গির সব কথা ভুলে যান ?

ঃ ভুলে গেলাম !

ঃ গেলেন না ? আপনাকে কি আমি বলিনি, দীলে কোন খট্‌কা লাগলে সরাসরি সে কথা জিজ্ঞাসা করবেন আমাকে ? তা না করে কেন এই একা একা গুমরে গুমরে মরছেন ?

উমিদ আলী থমকে গেল। সে থতমত করে বললো—এ্যাঁ ! তা কথা হলো—

ঃ আপনার সাথে কথা বলার জন্যে আমি সেই কবে থেকে কোশেশ করছি। আপনার চোখের সামনে ঘুরেছি, কিন্তু কিছুতেই আপনি আমার কাছে কোলে এলেন না বা আপনাকে ফাঁকে আড়ালে পেলাম না। অনেক ইশারা ইংগিত করলাম, তবু আপনি চোখ তুলে তাকালেন না, মুটের মতো সেরেফ মোট টেনেই চললেন !

ঃ সেকি ! এ আবার কি বলছেন ?

ঃ আপনি বসুন। আমার কাছে এসে বসুন আর যা বলি শুনুন।

উমিদ আলী ইতস্তত: করতে লাগলো। রওশন আরা শক্ত কণ্ঠে বললেন—বসুন বলছি ! অধিকক্ষণ মান ভাঙ্গাবার ফুরসৎ আমার নেই।

সংকুচিতভাবে পাশে এসে বসতে বসতে উমিদ আলী বললো—তা, আর একবার আমাকে বেয়াকুফ বানাচ্ছেন নাতো ?

ঃ এতবারই যখন বানিয়েছি, একবার বেশী বানালে দোষ নেই।

ঃ মানে ?

ঃ এইতো শেষ। এরপর তো আর বেয়াকুফ বানানোর প্রশ্ন কিছু উঠবে না ! আপনার তামাম সন্দেহ আর দুই একদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে ?

ঃ কেমন ?

ঃ এ শাদি হচ্ছে না। আমিই হতে দিচ্ছিনে। আর দু'একদিনের মধ্যেই শুনতে পাবেন, এ শাদি ভেংগে গেছে।

উমিদ আলীর মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করলো—বলেন কি ! একি সত্যি ?

ঃ সত্যি না হলে আপনার ঘরে এই সময় এভাবে আমি আসি কখনোও ? এখন যা বলি, শুনুন—

ঃ জি বলুন।

ঃ নওকরের মতো আপনি আর এরপর এ মকানে হুকুম খাটতে পারবেন না। তাতে যদি এ মকান ছাড়তে হয় ছাড়বেন, তবু আপনার এভাবে হেয় হওয়া চলবে না।

ঃ কিন্তু—

ঃ আর কিন্তু নেই। পরিস্থিতি অধিক উৎকট হলে, আপনি আপনার সামান নিয়ে মদ্রাসার মেহমানখানায় চলে যাবেন। ওখানে খরচ দিয়ে খাবেন।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর যা করার আমিই করবো। আপনি শুধু নিশ্চিত হয়ে থাকুন যে, আমি আপনারই আছি। আপনাকে ছেড়ে কোথাও আমি যাচ্ছিনে।

আবেগে আপ্লুত হয়ে উমিদ আলী বলে উঠলো—রওশন আরা !

রওশন আরাও মুহূর্তের জন্যে আবেগ তাড়িত হয়ে বললেন—কেন আপনি বার বার ভুল করেন ? কেন আপনি বুঝতে চান না যে, রওশন আরা আপনাকে ছাড়া আর কারো কথা ভাবে না ? আজ হোক কাল হোক, আল্লাহ চাহে তো আপনার ঘরেই যাবো আমি !

ঝড়ের বেগে কক্ষে ঢুকলেন গুলশান আরা বেগম। বাঘিনীর মতো গর্জে উঠে বললেন—তবেরে হতচ্ছাড়ি ! এই তোমার বিমার ? এই জীন ঘাড়ে চেপেছে তোমার ?

জরুরী এক কাজে উমিদ আলীকে খোঁজ করে গুলশান আরা বেগম অন্দরের কোথাও তাকে পেলেন না। এক নওকর তাঁকে জানালো, উমিদ আলী নামাজ পড়তে তার ঘরে গেছে। সেই কথা শুনে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে এক বাঁদী এসে গুলশান আরাকে বললো—হুজুরাইন, রওশন আরা হুজুরাইনকে কোথাও পাচ্ছিনে। তাঁর সাথে বিশেষ এক দরকার ছিল।

ইজ্জত আলী নামের অপর একজন নওকর সঙ্গে সঙ্গে বললো—ও হুজুরাইন তো অন্দর মহলে নেই। উনি উমিদ আলী সাহেবের ঘরে গেছেন।

শুনেই গুলশান আরা বেগম চমকে উঠে বললেন—কি বললে ?

ইজ্জত আলী বললো—না, আমি রওশন আরা হুজুরাইনের কথা বলছি। উনি উমিদ আলী সাহেবের ঘরে গেছেন, সেই কথা।

ঃ উমিদ আলীর ঘরে !

ঃ ঐ যে, যে ঘরে উনি থাকেন। অন্দর মহলের বাইরে রাস্তার পাশে ঐ ঘরে।

ঃ হুঁশিয়ার কমবক্‌ত্। ঘটনা মিথ্যা হলে জিব তোমার টেনে আমি ছিঁড়ে ফেলবো !

ইজ্জত আলী চমকে উঠে বললো—সেকি হুজুরাইন ! মিথ্যা হবে কেন ? কিছুক্ষণ আগে বাইরে থেকে আসার পথে আমি স্বচোক্ষে ঐ হুজুরাইনকে ঐ ঘরে ঢুকতে দেখে এলাম ! হুরমতুল্লাহও তো আমার সাথে ছিল !

বারুদের ঘরে আগুন লাগলো। মাথার আবরণ আরো খানিক টেনে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি সক্রোধে বললেন—এসো তো দেখি—

ইজ্জত আলীকে সাথে নিয়ে এসে উমিদ আলীর কক্ষের দুয়ারের আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলশান আরা বেগম, উমিদ আলী ও রওশন আরার ঐ শেষের দিকের কথোপকথন কয়টি শুনলেন এবং ঝড়ের বেগে উমিদ আলীর কক্ষে ঢুকে রওশন আরাকে সগর্জনে ঐ কথা কয়টি বললেন।

অকস্মাৎ গুলশান আরা বেগম কক্ষে এসে ঢুকে পড়ায়, উমিদ আলী ও রওশন আরা চমকে উটে ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে গেলেন। গুলশান আরা বেগম এবার উমিদ আলীকে আক্রমণ করে বললেন—আর তোমার এই স্বভাব ? নেমকহারাম ! বেত্তমিজ ! যার বুকে বসে খাও, তারই চোখের ভুরু উপড়াও ?

রওশন আরা বেগম শক্ত কণ্ঠে বললেন—খবরদার আপা ! ওঁকে আপনি অপমান করতে পারবেন না। ওঁর কোন কসুর নেই। উনি আমাকে ডাকেননি। নিজ গরজে নিজেই আমি এখানে এসেছি।

গুলশান আরা বেগম দাঁত পিষে বললেন—বটে ! তওবা-তওবা ! এতবড় নাছার তুমি ! এতটা বেশরম আর বেহায়া ? কি বলবো যে সামনে তোমার শাদি। জানাজানি হলে কেলেংকারী হয়ে যাবে। নইলে এর যা যোগ্য দাওয়াই, তাই দিয়ে ছাড়তাম। এবার এসোতো দেখি আমার সাথে !

রওশন আরাও মজবুত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, তাই চলুন। এখানে এভাবে হৈ চৈ করলে কারোই মান থাকবে না।

উভয়েই বেরিয়ে যেতে লাগলেন। কয়েক কদম এগিয়েই গুলশান আরা বেগম পেছন ফিরে উমিদ আলীকে লক্ষ্য করে বললেন—তোমার মতো একটা বেঈমান নেমকহারামকে এরপর যেন কখনোও অন্দর মহলে না দেখি। রওশন আরার শাদিটা আগে হয়ে যাক। তারপর কি করে তোমাকে এই মকান থেকে তাড়াতে হয় সেটা আমি দেখবো—

গোস্বাভরে গুলশান আরা রওশন আরার পিছে পিছে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। এর কোন জবাব না দিয়ে উমিদ আলী সেইদিনই সামানপত্র সহকারে মদ্রাসার মেহমানখানায় চলে গেল।

দাসদাসী ও কিছু আত্মীয় স্বজন সহকারে আবদুল আজিজের আম্মা কামরুন নাহার বেগম খোশহালে হুগলীতে আবদুল আজিজের মকানে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন এক বাক্সো গহনা ও প্রয়োজনীয় কাপড়

চোপড়। আবদুল আজিজ তখনও কাশিম বাজারেই ছিলেন। আত্মীয় স্বজন সহকারে মকানে ঢুকতে গিয়েই কামরুন নাহার বেগম সাহেবা দেখলেন, অতীব সুন্দরী কে এক যুবতী অত্যন্ত জৌলুশদার পোশাক পরে আবদুল আজিজের অন্দরে প্রবেশ করলো। যুবতীটিকে দেখে তিনি ও তাঁর সঙ্গী সাথী জেনানারা সকলেই উৎসুক হয়ে উঠলেন। মেয়েটির পিছে পিছে দ্রুত পদে অন্দরে ঢুকে কামরুন নাহার বেগম ডাক দিয়ে বললেন—কে মা তুমি ?

পেছন ফিরেই যুবতীটি উল্লাস ভরে বলে উঠলো—ওমা, বড় আম্মা যে ! কি আনন্দ-কি আনন্দ—

বলেই যুবতীটি এসে কামরুন নাহার বেগমের কদম বুঁচি করলো।

যুবতীটি শিরিবানু। বিশেষ এক দাওয়াত রক্ষে করে সে তার এক পড়শীর মকান থেকে এইমাত্র ফিরে এলো। তার পরনে তখন ছিল আবদুল আজিজের দেয়া সেই মূল্যবান ও জৌলুশদার ঈদ উপহার। যুবতীটি যে শিরিবানু, এটা দেখেই কামরুন নাহার বেগম অতিশয় অপ্রসন্ন হলেন এবং তার পরণে এত মূল্যবান লেবাস দেখে মনে মনে জ্বলে উঠলেন। একজন আশ্রিতার মেয়ের এতটা বাড়াবাড়ি তাঁর দুইচোখে কাঁটার মতো বিঁধলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শিরিবানুকে প্রশ্ন করলেন—এ লেবাস ! এ লেবাস তুমি কোথায় পেলে ?

শিরিবানু সলজ্জ কণ্ঠে বললো—ছোট সাহেব আমাকে দিয়েছেন।

কামরুন নাহার বেগম সবিস্ময়ে বললেন—ছোট সাহেব ! মানে আবদুল আজিজ ?

ঃ জি-জি। তিনি আমাকে ঈদের দিনে এই ঈদ উপহার দিয়েছেন।

কামরুন নাহার বেগমের দুইকানে অগ্নি শলাকা প্রবেশ করলো। তাঁর চোখ দুটি ভাঁটার মতো প্রসারিত হয়ে গেল। সেদিকে নজর না দিয়ে শিরিবানু তৎক্ষণাৎ ভেতরের দিকে ছুটলো এবং ডাক হাঁক করে লোকজন জুটিয়ে নিয়ে মেহমানদের মেহমানদারীতে লেগে গেল।

কামরুন নাহার বেগমের পাশেই দণ্ডায়মানা তাঁর এক আত্মীয়া কামরুন নাহারকে প্রশ্ন করলেন—মেয়েটি কে বহিন ? এইটিই বুঝি সেই দুলহীন ?

কামরুন নাহার বেগম বিব্রত কণ্ঠে বললেন—না-না, তা হবে কেন ?

আত্মীয়াটি আফসোস্ করে বললেন—তা নয় ! ইশ্ ! আবদুল আজিজের শাদিটা যদি এই মেয়েটার সাথে হতো, তাহলে যা মানাতো বহিন, এমন জুটি দশজনে হা করে চেয়ে দেখতো।

কামরুন নাহার বেগম অত্যন্ত নাখোশ কণ্ঠে বললেন—কি যে বলেন আপনি ! একজন পরিচারিকার মেয়ের সাথে আবদুল আজিজের শাদি হবে কোন্ দুঃখে ?

ঃ কি বললেন ? পরিচারিকার মেয়ে ?

ঃ পরিচারিকা বৈ কি ? অতি দূর দিয়ে সম্পর্ক একটা থাকলেও, ও আর ওর আম্মা আমাদের আশ্রিতা। ওরা আমাদের সংসারে কাজ কাম করে খায়।

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে আত্মীয়াটি ফের বললেন—তা যা-ই করে থাক, এত অধিক খুব সুরাতের মেয়ে আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি। এতো একদম ফুটন্ত গোলাপ, বহিন !

জবাবে কামরুন নাহার বেগম বিদ্রূপ করে বললেন—হ্যাঁ, জংলী ফুলের বাহার অমন সৃষ্টি ছাড়াই হয়। তা থাক ওসব কথা। আপনারা এখন আসুন আমার সাথে—

সঙ্গী সাথী নিয়ে কামরুন নাহার বেগম এসে প্রশস্ত এক কক্ষের মধ্যে ঢুকলেন।

আবদুল আজিজ তার পরের দিনও ফিরলেন না। মদিনা বিবি, আমিন গাজী ও অন্যান্যদের নিয়ে শিরিবানু যথাবিহিত সমাদরে মেহমানদের মেহমানদারী করতে লাগলেন আর কামরুন নাহার বেগম পুত্রের শাদির সুখবরটা সবাইকে শুনিয়ে সগরবে অন্দরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

আবদুল আজিজ ফিরে এলেন তারও একদিন পরে। মকানে ফিরে আম্মাজান আর আত্মীয় স্বজনদের দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, জেহাদের ময়দান তৈয়ার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি কোন রকম বিরূপ ভাব প্রকাশ না করে আম্মাজান ও আত্মীয়া সকলের সাথে খোশদীলে কথাবার্তা বললেন এবং মেহমানদের মেহমানদারীর কসুর কিছু যাতে করে না হয়, সেই মর্মে মকানের সকলকে নির্দেশ দিলেন। ছেলের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ভাব দেখেই কামরুন নাহার বেগম এই ভেবে জার জার হয়ে গেলেন যে, ছেলে তার অধীর আগ্রহে তাঁদের পথই চেয়েছিল এবং তাঁরা ইতিমধ্যেই এসে গেছেন, এই আশা নিয়েই সে কাশিম বাজার থেকে ছুটেফুটে মকানে ফিরে এসেছে।

পোশাক আশাক পাল্টিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আবদুল আজিজ তাঁর কক্ষে এসে সুস্থির হয়ে বসতেই গহনার বাক্সো হাতে নিয়ে আবদুল আজিজের আম্মা এসে খোশদীলে ছেলের পাশে বসলেন এবং গহনার বাক্সো খুলতে লাগলেন।

আবদুল আজিজ নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি আম্মাজান ?

খুশীতে ডগমগ হয়ে আম্মাজান বললেন—দাঁড়াও-দাঁড়াও—

এরপর একখান একখান করে গহনাগুলো মেলে ধরে আম্মাজান সপুলকে বললেন—কি বাপজান, জেওরগুলো পছন্দ হয় ?

একই রকম নির্লিপ্ত কণ্ঠে আবদুল আজিজ বললেন—কেন হবে না ? এত সুন্দর জেওর।

গহনাগুলোর মধ্যে থেকে একখানা সুদৃশ্য আংটি তুলে নিয়ে আম্মাজান ফের বললেন—এটা ?

ঃ চমৎকার ! আংটিটাতো খুবই সুন্দর দেখছি। এতো অনেক দামী জিনিস।

ঃ দামী তো হতেই হবে। আমার ছেলের বউ এর হাতে ফালতু জিনিস দেখলে লোকে বলবে কি ?

এরপর আংটিটা বাড়িয়ে ধরে ফের তিনি বললেন—নাও, এটা তোমার কাছেই রাখো। এটা তুমি নিজে বউমার হাতে পরিয়ে দেবে।

আবদুল আজিজ বাধা দিয়ে বললেন—সেকি ! আমি এখনই নেবো কেন ? ওটা আপনার কাছেই থাক।

ঃ না-না বাপজান। আমার যা ভোলা মন ! কাজের সময় ওটা হয়তো খেয়ালই থাকবে না আমার। এটা তোমার কাছেই থাক—

বলেই তিনি আংটিটা টুপ্ করে আবদুল আজিজের জামার জেবের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। আবদুল আজিজ এ ব্যাপারে আপত্তি করতে যেতেই আম্মাজান ফের বললেন—তাহলে বাপজান এবার বলো, কখন তোমার সময় হবে ?

ঃ সময় ?

ঃ হ্যাঁ, আমি চাই আগামীকালই শুভ কাজটা হয়ে যাক। আমি প্রশাসক সাহেবের মকানে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। ওঁরাও যোগাড় যন্তর করে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছেন। এখন তুমি বললেই ওঁদের ফের সময়টা আমি জানিয়ে দিতে পারি।

ঃ আম্মাজান !

ঃ তুমি হুগলী থেকে ফিরেছো, এ খবরটাও এখনই আমি পাঠিয়ে দিলাম।

আবদুল আজিজ এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁ ! আপনি তাহলে ঐ শুভ কাজটা শেষ করতেই এসেছেন ?

জবাবে আম্মাজান হাসি মুখে বললেন—তো কি আর অমনি ? পত্রে তো তোমাকে তা জানিয়েই দিয়েছি।

ঃ বেশ করেছেন। তা আপনার কথা কি শেষ হয়েছে ?

ঃ আর কি আমার কথা বাপজান ? কথা তো আমার একটাই, আগামীকালের মধ্যেই শাদিটা আমি শেষ করতে চাই।

ঃ তাহলে এবার আমার কথা শুনুন আম্মাজান, যেমন এসেছেন এই জেওরপত্র জড়িয়ে নিয়ে তেমনি আবার ঢাকাতে ফিরে যান। এ শাদি হবে না।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে কামরুন নাহার বেগম বললেন—কি বললে ?

ঃ শাদি করার মতো এখন আমার সময় নেই। তার চেয়েও বড় কথা, যখনই আমার সময় হোক, এ শাদি আমি কখনও করবো না।

অপরিসীম বিস্ময়ে দুই চোখ ফুটিয়ে তুলে আম্মাজান বললেন—সেকি ! সেকি কথা ? হঠাৎ এসব কথার মানে ?

ঃ মানেটাও ঐ একটাই, প্রশাসক সাহেবের শ্যালিকাকে শাদি করার কোন ইচ্ছে কোনদিন আমার ছিল না, আজও নেই। ওখানে শাদি কিছুতেই আমি করবো না।

আম্মাজান চীৎকার করে বললেন—আবদুল আজিজ !

ঃ ধীরে কথা বলুন আম্মাজান। অনেক লোক হাসিয়েছেন আর লোক হাসাবেন না। কাশিম বাজার থেকে আব্বাজানকেও আমি এই মর্মে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। উনিও ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন, এ শাদি হচ্ছে না। কিছুটা ধৈর্য ধরতে পারলে, ঢাকাতে থেকেই আপনিও এ খবর পেতেন। কিন্তু আপনি তো ঘোড়া বাঁধতে পারেননি।

নিদারুণ ক্ষোভের সাথে আম্মাজান বললেন—তুমি আমাকে এইভাবে অপমান করলে ?

ঃ আমি অপমান করবো কেন আম্মাজান ? নিজেই আপনি নিজেকে অপমান করেছেন। আমি নাদানও নই, নালায়েকও নই। একজন দায়িত্ব সম্পন্ন লোক আমি। অথচ আমার শাদির ব্যাপারে আমি কিছুই জানলাম না, নিজের খেয়াল খুশী মতো আপনি নিজেই এসে পাত্রী দেখে যাচ্ছেন, নিজেই শাদির কথা পাকা করছেন, আজ আবার আমাকে শাদি পড়াতে এসেছেন। আমি গরু না ছাগল ?

ঃ আবদুল আজিজ !

ঃ বার বার এভাবে এসে আপনি এখানে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, তাতে এখন হুগলীতে থাকাই আমার দায় হয়ে পড়েছে। তাই আমার সবিনয় অনুরোধ আম্মাজান, মেহেরবানী করে শাদির কথা এখানে আর একটি বারও উচ্চারণ না করে লোকজন নিয়ে চলে যান। আমাকে আর আপনি পেরেশান করবেন না।

ঃ চলে যাবো ?

ঃ না এখনই যেতে বলছিনে। লোকজন নিয়ে এসেছেন, আরো দু'চারদিন থাকুন, আমাকে মেহমানদারী করার মওকা দিন, কিন্তু ঐ শাদির ব্যাপারে আর

একটা কথাও কারো কাছে বলবেন না বা এনিয়ে আলাপ আলোচনা করবেন না। খানদান-ঘুরে বেড়ান—ব্যস্ !

অত্যন্ত গোস্বাভরে কামরুন নাহার বেগম বললেন—তোমার এখানে আমি খাওয়ার জন্যে এসেছি ? খাওয়ার আমার এতই অভাব পড়েছে ? বেত্তমিজ কাহাঁকার ? এরপরও তুমি থাকতে বলো আমাকে ?

ঃ কেন বলবো না ? আপনি তো আমার আম্মাজান।

আম্মাজান পুনরায় ফেটে পড়ে বললেন—চুপ ! আমার কোন ছেলে নেই। কোন বেয়াদব আর অবাধ্যকে পেটে আমি ধরিনি—

অপরিসীম ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে কামরুন নাহার বেগম জেওরগুলো ক্ষিপ্রহস্তে বাক্সের মধ্যে তুলে নিলেন এবং দ্রুত পদে আবদুল আজিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। অতপর লোকজনদের ডেকে হেঁকে নিয়ে আবদুল আজিজের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে কামরুন নাহার বেগম ঐদিনই ঢাকার দিকে রওনা হলেন। অত্যন্ত কষ্টদায়ক হলেও, নিরুপায় হয়েই আবদুল আজিজকে সব কিছু সহ্য করতে হলো।

ফেরার পথে কামরুন নাহার বেগমের সঙ্গী সাথী মহিলারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—এমন যে হবে, মকানে ঢুকেই তা আমরা অনুমান করেছি। মাগো মা ! রূপ তো নয়, আগুনের ডালী। ঢলঢলে যৌবনের এমন একজন রূপসী ঘরে আছে যার, তার নজর আর অন্যদিকে কোন্ কারণে যাবে, বলুন ?

অন্য একজন মহিলা সঙ্গে সঙ্গেই সায় দিয়ে বললেন—সেতো বটেই। চোখের উপর মন ভোলানো এমন রূপ থাকতে আবদুল আজিজ অন্য কাউকে শাদি করতে চাইবেই বা কেন আর চাওয়াটাই কি তার উচিত ! নিজের পছন্দটা কি সে বেচে খেয়েছে বিলকুল ? তামাম বাংলা তালাশ করলে কি ঐ রকম আর একটা মেয়ে পাবে সে ?

তৃতীয়জন বললেন—তার উপর মেয়েটার ব্যবহার আর আদব-স্বভাব কি সুন্দর দেখেছো ? একদম সোনার মেয়ে লো বহিন। আবদুল আজিজ আমার ছেলে হলে, এ মেয়েকে কিছুতেই আমি হাত ছাড়া করতাম না।

শিরিবানুর উপর কামরুন নাহার বেগমের এমনিতেই যথেষ্ট আক্রোশ ছিল শিরিবানুর মতিগতি আর চাল চলন তাঁর বরদাস্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। এঁদের এই কথাবার্তা কানে পড়ায় আগুনে ঘি পড়লো। তাঁর মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো এবং এই অঘটন আর অপমানের জন্যে তাঁর তামাম আক্রোশ গিয়ে শিরিবানুর ঘাড়ের উপর পড়লো। তিনি অনুভব

করলেন, এই শিরিবানুর কুহকে পড়েই আবদুল আজিজের এই মতিভ্রম ঘটেছে। এতে করে ক্রোধে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন এবং দাঁতের উপর দাঁত পিষে মনে মনে বললেন—দাঁড়াও, তোমার কুহক আমি ছুটাচ্ছি! আগে যাইতো বাড়ীতে !

কামরুন নাহার বেগমের আগমন বার্তা পেয়েই প্রশাসক গিন্নী গুলশান আরার তৎপরতা জিয়াদা গুণে বেড়ে গেল। দুইহাতকে দশহাত বানিয়ে উৎসবের আয়োজনে নিজে তো আত্মনিয়োগ করলেনই, সেই সাথে মকানের চাকর-নফর, দাসী-বাঁদী আর লোকজনদের অবিরাম চরকীর মতো ঘুরাতে লাগলেন এবং গরু ছাগলের মতো তাড়া করে ফিরতে লাগলেন। কারো কোমর জুড়ানোর অবকাশটিও রাখলেন না।

ইতিমধ্যে আবার খবর এলো, কাশিম বাজার থেকে আবদুল আজিজ ফিরে এসেছেন। তিনি রাজী থাকলে, শাদির অনুষ্ঠান আগামীকালও হতে পারে। আবদুল আজিজের আম্মাই এই খবর পাঠিয়ে আরো জানিয়েছেন, ছেলের সাথে কথা বলে আজকেই তিনি নিজে এসে শাদির দিন ধার্য করে যাবেন, তবে আগামীকাল না হলেও পরশুর ওপারে যাবে না। এরপর গুলশান আরা বেগমকে ধরে রাখার সাধ্য কারো রইলো না।

গুলশান আরার এই অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখে রওশন আরা বেগম ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, ব্যাপার কি ? দুলাহ ভাই কি তাহলে ভুলেই গেলেন ওয়াদা তাঁর ? নাকি আবদুল আজিজ সাহেবই তাঁর কথায় কোন গুরুত্ব দিলেন না ? পাত্রীর বড় বহিন বলে গুলশান আরা বেগমকেই কি এ ব্যাপারে মূল ব্যক্তি ধরে নিলেন আবদুল আজিজ সাহেব ? এসব ভেবে রওশন আরা তাঁর দুলাহ ভাইকে ফাঁকে পাওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

কিন্তু দুলাহ ভাইকে করতে হলো না কিছুই। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খাস মকানে খবর এলো—ভেংগে গেছে শাদি। আবদুল আজিজ এ শাদিতে নারাজ হওয়ায় আবদুল আজিজের আম্মা লোকজন ও আনযাম আদি নিয়ে ইতিমধ্যেই ঢাকাতে ফিরে গেছেন।

গুলশান আরা বেগম যখন শিল-পাটা নিয়ে আর পাঁচজন সখী সাথী সহকারে মহানন্দে হলুদ-মেন্দী বাটছিলেন, ঠিক সেই সময় আমিন গাজী এসে এই খবর খাস মকানে পরিবেশন করে গেল। এ খবর কানে পড়তেই গুলশান আরা বেগম তাঁর মেন্দীমাখা হাতখানা সশব্দে কপালে মেরে পাটার পাশেই শুয়ে পড়লেন।

এ ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু তা হলো না। গুলশান আরা বেগমের এই অহেতুক আতিশয্য ও বাড়াবাড়ি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বিরূপ হাসাহাসি আর অসহ্য টিকা টিপ্পনী। এই দুঃসংবাদের খবরে আশপাশের পড়শীরা এসে তাঁকে সমবেদনা জানানোর নামে অলক্ষ্যে চোখ টিপাটিপি ও মুখে কাপড় দিয়ে হাসাহাসিই করে যেতে লাগলেন। তার চেয়েও দায় হলো, চাকর-নফর ও দাসী-বাঁদীদের সামলানো। এই যে তাদের অবিরাম তিনি কুকুর তাড়া করেছেন, আর পেরেশান করে মেরেছেন, এবার তারা সে ঝাল মনের সাধে মিটিয়ে নিতে লাগলো। গুলশান আরা লক্ষ্য করলেন, আড়ালে অন্তরালে আর অন্দর মহলের কোণে কিনারে দাসী-বাঁদী, চাকর-নফর, সকলেই গুপ্‌গুপ্ করে হাসাহাসি করছে আর নানাবিধ টিকা-টিপ্পনী কাটছে। গুলশান আরা সামনে পড়লেই তাদের সব আলাপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর তিনি চোখের আড়ালে চলে গেলেই অমনি আবার চাপাহাসির আওয়াজ তীব্র হয়ে উঠছে। কাজে কামে যারা তাঁর সামনে আসছে তারা তখন একটা কথাও বলছে না বা স্বাভাবিকভাবে তাঁর মুখের দিকেও চাইছে না। কেমন যেন একটা উপহাসের ভঙ্গি তাদের চাল চলনে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। হুমকি-ধমক দিয়েও তিনি দেখলেন, এই প্রবাহ তাতে কিছুই কমছে না, বরং আরো বাড়ছে।

এমনই এক পরিবেশে দাসী-বাঁদীদের গোপন কিছু উপহাস তাঁকে উন্মাদ করে তুললো। তিনি অন্দর মহলের পেছনে দিকের দেউটির কাছে আসতেই তাঁর কানে পড়লো কিছু চাপাহাসির আওয়াজ। আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, দেউটির ওপারে নির্জন একস্থানে কয়েকজন দাসী-বাঁদী জড়ো হয়ে এন্তার হাসাহাসি আর মন্তব্যের পর মন্তব্য করে চলেছে। এদের একজন বলছে "একেই বলে, তারা মণি বাড়া বানে ঢেঁকি উঠে না, তেল সিন্দুর দিয়ে বসে থাকে রব আসে না।" সঙ্গে সঙ্গেই অন্য একজন বলছে, "হলো না-হলো না। কথাটা ওরকম নয় লো ? "যার বিয়ে তার চাড়া নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই'—ঘটনাটা হলো গিয়ে এই রকম।" তৃতীয় জন বলেছে, "ঢং দেখে আর বাঁচিনে। 'কে বর কোথায় বিয়ে, তার কোন খবরই নেই, নেংড়ি খালা উঠে বলে, ওরে নাচন কুঁদন কই ? নাচ না সবাই আমার সাথে এইভাবে কোমর দুলিয়ে !' গলায় দড়ি জোটে না, ছিঃ !"

প্রতিটি মন্তব্যের পরেই তুফান ছুটছে হাসাহাসির।

এসব কথা কানে পড়তেই গুলশান আরা বেগমের মাথার মধ্যে হাজারটা বিষ পিঁপড়ে একসাথে কামড় জুড়ে দিলো। দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে নিয়ে তিনি ছুটে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন এবং অসহ্য মর্মদাহে এপাশ ওপাশ

করতে লাগলেন। এইভাবে বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে দিতেই হঠাৎ তার খেয়াল হলো, যেভাবে হোক আর যার সাথে হোক, রওশন আরার শাদিটা এখনই আর এই আনযামের মধ্যে শেষ করতে পারলেই, ঐসব ইতর ছোটলোকদের মুখে থাবা থাবা ছাই ছিটিয়ে দেয়া যায়। সেই সাথে আবদুল আজিজকেও দেখিয়ে দেয়া যায়, সে গররাজী হলেও রওশন আরার শাদি তাতে মোটেই ঠেকে থাকে না।

বরের কথা ভাবতে গিয়েই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো উমিদ আলীর মুখ। সেই সাথেই তাঁর খেয়াল হলো রওশন আরার ইরাদার কথা। উমিদ আলীর ঘরে যেতেই সে মনে প্রাণে আগ্রহী। "পেয়েছি-পেয়েছি" বলে তিনি ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলেন এবং মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললেন।

সিদ্ধান্ত স্থির করেই তিনি ছুটে বেরুলেন তাঁর খসমের তালাশে। প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব তার নিজ কক্ষেই ছিলেন। গুলশান আরা ছুটে এসে তাঁর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললেন—দোহাই জনাব, যেভাবেই হোক, আপনি আমাকে বাঁচান!

চমকে উঠে দুই পা গুটিয়ে নিতে নিতে জিন্দা মালিক সাহেব বললেন—আরে-আরে! করেন কি-করেন কি?

এই রকম আকুল কণ্ঠে গুলশান আরা বললেন—পায়ে পড়ি জনাব। একটু মেহেরবানী করুন। আমি আর সহ্য করতে পারছিনে।

ঃ আহা, হলোটা কি তাই আগে বলুন?

ঃ শুধু অন্দর মহলেই নয়, এই পাড়াতেই থাকা আমার দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে জনাব। নানাজনের নানা রকম উপহাসে আমার কর্ণমূল গরম হয়ে গেছে। আমি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতেও পারছিনে। আমাকে এই দুর্বিসহ যন্ত্রণা থেকে মেহেরবানী করে বাঁচান।

জিন্দা মালিক সাহেব বিষয়টি অনুমান করে মনে মনে হাসলেন। বললেন—ঘটনাটা খুলেই বলুন না শুনি!

গুলশান আরা বললেন—রওশন আরার শাদিটা ভেংগে যাওয়ায় দাসদাসী আর ছোটলোকদের হাসাহাসির জ্বালায় আমি আর অন্দর মহলে টিকে থাকতে পারছিনে। এটা আমি বন্ধ করতে চাই।

ঃ কি তাজ্জব! লোকের লাঠি ছান্দা যায়, মুখ ছান্দবেন কি করে? বার বার বলা সত্ত্বেও আমার কথায় গুরুত্বই কিছু বেগম সাহেবা দিলেন না। ব্যাপারটা যে এ রকমও হতে পারে, এটা তিনি বুঝতেই চাইলেন না।

ঃ আমার কসুর হয়ে গেছে জনাব। আমাকে মাফ করে দিন। আর সেই সাথে আমি যা করতে অনুরোধ করি, মেহেরবানী করে জনাব তা করুন। আমার ইজ্জত জনাবেরও ইজ্জত!

ঃ বটে! তা কি করতে চান, বলুন?

ঃ রওশন আরার শাদিটা আমি এই আনযামের মধ্যেই দিতে চাই। জনাব সেই ব্যবস্থাই করুন।

ঃ তার মানে! এটা কি করে সম্ভব? হঠাৎ আপনি বর পাবেন কোথায় আর রওশন আরাই বা তাতে রাজী হবে কেন?

ঃ হবে-হবে। জনাব একটু উদ্যোগ নিলে রওশন আরাও রাজী হবে আর বরও আছে হাতেই।

ঃ অর্থাৎ?

গুলশান আরা বেগম ঈষৎ হেসে বললেন—উমিদ আলী ভাই-ই সেই বর আর রওশন আরার ইচ্ছেটাও এই রকমই। ওটা আমি টের পেয়েছি।

প্রশাসক সাহেব অতিশয় বিস্মিত হলেন। এরপর তিনি ঠেশ্ দিয়ে বললেন—বলেন কি! উমিদ আলী! সে তো একজন বেগম সাহেবার হুকুম বরদার। তার হাতে বেগম সাহেবা বহিনকে দিবেন কিভাবে? মান থাকবে তাঁর?

গুলশান আরা বেগম সলজ্জ কণ্ঠে বললেন—ছিঃ! জনাব যে কি বলেন। সেকি জনাবের ভাই নয়? একজন প্রশাসকের ভাইয়ের সাথে তাঁর শ্যালিকার শাদি হলে তা বেমানান হবে কেন, যে মান থাকবে না।

ঃ বটে!

ঃ তদুপরি, সে এখন মাদ্রাসার একজন মুদাররেস্। সরকারী কর্মচারী মানেই তো পক্ষান্তরে গোলাম। একজন সরকারী কর্মচারীর চেয়ে যিনি এলেম শিক্ষা দেন, তাঁর মর্যাদা কি কম?

ঃ বলেন কি! হঠাৎ বেগম সাহেবার এই মহৎ অনুভূতি!

ঃ সব অবস্থাতেই সব কিছু অনুভব করা যায় না জনাব। ঠেকায় পড়লেই মানুষের দিব্য দৃষ্টি খোলে। আজ আমি যেভাবে চিন্তা করতে পারছি, যেভাবে সত্যটা এখন আমার কাছে ধরা পড়ছে, এভাবে তো আগে কখনও পড়েনি। তখন আমি এক দিকটাই দেখেছি, আর পাঁচ দিক দেখিনি।

ঃ বেগম।

ঃ তা ছাড়া উমিদ আলী ভাইয়ের মতো এমন সরল-সৎ মানুষ যে লাখে একটা পাওয়া যায় না, সেটাও এখন আমি সঠিকভাবেই বুঝতে পারছি।

ঃ কিন্তু সেই সরল-সৎ মানুষটাকে তো বেগম সাহেবা তাড়িয়ে তবে ছেড়েছেন। সে যদি এবার বেঁকে বসেন ?

ঃ যেভাবে হোক, তাকে আবার ফিরিয়ে আনুন জনাব।

ঃ কিন্তু সে যদি আর এ মকানে না আসতে চায় ? না থাকতে চায় এখানে ? সে তো এখন স্বাবলম্বী মানুষ !

ঃ না থাকতে চায় না থাকুক, কিন্তু তাকে একবার ডেকে আনুন জনাব। আমি তার সাথে কথা বলি। শাদি করে সে যেখানে থাকতে চায়, সেখানেই স্বাধীনভাবে থাকুক।

ঃ কিন্তু—

ঃ নইলে আমাকেই তার কাছে নিয়ে চলুন জনাব। আমি নিজে তার হাত চেপে ধরবো। আমার বিশ্বাস, আমি তার হাত ধরলে তার ভাবী সাহেবাকে সে কোনদিনই অমান্য করেনি, আজও করবে না।

অপরিসীম বিস্ময়ে জিন্দা মালিক বললেন—তাজ্জব ! আমি খোয়াব দেখছি নাতো ! বেগম সাহেবার এতটা পরিবর্তন—এটা চিন্তা করা যায় কিভাবে ?

ঃ কেন যাবে না জনাব ? আমি যে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি, একমাত্র ঐ উমিদ আলী ভাইয়ের সাথে শাদি হলেই, রওশন আরা সুখী হবে, অন্য কোথাও হলে সে তা হবে না। আমার এই সহোদরা বহিনটার সুখটাই তো সবার আগে দেখবো আমি !

পরের দিনই আবার সেই স্থগিত শাদির আনযাম জোরদার হয়ে উঠলো এবং পূর্ব পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বেশী ধুমধামের মধ্যে দিয়ে উমিদ আলীর সাথে রওশন আরার শাদি মোবারক সুসম্পন্ন হয়ে গেল। স্বপ্ন দেখার মতো উমিদ আলী কেবলই অনুভব করতে লাগলো, সে যেন আজ উমিদ আলী নয়, সে রঘু পোদ্দারের কন্যা শ্রীমতির বিশ্বনাথ। গায়েবী এক মদদে যাকে সে পাওয়ার আশা করতেই পারেনি, তারই সাথে আজ তার শাদি হয়ে যাচ্ছে। গায়ে চিমটি কেটে বার বার সে নিজের অস্তিত্বটা অনুভব করতে লাগলো।

তার তামাম ঘোর কাটিয়ে দিলেন রওশন আরা বেগম।

বাসর ঘরে ঢুকেই তিনি সলজ্জ হাসি মুখে সর্বাগ্রে বললেন—কি ? সন্দেহটা ঘুঁচলো ?

উমিদ আলী থমমত করে বললো—সন্দেহ !

রওশন আরা বললেন—ঐযে সেদিন বলেছিলেন, "আরে যাবেন নাতো কি আমার বউ হয়ে আপনি আমার ঘরে আসবেন যে, অন্যের ঘরে যাবেন না ?" মনে আছে সে কথাটা ?

উমিদ আলীও সলজ্জ হাসি মুখে বললো—জি-জি, জরুর আছে।

ঃ কার ঘরে গেলাম আমি, এবার বলুন ?

মুখে কিছু না বলে উমিদ আলী তৎক্ষণাৎ বিপুল আবেগে রওশন আরাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন।

১১

নবাব শায়েস্তা খান আবার বাংলা মুলুকের নবাব হয়ে এলেন। আবার পাল্টে গেল বাংলা মুলুকের প্রেক্ষাপট। ঈমানদার আর সজ্জনের মুখে ফুটে উঠলো হাসি। চুন হলো দুর্জনের মুখ।

শাহান শাহ আওরঙ্গজেব তাঁর আওলাদ ও বাংলার সুবাদার সুলতান মুহাম্মদ আজম শাহকে বাংলা থেকে ডেকে নিলেন। আজম শাহকে তিনি দাক্ষিণাত্যে-তাঁর সাথে যোগদান করার নির্দেশ দিলেন। বাংলার প্রয়োজনে ও বাংলার শুভাকাঙ্খী এবং ঈমানদারদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খান সাহেবকে আবার বাংলার নবাব করে পাঠালেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে যাদুমন্ত্রের মতো বাংলা মুলুক আপছে আপ অনেকখানি পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো। নড়বড়ে শাসন এ সংবাদে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। সতর্ক হয়ে গেল আমলা-অমাত্য-কর্মচারীরা। শক্ত হয়ে গেল প্রশাসনের ঢিলেঢালা কলকব্জা। চমকে উঠে কচ্ছপবৎ পেটের মধ্যে শুঁড় লুকালো মতলববাজ দুর্বৃত্তেরা। নবাব শায়েস্তা খানের ভাবমূর্তি বিরল এক ভাবমূর্তি।

বাংলা মুলুকে ফিরে এসেই নবাব শায়েস্তা খান প্রশাসনের ফাটলগুলো খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলেন এবং প্রশাসনে এক ব্যাপক রদবদল আনলেন। তিনি ঈমানদার ও একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করলেন, তিরস্কার, শাস্তি প্রদান ও বহিষ্কার করলেন সুযোগ সন্ধানী অসৎজনদের।

পুরস্কারের হিড়িক পড়লো হুগলীতে। নবাব শায়েস্তা খান সানন্দে অনুধাবন করলেন, তাঁর অনুপস্থিতির তিল পরিমাণ ছায়াও হুগলীর প্রশাসনে পড়েনি।

তাঁর উপস্থিতিতে এ প্রশাসন যেমনটি ছিল, এখনও তা তেমনই বা ততোধিক মজবুত আছে, এর কোথাও কোন চিড়-ফাটল ধরেনি। ফলে, নবাব শায়েস্তা খানের অকুণ্ঠ তারিফের হকদার হলেন হুগলীর প্রশাসক, ফৌজদার ও আমলা-অমাত্য সকলেই। গুণানুযায়ী সকলেই লাভ করলেন পুরস্কার ও পদোন্নতি। নবাবের সর্বাধিক তারিফ পেলেন ফৌজদার আবদুল আজিজ বেগ ও তাঁর পরেই প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেব। উভয়েরই যথাযথ পদোন্নতি হলো। প্রশাসক জিন্দা মালিক সাহেবকে নবাব শায়েস্তা খান তাঁর নিজ দরবারের বিশিষ্ট এক সভাসদ ও উপদেষ্টা বানালেন। ফৌজদার আবদুল আজিজকে তিনি দিলেন হুগলীর প্রশাসকের পদ। সেই সাথে আবদুল আজিজকে আরো দিলেন খিতাব ও তরবারি। শূন্যস্থান পূরণার্থে নবাব শায়েস্তা খান হুগলীর অন্যতম ফৌজদার করে পাঠালেন আবদুল গনি নামের এক জানবাজ লড়াইয়াকে।

হুগলীর সর্বত্রই পরিবর্তনের হাওয়ার সাথে এক খোশপ্রবাহ বইতে লাগলো। প্রশসাকের কর্তৃত্ব হাত ছাড়া হলেও, খাস দরবারের সভাসদ হওয়ার কিস্‌মত লাভ করায় জিন্দা মালিক সাহেব খোশদীলে ঢাকায় যাওয়ার আনযাম করতে লাগলেন। প্রশাসকের দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে আবদুল আজিজ বেগ খাস মকানে পার হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। আবদুল আজিজের সরকারী বাসস্থানে সপরিবারে ঠাঁই নেয়ার ইরাদায় নয়া ফৌজদার আবদুল গনি সাহেব সানন্দে এন্তেজারে রইলেন। পদোন্নতি প্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিরাও মাহানন্দে নয়াপদ বুঝে নিতে লাগলেন। সর্বত্রই হাসি খুশী। পরিবর্তনের কারণে তেমন কোন আজাব-আঁচড় কোথাও পরিলক্ষিত হলো না।

পরিবর্তনের এই প্রেক্ষাপটে আবদুল আজিজই সর্বাধিক ভাস্বর হয়ে উঠলেন। তাঁকে নিয়েই সর্বাধিক সোচ্চার হলেন সকলে। হুগলীর সমুদয় খোশদীল ফৌজদার-আমলা-সেরেস্তাদার এসে নয়া প্রশাসক আবদুল আজিজ বেগকে সকাল-সন্ধ্যা খোশ আমদেদ জানিয়ে যেতে লাগলেন। জিন্দা মালিককে হারালেও, আবদুল আজিজকে প্রশাসকরূপে পেয়ে সকল পর্যায়ের দেশপ্রেমিক সরকারী ও বেসরকারী জনগোষ্ঠী বেদনার চেয়ে আনন্দটাই অধিক অনুভব করলেন এবং তারা আবদুল আজিজের ভালাই কামনা করতে লাগলেন। মুখে মুখে ফিরতে লাগলো আবদুল আজিজের নাম। আবদুল আজিজকে ঘিরে সর্বত্রই উষ্ণ হলো হুগলীর আবহাওয়া। কিন্তু আনন্দের তাপ নেই আবদুল আজিজের দীলে। দীল তাঁর অত্যন্ত শীতল ও নির্জীব।

এই রদ বদলের আগেই আনন্দের উৎস তাঁর উধাও হয়ে গেছে। যে সুষমার হিল্লোল তাঁর তামাম গ্লানী তামাম ক্লান্তি মুছে নিতো নিঃশেষে, সেই সুষমাময়ী শিরিবানু তাঁর কাছে আর নেই। আজকের এই আনন্দে যে সর্বাধিক

উল্লসিত হয়ে উঠতো, সেই শিরিবানুর সান্নিধ্য থেকে তিনি এখন বিচ্ছিন্ন। এক দুরপনেয় কারণ তাকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। শস্যহীন ক্ষেতের মতো তাঁর প্রফুল্ল মকান এখন বিষণ্ন ও বিরাণ।

আবদুল আজিজের শাদি দিতে এসে তাঁর আম্মা কামরুন নাহার বেগম সেই যে ব্যর্থ হলেন, সেই ব্যর্থতার গ্লানী আর জ্বালা তাঁকে অবিরাম দগ্ধ করতে লাগলো। ফিরে আসার পথেই তাঁর সঙ্গিনীদের আলাপ শুনে তিনি তাঁর সেই ব্যর্থতার ঝাল মেটানোর লক্ষ্যবস্তু স্থির করে ফেললেন এবং ঢাকায় পৌছার সাথে সাথেই সেই ঝাল মেটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মকানে ফিরেই তিনি তাঁর খসম আবদুল খালেক সাহেবকে জানালেন, এই অঘটনের একমাত্র কারণ ঐ মদিনা বিবি আর তার মেয়ে শিরিবানু। এরাই আবদুল আজিজকে যাদু করে রেখেছে। এদেরই কুমতলবের শিকার হয়ে আবদুল আজিজ তাঁকে এইভাবে হেয়প্রতিপন্ন করেছে আর এমন একটা কেলেংকারী ঘটিয়েছে। অতি সত্বর এর বিহিত না করলে, এখনও মান সম্মান যেটুকু আছে, সেটুকুও থাকবে না।

আবদুল আজিজের পত্রে আবদুল খালেক সাহেব ব্যাপারটা জেনেছিলেন। কিন্তু কি কারণে শাদিতে তাঁর একান্তই এই অনীহা, পত্রে কিছু আপত্তির কথা থাকলেও, পুত্রের পত্র থেকে তিনি তা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। স্ত্রীর কথায় এদিকটা নিয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এবং চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—কি করতে চান আপনি?

কামরুন নাহার বেগম বললেন—ঐ কুহকটা এখনই আবদুল আজিজের সামনে থেকে সরিয়ে আনতে চাই আর আবদুল আজিজের সংস্পর্শ থেকে আপদটাকে চিরতরে সরিয়ে দিতে চাই।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ শিরিবানু আর তার আম্মাকে হুগলী থেকে এখনই ফিরিয়ে আনতে হবে আর ঢাকায় এনেই যেখানে হোক, জলদি জলদি শাদি দিয়ে শিরিবানুকে বিদায় করতে হবে।

ঃ এতটাই করতে হবে?

ঃ হবে না? পুরোপুরি খতম করে না দিয়ে ভিমরুলের চাকে ঢিল দেয়ার যুক্তি আছে? সেরেফ ঢিল দিয়ে ছেড়ে দিলে তো উল্টা মুসিবত পয়দা হবে।

ঃ কি রকম?

ঃ জনাব কেন বুঝতে চাচ্ছেন না? শুধু সরিয়ে এনে চুপ থাকলেই হবে? এখান থেকেই ঐ কুহকিনী যে কোন কায়দায় আবদুল আজিজকে আবার তার কুহকে শক্ত করে জড়িয়ে ফেলবে, তার ঠিক ঠিকানা কি? আপদের আমি শেষ রাখতে চাইনে।

বেগম সাহেবার আধিক্যে তেমন কোন গুরুত্ব না দিয়ে আবদুল খালেক সাহেব ঠাণ্ডা কণ্ঠে বললেন—সে যা হয় তা করবেন। সরিয়ে আনতে চান, সরিয়েই ওদের আনুন আগে।

জবাবে কামরুন নাহার বেগম হাঁ-হাঁ করে বললেন—আমি সরিয়ে আনবো কি। আমার কথায় কি আর কাজ হবে, না আমাকে আর আদৌ সে গ্রাহ্য করে? যে আচরণ সে আমার সাথে করেছে, তাতে একথা আমি চিন্তাই করতে পারিনে। আমি আনতে লোক পাঠালে, সে তাতে গুরুত্ব তো দেবেই না, আরো বরং যা ভাবতে পারিনে, সেইটেই হয়তো ঘটিয়ে ফেলবে।

ঃ কেমন!

ঃ হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে তখনই যে সে শিরিবানুকে শাদি করে বসবে না, এমন কোনই নিশ্চয়তা নেই।

আবদুল খালেক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন—এসব আপনি কি বলছেন?

ঃ বলছি কি আর সাধে? আবদুল আজিজ আর সে আবদুল আজিজ নেই। এখনই সে যেমনই বেশরম, তেমনি অবাধ্য আর জেদী। ঐ একটা আশ্রিতার মেয়েকে সে যেভাবে এলেমদার করে তুলেছে আর শাহজাদীর লেবাসে যেভাবে তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছে, জনাব তা নিজের চোখে দেখলে তবেই আমার আশংকাটা উপলব্ধি করতে পারতেন।

ঃ বলেন কি?

ঃ আমি একাই তা বলবো কেন? হুগলীতে যাঁরা আমার সাথে গিয়েছিলেন জনাব একবার তাঁদের মুখেই শুনুন না? সবাই তাঁরা একমত যে, ঐ শিরিবানুকে শাদি করার জন্যেই আবদুল আজিজ এই ধরাবাঁধা শাদিটা নাকোচ করে দিয়েছে।

ঃ তাজ্জব!

ঃ সেই জন্যেই তো বলছি, আমার কথাতে হবে না। জনাব একটা পত্র দিন আবদুল আজিজকে। ওদের পাঠিয়ে দেয়ার কথা জনাব নিজে আবদুল আজিজকে লিখলে হয়তো আবদুল আজিজ আর তা অমান্য করতে পারবে না। নির্ঝঞ্ঝাটে কাজটা হয়ে যাবে।

ঃ কি আশ্চর্য! এতটাই আশংকা আপনার?

ঃ এতটাই—এতটাই। কত আর বুঝিয়ে বলবো আমি? ঐ মা-মেয়ে মিলে যদি ছিঁচকে কাঁদন জুড়ে দেয়, আবদুল আজিজের মাথাটা বিগড়ে যেতে একদণ্ডও লাগবে না।

ঃ বেগম!

ঃ আমি কালসাপকে বিশ্বাস করতে পারি, তবু ওদের বিশ্বাস করিনে। ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। মেহেরবানী করে জনাব একটা পত্র দিন

আবদুল আজিজকে, আমি জলদি জলদি লোক পাঠিয়ে দেই। ভালোয় ভালোয় আগে ওদের সরিয়ে আনি।

আবদুল খালেক সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—এযে মশা মারতে কামান দাগার ব্যাপার দেখছি। ঠিক আছে, বেগম সাহেবা চান যখন, পত্র আমি দেবো একটা। তবে কি লিখবো, তা একটু ভেবে দেখি।

আবদুল খালেক সাহেব তাঁর বেগমকে সবিশেষ চেনেন। যেকোন ব্যাপারকেই তিনি এক তরফাভাবে চরম করে দেখেন। মামুলী একটা ব্যাপারেও তিনি হৈ চৈ করে মাত্রাধিক আধিক্যে চলে যান এবং মনগড়া চিন্তা-ভাবনার উপর উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তার উপর আস্থা রাখা শক্ত। ঘটনাটা তাই তিনি যাচাই করে দেখলেন। কামরুন নাহার বেগমের সাথে হুগলীতে যাঁরা গিয়েছিলেন, পত্র লেখার আগে তিনি তাদের সাথে কথা বললেন। আলাপ করে যা বুঝলেন, তাতে ঘটনাটা যা-ই হোক, নানাবিধ কারণেই শিরিবানুদের ওখান থেকে সরিয়ে আনা উচিত।

বেগমের পীড়াপীড়িতে তাই তিনি পত্র দিলেন পুত্রকে। দোআ ও কুশল জানিয়ে তিনি আবদুল আজিজকে লিখলেন, শিরিবানুকে আর এখন তোমার মকানে রাখাটা ঠিক নয়। শিরিবানুর বয়স হয়েছে। এ নিয়ে এখন অনেকেই অনেক কথা বলতে শুরু করেছে। সামাজিক মর্যাদা এতে করে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার চেয়েও বড় কথা, এটা শরিয়তের বরখেলাপ। বয়স্থা এক বেগানা আউরাতকে তোমার মকানে চোখের সামনে রাখা শরিয়তের পরিপন্থী। তুমি জ্ঞানী ছেলে। তোমাকে আর অধিক বলার প্রয়োজন নেই। প্রেরিত লোকদের সাথে শিরিবানু আর তার আম্মাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিও। তোমার তয় তদবিরের জন্যে অন্য একজন কাজের মেয়ে পাঠালাম।

অতপর নকরী ও শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ নসিহত দিয়ে তিনি পত্রটি শেষ করলেন।

বাড়ীর এক পুরাতন ও নির্ভরযোগ্য কাজের মেয়ে সহকারে কামরুন নাহার বেগম হুগলীতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। শিরিবানুর আম্মা মদিনা বিবির উদ্দেশ্যে প্রেরিত লোকদের মারফত তিনিও গোপনে এক পত্র প্রেরণ করলেন। মদিনা বিবিকে গরম গরম নানা কথা লিখার পর তাঁর পত্রে তিনি অবশেষে লিখলেন, কিছুমাত্র শরম আর কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে পত্র প্রাপ্তির পর আর একটা দিনও অপেক্ষা না করে শিরিবানুকে নিয়ে তুমি ঢাকায় চলে আসো। তোমাদের কুমতলব বুঝতে আর আমার বাঁকী নেই। আর সে কারণেই তোমাকে আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, তোমার কোন মতলবই ফলপ্রসূ হবে না। শিরিবানুকে আবদুল আজিজের ঘাড়ে চাপানোর যতই কায়দা করো না

কেন, এটা কেউ আমরা বরদাস্ত করবো না। তোমাদের কুহকে পড়ে আবদুল আজিজ যদি মাতা পিতার অবাধ্য হয়, ঐ পুত্রের মুখ জীবনেও কেউ আমরা দেখবো না বা তোমার মেয়ের স্থান এ মকানে হবে না। জোয়ান মেয়েকে বেগানা এক জোয়ান পুরুষের সামনে এভাবে লেলিয়ে দিয়ে না রেখে, মেয়ের বয়স অধিক হওয়ার সাথে সাথেই নিজ গরজে তোমার ঢাকায় আসা উচিত ছিল। তা যখন আসোনি, তখন নেমক খেয়ে আর নেমকহারামী না করে প্রেরিত লোকের সাথে মা-মেয়ে দুইজনই তোমরা ঢাকায় চলে আসবে, এই আমার শেষকথা।

যথাসময়ে পত্র দুইটি নির্দিষ্ট দুই ব্যক্তির হাতে পড়লো। পত্র পাঠ করেই মদিনা বিবি ক্ষোভে দুঃখে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর চোখ ফেটে কান্না এলো। তামাম দুনিয়া তাঁর সামনে আঁধার হয়ে গেল। নিজের এই অসহায় অবস্থাকে তিনি বার বার অভিসম্পাত দিতে লাগলেন।

আম্মাকে হঠাৎ এভাবে আকুলি বিকুলী করতে দেখে শিরিবানু আম্মার কাছে ছুটে এলো এবং কারণ জিজ্ঞাসা করলো। মদিনা বিবি মুখে কিছু না বলে কামরুন নাহার বেগমের ঐ পত্রখানা ক্রোধভরে তাঁর দিকে ছুড়ে দিলেন। পত্রখানা কুড়িয়ে নিয়ে পাঠ করার সাথে সাথে শিরিবানুও থর থর করে কেঁপে উঠলো। মাথায় তার আকাশ ভেংগে পড়লো। দুঃখে ও আক্রোশে সে উন্মাদিনী হয়ে গেল। চোখের সামনে থেকে তার রঙ্গিন জগৎ এক পলকে মিলিয়ে গেল। পত্রখানা হাতে নিয়ে সে আবদুল আজিজের কামরার দিকে ছুটলো এবং বিপুল অভিমান ভরে পত্রখানা আবদুল আজিজের সামনে পালংকের উপর ফেলে দিয়েই তৎক্ষণাৎ সে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

আব্বার পত্রখানা পাঠ করার পর আবদুল আজিজ এই সময় বিষণ্নদীলে বসে বসে আসমান জমিন বিচরণ করে ফিরছিলেন। তাঁর আব্বার এই পত্র পাঠানোর হেতু খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কিভাবে তিনি এই কথাটা শিরিবানুদের বলবেন, এটা ভেবে দিশেহারা হচ্ছিলেন। এই সময় শিরিবানু ঐ পত্রখানা ফেলে দিয়ে যাওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ পত্রখানা তুলে নিলেন এবং এক নিঃশ্বাসে পত্রখানা পাঠ করলেন। পত্রখানা পাঠ করেই তিনি পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেলেন। ক্রোধে তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। এতক্ষণে তাঁর আব্বার ঐ পত্র লেখার তিনি হেতু খুঁজে পেলেন। এতে করে তাঁর আম্মার উপর মন তাঁর আরো অধিক বিষিয়ে গেল। তখনই তিনি ভাবলেন, গর্ভধারিণী হলেও, এই অবিবেচক ও হৃদয়হীনা মহিলাটিকে চরম শিক্ষা দিয়ে এখনই তিনি শিরিবানুকে শাদি করে ফেলবেন। তাঁর আম্মার এই অসহ্য ও মাত্রাহীন অত্যাচারের এখানেই তিনি কবর রচনা করবেন। এই অহেতুক জিদকে আর বরদাস্ত করবেন না।

কিন্তু আব্বার কথা মনে পড়তেই আবদুল আজিজ আবার দুর্বল হয়ে গেলেন। তাঁর ঐ প্রশান্ত ও দানেশমান্দ ওয়ালেদের প্রতি গভীর তাঁর ভক্তি। ওয়ালেদের ব্যক্তিত্বের প্রতি অগাধ তাঁর বিশ্বাস। ওয়ালেদের ঐ শান্তধীর পত্রখানা আবার তিনি পাঠ করলেন। পাঠ অন্তে আবদুল আজিজ ঝিমিয়ে পড়লেন আস্তে আস্তে। পিতার আদেশ অমান্য করার চিন্তা করতে পারলেন না। সেই সাথে তাঁর আম্মার মতো একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অবুঝ আউরাতের সাথে খামখেয়ালীর পাল্লা দেয়াটাও তিনি সমীচীন বোধ করলেন না। ভাবলেন, শিরিবানুকে ঢাকায় নিতে চান তাঁরা, যাক সেখানে শিরিবানু। গেলেই তো তাকে কেউ খেয়ে ফেলবে না গিলে ! তাদের নিয়াত আর মুহাব্বত যদি ঠিক থাকে, তাদের জুদা করে কে ? সময় সুযোগ মতো বিষয়টা কাউকে দিয়ে আব্বাজানকে সমঝিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চয়ই কোন জটিলতা আর থাকবে না। সম্ভাব্য পথ পন্থায় চেষ্টা করে না দেখেই শিরিবানুকে এভাবে শাদি করে কাজ নেই সবার সাথে সুসম্পর্ক ছেদ করে !

এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা করে আবদুল আজিজ উঠলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে মদিনা বিবির কাছে গেলেন। আবদুল আজিজকে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন মদিনা বিবি। কপালে হাত রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—এতটা লাঞ্ছনাই নসীবে আমার ছিল বাপজান !

আবদুল আজিজ তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার কোশেশ করলেন। বললেন—এতে এত পেরেশান হচ্ছেন কেন চাচী আম্মা ! যে কারণেই হোক, আমার আম্মার মাথা খারাপ হয়েছে। আমাকেও সেদিন তিনি নানাভাবে গালমন্দ করেছেন। একজন অস্থির মস্তিষ্ক আউরাতের কথায় এতটা আপনি ভেঙ্গে পড়ছেন কেন ? আমরা তো কেউ আপনাদের সাথে দুর্ব্যবহার করিনি ? আব্বাও করেননি। বরং তিনি বেশ শান্তভাবে কথাটা বুঝিয়ে বলে আমাকে এক পত্র দিয়েছেন। আপনি শান্ত হোন। শান্তভাবে বসে বিষয়টা চিন্তা করলেই দীল আপনার হাল্কা হয়ে যাবে। আম্মার খামখেয়ালী তো বরাবরই দেখছেন। তাঁর কি মাথার ঠিক আছে ?

মদিনা বিবির ব্যথা এতে কিছুমাত্র প্রশমিত হলো না। তিনি আফসোস্ করে বললেন—তা তুমি যা-ই বলো বাপজান, আমার ঢের আক্কেল হয়েছে। আর এক মুহূর্তও এ নিয়ে আমি চিন্তা করতে রাজী নই।

ঃ চাচী আম্মা !

ঃ আর একদণ্ড এখানে আমি থাকবো না বাপজান। এ রকম একটা ধিক্কারের পর আর এখানে থাকা আমার সম্ভব নয়। ঢাকায় তো আগে যাই, তারপর চিন্তা-ভাবনা যা করার সেখানে গিয়ে করবো।

ঃ সেকি চাচী আম্মা ! এখনই আপনি ঢাকায় যেতে চান ? দু'একটা দিন দেরী করে যাবেন না !

ঃ একটা বেলাও নয়। যাওয়ার যদি অন্য কোন জায়গা আমার থাকতো বাপজান, তাহলে ঐ ঢাকাতেও আর যেতাম না। এতটা দিগ্‌দারীর পর ঐ পরিবেশে আর ঢুকতাম না। তোমাদের তামাম সংশ্রব এখানেই খতম করে দিয়ে আমি সেই জায়গায় চলে যেতাম। কিন্তু কি করবো ? নসীবটা যে বড়ই নারাজ আমার !

ঃ চাচী আম্মা !

মদিনা বিবি এবার ফুঁশে উঠে বললেন—তোমাকে আমি বার বার বলেছি বাপজান, শিরিবানুকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি তুমি করো না ? গরীবের এলেম শিক্ষার গরজ নেই। দেখে শুনে জলদি জলদি শাদিটা তার দিয়ে ফেলি ! কিন্তু তুমিই তাতে বাদ সাধলে। কেন তুমি বাদ সাধলে বাপজান ? এইভাবে আমাদের নিয়ে মস্করা করার জন্যে ? এইভাবে অপমান করার জন্যে ?

আবদুল আজিজ আহত কণ্ঠে বললেন—চাচী আম্মা !

মদিনা বিবি বললেন—যে ভয়টা বরাবর আমি করেছি, সেইটেই তো হলো। গরীবের যে এত সুখ সয় না, সেইটেই তো ফললো ? অথচ এদিকটা তুমি তুলতেই দাওনি আমাদের। আমাদের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে গেলেই তখনই তুমি হৈ হৈ করে উঠেছো। কি গুনাহর ফলে যে তোমার খপ্পড়ে পড়ে গেলাম আমরা ! এখন না থাকলো হেঁটে যাওয়ার ঘাঁটা, না থাকলো মেপে খাওয়ার কাঠা !

শিরিবানু ইতিমধ্যেই এসে এক পাশে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল। তার উপর নজর পড়তেই মদিনা বিবি বিপুল আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে শিরিবানুকে বললেন—হা করে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে না ? পিঁপড়ে হয়ে পাখীর মতো আসমানে উড়ার সখ ! হতচ্ছাড়ি কাঁহাকার ! হাজার বার বলেছি, সমঝে চলো—নিজের নসীব গুণে চলো। কানে তো সে কথা একবারও ঢুকেনি ! এখন নাও, কোন্ ভাগাড়ে উড়বে এখন উড়ো। বেহায়া-বেশরম ! ঢং ধরে আর দাঁড়িয়ে না থেকে শিগ্গির শিগ্গির গুছিয়ে নাও সব কিছু !

অতিষ্ঠ হয়ে আবদুল আজিজ বললেন—আহ্ ! আপনি থামুন তো চাচী আম্মা ! যাওয়ার জন্যে এখনই এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন ?

মদিনা বিবি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—থাক বাপজান। আর কিছু শোনার আমার গরজ নেই। যাঁদের হাতে আমাদের গিয়ে পড়তে হবে, তাঁদের হুকুম অমান্য করলে চলবে কেন আমাদের ?

ক্ষুব্ধ চিত্তে মদিনা বিবি সেখান থেকে সরে গেলেন। অনেক সাধাসাধি করেও আবদুল আজিজ তাঁকে শান্ত করতে পারলেন না। সেই দিনই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থেকে তিনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলেন। হতাশ দীলে ফিরে এসে আবদুল আজিজ বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়া শেষ হলো। ঢাকা থেকে আগত লোকেরা এসে আবদুল আজিজের কাছে বিদায়-আদায় নিয়ে গেল। খানিক পরে মদিনা বিবিও এসে "আসি বাপজান, কসুর থাকলে মাফ সাফ করে দিও," বলে যেভাবে তিনি এসেছিলেন, ঐভাবেই নতমস্তকে বেরিয়ে গেলেন।

আবদুল আজিজ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হঠাৎ করে খেয়াল হতেই তিনি দ্রুতপদে তাঁর সেই দোতালার বিশেষ কক্ষে উঠে গেলেন। তাঁর আম্মাজান তামাম গহনাই গুছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আংটিটা উভয়ের ভুলের জন্যে আবদুল আজিজের জামার জেবেই রয়ে গিয়েছিল। আবদুল আজিজ সেই আংটিটা এই দ্বিতল কক্ষে রেখেছিলেন। আংটিটা শিরিবানুকে পরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতল কক্ষে আংটি নিতে এলেন। তিনি জানতেন, যাওয়ার আগে শিরিবানু অবশ্যই তার কাছে বিদায় নিতে আসবে। না এলে, নিজেই তাকে ডেকে নিয়ে তিনি পরিয়ে দেবেন আংটিটা। এই ভেবে এসে আংটিটা হাতে নিয়েই আবদুল আজিজ তড়িৎ গতিতে তাঁর দ্বিতল কক্ষের বারান্দায় এসে নীচে একবার উঁকি দিলেন। দেখলেন, মালপত্র সব বের করা হয়েছে, কিন্তু লোকজন এখনও বেরোয়নি। এই উঁকি দিয়ে দেখার কালেই কম্পিত পদে দ্বিতল কক্ষে উঠে এলো শিরিবানু। দেখার পরই নীচে নামার উদ্দেশ্যে আবদুল আজিজ তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াতেই শিরিবানু নীরবে এসে কদমবুঁচি করার জন্যে ঝুপ্ করে আবদুল আজিজের পায়ের কাছে বসে পড়লো। কদম বুঁচি করতে গিয়ে কদমবুঁচি করেই সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে পারলো না। লহমা খানেক ঐভাবেই নতমস্তকে বসে রইলো। হতবুদ্ধি হয়ে আবদুল আজিজও ঐভাবে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর শিরিবানুর অবাধ্য অশ্রুর কয়েক ফোঁটা আবদুল আজিজের পায়ে পড়তেই আবদুল আজিজ চমকে উঠে বললেন—এ্যাঁ ! একি !

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো শিরিবানু। তার দুই চোখে তখন প্লাবণ ছুটছে অশ্রুর। বেদনাসিক্ত মুখখানা সে আবদুল আজিজের মুখের দিকে তুলতেই আবদুল আজিজ খপ করে তার বামহাত খানা ধরলেন এবং হাতে ধরা আংটিটা ক্ষিপ্রহস্তে শিরিবানুর আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। সংগে সংগে থর থর করে কেঁপে উঠলো শিরিবানু। ঝঞ্ঝাপিষ্ট পত্রের মতো শিরিবানুর ঠোঁট দুটি কেবলই একের সাথে অপরে বাড়ি খেতে লাগলো। কথা বলার কোনই শক্তি

না থাকায়, শিরিবানু জিজ্ঞাসু নেত্রে আবদুল আজিজের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

কথা বললেন আবদুল আজিজ। তাঁরও দুই নয়নে তখন থৈ থৈ করছে পানি। তিনি অতি কষ্টে বললেন—আমার আম্মাজান বলেছিলেন, আমি যেন নিজের হাতে এই আংটিটা আমার বউ এর হাতে পরিয়ে দিই। তাঁর কথাটাই রাখলাম।

এবার ফুঁপিয়ে উঠলো শিরিবানু। কম্পিত কণ্ঠে সে কোন মতে বললো—ছোট সাহেব !

আবদুল আজিজের অশ্রুও গড়িয়ে পড়লো এবার। জবাবে তিনি বললেন—আমার উপর বিশ্বাস রেখো।

নিজেকে সামলাতে গিয়ে তিনিও আর কথা বলতে পারলেন না। ইতিমধ্যে মদিনা বিবি ডাকাডাকি শুরু করায়, শিরিবানু পুনরায় কাঁপতে কাঁপতে বসে আবদুল আজিজের কদমবুঁচি করলো। এরপর উঠে দাঁড়িয়েই মুখে কাপড় গুঁজে কান্না চাপতে চাপতে শিরিবানু দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল। আবদুল আজিজ হুঁশবুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। প্রস্তর মূর্তির মতো তিনি অনেকক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর নীচে নামার কথাটা তাঁর খেয়াল হতেই তিনি বারান্দা থেকে দেখলেন, আগত লোকদের সাথে শিরিবানু ও তার আম্মা অধঃবদনে সদর ফটকের ওপারে চলে গেলেন।

সেই থেকেই আবদুল আজিজের আনন্দ অন্তর্হিত হয়েছে। নিরানন্দ গৃহে সেই থেকেই তিনি বিষণ্ন জীবন যাপন করে আসছেন। আমনি গাজী, আজব আলী, আতরজান সহ আর যে যেখানে ছিল, সবাই ঠিক ঠিক থাকলেও, এক শিরিবানুর অভাবে মকানটা তাঁর আঁধার হয়ে গেছে। একাকীত্বের তীব্র এক অনুভূতি নিয়ে এখন পেরেশান হয়ে আছেন তিনি।

এরই মাঝে এলো এই বদবদলের পালা। নবাব শায়েস্তা খান আগে থেকেই তাঁকে পুত্রবৎ সুনজরে দেখতেন। তাঁর কর্মতৎপরায় তুষ্ট হয়ে নবাব তাঁকে এবার সরাসরি হুগলী এলাকার প্রশাসক বানিয়ে দিলেন। এই সুখবরে দীল তাঁর চাঙ্গা হয়ে উঠলেও, এই খোশ কিস্মতির আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠার তাকত দীলে তাঁর ছিল না। পদোন্নতির খোশ প্রবাহে তিনি হাসি মুখে সাড়া দিলেন, নবাবের মহানুভবতার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেন, শুভাকাঙ্খীদের অভিনন্দন-অভ্যর্থনা হাসি মুখে গ্রহণ করলেন এবং স্বাভাবিক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তিনি দায়দায়িত্ব বুঝে নিলেন। কোথাও কোন বেদনার ছাপ পড়লো না। কিন্তু লোক চক্ষুর আড়ালে বেদনার এক অদৃশ্য ছায়া তার অন্তরের অন্তঃস্থল নিবিড়ভাবে ঘিরে নিয়ে রইলো।

জিন্দা মালিক সাহেব সপরিবারে ঢাকায় চলে গেলেন। চিরাচরিত নিয়মানুসারে আবদুল আজিজও খাস মকানে চলে এলেন। লটবহর ও বইপত্র সহ তাঁর সঙ্গে এলো তাঁর মকানের সমুদয় বাসিন্দা। আমিন গাজী, আজব আলী, আতরজান, মতি বিবি ও অন্যান্য সকলেই। এর সাথে যোগ হলো প্রশাসকের আবাসস্থলের স্থায়ী কিছু দাসদাসী, মালীমজুর, খানসামা, দারোয়ান। সব মিলে লোকজনের ঘাটতি কিছুই রইলো না। তবুও এই প্রশস্ত খাস মকানে এসে আবদুল আজিজ আরো বেশী নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। বিস্তৃত খাস মকানে প্রশাসকের খাস কামরা তাঁর কাছে এক নির্জন ও পরিত্যক্ত পুরী বলে মনে হতে লাগলো। বিশেষ করে, মনের ভাব ব্যক্ত করার মাধ্যম কিছু না থাকায়, তার এই মানসিক অনুভূতি বিলীন হওয়ার বদলে স্থায়ী ও অটুট হয়ে রইলো। চাকর-নফর দাসদাসীদের সাথে প্রয়োজনীয় দু' চারটি কাজের কথা ব্যতীত অন্য কথা চলে না। দীল খুলে আলাপ বা হাসি ঠাট্টা চলে না। ফলে, তাঁর দীলের ঐ গুমোট ভাবটা এই মকানে এসে আরো অধিক জমাট বেঁধে গেল।

প্রশাসনিক কাজ নিয়ে বাইরে বাইরে থাকেন যখন, তখন বেশ সতেজ ও সজীব থাকেন আবদুল আজিজ। স্বচ্ছন্দে ও খোশহালে তাঁর সময় তখন কেটে যায়। মকানে ফেরার সময় হলেই মুষড়ে পড়ে মন তাঁর। নির্জন কারাকক্ষের নিঃসঙ্গ কয়েদীর মতো তখন তিনি টলতে টলতে মকানে ফিরে আসেন। সীমিত সময় তখন নিঃসীম হয়ে যায়। রাত্রিটার স্থিতি যায় অত্যধিক বেড়ে। বই পুস্তক পড়ে আর এপাশ ওপাশ করেও রাত কাটতে চায় না। এ কারণে, সকাল সন্ধ্যা সবসময় প্রশাসনিক কাজের মধ্যেই নিজেকে এখন ডুবিয়ে রাখেন আবদুল আজিজ। বিরামহীন পরিশ্রমে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে তিনি খাস মকানে ফিরে আসেন একঘুমে রাত্রিটুকু কাটিয়ে দেয়ার সংকল্প নিয়ে।

উমিদ আলী এখন স্ত্রী রওশন আরা বেগমকে নিয়ে ভিন্ন মকানে থাকে। মাদ্রাসার কাজে তার আরো সুনাম হয়েছে এবং পদোন্নতির সাথে তার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এসেছে। ভক্তি-আপ্লুত তালেবে এলেমদের সে ভক্তিটুকুই গ্রহণ করে, ভক্তি উপহার নেয় না। ভাবুক, দার্শনিক ও আত্মভোলা এই উস্তাদকে সম্মান করার সাথে কিছু সম্মানী দেয়ার আগ্রহ তার সঙ্গতি সম্পন্ন তালেবে এলেমদের দুর্বার। যদি উমিদ আলী তা কবুল করতো, এই অল্পদিনেই সে হুগলীর একজন ধনী ব্যক্তি বনে যেতো। কিন্তু উমিদ আলী এ ব্যাপারে পর্বত প্রমাণ অটল। স্বল্প বিত্তের স্বাচ্ছন্দেই অধিক আনন্দ তার। রওশন আরার সমর্থনও এ ক্ষেত্রে মজবুত।

ভাই জিন্দা মালিক বদলী হয়ে যাওয়ায় উমিদ আলীর যা কিছু বেদনা, তার চেয়েও তার বেশী আনন্দ আবদুল আজিজ প্রশাসক পদে উন্নীত হওয়ার জন্যে।

এর একটা কারণ, আবদুল আজিজ তার ঘনিষ্ঠ দোস্ত। বড় কারণ, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথটা আরো সুগম হলো বলে। উমিদ আলীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার তালেবে এলেমরা এখন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়েই দলে দলে নয়া ফৌজদার আবদুল গনির ফৌজে ভর্তি হচ্ছে। তার তালেবে এলেমরা এক একজন বিবেদিত প্রাণ। নিজের 'ওয়াতন' বা স্বদেশকে বিপদমুক্ত করার কাজে শহীদ বা গাজী হওয়ার উম্মিদ তাদের দুরন্ত। নয়া ফৌজদার আবদুল গনি সাহেবও অনন্য এক সৈনিক। তাঁরও ইরাদা স্বচ্ছ ও তরতাজা। ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে দুর্বার এক আক্রোশ তাঁর শিরায় শিরায় প্রবহমান। এদের দুর্বিনীত আচরণই তাঁর এই আক্রোশের কারণ। তাই ফৌজদার আবদুল গনির কথা, এই বেনিয়াদের বাড়াবাড়িটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাদশাহ বা নবাবের মর্জির উপর নির্ভর করে থাকবেন না। স্থানীয় প্রশাসকের মৌন সমর্থন পেলেই, তিনি তাঁর ফৌজ নিয়ে একাই এই বেনিয়াদের এক ধারছে কোপানো শুরু করবেন, এতে ফলাফল যা আসে আসুক।

উমিদ আলীকে আর পায় কে ? তার উৎসাহের তাই শেষ অন্ত নেই এখন। ক্রমেই সে পরিবেশটা অনুকূলে পেয়ে যাচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে তার উপলব্ধির সমর্থক। এর উপর সঙ্গে আছেন রওশন আরা বেগম। উৎসাহই শুধু নয়, সুদক্ষ কাণ্ডারীর মতো শক্ত হাতে হাল ধরে থেকে তিনি উমিদ আলীকে সঠিক পথে পরিচালিত করছেন আর নির্দেশনা দিচ্ছেন। উমিদ আলীর নসিহতের এ কারণেই কদর বাড়ছে দিন দিন। থেমে গেছে উমিদ আলীর আফসোস্। কমে গেছে হতাশা। আজ সে বিপুলভাবে আশাবাদী।

উমিদ আলীর সাথে আবদুল আজিজের সেই থেকেই আলাপ সালাপ কম। দুই একবার ইতিমধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। অল্প কিছু কথাবার্তাও হয়েছে। প্রশাসক হওয়ার পর উমিদ আলী এসে তাঁকে খোশ আমদেদ জানিয়েও গেছে। কিন্তু তার সাথে আবদুল আজিজের নিবিড়ভাবে আর কোন আলাপ হয়নি। কারণ তার অনেক। রওশন আরার শাদি সংক্রান্ত সংকোচ, আবদুল আজিজের মানসিক দুরবস্থা এবং সবশেষে এই রদবদলের হুটপিট। এই সমস্ত নানাবিধ কারণেই আবদুল আজিজ অনেকদিন যাবত উমিদ আলীর সাথে নিবিড়ভাবে আলাপ করার মওকা-অবকাশ পাননি। তবে উমিদ আলীর সাথে তাঁর যে সামান্য কথাবার্তা ইতিমধ্যেই হয়েছে, তাতে আবদুল আজিজ তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করেছেন, রওশন আরা সংক্রান্ত কোন দিক নিয়েই উমিদ আলীর মধ্যে এতটুকু সংকোচ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। সে পূর্বে যেমন ছিল, এখনও সে তেমনি উজ্জ্বল ও সরল সহজ রয়ে গেছে। মুখে তার সেই হাসি, দীলে তার সেই

আবেগ। তাকে খোশ আমদেদ জানানোর কালে উমিদ আলীর যে আনন্দ আর যে উল্লাস নজরে তাঁর পড়েছে, তাতে আবদুল আজিজ বেগ আবার নতুন করে ভেবেছেন, উমিদ আলী সত্যিই এক অনন্য মানুষ। দুনিয়ার এই বেচাকেনার বাজারে এমন দীল দুর্লভ।

আবদুল আজিজের এই দুর্দিনে এই উমিদ আলীই হুগলীতে একমাত্র লোক যে আবদুল আজিজের নিঃসঙ্গতা বহুলাংশে দূর করতে পারে। যার সাথে আলাপ করে, যার সাহচর্য লাভ করে আবদুল আজিজ তাঁর বিষণ্নতা বিপুল অংশে কাটিয়ে উঠতে পারেন, বর্তমানে সে লোক এই উমিদ আলী। উমিদ আলীকে আগের মতো এই খাস মকানে রাখতে যদি পারতেন তিনি, তাহলে তার সমস্যার সুন্দর একটা সমাধান হয়ে যেতো। কিন্তু সে অবস্থা আর নেই এখন। উমিদ আলী এখন বিবাহিত এবং যে রওশন আরাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি, সেই রওশন আরাই এখন তার স্ত্রী। কাজেই সে প্রশ্ন আর গণ্যের মধ্যেই আসে না। উমিদ আলীকে ডেকে নিয়ে যে দু'দণ্ড আলাপ করবেন, ঐ রওশন আরা বেগমের কথা খেয়াল হতেই তিনি আবার জড়িয়ে আসেন সংকোচে। রওশন আরার কাছে আবদুল আজিজের নামটা যে এখন কতটা অপ্রিয় তা একমাত্র ঐ আলেমুল গায়েবই জানেন।

সেই উমিদ আলীর সাথে আবদুল আজিজের সাক্ষাৎ হলো অকস্মাৎ। কাজের ভিড় কম থাকায় আবদুল আজিজ সেদিন সকাল সকাল দপ্তর থেকে বেরুলেন এবং সময়টা কাটিয়ে দেয়ার ইরাদায় দপ্তর ও মকানের মাঝামাঝি পথে এক পরিচ্ছন্ন ও ছায়াঘেরা দিঘীর ধারে চলে এলেন। সঙ্গে এলো দপ্তরের দুই হুকুম বরদার। তাদের এক পাশে বসিয়ে রেখে আবদুল আজিজ দিঘীর পাড়ে হাঁটতে লাগলেন এবং আনমনে হাঁটতে হাঁটতে হুকুম বরদারদের নিকট থেকে অনেকখানি তফাতে চলে এলেন। এখানে এই দিঘীটার কোল ঘেঁষে সদর রাস্তার সাথে যোগাযোগকারী ছোট্ট একটা মফস্বল রাস্তা ছিল। এ পথে লোক চলাচল অত্যন্ত ক্ষীণ। এই সময় এই পথে উমিদ আলী যাচ্ছিল। রাস্তা থেকে আবদুল আজিজকে দেখতে পেয়েই সে ছুটে এসে উল্লাসভরে আবদুল আজিজকে বললো—আরে দোস্ত, কি তাজ্জব ! প্রশাসক হওয়ার পর তুমি আউরাত বনে গেলে নাকি ? তোমার যে আর দেখা-সাক্ষাৎই মেলে না ?

উমিদ আলীকে এই সময় কাছে পেয়ে আবদুল আজিজও যারপর নেই হরষিত হয়ে উঠলেন। তিনিও আবেগ ভরে বললেন—একি ! দোস্ত তুমি ? আরে এসো-এসো। এখন কি খুবই ব্যস্ত আছো ? মানে খুব কি তাড়া আছে ?

উমিদ আলী বললো—না-না, মোটেই না-মোটেই না।

ঃ ব্যস্ ! এসো-এসো, অনেকদিন পর তাহলে একটু বসি এখানে, এসো।

ঘাসের উপর উভয়েই মুখোমুখী বসে পড়লেন। বসতে বসতেই আবদুল আজিজ হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন—কি যেন বললে ? আউরাত বনে গেছি না কি ?

ঃ জেনানা-জেনানা। বিলকুল অন্দর মহলের জেনানা। তোমার সাক্ষাৎ পায় আর সাধ্যি কার ?

ঃ তাই নাকি ?

ঃ প্রশাসক হলে বুঝি লোকজন সব এই রকমই হয়, তাই না ? তারা ভিন জগতের ভিন কিসিমের ইনসান বনে যায়। অতীতের কাউকে আর খেয়াল খবরে রাখে না !

ঃ কি রকম ?

ঃ তোমাকে দিয়েই তো তাই দেখছি। আমার কথা বিলকুলই ভুলে বসে আছো। কোন খোঁজ খবরই রাখতে আর চাও না।

আবদুল আজিজ হেসে বললেন—আরে না-না দোস্ত, ঠিক তা নয়। দেখতেই তো পাচ্ছো, কেমন ব্যস্ততার মধ্যে আছি এখন ?

ঃ এখন না হয় তাই থাকলে। কিন্তু এর আগে ? এর আগেও তো কখনো কোন পাত্তা খবর পেলাম না। আমার শাদির দাওয়াতটাও কবুল করতে এলে না। নাকি আমার উপর গোস্বা করে আছো তুমি ?

ঃ গোস্বা ! কেন, গোস্বা করবো কেন ?

ঃ রওশন আরাকে আমি শাদি করলাম বলে ?

আবদুল আজিজ চকিতে একটু সংকুচিত হয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আরে-আরে। আমি তাতে গোস্বা হবো কেন ? আমি তো তাঁকে শাদি করতে চাইনি।

ঃ কি জানি ! তুমি যাকে শাদি করতে চাইলে না, তোমার দোস্ত হয়ে আমি তাকে শাদি করায় তুমি আবার নারাজ হলে কিনা—

ঃ তওবা তওবা ! তা হবো কেন ? আমি রবং এ খবরে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। তোমাদের জন্যে প্রাণ খুলে দোআ করেছি।

ঃ দোআ করেছো ?

ঃ করবো না ? তোমার সাথেই রওশন আরার শাদিটা হোক, এইটেই তো বরাবর আমি চেয়েছি।

ঃ বলো কি দোস্ত ! তবু যে দাওয়াতটা কবুল করতে এলে না ?

ঃ তাই কি আসা যায় ? বুঝতে পারছো না কেন, যাঁকে আমি শাদি করতে অস্বীকার করলাম, তাঁর শাদির দাওয়াতে আমি কোন্ মুখে যাই, বলো ?

একটু চিন্তা করে উমিদ আলী বললো—তা অবশ্য ঠিক। তুমি তা পারো না। তবে তোমাকে তখন কাছে পেলে আমার বড়ই আনন্দ হতো।

ঃ তা হয়তো হতো। কিন্তু আমার হালত হতো মিস্‌কীনেরও অধম।

ঃ কেন-কেন ?

ঃ ঐ মকানের সবাইতো তখন আমার উপর বেজায় নারাজ ! আমার মুখ দেখলেই সবাই তখন জ্বলে উঠতেন গোস্বায়। এমন কি, যার সাথে তোমার শাদি, সেই রওশন আরা বেগমও তখন আমার উপস্থিতিটা বরদাস্ত করতে চাইতেন না।

ঃ সেকি ! তা চাইবেন না কেন ?

আবদুল আজিজ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—তুমি এমন বেয়াকুফের মতো কথা বলছো কেন, বলোতো ? যাঁকে আমি প্রত্যাখ্যান করলাম, মানে যাঁকে আমি শাদি করতে রাজী হলাম না, তাঁর কি রাগ হবে না আমার উপর ? তিনি কি আমাকে রোষ নজরে দেখবেন না ? এতে তো জরুর অপমানিত হয়েছেন তিনি। আমার এ অপরাধ তিনি কখনো ক্ষমা করতে পারেন, না পারাটা তাঁর সম্ভব ?

উমিদ আলী অসহায় কণ্ঠে বললো—যা-ব্বাবা ! এই বুঝে আছো তুমি ?

ঃ কেন, এই বুঝ কি আমার ভুল ?

ঃ ভুল-ভুল। মহাভুল। আরে দোস্ত, তুমি তাঁকে শাদি করতে না চাওয়ায় তিনি যে তোমার উপর কত খুশী হয়েছেন, তা তোমাকে বলে বুঝাতে পারবো না। তুমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে কি ? তার আগে তিনিই তো তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে বসেছিলেন। তোমাকে নাকোচ করে দিয়েছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তুমি নিজে শাদিটা ভেঙ্গে না দিলে, তিনিই তো ভেংগে দিতেন জরুর।

আবদুল আজিজ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—বলো কি দোস্ত !

ঃ কি বলবো ? তিনি তোমাকে শাদি করতে আদৌ রাজী ছিলেন না। তুমি শাদিটা ভেংগে দেয়ায় তাকে যে তুমি কতবড় এক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছো, তা আর বলবো কি ?

আবদুল আজিজের মুখমণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি সোল্লাসে বলে উঠলেন—সোবহানআল্লাহ। তাহলে এয়সা মাফিক কারবার ?

ঃ দোস্ত !

ঃ কেন তিনি আগেই আমাকে নাকোচ করে রাখলেন ?

উমিদ আলীও হেসে বললো—যে কারণে তুমি তাঁকে নাকোচ করে দিলে, সেই কারণে।

ঃ কেয়াবাত্-কেয়াবাত্ !

ঃ তোমার মতো তারও দীল অন্যখানে দেয়া ছিল।

ঃ সাব্বাস্ ! আরে দোস্ত, সেইটেই তো জানতে চাচ্ছি আমি ! সেই অন্যখানটা কোন্‌টা ইয়ার ? কোথায় দেয়া ছিল তাঁর দীল। কে তাঁর সেই দীলের মানুষ ?

উমিদ আলী শরম পেয়ে বললো—আমি জানিনে।

হোহো করে হেসে উঠলেন আবদুল আজিজ। বললেন—ওরে আমার ইয়ার ! দেখতে তো তুমি খুব আলা ভোলা মানুষ ! কিন্তু তলে তলে এত ?

ঃ মানে ?

ঃ ঐ যে বললাম, তোমাদের দুইজনের শাদি হোক, এইটেই আমি বরাবর কামনা করে এসেছি ! সেটা কি আর অমনি অমনি ? তোমাদের দুইজনের ঐ মুহাব্বতের জন্যে।

ঃ দোস্ত !

ঃ ওটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু তলে তলে তোমরা যে এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলে, এটা জানা ছিল না। সকল প্রশংসাই আল্লাহর। তোমরা সুখী হও দোস্ত, এই দোআ তোমাদের জন্যে আবার আমি করছি।

উমিদ আলী তৃপ্ত কণ্ঠে বললো—তা না হয় হলাম। কিন্তু তোমার খবরটা কি ? সেটা একটু বলো, শুনি।

খেয়াল হতেই আবদুল আজিজ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, এরকম একটা কি যেন তুমি বললে ! মানে, আমার মতো তাঁরও দীল অন্যখানে দেয়া ছিলো। আমার মতো মানে ? আমার দীল আবার কোথায় দেয়া আছে দেখলে ?

ঃ থাকতেই হবে কোথাও। রওশন আরার মতো এমন একটা তোফা মেয়েকে শাদি করতে নারাজ হওয়াটা কি বিনা কারণে হয় ? ওটা আমরা বুঝি।

ঃ তোমরা বুঝো ?

ঃ জরুর বুঝি। আমি একটু কম বুঝলেও, আমার বেগম সাহেবা আমাকে ওটা সবই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আবদুল আজিজ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন—কি রকম ? তিনি বুঝিয়ে দিলেন মানে ?

ঃ মানে, তাঁর নাকি আগে থেকেই এ সন্দেহ ছিল। তোমার মকানে সেই যে পয়লাবার গেলেন, সেই তখন থেকেই। শিরিবানু বহিনের রূপ দেখেই তখনই নাকি তিনি চমকে গিয়েছিলেন।

আবদুল আজিজ কপট বিস্ময়ে বললেন—এ্যাঁ শিরিবানু ! তাকে আবার এর মধ্যে টানছো কেন ?

ঃ আরে রাখো-রাখো। মুহাব্বতের কথা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে, তা জানো না ? আগে বলতে দাও—

ঃ আচ্ছা বলো।

ঃ তারপর যখন শুনলেন, ঐ বহিনকে তুমি কোমর বেঁধে এলেমদার করে

তুলছো, তখন আমার বেগমের সন্দেহটা দানা বেঁধে গেল। এরপর তোমার এক প্রতিবেশী মহিলার কাছে আমার বেগম যেদিন শুনলেন, শিরিবানু বহিনের আম্মা শিরিবানু বহিনের যে শাদির সম্পর্ক এনেছিলেন, সেটা তুমি ভেঙ্গে দিয়েছো, ঐ বহিনকে তুমি বেগমের হালে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছো, তাঁকে ছাড়া তোমার একদণ্ডও চলে না, তাঁর পাকানো সালুন ছাড়া অন্য সালুন তোমার মুখে রোচে না, সেদিন আমার বেগম তোমাদের মুহাব্বত সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গেলেন।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর আবার কি ? এতটার পরও যখন আমার বেগমের সাথে তোমার শাদির আনযাম এগিয়ে চললো, তখন আমার বেগম তোমার উপর হাড়ে হাড়ে বিষিয়ে গেলেন। সেরেফ গরীব বলেই আর নিজের স্বার্থ দেখেই ঐ বহিনের মুহাব্বতকে তুমি ইনকার করলে দেখে, তিনি তোমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন। এরপর যখন তিনি শুনলেন, তুমি নিজেই শাদি করতে নারাজ হয়ে শাদিটা ভেংগে দিয়েছো, তখনই আবার আমার বেগম তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় গদ গদ হয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন, সত্যিই তুমি একজন মহৎলোক, মুহাব্বতের যথাযথ কদর দিতে জানো।

আবদুল আজিজ সকৌতুকে বললেন—ব্যস্ ! সেরেফ কল্পনার উপর ভর করেই এতবড় একটা ইমারত গড়ে ফেললে তোমরা ?

ঃ কল্পনা !

ঃ তোমরা কিছুই দেখোনি বা নিজেরা কিছুই জানো না। সবই তোমাদের শুনা কথা।

ঃ তাতে কি হয়েছে ?

ঃ 'শুনা কথার দুনা ভাও' এর কি কোন গোড়া মাথা আছে ?

উমিদ আলী শংকিত কণ্ঠে বললেন—তার মানে ! তাহলে তোমাদের মুহাব্বতের ঘটনাটা সত্যি নয় ?

আবদুল আজিজ হেসে বললেন—মিথ্যাই বা বলি কি করে ? তাহলে তো তোমাদের মেধার আর কল্পনা শক্তির অবমাননা হয়ে যায় ?

উমিদ আলী অধৈর্য কণ্ঠে বললো—এত হেঁয়ালী করছো কেন শুনি ? সত্যি না মিথ্যা তা সরাসরি বলো না ?

ঃ ওরে বাপরে ! এযে নাছোড় বান্দা দেখছি। মিথ্যা নয় দোস্ত, সত্যি। তোমরা যা বুঝেছো, সবই সত্যি।

উমিদ আলীর মুখমণ্ডল ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো—মার কেল্লা ! তবে যে ভয় দেখিয়ে দিলে খামাখা ? দিন বরাবর ঘটনাটাকে তুমি মিথ্যা বানিয়ে দিতে চাও ! এবার বলো, তোমাদের মুহাব্বতটা কোন্ পর্যায়ে এখন ?

ঃ কোন্ পর্যায়ে ?

ঃ জি-জি। দাওয়াতটা কবে পাচ্ছি !

ঃ পাচ্ছো না। হয়তো বা কোনদিনই পাবে না ?

ঃ তার মানে !

ঃ সবই নসীবের ব্যাপার দোস্ত্। আমার নসীবটাতো আর তোমাদের মতো তাগড়া নয় যে, মুহাব্বত হয়ে গেল আর অমনি তার সুফলটা ছাপ্পড় ফেঁড়ে এসে গেল ?

ঃ কি রকম ?

ঃ সে অনেক কথা। ওটা অন্যদিন হবে। এখন যা বলছিলে, তাই বলো, একটার মধ্যে আর একটা টেনো না।

ঃ যা বলছিলাম মানে ?

ঃ মানে, তোমার বেগম সাহেবা তাহলে সত্যিই আর নারাজ নেই আমার উপর ?

উমিদ আলী পুনরায় সরবে বললো—নারাজ ! আরে না-না, এক ফোঁটাও না। তুমি তো আমার মকানে যাবে না। প্রশাসক হয়েছো, গরীবের বাড়ীতে গেলে হয়তো তোমার ভাবমূর্তি খাটো হয়ে যাবে। গেলে বুঝতে পারতে, তোমার প্রতি কত তাঁর শ্রদ্ধা। কথা উঠলেই, তোমার তারিফে কেমনভাবে খৈ ফুটে তাঁর মুখে।

ঃ বলো কি !

ঃ তবে ইদানিং আবার তোমার উপর নাখোশ হতে শুরু করেছেন তিনি। বড়লোকেরা গরীবদের ইনকার করুক, এটা তাঁর খুবই অপছন্দ কিনা ?

ঃ ইনকার করলাম !

ঃ করলে না ? আমার মকানে একবারও তুমি গেলে না, এটাকে কোন্ভাবে দেখি আমরা।

ঃ আরে পাগল, আমার না যাওয়াটা ইনকার করা নয়। তোমার বেগম সাহেবা আমার উপর নারাজ আছেন ভেবেই, যেতে ইচ্ছে হলেও, যাওয়ার আমি সাহস পাইনি। আমি কি আর জানি যে উনি সত্যি সত্যিই আমার উপর নারাজ নেই !

ঃ তাহলে সেটা যাচাই করে দেখার জন্যেও তো একবার তুমি যাবে। তাছাড়া আমার বেগমের কথা থাক, আমি তোমার দোস্ত্। দোস্তের মকানে যাবে তুমি, এতে এত খোঁড়া অজুহাত টানছো কেন ?

আবদুল আজিজ নাখোশ হলেন। তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বললেন—বটে ! তা আমি যাইনি বলে তুমি এত কথা বলছো, কিন্তু কৈ, তুমি কি এসে কখনোও দাওয়াত করেছো আমাকে ? বলেছো কখনো, শাদি করে নতুন সংসার

পেতেছি, এসো দোস্ত্, আমার মকানে এসে একবার দেখে এসো সংসারটা ? সেরেফ অন্যের কসুরটাই চোখে পড়ে ?

উমিদ আলী চমকে উঠলো। চুপ্সে গিয়ে বললো—এহ্-হে ! তাইতো-তাইতো ! বিলকুল ঠিক কথা। আমার কসুর হয়ে গেছে দোস্ত্। এদিকটা খেয়ালই আমি করিনি।

ঃ তবে ?

ঃ ঠিক আছে-ঠিক আছে। আজ তোমাকে দাওয়াত করছি আমি। তুমি জলদি জলদি আমার মকানে চলে এসো।

আবদুল আজিজ হেসে বললেন—বটে !

ঃ তুমি আমার নয়া মকান দেখে আসবে আর সেই সাথে আমাকে তোমার মেহমানদারী করার মওকা দেবে। কবুল ?

ঃ আমি যাবো গল্প করতে। গল্প করে চলে আসবো। তুমি মেহমানদারী করা নিয়ে ব্যস্ত হলে আমি কবুল করতে রাজী নই।

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা, তাই হবে। যেভাবে তুমি খুশী হও, তাই করা হবে। এখন দাওয়াতটা কবুল করছো কিনা, তাই বলো ?

আবদুল আজিজ পুনরায় হেসে বললো—অগত্যা কবুল।

ঃ কবে যাবে ?

ঃ সময় আর দিনটা আমি পরে জানিয়ে দেবো। এখনই তা ঠিক ঠিক বলে দেয়া সম্ভব নয়। কখন কি কাজ আছে, দেখতে হবে তো ?

ঃ ব্যস্-ব্যস্। তাই দিও। তবে কোন রকম গড়িমসি বা অত্যধিক বিলম্ব কিন্তু বরদাস্ত করা হবে না। কবুল ?

ঃ না করে আর উপায় কি ? পাগলকে নাও ডুবাতে নিষেধ করেই যখন ঠকে গেলাম, তখন উও ভি কবুল।

উমিদ আলীকে বিদায় করে মকানে ফিরে এসেই আবদুল আজিজ আর একটা ধাক্কা খেলেন। মকানে এসে দেখলেন, ঢাকা থেকে এক পত্র বাহক এসে বিকেল থেকে বসে আছে। শিরিবানুই এই পত্রবাহককে অতিকষ্টে যোগাড় করে এক পত্র প্রেরণ করেছে। শিরিবানু যা লিখেছে তার সারমর্ম হলো, ঢাকায় আসার পর থেকেই শিরিবানু আর তার আম্মার উপর অকথ্য নির্যাতন চলছে। আবদুল আজিজের আম্মা একটা কুকুর বেড়ালের মর্যাদাও আর তাদের দিচ্ছেন না। মা-মেয়ে উভয়কেই গরুর মতো খাটিয়ে নিচ্ছেন দিনরাত। তিরস্কার আর লাঞ্ছনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সেই সাথে শিরিবানুকে যত্রতত্র শাদি দিয়ে বিদায় করার তৎপরতা চলছে। তাদের টিকে থাকা ওখানে

দায় হয়ে পড়েছে। সুতরাং আবদুল আজিজের সেখানে অতি সত্বর যাওয়া উচিত একবার।

পত্রখানা পাঠ করে আবদুল আজিজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। যেতে চাইলেই এখন তিনি কর্মস্থল যখন তখন ত্যাগ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে কি তাঁর করা উচিত বা বলা উচিত, চিন্তা করে তাৎক্ষণিকভাবে কিছুই তিনি স্থির করতে পারলেন না। 'বিষয়টি তিনি ভেবে দেখছেন এবং বিপদে ধৈর্য ধরা উচিত', এই বলেই পরের দিন প্রত্যুষে তিনি পত্রবাহককে বিদায় করে দিলেন। নির্দিষ্ট কিছু বলার না থাকায় কোন চিঠিপত্র দিলেন না, দু'চার কথা যা বলার তা মুখে মুখেই বলে দিলেন।

মনের এই নাজেহাল অবস্থা আর কাজের বেজায় চাপের মধ্যে আবার কয়দিন কেটে গেল। উমিদ আলীর দাওয়াতের কথা আবদুল আজিজ প্রায় ভুলেই গেলেন। উমিদ আলীর সামনে পড়ে আবার বিস্তর গালমন্দ খাওয়ার পর আবদুল আজিজ উমিদ আলীকে দিন দিলেন এবং সেই দিন ও সময় মোতাবেক উমিদ আলীর মকানে এসে হাজির হলেন।

আবদুল আজিজের ধারণা ছিল, উমিদ আলী যতই বলুক, রওশন আরা বেগম সংকোচটা তাঁর পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। আর তাই আগের মতো তাঁর সাথে সহজভাবে কথা বলতেও পারবেন না। কিন্তু উমিদ আলীর মকানে এসে পৌছার পর আবদুল আজিজের সে ধারণাটা আগাগোড়াই পাল্টে গেল। উমিদ আলীর দহলীজে বসে উমিদ আলীর সাথে দু'চারটে কথা বলতেই রওশন আরা বেগম এসে দহলীজের অন্দর মুখী দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন এবং আবদুল আজিজকে সালাম জানানোর পর প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন—কি খোশ্ কিসমতি আমাদের! ভাই সাহেব যে সত্যি সত্যিই আমাদের মকানে আসবেন, এনিয়ে আমার অনেকখানি সন্দেহ ছিল। ভাই সাহেব মেহেরবানী করে এসে সে সন্দেহটা দূর করলেন।

আবদুল আজিজ সসংকোচে বললেন—কেন-কেন, সন্দেহ ছিল কেন?

রওশন আরা বললেন—ভাই সাহেব এখন একজন প্রশাসক। অনেক তাঁর কাজ আর ঝামেলা। এদিকে আবার আমরাও বিলকুল সাদামাটা মানুষ, প্রশাসনের কোন উল্লেখযোগ্য লোক নই। এত সময় কোথায় পাবেন তিনি?

আবদুল আজিজ কিছুটা আহত কণ্ঠে বললেন—সেকি! আমার দোস্তের মতো আপনিও ঐ আজগুবী কথা তুলে আমাকে আঘাত করতে চান ভাবী সাহেবা?

রওশন আরা বেগম ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—না-না ভাই সাহেব, আঘাত করার জন্যে নয়। আমি ইচ্ছে করে একথাটা বলিনি। ভাই সাহেব তাঁর এত

পেয়ারের দোস্তকে একদম ভুলে রইলেন বলেই একান্ত অনিচ্ছায় এই রকম একটা ধারণা দীলে এসেছে আমার।

ঃ কিন্তু সাদামাটা লোক বলে ইনকার করে আমি আমার দোস্তকে ভুলে গেছি, সেরেফ এই ধারণাটাই ভাবী সাহেবার দীলে এলো কি করে?

ঃ তাছাড়া যে অন্য কোন কারণই আর খুঁজে পাইনি ভাই সাহেব? প্রথমে আমার ধারণা ছিল, বিগত ঐ শাদী সংক্রান্ত সংকোচ নিয়েই ভাই সাহেব হয়তো আমাদের এখানে আসছেন না। কিন্তু আপনার এই দোস্তের মুখে শুনলাম, ভাই সাহেবের তামাম সংকোচ উনি ভাঙ্গিয়ে দিয়ে এসেছেন। এরপরও দাওয়াত কবুল করে ভাই সাহেব দাওয়াত রক্ষায় গড়িমসি করলেন। এর যে আর কোন কারণই খুঁজে পেলাম না ভাই সাহেব?

ঃ ভাবী সাহেবা এত কিছুই ভাবতে পারলেন আর এইটুকু ভাবলেন না যে, উমিদ আলী সাহেবের মতো আমার এতবড় দোস্ত আর একজনও এই হুগলীতে কেউ নেই? ইনকার করা তো দূরের কথা, তাকে ভুলে যাওয়া এ জিন্দেগীতে সম্ভব নয় আমার?

ঃ আমার ভুল হয়েছে ভাই সাহেব। ভাই সাহেবের এই আসার জন্যে আমার সে ভুলটা ভেংগে গেছে। আমায় মাফ করে দিন। আমি এখন বুঝতে পারছি, এ ভুলটা করা আমার ঠিক হয়নি। এজন্যে আমি অনুতপ্ত ভাই সাহেব।

রওশন আরার কণ্ঠস্বর গাঢ় হলো। আবদুল আজিজ সহাস্যে বললেন—হ্যাঁ। এই ভুলটা যেন আর কখনো না হয় ভাবী সাহেবা। এতে দীলে আমার চোট লাগে।

ঃ আর হবে না–আর হবে না। আপনার মতো এমন একজন মানুষ সম্বন্ধে ঐ খারাপ ধারণা দীলে এনে আমি অনেক গুনাহ করে ফেলেছি। আর এ গুনাহ বাড়াবো না।

ঃ বহুৎ আচ্ছা! আসলে মনটা আমার বর্তমানে খুবই খারাপ ভাবী সাহেবা। মনের এই দুরবস্থার জন্যেই আপনাদের খবর করতে দেরী হয়ে গেছে।

উমিদ আলী এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল। এবার সে সরবে বলে উঠলো—এই রে! আসল কথা পড়ে রইলো আর বেগম সাহেবা খামাখা এই মান-অভিমানের কথা তুলে পরিবেশটাই ঘোলাটে করে দিলেন'। তা মনটা এত খারাপ কেন দোস্ত? সেরেফ ঐ প্রশাসনের ঝামেলার জন্যেই?

আবদুল আজিজ কিছুটা উদাস কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, সে ঝামেলা তো আছেই। এছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে দোস্ত। দীলটা আমার বর্তমানে খুবই অস্থির।

ঃ সেটা কি পারিবারিক কোন কারণ ?

আবদুল আজিজ ম্লান হেসে বললেন—পরিবারই যার নেই, তার আবার পারিবারিক কি কারণ থাকবে দোস্ত ?

ঃ তাহলে দীলের কারণ জরুর ?

ঃ তা যা মনে করো।

উমিদ আলী অধীর কণ্ঠে বললো—মনে করাকরি নয় দোস্ত ! আজ তোমার সব কথা শুনে তবে ছাড়বো। সেদিন বলতে গিয়েও এড়িয়ে গেলে। আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই।

ঃ কি রকম ?

কথা ধরলেন রওশন আরা বেগম। তিনি বললেন—বেয়াদবী নেবেন না ভাই সাহেব। আপনার দোস্তের মুখে শুনে জানলাম, শিরিবানু বহিনের ব্যাপারে আমার যে ধারণা ছিল, তা বিলকুল ঠিক। সে ব্যাপারে আমাদের কিছু বলুন ?

ঃ জি ?

ঃ ব্যক্তিগতই হোক আর পারিবারিকই হোক, ভাই সাহেবের সেদিকগুলো কিছুই আমরা জানবো না, তা কি করে হয়। আপনার দোস্ত আর ভাবী সাহেবা হিসাবে সেগুলো জানার আমাদের পুরো হক আছে। সুরাহা কিছু না হোক, সমবেদনা জানানোর লোক তো জরুর চাই।

আবদুল আজিজ পুনরায় উদাস কণ্ঠে বললেন—ভাবী সাহেবা।

উমিদ আলী ফের গরম হয়ে বলে উঠলো—আরে রাখো তোমার ভাবী সাহেবা। সেদিন কি একটা জটিলতার কথা বললে। সেই জটিলতাটা কি আর শিরিবানু বহিনের সাথে তোমার শাদির আর কত দেরী, সেইটে বলো।

আবদুল আজিজ বললেন—শাদি !

ঃ শাদির মানে জানো না ? শাদি মানে নিকাহ বা বিয়ে। ওটার আর কত দেরী ? একটা বেগানা আউরাতকে কতদিন আর চোখের সামনে রাখবে ? তোমার শরিয়তের ভয় নেই ?

ঃ সে ভয় আর নেই দোস্ত।

ঃ নেই ?

ঃ না। শিরিবানু আর আমার মকানে নেই। আমার আম্মা তাকে ঢাকায় নিয়ে গেছেন।

ঃ কেন ঢাকাতে নিয়ে গেলেন কেন ? শাদির অনুষ্ঠানটা ওখানে করবেন বলে ?

আবদুল আজিজ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—কি আজগুবী শূন্যের উপর বেড়াচ্ছো ? শাদির অনুষ্ঠান করার জন্যে নয়। শিরিবানুকে তিনি ঢাকায় নিয়ে গেছেন শাদির খোয়াবটা ছুটিয়ে দেয়ার জন্যে।

ঃ সেকি ! তার কারণ ?

ঃ আমি শিরিবানুকে শাদি করলে আম্মাজানের আত্মসম্মানে ঘা লাগবে বলে উনি শিরিবানুকে নিয়ে গেছেন তাকে অন্যত্র শাদি দিয়ে বিদেয় করার জন্যে।

ঃ তাজ্জব !

রওশন আরা বললেন—ব্যাপারটা তো সত্যিই তাহলে জটিল। আপত্তি না থাকলে, সব কথা কি আমরা জানতে পারিনে ভাই সাহেব ?

ঃ আপত্তি আর কি ! আমাকে শাদি দিতে এসে সেই যে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন, সেই ঝালটা তিনি মেটাচ্ছেন।

রওশন আরা ইতস্ততঃ করে বললেন—এ থেকে তো সব কথা স্পষ্ট হলো না ভাই সাহেব ?

আবদুল আজিজ সংক্ষেপে তামাম কথা বললেন। শিরিবানুর সাথে তাঁদের সম্পর্ক, তাঁদের পরিবারে শিরিবানুদের অবস্থান, শিরিবানুর সাথে তাঁর মুহাব্বতের মোটামুটি বৃত্তান্ত—তামামই সংক্ষেপে তুলে ধরলেন। ঢাকাতে নিয়ে গিয়ে তাঁর আম্মা যে তাঁদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন, সে কথাও বাদ দিলেন না। সব কিছু শুনার পর রওশন আরা বেগম দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—তাজ্জব ! তাহলে ভাই সাহেব এখন কি ভাবছেন এ ব্যাপারে ?

আবদুল আজিজ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—কি আর ভাববো ? এই কয়দিন আগে শিরিবানু ফের পত্র দিয়ে আমাকে যেতে বলেছে সেখানে।

ঃ পত্র দিয়ে যেতে বলেছেন মানে ? ভাই সাহেব কি তাহলে সেই থেকে আর ঢাকাতে যাননি ?

ঃ কি করে যাই বলুন ? এতটার পর সেখানে যেতে তো দুইচোখ আমার ঢেকে আসছে শরমে। আমার আব্বা আম্মা আর মকানের আর সকলে আমার সেখানে উপস্থিতি নিয়ে কি ভাববেন, সেই কথা ভেবেই তো দিশেহারা হচ্ছি আমি।

উমিদ আলী আবার কলরব করে বলে উঠলো—আরে সেকি ! শরম পেলে চলবে কেন দোস্ত ? ঐ যে কথায় বলে, রণে আর প্রেমে শরম বলে কোন কথার স্থান নেই। প্রেমও করবে আবার শরমও করবে, মানে দুই নৌকায় দুই পা দিলে আখের তোমার ঝরঝরে।

ঃ দোস্ত !

ঃ এই যে আমাকে দিয়েই দেখো না ? যার পর নেই অপমান করার পরও আমার ভাবী সাহেবা যখন আমাকে শাদির কথা বললেন—তখন কি কোন শরম করেছি আমি ? না মান অভিমান করেছি। এক কথায় লাফিয়ে উঠে রাজী হয়ে গেছি। শরম করে কি আখের খোয়াবো ?

রওশন আরা বেগম ধমকে উঠে বললেন—আপনি থামুন তো।

এরপর তিনি আবদুল আজিজকে বললেন—তা ভাই সাহেব, শিরিবানু বহিন চিঠি লিখে যেতে বললেন, তাঁর কোন মুসিবত হয়নি তো?

ঃ ঐ তো বললাম, মুসিবত তো হয়েছেই। এছাড়া তাকে শাদি দেয়ার জন্যেও নাকি আমার আম্মা উঠে পড়ে লেগেছেন।

ঃ তবুও চুপচাপ বসে আছেন আপনি? জোর করেই কোথাও যদি শাদি দিয়ে ফেলেন তাঁর?

ঃ তা কি করে হবে? শিরিবানু রাজী না হলে, জোর করেই কি কাউকে শাদি দেয়া যায়?

ঃ তা না যাক, জুলুম আর নির্যাতন তো সে কারণে আরো বেশী বেড়ে যেতে পারে।

ঃ তা কিছুটা পারে। তবে আমার আব্বাজান বড় বিবেচক লোক। তিনি থাকতে নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, এমন আমি মনে করিনে।

ঃ তাই বলে ঐ ভেবেই ভাই সাহেব বসে থাকবেন চুপচাপ? তাঁর তো জরুর সেখানে যাওয়া উচিত।

ঃ হ্যাঁ, মানে—

ঃ মুসিবত বেড়ে যাচ্ছে আর ভাই সাহেব নিষ্ক্রীয় হয়ে বসে আছেন, এতো বড় তাজ্জব কথা! জলদি জলদি জরুর তাঁকে যেতে হবে ঢাকায়। এখানে বসে থাকলে কি সুরাহা কিছু হবে?

আবদুল আজিজ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—জি-জি, আমিও সেই কথাই ভাবছি। জলদি জলদিই যেতে হবে আমাকে, এইটেই এখন জোরদারভাবে অনুভব করছি। আর দেরী করা সত্যিই ঠিক হবে না।

ঃ অবশ্যই শিগ্গির-শিগ্গির যান সেখানে। কখন কি ঘটে যাবে, কে বলতে পারে?

ঃ তা ঠিক। হপ্তাখানেকের মধ্যেই যাবো আমি জরুর। এ নিয়ে আর কথা নেই।

ঃ হ্যাঁ, তাই যান।

এরপর আরো কিছু আলাপ অন্তে আবদুল আজিজ মেজবানদের উষ্ণ মেহমানদারী কবুল করলেন এবং কিছুটা রাত করে মকানে ফিরে এলেন।

১২

হপ্তাকালের মধ্যে আবদুল আজিজ ঢাকায় যেতে পারলেন না। উমিদ আলীর মকান থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকায় যাওয়ার যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি ফিরে এলেন, কয়েকটা দিন না যেতেই সে ইরাদা তাঁর বানচাল হয়ে গেলা। অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত ঝামেলায় পড়ে আবদুল আজিজ আটকে

গেলে। ঝামেলাটা পয়দা হলো হুগলীতেই আর প্রশাসক হওয়ার কারণে আবদুল আজিজ সেই মুহূর্তে হুগলী ছাড়তে পারলেন না।

ঝামেলাটা বাধালো ঐ ইংরেজরাই। বাংলা মুলুকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় দিনে দিনে সে ব্যবসার এতই প্রসার ঘটেছিল যে, কোম্পানীকে এখন এখানে একটি পৃথক ও স্বয়ং সম্পন্ন দপ্তর খুলতে হলো। এ যাবত বাংলা মুলুকে কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য মাদ্রাজ থেকে কোম্পানীর মাদ্রাজ কাউন্সিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। বাংলায় অবস্থিত কোম্পানীর কুঠিয়াল ও কর্মচারীরা এই মাদ্রাজ কাউন্সিলের অধীন ছিল। বাংলা মুলুকে ব্যবসার এই বিপুল অগ্রগতি দেখে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বাংলায় কোম্পানীর এক পৃথক ও মাদ্রাজ থেকে স্বাধীন দপ্তর খুললো এবং ডিন সেন্টকে সরিয়ে উইলিয়াম হেজ নামক কোম্পানীর এক অন্যতম পরিচালককে বাংলায় কোম্পানীর প্রতিনিধি এবং এই নয়া দপ্তরের প্রধান করে পাঠালো। এই নয়া দপ্তর হুগলীতেই খোলা হলো এবং উইলিয়াম হেজের বাসস্থান এই হুগলীতেই নির্ধারণ করা হলো। উইলিয়াম হেজ এসে এই নয়া দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে তার বাসস্থানে উঠলো।

এ পর্যন্ত কোন জটিলতা ছিল না। কুঠিস্থাপন করে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়ার পর কুঠিয়ালরা কোন্ কুঠিতে তাদের প্রধান দপ্তর খুলবে, কোথায় তাদের প্রতিনিধি বা দপ্তর থাকবে, এটা সম্পূর্ণই তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাংলার প্রশাসনের এটা দেখার বিষয় নয়। কিন্তু এই টুকুতেই ইংরেজেরা থামলো না। একজন দলপতি সহ ইংলন্ডের বিশজন খাস ইংরেজ সৈন্য এনে তারা হেজের মকানে মোতায়েন করলো। অন্য কথায়, এক দেশে অন্য দেশের ফৌজ এসে অবস্থান নিলো। স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হলো উত্তেজনা।

খবরটা জানাজানি হতেই প্রশাসক আবদুল আজিজের কাছে সবিস্ময়ে ছুটে এলেন ফৌজদার আবদুল গনি সহ অন্যান্য ফৌজদার ও আমলারা। ছুটে এলো মুদাররেস উমিদ আলী। উমিদ আলীর সেপাই তালেবে এলেমরাই এ খবর উমিদ আলীর কাছে পৌছালো। আবদুল আজিজের কাছে খবরটা পরিবেশন করেই ফৌজদার আবদুল গনি প্রশ্ন করলেন—এ অনুমতি কি আপনিই দিয়েছেন জনাব?

স্তম্ভিত হয়ে আবদুল আজিজ বললেন—নাতো। আমি কিছু জানিনে তো!

ফৌজদার আবদুল গনি সাহেব সক্রোধে বললেন—তাহলে হুকুম দিন জনাব, এখনই ঐ সেপাইদের পিটে বাংলার বাইরে বের করে দিই। ব্যাটাদের এত দুঃসাহস!

দুঃসাহস তো বটেই। আন্তর্জাতিকভাবেও এটা একটি অবৈধ ও গর্হিত কাজ। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে অন্য দেশের সৈন্য এসে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা এক অমার্জনীয় অপরাধ। খবর শুনেই আবদুল আজিজের মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। একবার তাঁর ইচ্ছে হলো আবদুল গনি সাহেবের সাথে তিনি নিজেও এখনই বেরিয়ে পড়েন তলোয়ার হাতে। কিন্তু ইচ্ছে হলেও আবদুল আজিজ এখন আর তা পারেন না। এখন তিনি প্রশাসক। ঘটনাটির ভেতর-বাহির না জেনে, নিজে তো তিনি বেরুতে আদৌ পারেন না, কাউকে সে হুকুম দিতেও পারেন না। জবাবে আবদুল আজিজ বললেন—হ্যাঁ, করা তাই-ই উচিত। এ ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করার নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি, এর পেছনে কি আছে, নবাব বাহাদুর বা অন্য কারো অনুমতি আছে কিনা, এসব না জেনেই ক্রোধের বশে কোন কিছু করা আমাদের ঠিক হবে না। ব্যাপারটা আগে বুঝে নিতে দিন।

ফুঁশে উঠলো উমিদ আলী। সে বললো—দেখো দোস্ত, তোমার এলাকা, তুমি কিছুই জানো না, ব্যস্ ! এরপর আর বুঝাবুঝির কি আছে ? আগে লাঠি মেরে বের করে দাও, বুঝে নেবে পড়ে।

ঃ দোস্ত, !

ঃ খোদ বাদশাহর হুকুম থাকলেও, সেটা তোমাকে দেখানোর পর তবে ওরা ফৌজ ঢোকাবে তোমার এলাকায়। তা যখন করেনি, তুমি ওদের ধুনলে বাদশাহও কোন কসুর ধরতে পারবে না তোমার।

অত্যন্ত ন্যায্য কথা। তবু প্রশাসক হওয়ার পর আবদুল আজিজকে অনেক কিছুই বিবেচনা করে দেখতে হচ্ছে। সেরেফ একদিকে তাকিয়েই একটা কিছু করতে তিনি পারছেন না। কারণ, ভুল হলে সে কৈফিয়ৎ তামামই তাঁকে দিতে হবে। এছাড়াও আছে মানবিক বিবেচনা। হুকুম দিলে, ঐ কয়জন সেপাইকে এরা তুলো বানিয়ে ছাড়বে। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে ওরা এসে থাকে, যোগাযোগ বিভ্রাটের দরুন সে কারণটা তিনি না জানায় ওদের এভাবে নির্যাতন করলে, মানবিকতার মস্তবড় বরখেলাপ হয়ে যাবে, যদিও আবদুল আজিজ জানেন, মানবিক বিবেচনা পাওয়ার যোগ্য চরিত্র ইংরেজদের নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও ঈমানদাররা অবিবেচক হতে পারেন না তবুও ঈমানদারদের এই মানবিক বোধটাকেই বেঈমানেরা বরাবর কাজে লাগিয়ে এসেছে এবং এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

যাহা হউক, নানাবিধ কারণে আবদুল আজিজ বাধ্য হয়েই সবাইকে সবিশেষ বোঝালেন এবং বুঝিয়ে তাঁদের শান্ত করে উইলিয়াম হেজকে তলব দিয়ে পাঠালেন।

সৈন্য আনার কালেই ইংরেজেরা, বিশেষ করে উইলিয়াম হেজ জানতো, যে কাজ তারা করছে তা অবৈধ এবং এ জন্যে তাদের কৈফিয়ত দিতে হতে পারে। এ কারণে তাদের নজর সদাজাগ্রত ছিল। ইংরেজ সৈন্য হুগলীতে অবতরণ করার সাথে সাথেই হুগলীর সামরিক ও বেসামরিক লোকজনের মধ্যে যে বিস্ময় আর রোষ তারা লক্ষ্য করলো, তাতে তারা বুঝলো, সেরেফ কৈফিয়ত দেয়ার মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ না থেকে আরো অনেক দূর গড়িয়ে যেতে পারে। তারা মনে মনে শংকিত ছিল। তলব পেয়েই উইলিয়াম হেজ তড়িৎ গতিতে ঢাকায় লোক পাঠিয়ে দিলো। সৈন্য আমদানীর যথাযথ কৈফিয়ত দেয়ার পর নবাবের দরবার থেকে যাতে করে এ ব্যাপারে কোন বদহুকুম না আসে বা হুগলীর প্রশাসন যাতে করে সেখান থেকে কোন প্রকার সাহায্য-উৎসাহ না পায়, প্রেরিত লোককে উইলিয়াম হেজ সেই ব্যবস্থা করে আসতে বললো। হেজ তাকে আরো বললো—ঠিক মতো বুঝাতে পারলে, ব্যাপারটা এখনও মামুলী। নবাবের কাছে যাওয়ার আগে সে যেন নবাবের দরবারীদের ধরে এবং তাদের আগে হাত করে।

ঢাকাতে লোক পাঠিয়ে দেয়ার পর উইলিয়াম হেজ নিজে যাওয়ার সাহস না করে, কুঠির একজন অভিজ্ঞ কুঠিয়ালকে তার প্রতিনিধি করে প্রশাসক আবদুল আজিজের কাছে কৈফিয়ত দিতে পাঠালো। প্রতিনিধি কুঠিয়াল এসে তাজিমের সাথে প্রশাসককে হাঁটু গেড়ে অভিবাদন জানালো এবং উঠে দাঁড়িয়ে খোশ মেজাজে বললো—হুজুরের টলব পাইয়া হামি লোগ আসিয়াছে।

প্রশাসক আবদুল আজিজ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—আমি তোমাকে তলব দেইনি। তোমাদের দপ্তর-প্রধান উইলিয়াম হেজকে তলব দিয়েছি। তুমি এসেছো কেন ?

হেজের প্রতিনিধি কুঠিয়ালটি সবিনয়ে বললো—হুজুর উও আডমী এখানে বিলকুল নয়া আডমী আছে। কুছ ভাল বোঝে না আওর রীটিনীটি জানে না। হুজুর মেহেরবানী করে হামাকে প্রশ্ন করুন। হামি উহার পক্ষে কঠা বলিবে।

ঃ বটে ! তোমরা এখানে সৈন্য এনেছো কেন ? এদেশ তোমাদের দেশ, না আমাদের দেশ, তোমাদের দেশের সেপাই তোমরা কোন্ সাহসে এই হুগলীতে এনে মোতায়েন করেছো ?

জবাবে কুঠিয়ালটি অবিচল কণ্ঠে বললো—নেহি-নেহি, ইয়ে টো কুয়ী ড্যাঙ্গারাস্ ম্যাটার, আইমিন মারাট্টক বিষয়, না আছে হুজুর ! বিলকুল মামুলী বিষয়। ক্রোচ হইবার কুছু না আছে

ঃ মামুলী বিষয় !

ঃ জি হুজুর। স্রেফ একঠো ডেকোরামের ব্যাপার। ইয়ে হেজ সাহেব হামাডের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন মষ্টবড় আড্‌মী আছে হুজুর। কোম্পানীর এক জবরডষ্ট ডাইরেক্টার আছে। উহাকে ইজ্জট ডেয়ার জন্যেই হামরা হামাডের নিজের ডেশের বিশঠো সোল্‌জার উহার মকানে মোটায়েন করিয়া ডিয়াছে।

আবদুল আজিজ আরো অধিক রুষ্ট হলেন। বললেন—তার মানে ! ইজ্জত দেয়ার জন্যেই তোমরা ফৌজ মোতায়েন করেছো ?

ঃ জি হুজুর। হামাডের কোম্পানীর লোকডের মধ্যে উহার ইমেজ, আইমিন ভাবমূর্তি, মজবুট না হইলে, হামাডের লোকডের উনি কন্ট্রোল করিবে কি করিয়া ?

ঃ সেই ভাবমূর্তি মজবুত করার জন্যেই তোমরা তোমাদের দেশের সেপাই আমাদের দেশে আনলে ?

ঃ নিরাপট্‌টার ভি জরুরট আছে হুজুর। হেজ সাহেব একজন গুরুট্‌টোপূর্ণ আডমী। উহার নিরাপট্‌টা বিডান করিটে হোবে টো জরুর।

আবদুল আজিজ গর্জে উঠে বললেন—খামুশ ! এদেশে সেপাই নেই ? এদেশে প্রশাসন নেই ? এদেশের কোথাও কোন নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব কি তোমাদের, না এদেশের প্রশাসনের ? এদেশের নিরাপত্তা বিধান কি তোমাদের দেশের সেপাইরা করবে, না এদেশের সেপাইরা করবে ? পেয়েছো কি তোমরা ?

অধিক বিচলিত না হয়ে কুঠিয়ালটি ধীর কণ্ঠে বললো—জি হুজুর, নিরাপট্‌টা বিডান টো জরুর এডেশের প্রশাসন করিবে। লেকেন হামাডের জন্যে ইহা এনাফ, আইমিন, জিয়াডা না আছে।

ঃ অর্থাৎ ?

কুঠিয়ালটি এবার জোর দিয়ে বললো—হুজুর কেনো খেয়াল করিটেছে না, হামাডের মাডরাজ কোঠিতে ইউরোপীয়ান সোলজারের একঠো পুরো বাহিনী হামরা রাখিয়াছে। এক মষ্ট বড় বাহিনী। সী-পাইরেট্‌স্ আইমিন, জলডস্যুডের ডারা হামাডের মাডরাজ কোঠী আক্রান্ট হইল, জানমালের ক্ষটি হইল। বাডশাহর অনুমটি লইয়া সেখানে হামরা ডুর্গ টৈয়ার করিল। ফোর্ট সেন্ট জর্জ হামাডের সেনাবাহিনীর ঘাঁটি হইল। হামাডের ডেশের পুরো ব্যাটেলিয়ান আসিল। হামরা এখোন নিরাপডে কাজ কাম কারিটেছে। এখানে টো হামরা কুয়ী ডুর্গ নির্মাণ করিয়া সৈন্য ডল আনিটেছে না হুজুর ? স্রেফ হেজ সাহেবকে ইজ্জট ডেয়ার জন্যে টাহার মকানে কয়েকঠো সেপাই ডাঁড় করিয়ে ডিয়াছে। হুজুর ইহাটে নাখোশ হইটেছে কেন ?

আবদুল আজিজ বেগ বিষয়টি চকিতে একটু চিন্তা করলেন। বাদশাহদের এই অদূরদর্শিতার কথা ভেবে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে গেলেন। এরপর তিনি কণ্ঠে জোর এনে বললেন—তাহলে সেই অনুমতি তোমাদের কোথায় ? এখানে ফৌজ আনার আগে সে অনুমতি কি আদৌ তোমরা নিয়েছো ?

কুঠিয়ালটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—জি হুজুর জি। ইয়ে একঠো মামুলী ম্যাটার। অনুমটি লইবার কোন বিষয় ইহা না আছে। টবু বিষয়টি হামরা ঢাকার নবাব বাহাডুরকে জানাইয়া ডিয়াছে। হুজুর ডাবি করিলে হামরা অনুমটি ভি আনিয়ে ডেবে।

আবদুল আজিজ পুনরায় সক্রোধে বললেন—আনিয়ে ডেবে মানে ? আমার এলাকায় সেপাই এনেছো তোমরা। আমার অনুমতি কোথায় ?

কুঠিয়ালটি এবার কাবু হয়ে বললো—হামরা উহা ভাবিয়া ডেখে নাই হুজুর। উহা মাফ করিয়ে ডিন। বিলকুল মামুলী বিষয় মালুম করিয়া হামরা ভাবিল, নবাব বাহাডুরের জানা ঠাকিলেই চলিবে। ইহার জন্যে আওর কুয়ী অনুমটি জরুরট হইবে না।

ঃ বটে ! নবাব বাহাদুরের জানা থাকিলেই চলিবে ?

ঃ হুজুর।

ঃ যে কসুর তোমরা করেছো আর যে স্পর্দ্ধা দেখিয়েছো তা অমার্জনীয়। নবাব বাহাদুরকে জানিয়েছো বলেই এই মুহূর্তে তোমাদের কিছু বলছিনে। কিন্তু হুঁশিয়ার, ঢাকা থেকে কোন নির্দেশ যদি অবিলম্বে না পাই, তাহলে তোমাদের অনেক খেশারত দিতে হবে এ জন্যে।

আবদুল আজিজ ক্রোধ ভরে কুঠিয়ালটিকে বিদায় করে দিলেন। এই কৈফিয়তে তিনি নিজে বা হুগলীর কোন ফৌজদারই পরিতৃপ্ত হলেন না। বিশেষ করে, ফৌজদার আবদুর গনি সাহেব এই ফালতু অজুহাত একদমই হজম করতে পারলেন না। প্রশাসকের কাছে পুনরায় তিনি বল প্রয়োগের অনুমতি চাইলেন।

উমিদ আলীর আহার ঘুম সেই থেকে উঠে গেছে। "কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! বাংলার জমিনে ইংরেজ ফৌজ ! কোন গজবের আলামত এটা"—এই বলে সে দিনরাত বুক চাপড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আবদুল গনির কণ্ঠের সাথে সেও কণ্ঠ মিলিয়ে বললো—পিটাও আগে ব্যাটাদের। কবে আর কোন্ কালে ঢাকা থেকে কোন নসিহত আসবে, তারই এন্তেজারে বসে থাকবে তুমি ? লোহাটা যে গরম থাকতে পেটাতে হয়, সে কথাটা ভুলে গেলে ? ওরা ঢাকার কথা যা বলছে, তাই-ই বা কতখানি ঠিক কে জানে ! আগে পেটাও, পরে মেটাও।

আবদুল আজিজ মুসিবতে পড়ে গেলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে সাহায্য করলেন ফৌজদার মির্জা মালিক ও ফৌজদার আবদুল কাদের। তাঁরা বললেন, এখনই এত হুটপিট না করে ঢাকাতেই তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত। বিষয়টি যদি ঢাকা পর্যন্ত গড়িয়েই থাকে, তাহলে আমাদের কিছু করা এখন হঠকারিতাই হবে। অনুমতি বা ওদের পেছনে ওখানে জোর সমর্থন না থাকলে, আমরা যখন তখন বল প্রয়োগ করতে পারবো।

কথা কাটাকাটি করে অতি সত্বর ঢাকাতে লোক পাঠানোর সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হলো। আবদুল আজিজ এই মুহূর্তে একবার ভাবলেন, নিজেই তিনি ঢাকায় যাবেন। তিনি গেলে এই সাথে তাঁর বাড়ীর খবরও করে আসতে পারবেন। কিন্তু হুগলীর আবহাওয়া তখন অত্যন্ত গরম। প্রতিবাদ না করলেও, আবদুল গনি ও অন্যান্যরা এ সিদ্ধান্ত খোশদীলে গ্রহণ করতে পারলেন না। এই সামান্য একটা স্থানীয় ব্যাপারে ঢাকা নিয়ে টানাটানি করাটা তাঁদের মনঃপুত হলো না। এ নিয়ে সেপাইদের মাঝেও উত্তেজনা বিরাজ করতে লাগলো। এই মুহূর্তে আবদুল আজিজ হুগলীতে না থাকলে, ক্ষিপ্ত সেপাই-সেনারা যে কোন কারণে যে কোন মুহূর্তে আধিক্য ঘটিয়ে ফেলতে পারে ভেবে, আবদুল আজিজ ঢাকা যেতে পারলেন না। তিনি ফৌজদার আবদুল কাদেরকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন এবং নবাবের মনোভাবটা জেনে নিয়েই তাঁকে জলদি জলদি ফিরে আসতে বললেন।

নসীবটা বরাবরই ইংরেজদের পক্ষে ছিল। এই সময় নবাব শায়েস্তা খান বাহাদুর জরুরী এক কাজ নিয়ে দিল্লীতে গিয়েছিলেন এবং দপ্তরের দায়িত্ব ঢাকার দেওয়ানের উপর ছিল। যে কোন কারণেই হোক, দেওয়ান সাহেবের কিছুটা ইংরেজ প্রীতি ছিল। ঢাকার কুঠির বর্তমান কুঠিয়াল প্রধান মিঃ পনসেন্ট দেওয়ানকে একজন "গুড্‌ম্যান"ও "যুক্তিসংগত লোক" বলে অভিহিত করতো। অনায়াসেই ইংরেজেরা দেওয়ানকে সমঝাতে সক্ষম হলো। দেওয়ানও এটাকে তুচ্ছ একটা ব্যাপার বলে গণ্য করলেন। ফলে, ফৌজদার আবদুল কাদের ঘটনাটা জানতে গেলে দেওয়ান সাহেব তাঁকে কিছুটা রুষ্ট কণ্ঠেই বললেন—এ নিয়ে আপনাদের এত মাথা ব্যথার কারণটা কি ঘটলো ? তারা তাদের জানমাল তাদের নিজের লোক দিয়ে হেফাজত করবে, এতে আমাদের আপত্তিটা কোথায় ? ওরা যদি কখনো আমাদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে আসে, তখন আমরা তাদের নিয়ে ভাববো আর আপনারাও আপনাদের করণীয় করবেন। এখন সবাই এ নিয়ে মাতামাতি না করে যার যা নির্দিষ্ট কাজ, তাই আপনারা করুনগে।

জবাব নিয়ে আবদুল কাদের হতাশ দীলে অতি সত্বর ফিরে এলেন। খবর শুনে আবদুল আজিজ সহ সকলেই বিমর্ষ হয়ে গেলেন। আবদুল আজিজ মলিন

কণ্ঠে বললেন—দেখুন তো, আপনারা যে সবুর করতে চান না, একটা কিছু ঘটিয়ে ফেললে, অবস্থাটা কি দাঁড়াতো এখন ?

সংগত কারণেই ফৌজদার আবদুল গনি সাহেব সহ সকলেই লা-জবাব হয়ে গেলেন। নবাবের অনুপস্থিতিতে দেওয়ানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এর বিরুদ্ধে কারো কিছুই করার নেই। এ সিদ্ধান্ত পাল্‌টালে একমাত্র নবাব বাহাদুরই পাল্টাতে পারেন, নচেৎ নয়। সবার সাথে আলাপ করে আবদুল আজিজ স্থির করলেন, নবাব বাহাদুর ফিরে এলে তিনি নিজে যাবেন এ নিয়ে নবাবের সাথে দরবার করতে। অতপর ঢাকায় যাওয়ার জন্যে আবদুল আজিজ নবাবের ফিরে আসার পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তামাম খবর শুনে উমিদ আলী এক ফাঁকে এসে একটা মস্তবড় নিঃশ্বাস ফেলে আবদুল আজিজকে বললো—আমার সব বুঝা শেষ হয়ে গেল দোস্ত্। তোমরা আর যে যা-ই ভাবো এ আপদ আর ঘাড়ে থেকে নামলো না। এটা স্থায়ী হয়ে রয়ে গেল।

জোর কণ্ঠে প্রতিবাদ করার মনোবল আবদুল আজিজের ছিল না। তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন—মানে ?

ঃ ঐ ইংরেজ সৈন্যেরা রয়েই গেল এখানে। ইমারতের এককোণে বট বৃক্ষের যে কচি চারাটা আজ দুই আঙ্গুলে উপড়ে ফেলা যায়, এই প্রশাসনের সবাই সেটাকে উপেক্ষা করে গেল। কালক্রমে যে ঐ চারাটাই মহীরুহ হয়ে গোটা ইমরাতটাই গ্রাস করে ফেলবে না, এটা কে বলতে পারে ?

ঃ দোস্ত্ !

ঃ এ মুলুকে এইটেই যে ইংরেজদের সামরিক ঘাঁটির শুভ সূচনা হয়ে গেল কিনা, কে জানে !

আবদুল আজিজ মনে মনে চমকে উঠলেন। ফের তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন—আল্লাহ মালুম ! তবে নবাব বাহাদুর ফিরে এলে আমি আর এক দফা কোশেশ করে দেখবো। এরপর আমাদের নসীব !

উমিদ আলী নিঃশ্বাস চেপে বললো—হুঁ !

কিন্তু নবাব বাহাদুরের ফিরে আসার অপেক্ষায় আবদুল আজিজের বসে থাকার অবকাশ আর রইলো না। অকস্মাৎ এই সময় যে এক পত্র এসে তাঁর হাতে পড়লো, তা পাঠ করেই আবদুল আজিজের মাথা-মগজ বন বন করে উঠলো। পত্রখানা হপ্তাদেড়েক আগের লেখা। কিন্তু পত্রবাহক আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায়, এত দেরীতে সে পত্র তাঁর হাতে এসে পড়েছে। পত্র লিখেছে শিরিবানু। খুবই ক্ষিপ্রহস্তে লেখা। পত্রের সাথে শিরিবানু আবদুল আজিজের দেয়া সেই আংটিটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। সে লিখেছে ঃ

ছোট সাহেব,

এই শেষবারের মতো আমার সালাম গ্রহণ করে আপনার কাছে এ জীবনে কসুর যা করেছি, তা মাফ করে দেবেন। সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে আপনার পথ চেয়ে থেকে থেকে অবশেষে মর্মান্তিকভাবে নিরাশ হতে হলো। আমাদের প্রাণান্তকর দুর্ভোগ আপনার দীলে কোন সাড়া জাগাতেই পারলো না। যে অকথ্য নির্যাতন আমাদের উপর চলছে, তা মানুষ তো নয়ই, বোধ করি অনেক পশুও তা সহ্য করতে পারবে না। একথা জানিয়ে আপনাকে পত্র দেয়ার পরও, আপনি নিজে তো এলেনই না, জবাবে একটা পত্র দেয়াও জরুরত মনে করলেন না। আপনার আম্মাজান আমাদের জীবন যে এখানে কতখানি দুর্বিসহ করে তুলেছেন, তা এসে এক নজর দেখলেই আপনি বুঝতে পারতেন। পত্র দ্বারা তার অর্ধেকটাও আমি তুলে ধরতে পারিনি।

এর উপর আবার এখন যা চলছে, তা বর্ণনার অতীত। মুহাব্বতের খাতিরে আমি জান দিতে পারি, কিন্তু ইজ্জত খোয়াতে কিছুতেই পারিনে। তাই বাধ্য হয়েই আমি আমার আম্মাকে নিয়ে নিজের ভাগ্য নিজেই খুঁজে নিতে বেরুলাম। আকাশ কুসুমের কিছুমাত্র আশা পোষণ করাও যে আমার এক চরম মূর্খামী আর মাত্রাহীন বেহায়াপনা, এটা এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই আপনার দেয়া আংটিটা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। মুহাব্বতের নাম করে ওটা আপনি আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেও, এখন বুঝতে পারছি, ওটা আপনার মুহাব্বত ছিল না, ওটা ছিল সেরেফ একটা ক্ষণিকের আবেগ। তাই এই উপহাসের কাঁটা আর আমি বয়ে বেড়াতে রাজী নই। ওটা এই পত্রের সাথে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। আমাকে নিয়ে আপনার এই নির্মম পরিহাস এখানেই শেষ হোক, আল্লাহ তায়ালার কাছে এখন এইটেই আমার একমাত্র কামনা। আমীন।

শিরিবানু

পত্রখানা পাঠ করেই আবদুল আজিজ উন্মাদ হয়ে গেলেন। ফৌজদার মির্জা মালিক সামনেই ছিলেন। তাকে দপ্তরটা দেখতে বলেই, তিনি ঢাকার দিকে ছুটলেন। অবিরাম ছুটার পর ঝড়ের কাকের মতো তিনি ঢাকায় তাঁদের মকানে এসে পৌছলেন। কিভাবে যে তামাম পথ পাড়ি দিয়ে এলেন, তাঁর সেটা খেয়ালেই রইলো না। বাড়ীতে পৌছেই দেখলেন, শিরিবানু আর তার আম্মা সে মকানে নেই, এবং বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই নেই। কোথায় তাঁরা, কেউ তা জানে না। আব্বা-আম্মার সাথে এ নিয়ে কথা বলার আগেই তিনি পুরো ঘটনার হদিস করলেন। হদিস করে যা জানলেন, তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ঢাকায় আনার পর থেকেই আবদুল আজিজের আম্মা কামরুন নাহার বেগম শিরিবানুর আম্মা ও শিরিবানু—এই দুইজনের ঘাড়েই সংসারের যাবতীয় কাজ কাম চাপিয়ে দেন এবং নিকৃষ্টতম কাজগুলিও জুলুম করে তাদের দিয়ে করিয়ে নেন। তুলনামূলকভাবে বাড়ীর একজন নিম্ন পর্যায়ের দাসীও যে আরাম-আহার পায়, তা থেকেও তাঁদের তিনি বঞ্চিত করেন। এমন কি আবদুল আজিজের দেয়া তামাম লেবাস তিনি কেড়ে নেন এবং মামুলী এক পরিচারিকার লেবাস শিরিবানুকে পরিয়ে রাখেন। এরই সাথে তাল দিয়ে চলে শিরিবানুকে শাদি দেয়ার তৎপরতা। কামরুন নাহার বেগম যেখান সেখান থেকে শিরিবানুর শাদির প্রস্তাব আনতে থাকেন এবং শাদিতে সম্মত হওয়ার জন্যে মা-মেয়ে উভয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। আবদুল আজিজের আব্বা নকরীর কাজে বাইরে বাইরে থাকার কারণে অন্দরের এত খবর করা সবসময় তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তবুও তিনি এসব ব্যাপারে অল্প বিস্তর প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং কামরুন নাহার বেগমকে কিছুটা হুশিয়ার করেও দেন। তাঁর এই হস্তক্ষেপের ফলে, পরিস্থিতিটা দুর্বিসহ হলেও, তা সীমা ছাড়িয়ে যায় না। কামরুন নাহার বেগম একেবারেই হিংস্র হতে পারেন না।

পরিস্থিতিটা চরমে উঠে এই পক্ষকাল আগে। আবদুল আজিজের আব্বাকে সরকারী এক কাজে কয়েকদিনের জন্যে ঢাকার বাইরে যেতে হয় আর ঢাকার বাইরে থাকতে হয়। এতে করে কামরুন নাহার বেগম ফাঁকা ময়দান পেয়ে যান। কাজের চাপ বাড়িয়ে দিয়ে এবং ধমকিয়ে তিনি মদিনা বিবিকে তাঁর ডেকে আনা বরের সাথে শিরিবানুকে শাদি দিতে সম্মত করেন। কিন্তু পর পর দুই দুইটি বরের সাথে শাদি দিতে না পেরে অর্থাৎ শিরিবানুকে কবুল করাতে না পেরে, কামরুন নাহার বেগমের মাথায় আগুন ধরে যায়। তিনি দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ক্রোধের আধিক্যে তিনি বাজারের এক লম্পট ও খন্নাস আদমীর সাথে শিরিবানুর শাদি দিতে উদ্যত হন। সহজ পথে কাজ হবে না জেনে তিনি বিকল্প পথ ধরেন। সেই খন্নাস আদমীর সাথে গোপনে পরামর্শ করে তিনি স্থির করেন যে, শিরিবানুকে তিনি পরের দিনই তার সাথে শাদি দিয়ে ফেলবেন। শিরিবানু শাদি কবুল করুক আর না করুক, শিরিবানুকে তিনি জোর করেই তার হাতে তুলে দেবেন আর সেই খন্নাস আদমী শিরিবানুকে বউ হিসাবে জোর করেই তুলে নিয়ে যাবে। শাদির অনুষ্ঠানটি আকস্মিকভাবে এবং এক নিভৃত স্থানে সম্পন্ন করা হবে। সেই খন্নাস আদমী সেই মোতাবেক লোকজন ও যানবাহন সহকারে প্রস্তুত হয়ে আসবে। পরিকল্পনা এঁটে নিয়ে উভয়েই প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই ষড়যন্ত্রের তামাম কথা সেইদিনই শিরিবানু ও তার আম্মা মদিনা বিবির কাছে ফাঁশ হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে তাঁরাও তাঁদের

সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেন। পরের দিন সকালে উঠে সকলেই দেখেন, শিরিবানু আর তাঁর আম্মা যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরের দুয়ার খোলা আছে। কিন্তু শিরিবানুরা নেই। তামাম মকান ও আশেপাশের মকানগুলিও তালাশ করে শিরিবানু আর তার আম্মাকে পাওয়া যায় না। আবদুল আজিজের আব্বা আবদুল খালেক সাহেব ফিরে এসে ঘটনা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে যান। আবদুল আজিজের আম্মার ষড়যন্ত্রের কথাও তাঁর কাছে ফাঁশ হয়ে যায়। এতে করে আবদুল আজিজের আম্মাকে তিনি যারপর নেই অপমান করেন এবং সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু অনেক মেহনত করার পরও ঢাকার ভেতরে বা বাইরে কোথাও তাঁদের অনুসন্ধান পান না।

ঘটনা শুনে আবদুল আজিজ দিশেহারা হয়ে গেলেন এবং সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। ছেলেকে উদ্ভ্রান্ত দেখে তাঁর আম্মা তাঁর কাছে আসতেই আবদুল আজিজ তিক্ত কণ্ঠে বললেন—সখ মিটেছে আপনার ? উম্মিদ পূরণ হয়েছে ?

কামরুন নাহার বেগম ঢোক চিপে বললেন—বাপজান !

আবদুল আজিজ একইভাবে বললেন—এখন ঝালটা কার উপর ঝাড়বেন ? কার উপর গায়ের জ্বালা মেটাবেন ?

ঃ সেকি বাপজান !

ঃ সেকি ! শিরিবানুবা কৈ ? কোথায় রেখেছেন তাঁদের ? নাকি ষণ্ডা লাগিয়ে দিয়ে গুম্ করে ফেলেছেন ?

ঃ তা মানে—এসব কি কথা ! এর আমি কি বলবো ? তারা তাদের ঘরে ছিল, সকালে দেখি, নেই।

ঃ নেই কেন ? কেন তাঁরা নেই ?

ঃ আবদুল আজিজ !

আবদুল আজিজ চীৎকার করে বললেন—জবাব দিন—

কামরুন নাহার বেগম খেদ টেনে বললেন—সেকি বাপজান ! একি তোমার আচরণ ? আমি তোমার আম্মা !

ঃ আম্মা ! কে আম্মা ? আপনি ? আপনার মতো একজন জঘন্য আউরাতের গর্ভে আমি হয়েছি, এটা আমি বিশ্বাস করিনে।

কামরুন নাহার বেগম ধমকের সুরে বললেন—আবদুল আজিজ !

আবদুল আজিজ বললেন—আমি আপনার সন্তান নই। কারো সন্তানকে চুরি করেছেন আপনি। আপনার পক্ষে সব সম্ভব।

ঃ খবরদার !

ঃ আপনাকে আম্মা বলে ভাবতেও এখন আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

নিজের অপরাধটা হাল্কা করার উদ্দেশ্যে কামরুন নাহার বেগম এবার মরিয়া হয়ে বললেন—তা যদি বলো, তাহলে গলায় তোমার দড়ি দেয়াই উচিত। সামান্য একজন কাজের মেয়ের মুহাব্বতে যে তার আম্মাকে এইভাবে অপমান করে, নিজের খানদানের মুখে চুন দিয়ে যে একজন তুচ্ছ বাঁদীর মেয়েকে শাদি করার জন্যে দিউয়ানা বনে যায়, তার কি আর বেঁচে থাকা উচিত ?

আবদুল আজিজ গর্জে উঠে বললেন—চুপ করুন। অনেক জঘন্য আচরণ করেছেন আপনি। নিজেকে আর কুৎসিত বানাবেন না।

ঃ আবদুল আজিজ !

ঃ বাঁদী ! শিরিবানুর আম্মা বাঁদী হলে আপনিও তো বাঁদী। সহোদর ভাই না হলেও একই রক্ত দুই ভাইয়ের দেহেই বিদ্যমান। এক ভাইয়ের বউ বাঁদী হলে, আর ভাইয়ের বউয়ের মান ইজ্জত কোন্ পর্যায়ের ? শাহী বেগমের ? হায়া বলতে কিছুই কি নেই আপনার ?

কামরুন নাহার বেগম এবার উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—ওরে, তোমরা কে কোথায় রইলে ? আবদুল আজিজের আব্বাকে খবর দাও। আবদুল আজিজ পাগল হয়ে গেছে।

আবদুল আজিজ একই কণ্ঠে বললেন—থামুন ! পাগল যদি হয়েই থাকি, আপনিই তো তা বানিয়েছেন ! আবার চীৎকার করছেন কেন ?

ঃ আবদুল আজিজ—

ঃ আপনার সাথে কথা বলতেও আর আমার রুচি নেই। যত পারুন বদদোআ করুন। আপনার সাথে সম্পর্ক আমার এখানেই শেষ—

আবদুল আজিজ ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলেন, তাঁর আব্বাজান নিশ্চল হয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ মুখ একেবারেই শুষ্ক। আব্বার উপর নজর পড়তেই আবদুল আজিজ শরম পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে গিয়ে দহলীজের পালংকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন এবং সবলে কান্নার বেগ রোধ করতে লাগলেন।

অল্পক্ষণ পরেই পিঠের উপর কার এক হাতের স্পর্শ পেয়ে আবদুল আজিজ ধড়মড় করে উঠে দেখলেন, তাঁর আব্বা আবদুল খালেক সাহেব অত্যন্ত মলিন মুখে তাঁর পাশে বসে আছেন। আবদুল আজিজ উঠে বসতেই আবদুল খালেক সাহেব ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন—আসলে কসুরটা আমারই হয়েছে বাপজান ! ঐ নাদান আউরাতটাকে দোষারোপ করে লাভ নেই।

ঠোঁটে কামড় ধরে কান্নার বেগ রোধ করতে করতে আবদুল আজিজ বললেন—আব্বাজান !

ঃ বজ্জাত আউরাতটা যে এতটা বাড়াবাড়ি করবে, তা আমার কল্পনাতেও আসেনি। তার বজ্জাতির শাস্তিটাও সেই জন্যে সে এখন ভোগ করছে জিয়াদ।

সেই থেকে কথা তো বন্ধ করছিই, ঝি চাকরসহ বাড়ীর সকলের সম্পর্ক তার সাথে ছেদ করে দিয়েছি। নিজের কাজ তামাম এবার নিজে করো। দু'টো ভাতের জন্যে শিরিবানুরা এখানে কি তকলিফটা করে গেছে, সেটা কিঞ্চিৎ বোঝো।

ঃ আব্বাজান !

ঃ ভুলটা আমারই। তোমার আম্মাজান যে একজন জ্ঞানহীন, জেদী আর হীনমন্যা মহিলা, এটা জানা সত্ত্বেও, আমার এতটা উদাসীন থাকা ঠিক হয়নি। অবশ্য ভুলটা শিরিবানুও করেছে। লজ্জায় জড়িয়ে না থেকে তোমাদের তামাম কথা আমার কাছে তার খুলে বলা উচিত ছিল।

আবদুল আজিজ ঐ একইভাবে ধরা গলায় বললেন—আব্বাজান !

ঃ কিছুটা অনুমান করলেও আমি এতে গুরুত্ব দেইনি। তোমার আম্মার ঐ অতি আধিক্যের কারণেই আমি এতে গুরুত্ব দিতে যেয়েও থেমে গেছি। এর একমাত্র কারণ তোমার আম্মা যেটাকে হা বলে স্বাভাবিকভাবেই আমি সেটাকে 'না' বলে ধরে নিই। এরপর যখন ঘটনাটা প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো, তখন আমি স্থির করলাম, শিরিবানুকে নিজেই আমি ডেকে নিয়ে সব কথা জেনে নেবো আর ঘটনাটা সত্যি হলে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমি প্রাণ ভরে শুকরিয়া আদায় করবো। আমার মরহুম ভাইয়ের এই এতিম মেয়েটার এমন সদগতি হলে, এ দুনিয়ায় আমার চেয়ে অধিক খুশী হওয়ার মানুষ একমাত্র তার আম্মা ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। কিন্তু এই সময় হঠাৎ আমাকে সরকারী কাজে বাইরে যেতে হলো।

একটু থেমে আবদুল খালেক সাহেব পুনরায় বললেন—তুমিও তোমার সেই পত্রে এ সম্বন্ধে মোটেই কিছু বলোনি। বাইরে থেকে যে যা-ই বলুক, আসলে তোমার সত্যিকারের অভিপ্রায় বা নিয়তটা কি, তা জানতে পারলাম না। তুমিও যদি এই আজকের মতো সেদিনই সাহসী হতে, তাহলে কি আর এই অঘটনটা ঘটতে পারে ?

আবদুল আজিজ অভিমান ভরে বলেন—আপনার উপর আমার যে বড়ই ভরসা ছিল আব্বাজান !

আবদুল খালেক সাহেবও দুঃখিত কণ্ঠে বললেন—তোমার আব্বাজান তো আর সবজান্তা নয় বাপজান ! তোমার আম্মাজান যতই ছেলেমী করুক আর শিরিবানুদের যে অভিপ্রায়ই থাক, আসলে তোমার অভিপ্রায়ও তাদের সাথে সমান্তরাল কিনা, তা আমি জানবো কি করে ?

ঃ আব্বাজান !

ঃ না-উম্মিদ হয়ো না বাপ। তারা যদি কোথাও গিয়ে মারা পড়ে না থাকে আর শিরিবানুর মুহাব্বত যদি সহি হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আমাদের সাদাদীলে অধিক আঘাত করবেন না।

ঃ কিন্তু—

ঃ ইন্নাল্লাহা মাআস্‌সবেরীন ! এর চেয়ে তো বড় সান্ত্বনা নেই বাপজান। তুমিও খবর করো, আমিও খবর করতে থাকি। এরপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।

আব্বাজানের হাত এড়াতে না পেরে আবদুল আজিজ সে রাতটা কোন মতে সেখানেই কাটালেন। পরের দিনই কাজের ও স্বস্তি পাওয়ার অজুহাতে আব্বাজানের হাত সবিনয়ে এড়িয়ে আবদুল আজিজ সরকারী এলাকায় চলে এলেন এবং নবাব বাহাদুরের সাথে মোলাকাত করার ইরাদায় সরকারী মেহমানখানায় স্থান নিলেন। নবাব শায়েস্তা খান তখনও দিল্লী থেকে ফেরেননি। কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন জেনে আবদুল আজিজ মেহমানখানায় দিন কাটাতে লাগলেন এবং এই অবসর সময়টা তিনি শিরিবানুর খোঁজ খবরে নিয়োগ করলেন। ঢাকার শহর এলাকায় এবং ঢাকার বাইরে গ্রাম এলাকায় তাঁর ধারণা মাফিক স্থানগুলোতে তিনি কয়েক দিন একটানা তালাশ করে ফিরলেন। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। কোথাও কোন হদিস-সন্ধান না পেয়ে অবশেষে তিনি হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে এই ব্যর্থ চেষ্টা বাদ দিলেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, বাংলা মুলুক বিশাল এক মুলুক। এর কোন্ এলাকায় কোন্ দিকে তাঁরা চলে গেছেন, একেবারে অন্ধকারে এভাবে তালাশ করা যুক্তিহীন। কোন সূত্রে এর কিছুটা আভাস-ইংগিত পাওয়া গেলে, তবেই সেই দিকে ছুটোছুটি করা যায়। তাই ঢাকার ভেতর-বাইরের বন্ধুবান্ধব ও বিশ্বস্ত লোকজনদের এ ব্যাপারে চোখকান সক্রীয় রাখার অনুরোধ জানিয়ে আবদুল আজিজ আপাততঃ এ চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

ইতিমধ্যে একদিন নবাব শায়েস্তা খান দিল্লী থেকে ফিরে এলেন। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে নবাব বাহাদুর পেরেশান হয়ে এলেন বলে আবদুল আজিজ সেদিন চুপচাপ রইলেন। পরের দিন নবাবের সাথে যোগযোগ করতে বেরুতেই নবাবের এক বান্দা এসে আবদুল আজিজকে সালাম দিয়ে বললো—হুজুর, বাংলার হুজুরে আলা সালাম দিয়েছেন আপনাকে।

আবদুল আজিজ বিপুল বিস্ময়ে বললেন—হুজুরে আলা মানে ! নবাব বাহাদুর ?

ঃ জি হুজুর, জি।

ঃ আমি এখানে আছি, তা তিনি কি করে জানলেন ?

ঃ তাতো আমি বলতে পারবো না হুজুর। তবে হুজুরে আলা আপনার এন্তেজারে আছেন আর এখনই আপনাকে মোলাকাত করতে যেতে বললেন।

ঃ কোথায় তিনি ?

ঃ আসুন হুজুর-আমার সাথে আসুন—

ঃ এ্যাঁ ! হ্যাঁ-হ্যা, চলো-চলো—

বান্দার সাথে আবদুল আজিজ এসে নবাবের এক বিশেষ কক্ষে হাজির হলেন। নবাব বাহাদুর একাই ছিলেন সেখানে। আবদুল আজিজ এসে তাজিমের সাথে সালাম করে দাঁড়াতেই নবাব বাহাদুর তাঁকে ডেকে নিয়ে সামনা সামনি বসালেন এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কয়দিন ধরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছো তুমি ?

আবদুল আজিজ সবিস্ময়ে জবাব দিলেন—চার-পাঁচদিন হবে হুজুর। আজ নিয়ে পাঁচদিন।

ঃ হুঁ। তা ঐ সেপাইদের ব্যাপার নিয়ে খুব পেরেশান হয়ে পড়েছো বুঝি ?

আবদুল আজিজ পুনরায় বিস্মিত হলেন এবং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন —হুজুর !

নবাব বাহাদুর স্মিতহাস্যে বললেন—এ প্রশ্নে তাজ্জব হলে ?

ঃ জি-জি। এসব খবর হুজুর এত জলদি-জলদি—

ঃ গতকালই শুনেছি। তুমি ঢাকায় এসে আমার এন্তেজারে আছো, এ খবরও গতকালই পেয়েছি। তুমি আমার এন্তেজারে আছো শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি, হুগলীতে জরুর কোন গড়বড় দেখা দিয়েছে। তাই গতকালই দেওয়ান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে ঘটনাটা শুনলাম। খুবই ক্লান্ত ছিলাম বলে তখন আর তোমাকে ডাকিনি।

ঃ মেহেরবান !

ঃ পেরেশান হওয়ারই কথা। ঘটনাটা আমিও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি।

উৎসাহিত হয়ে উঠে আবদুল আজিজ বললেন—জি হুজুর, সেই জন্যেই আমি এসেছি। এতবড় সাংঘাতিক একটা ব্যাপার এভাবে উপেক্ষা করা যায় না। এ নিয়ে আরো ভেবে দেখার জরুরত আছে।

ঃ ভেবে আমি দেখেছি। ঐ দুষ্ট বেনিয়াদের এই দুঃসাহসের কথা শুনে আমি স্তম্ভিতও হয়েছি। আমার মুলুকে তারা তাদের মুলুকের ফৌজ এনে মোতায়েন করবে, এটা একটা কল্পনাতীত ব্যাপার।

ঃ হুজুর !

ঃ দেওয়ান সাহেবের কাছে খরবটা জেনে আর এ ব্যাপারে দেওয়ান সাহেবের পদক্ষেপের কথা শুনে আমি কোন মতে নিজেকে সংযত করে নিয়েছি।

ঃ আলমপনা !

ঃ আমার নিজেকেই নিজে সংযত করা কঠিন হয়ে গেছে, তোমরা তো এতে অস্থির হবে জরুর।

ঃ জি মেহেরবান, সেই জন্যেই—

ঃ সেই জন্যেই আমি এত ব্যস্ত হয়ে ডেকে পাঠালাম তোমাকে। তোমাদের সান্ত্বনার জন্যে আমার ইরাদার কথা জলদি জলদি জানানো তোমাকে দরকার। ঐ বিদেশী সেপাইদের এ মুলুক থেকে তাড়াতেই হবে আলবত্। তাড়াবোই আমি তাদের। এ নিয়ে কোন পেরেশানী দীলে তোমরা রেখো না।

আবদুল আজিজ আরো অধিক উৎসাহী হয়ে উঠে বললেন—তাহলে হুকুম দিন হুজুর। আমি গিয়েই ওদের—

নবাব বাহাদুর বাধা দিয়ে বললেন—না। এখানে কথা আছে আর সে কারণেই এতটা ভূমিকা টানছি আমি।

ঃ মেহেরবান !

ঃ দেওয়ান সাহেবই বিষয়টা জটিল করে দিয়েছেন। তিনি যদি তৎক্ষণাৎ শক্ত মনোভাব নিয়ে শক্ত হুকুম দিতেন, তাহলে কোন ঝামেলাই থাকতো না। কিন্তু দেওয়ান সাহেব তাদের সাথে বেরাদরী করে উল্টা নির্দেশ দিলেন।

আবদুল আজিজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন—হুজুর এখন সে নির্দেশ বাতিল করে দিলেই তো আর কারো কিছু বলার থাকে না।

জবাবে নবাব বাহাদুর কিছুটা শক্ত কণ্ঠে বললেন—বলার থাকে না ঠিকই, কিন্তু মন কষাকষির ব্যাপার থাকে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ঐ সেপাই আমদানী করাটা তেমন একটা বিরাট ব্যাপার নয়। এই মুহূর্তেই এ নিয়ে কোন হুমকি পয়দা হচ্ছে না। এখনই সেটা বিরাট কোন হুমকির ব্যাপার হলে, আলবত আমি দেওয়ান সাহেবের এ নির্দেশ বাতিল করে দিতাম। দেওয়ান সাহেবের নারাজ হওয়ার তোয়াক্কাও করতাম না।

আবদুল আজিজ থমকে গিয়ে বললেন—হুজুর !

নবাব বাহাদুর কণ্ঠস্বর নরম করে বললেন—জানোতো, একটা প্রশাসন চালাতে গেলে বহুজনের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আর বহুজনকে বহু কাজে লাগাতে হয়। তাদের কাজকর্মের আর পদক্ষেপের কিছুটা ইজ্জত না দিলে প্রশাসন চালানো দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই এ নিয়ে আমাদের এখনই হৈ চৈ না করে কিছুটা ধৈর্য ধারণ করতে হবে আর মওকার অপেক্ষায় থাকতে হবে। খামাখা এই ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে দেওয়ান সাহেবকে আমি ক্ষুব্ধ করতে চাইনে।

আবদুল আজিজ কমজোর কণ্ঠে বললেন—হুজুর !

ঃ হতাশ হচ্ছো কেন ? মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যাপার। ঐ দুর্জনের মতলব যে কিছুমাত্র সৎ নয়, এটা সবাই আমরা জানি। কিছু না কিছু অঘটন ঘটাতে ওদের ঢের দিন লাগবে না।

ঃ আলমপনা !

ঃ একটা মওকা, মানে সামান্য একটা অজুহাত চাই। অজুহাত একটা পাওয়া গেলে সাপও মরবে, লাঠিও ভাংবে না।

আবদুল আজিজকে ইতস্ততঃ করতে দেখে নবাব বাহাদুর ফের বললেন—বুঝলে না ? দেওয়ান সাহেবের সিদ্ধান্তটা উলঙ্গভাবে বাতিল করে না দিয়ে একটু বিকল্প পথে করতে চাই। নাকটাই আমি ধরবো, তবে সরাসরি না ধরে হাতটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে ধরতে চাই। এন্তেজারে থাকো, যেনতেন কারণ একটা ঘটলেই সেই অজুহাতে তখনই তোমরা লাঠি হাঁকাতে শুরু করবে। আধিক্য করে ফেললেও, তা আমি কানে তুলতে যাবো না। তুমি জ্ঞানী ছেলে। এত বলার প্রয়োজন এখানে দেখিনে।

আবদুল আজিজের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হলো। তিনি খোশদীলে বললেন—জি হুজুর, আর বলতে হবে না।

লহমাকয়েক নীরব থেকে নবাব বাহাদুর আবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—সার্বিকভাবে এই ইংরেজ বণিকদের মতিগতি খুব একটা ভাল নয় বুঝলে ? সেরেফ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যই তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। শুল্ক দেয়ার ব্যাপারে এদের এই ক্রমবর্ধমান একগুঁয়েমীর পেছনে জরুর কোন কারণ আছে। পায়ের তলে মাটি না থাকলে, তাদের এত লাভের ব্যবসাটা বিপন্ন হওয়ার ভয় তাদের থাকতো, তারা এত শক্ত হতে পারতো না। কত তাদের সুযোগ সুবিধে দেয়া হলো, সম্রাটের কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে নিজে আমি ঝুঁকি নিয়ে ওদের কত কথা রাখলাম, কত ওদের টালবাহানা মেনে নিলাম, তবু ওদের মন ভরছে না কেন ?

ঃ আলমপনা !

ঃ একটা ঝড় উঠার আলামত আমি লক্ষ্য করছি। নিশ্চয়ই ওরা ফ্যাসাদ একটা পয়দা করবে মনে হচ্ছে। একটা বড় ধরনের হুমকি আর ধাক্কা ওদিক থেকে আসবে, এটা আমি স্পষ্টভাবে অনুভব করছি। মাদ্রাজে ওদের সৈন্য আমদানী ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যস্ত থাকার দরুন বাদশাহরও নজর এদিকে নেই। দাক্ষিণাত্যে তথা মাদ্রাজে বাদশাহর নিয়ন্ত্রণও মজবুত নয়। তাই, আমি যা বলতে চাচ্ছি, তাহলো, এ সময় আমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। ছোট খাটো ব্যাপার নিয়ে সে ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আবদুল আজিজ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—জি হুজুর, জি। আমি বুঝতে পারছি।

ঃ বেশ। দীলে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না রেখে এখন ফিরে যাও আর সেইভাবে তোমার লোকজনদের বুঝাও। খেদ মেটানোর জন্যে এই একবারই নয়, এমন

আরো অনেকবারই তাদের তলোয়ার খুলতে হতে পারে। তারা যেন তৈয়ার হয়ে থাকে।

ঃ জি আচ্ছা মেহেরবান।

ঃ আর কি কোন প্রসঙ্গ ছিল তোমার ?

ঃ জিনা-জিনা। এই একটা বিষয় নিয়েই আমি এসেছিলাম।

ঃ বেশ। তাহলে এবার—

বলেই নবাব বাহাদুর তখনই আবার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—তা কি ব্যাপার ? তোমার চেহারা এতটা কাহিল হয়ে গেল কি করে বলোতো ? তোমাকে দেখার পরই এই প্রশ্নটা করবো করবো করে আমার করাই হয়নি।

আবদুল আজিজ চমকে উঠে বললেন—হুজুর।

ঃ মস্তবড় একটা পেরেশানী তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে ? প্রশাসকের দায়িত্বটা কি তোমার কোন তকলিফের কারণ হয়েছে ?

আবদুল আজিজ মুসিবতে পড়ে গেলেন। কি করে তাঁর ব্যথার কথা নবাব বাহাদুরকে বলবেন ? নবাবের প্রশ্নের জবাবে তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—জিনা হুজুর, জিনা। ওতে আমার মোটেই তকলিফ হচ্ছে না।

ঃ খুব খাটাখাটি করছো তাহলে নিশ্চয়ই ? যে জানবাজ লোক তুমি !

ঃ হুজুর।

ঃ কম করো। মেহনতটা কমাও। শুধু কাজ দেখলেই তো হবে না ? শরীরটাও দেখতে হবে। শরীর ঠিক থাকলে তবেই সবদিক সামাল দিতে পারবে।

ঃ মেহেরবান !

ঃ শরীরের প্রতি অবহেলা করা কখনো ঠিন নয়, বুঝেছো ?

ঃ জি হুজুর, জি।

ঃ হুগলীতে তো একাই থাকো ! আব্বা-আম্মা তো এখানে সব ?

ঃ জি মেহেরবান।

ঃ তাহলে তো এ হালত হবেই।

ঃ জি ?

ঃ কি যে আজকাল সব মতিগতি তোমাদের ? শাদির বয়স গড়িয়ে যাবে, তবু শাদির কথা ভাববে না। তোমাদের যত্ন নেবে কে ? চাকর-নফর দিয়েই কি আর সব কিছু হয় ?

আবদুল আজিজ নতমস্তকে বসে রইলেন। নবাব ফের হাসি মুখে বললেন—ও কাজটাও ফরজ বুঝলে ? শাদি করার কথাটা একেবারেই ভুলে না থেকে, ওদিকটা নিয়েও কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করো।

আবদুল আজিজ পুনরায় অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—জি ?

নবাব বাহাদুর বললেন—আচ্ছা, এবার তুমি এসো। আমারও কাজ রয়েছে জিয়াদা।

নবাব বাহাদুর নড়েচড়ে উঠলেন। আবদুল আজিজ উঠে আড়ষ্টভাবে সালাম করে কোন মতে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসেই তিনি দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করলেন—হায়রে আমার শাদি !

আসার কালে আবদুল আজিজ দুর্বার বেগে ঢাকায় এলেন। কিন্তু ফেরার পথে গতি তাঁর একেবারেই মন্থর হয়ে গেল। নিজেকে প্রায় টেনে নিয়েই তিনি হুগলীর দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। এলোমেলো হাজার চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ফিরতে লাগলো। ঘরের কথা মনে পড়তেই তাঁর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। আবার সেই একটানা নিঃসঙ্গতা। এক ঘেঁয়ে নিঃসীম নিঃসঙ্গ জীবন। এতদিন তাঁর মনের কোণে একটা আশা ছিল যে, একদিন না একদিন শিরিবানু আবার তাঁর মকানে ফিরে আসবেই আর শিরিবানু ফিরে এলেই তাঁর এই শূন্যতা ফের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আজ তাঁর সে আশাও মিথ্যা হয়ে গেল। শিরিবানু কোথায় গিয়ে কার হাতে পড়েছে আগের মতোই সজীব আর নিষ্কলুষ সে আছে, না উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, কে জানে ? জিন্দাই সে আছে কিনা, তাই বা কে বলবে ?

ক্ষত বিক্ষত দীল নিয়ে হুগলীতে ফিরে এসে আবদুল আজিজ প্রথমে তাঁর দপ্তরের খবর করলেন এরপর মকানে এসে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ ঐভাবে কাটতেই শোরগোল করে তাঁর কক্ষে ঢুকলো উমিদ আলী। এসেই সে বললো—আরে এই যে দোস্ত, একদম খাস কামরায় ! দপ্তরে গিয়ে খবর নিতেই জানলাম, আজকেই তুমি ফিরেছো আর এইমাত্র মকানে ফিরে এসেছো ! একদম শাট্‌পাট্ যে ? তবিয়ত খারাপ নাকি ?

আবদুল আজিজ উঠে বসে উদাস কণ্ঠে বললেন—আমার তবিয়ত আর খারাপই কি আর ভালই কি দোস্ত ? এর কোন ভালমন্দ নেই। এসো, এখানেই এসে বসো।

পালংকের ধারে বসতে বসতে উমিদ আলী বললো—ভালমন্দ নেই।

ঃ ভাসমান জিন্দেগীর কোন ভালমন্দ থাকে ? তা যাক, আমার খোঁজ নিতে দপ্তরে গিয়েছিলে ?

উমিদ আলী শশব্যস্তে বললো—যাবো না মানে ? সেরেফ এই আজকেই নাকি ? হররোজ সবেরা-শাম খোঁজ তো আমি নিতেই আছি।

ঃ বলো কি !

ঃ কি ঘটনা দোস্ত ? শুনলাম, কি এক কারণে তুমি ঝড়ের বেগে ঢাকার দিকে ছুটে গেছো। কেন গেছো-কি কারণ—কেউ তা জানে না।

আবদুল আজিজ পূর্ববৎ উদাস কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, ঠিকঠিক কারো তা জানার কথা নয়।

ঃ ঢাকায় যাবে, জানতাম। কিন্তু এইভাবে চলে গেলে, আমাদের তা একটুও জানালে না, ব্যাপারটা তো সহজ মনে হচ্ছে না ?

ঃ সময় ছিল না দোস্ত্। বলে যাওয়ার মতো মনের অবস্থাও ছিল না।

ঃ অর্থাৎ ? কারণটা কি ?

ঃ হঠাৎ করে আবার শিরিবানুর পত্র পেলাম। পত্রখানা পাঠ করেই মাথাটা আমার ঘুরে গেল। স্বাভাবিক অবস্থা আমার তখন ছিল না।

ঃ সেকি ! কি লিখেছিলেন তিনি ?

ঃ সে অনেক কথা।

ঃ অনেক কথা কি কথা ? অন্ততঃ সারমর্মটা বলো।

ঃ সারমর্ম হলো—সম্পর্ক খতম।

ঃ মানে ?

ঃ আমার সাথে সে সম্পর্ক ছেদ করার কথাটা জানিয়েছিল বলেই আমাকে পাগল হয়ে ঐভাবে ছুটে যেতে হলো।

ঃ বলো কি ! গিয়ে কি দেখলে ?

ঃ সে কোনই ভণিতা করেনি। পত্রে যা বলেছিল, সেই মোতাবেক সে তাঁর আম্মাকে নিয়ে আমাদের মকান ছেড়ে চলে গেছে।

ঃ কি গজব ! কোথায় গেলেন ? অন্যকোন রিস্তেদারের মকানে ?

ঃ খরব নেই।

ঃ খরব নেই। কোথায় গেলেন কেউ তা জানবে না ?

ঃ বলে না গেলে জানবে কি করে ? তাঁরা গোপনে চলে গেছেন।

ঃ তাজ্জব ! তাহলে কোথায় গেলেন বলে তোমার মনে হচ্ছে ?

ঃ যেখানে তার মন গেছে, সেখানে। এ প্রশ্ন আমাকে করে লাভ নেই। যথেষ্ট তালাশ করেও তাঁদের কোন হদিস পাওয়া যায়নি, এই হলো সারকথা।

বিস্ময় পিষ্ট হয়ে উমিদ আলী বললো—কি সাংঘাতিক-কি সাংঘাতিক ! শিরিবানু বহিন তাহলে তোমার সাথে সম্পর্ক তাঁর ছিঁড়ে ফেললেন ?

ঃ একটানে ছিঁড়ে ফেললেন।

ঃ কখ্খনো না, এ হতেই পারে না, তিনি তা করতেই পারেন না।

ঃ বেখবর হয়ে চলে গেলেন, তবুও পারেন না ?

ঃ গেলেন কেন ? কারণটা কি ? তাহলে কি সেই জুলুম ? মানে তোমার আম্মাজানের নির্যাতন ?

ঃ অমানুষিক নির্যাতন দোস্ত। সেটা বর্ণনার অতীত। সেই নির্যাতনের অর্ধেকটাও অন্যকোন মেয়ের উপর চললে, এর অনেক আগেই সে পালাতো। আমার মুখ চেয়েই শিরিবানু এতদিন তা সহ্য করেছিল।

ঃ সেকি ! তাহলে তো তোমার এত দেরী করাই এই দুর্ঘটনার কারণ ?

ঃ একমাত্র কারণ। শিরিবানুর কোন কসুর নেই। তামাম কসুর আমার। বিলকুলই আমার।

আবদুল আজিজ বিচলিত হয়ে গেলেন। উমিদ আলী সরবে বলে উঠলো—কি তাজ্জব ! কি তাজ্জব ! তোমার ভাবী, মানে আমার বেগম সাহেবা, তাহলে তো ঠিকই অনুমান করেছিলেন ? তোমার ঐ আকস্মিকভাবে ছুটে যাওয়ার কথা শুনেই তিনি উতলা হয়ে বলেছিলেন, "জরুর কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, আপনার দোস্তের জিন্দেগীর চরম কোন বিপর্যয় ঘটে গেছে। শিগ্গির-শিগ্গির পাত্তা লাগান। উনি কবে ফিরবেন খোঁজ নেন, কখন ফিরবেন খবর করুন।" সেই থেকে দুই বেলা আমি একবার তোমার মকান, একবার তোমার দপ্তর, এইভাবে ছুটোছুটি করছি। কি আশ্চর্য ! তাঁর ধারণাই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত ?

ঃ তাইতো হলো দোস্ত। আমার এই জিন্দেগীটা সত্যিই উলটপালট হয়ে গেল। শিরিবানুর খোয়াব আমার বিলকুলই ভেংগে গেল।

নিমেষ কয়েক নীরব থেকে উমিদ আলী বললো—কিন্তু দোস্ত, একেবারেই হতাশ হওয়ার বিষয় তো এটা নয়। বিপর্যয় এটা ঠিকই। কিন্তু একেবারেই তাঁকে পাবে না, এখনই তা কায়েমীভাবে ধরে নিচ্ছো কেন ? আমার বিশ্বাস, জোরদারভাবে তালাশ করলে ঐ বহিনকে জরুর তুমি পাবে আবার।

ঃ হুঁ ! কি যে বলো ? হাতের পাখী হাতে থাকতে পেলাম না, উড়ে যাওয়ার পর পাবো। থাক দোস্ত, ঐ সব মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আমার ব্যথাটাকে জিঁয়িয়ে রাখার কুচেষ্টা করো না। যা চুকেবুকে গেছে, তা আমাকে ভুলে থাকতে দাও।

ঃ ভুলে থাকবে ? একি ভুলে থাকার বিষয়, না কোশেষ করলেই এটা কখনো ভুলে থাকতে পারবে তুমি ? পেরেশান হয়ে এসেছো, দু'চার দিন বিরাম নাও। এরপর ফের কোমর বেঁধে তালাশ শুরু করো। পাগলামী ? চলে গেছেন বলেই সব শেষ হয়ে গেছে ?

ঃ দোস্ত !

ঃ মরে তো যাননি, জিন্দা মানুষ মকান থেকে চলে গেছেন। তো কি হয়েছে ? খোঁজ করো, পেয়ে যাবে।

ঃ বটে ! ছেলের হাতের মোয়া ? আমি চাইবো আর পেয়ে যাবো। এই নিয়াত নিয়েই সে গেছে বুঝি ? পেছন দিকটা কবর দিয়ে রেখে তবেই সে বেরিয়েছে।

ঃ মানে !

ঃ আমার জন্যে বাসর সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকার জন্যে সে বেরোয়নি। ও চিন্তা বাদ দাও। যা শেষ, তা শেষই।

ঃ আলবত শেষ নয়। আমার নাম উমিদ আলী। এত সহজেই না উম্মিদ আমি হইনে। কোন যুক্তিহীন চিন্তাও আমি করিনে। এটা একটা সাময়িক বিপর্যয়, কোন আখেরী পরিণতি নয়। তুমি না পারো, তুমি তোমার প্রশাসন নিয়ে থাকো। আমাকে শুধু মদ্রাসা থেকে কিছু বেশী দিনের ছুটি পাইয়ে দাও। আমি দেখি, জলজ্যান্ত দুই দুইটে মানুষ একদম হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যায় কিভাবে ?

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে আবদুল আজিজ বললেন—দোস্ত !

উমিদ আলী বললো—তুমি এখন পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম করো। কিন্তু শিগ্গির শিগ্গির আমার মকানে যেতে হবে তোমাকে। তোমার ভাবী সাহেবা তোমার জন্যে উতলা হয়ে আছেন। এই খবর শুনলে আরো অস্থির হয়ে উঠবেন।

ঃ এ্যাঁ !

ঃ তুমি না গেলে উনি হয়তো নিজেই ছুটে আসবেন। কোন আব্রু-পর্দা মানবেন না।

সচকিত হয়ে উঠে আবদুল আজিজ বললেন—সেকি ! না-না দোস্ত, আমিই যাবো সেখানে। তাঁকে আমার সালাম দিয়ে জানাও, আমি এখন পরিশ্রাম, তবে যত জলদি সম্ভব, নিজেই আমি আসছি।

সময় করে আবদুল আজিজ যথাসত্বর উমিদ আলীর মকানে এসে হাজির হলেন। রওশন আরা বেগম পথ চেয়েই ছিলেন। আবদুল আজিজের গলা শুনেই তিনি দ্রুত পদে এসে দহলীজের সেই অন্দর মুখী দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন। এরপর সালাম বিনিময় ও তবিয়তের খবর করেই তিনি বললেন—তাহলে এমনই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল ভাই সাহেব ?

আবদুল আজিজ ভারী কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ ভাবী সাহেবা। এমন একটা অঘটনই ঘটে গেল।

ঃ এ ভয়টা আমার আগে থেকেই ছিল। কিন্তু ভাই সাহেবই গড়িমসি করে এই মুসিবতটা ডেকে আনলেন।

ঃ আমি তা অস্বীকার করতে চাইনে ভাবী সাহেবা। কিন্তু আমার নসীব যখন নারাজ, তখন আমি গড়িমসি না করলেও এমন কিছু ঘটতো। আমার তৎপরতায় কোন কাজই হতো না।

ঃ ভাই সাহেবের দোস্তের কাছে মোটামুটি ঘটনা আমি শুনেছি। এ নিয়ে নাকি ভাই সাহেব খুবই হতাশ হয়ে পড়েছেন ?

ঃ আশা কিছুই রাখিনে আর, এইটেই বুঝি ভাবী সাহেবা। এর নাম হতাশা কিনা জানিনে।

ঃ সেকি ভাই সাহেব ! একি বলছেন ?

ঃ শিরিবানু নামের যে শুকতারাটা আসমানে আমার ছিল, সেটা চিরতরে অস্তমিত হয়ে গেল, এই কথাই বলছি।

ঃ অস্তমিত হয়ে গেল মানে ? খোঁজ খবর করলে তাঁর সন্ধান একদিন না একদিন জরুর পাওয়া যাবে। এত হতাশ হওয়ার কি আছে ?

আবদুল আজিজ নিঃশ্বাস ফেলে উদাস কণ্ঠে বললেন—পাওয়াও যদি যায়, তাতেই বা আর হবেটা কি ভাবী সাহেবা ?

ঃ কি রকম ?

ঃ এমন খবরও পাওয়া যেতে পারে যে, কাউকে শাদি করে নিয়ে সে খোশ হালে ঘর-সংসার করছে।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ কিংবা দুর্বৃত্তের হাতে পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে সে এখন ঘৃণ্য জীবন যাপন করছে !

ঃ মানে !

ঃ এমনও হতে পারে বিপাকে-বিভ্রাটে পড়ে মারাই পড়েছে শিরিবানু !

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ কোন্ খবর পাওয়া যাবে, কে বলতে পারে ?

ঃ না-না, মানে—

ঃ ঐ জ্বলন্ত রূপ নিয়ে লা-ওয়ারিশভাবে পথে নামলে যে একজন যুবতীর কি পরিণতি হতে পারে, এটা কি চিন্তা করা খুবই শক্ত ভাবী সাহেবা ? জীবিতও যদি থাকে, ঐ উচ্ছিষ্ট শিরিবানু আমার কোন্ কাজে লাগবে ? মানবতার খাতিরে তার একটা সদগতি হয়তো করতে পারি, কিন্তু সে কি আর মন ভরাতে পারবে আমার ? ঐ ফাঁকটা পূরণ করবে কে ?

উমিদ আলী অধৈর্য হয়ে বললো—আরে রাখো তোমার আজগুবী হা-হুতাশ ! ছুটিটা আগে পাইয়ে দাও, তারপর আমি দেখছি, একেবারেই বাতিল হয়ে গেছে, না আশা ভরসা আছে কিছু। আসল কাজ বাদ দিয়ে বসে বসে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। আজ কালের মধ্যেই আমি বেরিয়ে পড়তে চাই।

ম্লান কণ্ঠে বাধা দিয়ে আবদুল আজিজ বললেন—থাক দোস্ত, খামাখা উত্তেজিত হয়ো না। সে জন্যে তোমাকে কোন তকলিফ করতে হবে না।

ঃ মতলব !

ঃ মুখে যতই বলি, চেষ্টা কি আর বাদ আছে, না লোকের কোন ঘাটতি

আছে আমার ? একজন মুদাররিসকে এই কাজে ছুটতে হবে কেন ? ব্যবস্থা কিছুটা করাই আছে, বাদবাকীটাও আমিই করবো, যদিও এটা পণ্ডশ্রম।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আমার আব্বাজানও চেষ্টা করছেন, অন্য লোকও লাগিয়ে দেয়া আছে। এরপরও আরো লোক লাগাবো এখন ভাবছি। ফায়দার আশা খতম। তবু দীলের সান্ত্বনার জন্যে একাজ জরুর আমাকে করতে হবে।

ঃ কিন্তু—

ঃ কিন্তু নয় দোস্ত। তোমরা বরং বসে বসে দোআ করো আমার জন্যে। তাতেই বেশী কাজ হবে।

ঃ দোস্ত !

ঃ আমি এখন উঠি। মস্তবড় দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। কর্তব্য ফেলে রেখে সেরেফ মুহাব্বত নিয়ে বেহুঁশ হলে চলবে কেন আমার ?

ঃ এ্যাঁ !

ঃ শিরিবানুর মুহাব্বতের চেয়ে দেশ আমার কাছে অনেক বেশী বড়, দোস্ত ! আওয়ারা হয়ে থাকার আমার মওকা কোথায় ?

উমিদ আলী চিন্তিত কণ্ঠে বললো—হ্যাঁ, সেদিকটা তো অবশ্যই দেখতে হবে তোমাকে। তা ঐ ব্যাপারে কি হলো দোস্ত ? নবাব বাহাদুরের সাথে কি মোলাকাত করতে পেরেছো ?

ঃ হ্যাঁ, তাঁর সাথে কথা বলেই এসেছি।

ঃ তাহলে ঐ ইংরেজ সেপাইদের ব্যাপারে তাঁর অভিমত কি ?

ঃ অভিমত তাঁর ভাল। তবে ঐযে তুমি বলেছিলে, আপদটা আমাদের ঘাড়ে রয়েই গেল। কায়েমীভাবে না হলেও, আপাততঃ ওটা ঘাড়েই থাকছে আমাদের।

ঃ কি রকম ?

ঃ রকম আর কি দোস্ত ! একবার যা ঘটে যায়, তা তখনই আর মেটে না। কোনটা মেটেই না, কোনটা মিটলেও তাতে সময় লাগে বেশ কিছু।

ঃ ও সব তত্ত্বকথা ছাড়োতো। খোলাসা করে বলো।

আবদুল আজিজ নবাবের বক্তব্যটা সংক্ষেপে শোনালেন। এরপর বল লেন—সেরেফ ঐ এক ঝামেলাই নয়। সামনে আমাদের আরো দুর্যোগ আছে বোঝা যাচ্ছে। আরো অনেক লড়াই এখন আমাদের সামনে।

উমিদ আলী দুঃখ করে বললো—হবেই তো। কাঙালের কথা বাসী হলে মনে পড়ে। সেই কবে থেকে বলে আসছি, এদের মন মতলব ভাল নয়, ডাণ্ডা হাঁকাও। সময় থাকতে তো তা তোমরা কেউ শুনলে না। এখন কি ঝামেলা হয় পরে, কে জানে !

আবদুল আজিজ আশ্বাস দিয়ে বললেন—এখনও অসময় হয়নি দোস্ত্। নবাব বাহাদুরের এই মনোভাব যদি ঠিক থাকে আর বাদশাহ যদি খামখেয়ালী করে আবার তাঁকে সরিয়ে না নেন, তাহলে এখনও আমরা সাফল্যের সাথেই ঐ ইল্লতদের মোকাবেলা করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

ঃ তাই যেন হয় দোস্ত্। তবে ভুলে যেও না, তোমার সংগ্রাম কিন্তু দ্বিমুখী। একদিকে ঐ ইল্লতদের ঠাণ্ডা করা, অন্যদিকে শিরিবানু বহিনকে তালাশ করে বের করা। এক সংগে ঐ দুই সংগ্রাম তোমার। এর কোনটাতেই তোমার কিন্তু কমজোর হলে চলবে না।

আবদুল আজিজ পুনরায় উদাস কণ্ঠে বললেন—আল্লাহ ভরসা !

১৩

দেশপ্রেম আর প্রিয়ার প্রেম জাতে গোত্রে এক হলেও, চরিত্রে এরা পৃথক। এদের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। স্বভাবে এরা আলাদা। একটা বহির্মুখী, অন্যটা অন্তর্মুখী। একটা করে মানুষকে দুরন্ত ও দুর্বার; অন্যটা রে নরম ও নিদ্রালু। একটা চায় দিতে, অন্যটা চায় পেতে। একটার সুখ ত্যাগে, অন্যটার ভোগে। ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও পার্থক্য এদের প্রচুর। প্রথমটার ব্যর্থতায় মানুষ হয় জেদী। বিকল্প পথ উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে সে। দ্বিতীয়টার ব্যর্থতা পঙ্গু করে মানুষকে, সে বিরাণ হয়ে যায়। বিশেষ করে বীরের আর প্রেমিকের জিন্দেগীতে এ সত্যের ব্যত্যয় নেই। প্রিয়ার প্রেমের ব্যর্থতার খেশারত বীর পারে দেশপ্রেমে ডুবে গিয়ে অনেকখানি উশুল করতে। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানী প্রিয়ার প্রেমে ডুব দিয়ে বীর কখনো একবিন্দুও ধুয়ে ফেলতে পারে না।

ফলে, এক মানুষের দীলে এই দুই প্রেম, অর্থাৎ দেশপ্রেম ও প্রিয়ার প্রেম এক সাথে সমান্তরাল চলে না। কিয়দ্দূর এগুতেই নেতিয়ে পড়ে পরেরটা। দেশ প্রেমের পাশে প্রিয়ার প্রেম সূর্যের পাশে চাঁদ। সূর্যের উপস্থিতি জোরদার হলে চাঁদ যায় অন্তরালে। অস্তিত্ব তার বিলীন হয়ে যায় না ঠিকই, কিন্তু চাঁদ আর তখন দৃশ্যমান থাকে না। দেশপ্রেমিকের কাছে আগে দেশ, পরে প্রিয়া। দেশপ্রেমের প্লাবণে প্রিয়ার মুখ তলিয়ে যায়। সে মুখ তখন আর অনুক্ষণ দৃষ্টির মাঝে থাকে না। থাকে শুধু স্মৃতি। প্রসঙ্গে ও অবকাশে মনে পড়ার স্মৃতি।

আবদুল আজিজ একাধারে প্রেমিক ও বীর। এক সাথে এই দুই কিসিমের প্রেম দীলে নিয়ে মাঠে নামলেন আবদুল আজিজ। দ্বিমুখী সংগ্রামের ইরাদা তাঁর দীলে। লক্ষ্য তাঁর, সম্ভাব্য দুর্যোগ থেকে দেশোদ্ধার ও হৃত প্রেম পুনরুদ্ধার। কিন্তু কয়েকটা দিন না যেতেই দেশ প্রেমের ঝাপটায় তাঁর প্রিয়ার

প্রেম ফিঁকে হয়ে গেল। বিরামে ও অবসরে দহনটুকু ছাড়া এ দহন নিরাময় করার জোরদার কোন ভূমিকাই তাঁর রইলো না। দেশোদ্ধারে মেতে উঠলেন আবদুল আজিজ। কর্তব্যের কাছে হেরে গেল হৃদয়।

নবাব শায়েস্তা খানের শংকাটা ক্রমশঃই বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করতে লাগলো। অবশ্য এ শংকাটা নবাবের দীলে এককভাবেই ছিল না, দেশপ্রেমিক সবার দীলেই এ শংকাটা কমবেশী সবসময়ই ছিল। এটা এখন ক্রমেই ঘনীভূত হতে লাগলো। প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো বিপর্যয়ের পূর্বাভাস।

এর আলামত আবদুল আজিজ হুগলীতেই প্রথম লক্ষ্য করলেন। অকস্মাৎ কুঠিয়ালরা চাল বদলিয়ে ফেললো। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে আদৌ আর অস্থিরতা রইলো না। অকস্মাৎ তারা পরিমাণের অনেক বেশী শান্ত হয়ে গেল। ঝড় উঠার পূর্বক্ষণের মতো আকস্মিক এক নিস্তব্ধতা তাদের আচরণে প্রকট হয়ে উঠলো। ঐ ইংরেজ সৈনিকেরা সেই যে এসে কুঠিয়ালদের চত্বরের মধ্যে ঢুকলো, আর তাদের বাইরে দেখা গেল না। বাইরে তাদের কোন রকম আনাগোনা কারো নজরে পড়লো না। আবদুল আজিজ বেয়াকুফ হয়ে গেলেন। তাদের তাড়ানোর মতো মওকা-অজুহাত—কিছুই তারা আবদুল আজিজকে দিলো না। হৈ চৈ ও উত্তেজনা পরিত্যাগ করে তামাম কুঠিয়াল ব্যবসার মাঝে একান্তভাবে তলিয়ে গেল এবং এদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের পুঁজি বিনিয়োগ আরো অনেকাংশে বাড়িয়ে দিলো। বিড়ালের এই নির্লিপ্তভাব স্বাভাবিকভাবেই আবদুল আজিজকে চিন্তিত করে তুললো।

ইংরেজ কোম্পানীর এই নীরবতা আরো বেশী উৎকট হয়ে দেখা দিল শাহান শাহ আওরঙ্গজেবের শুল্ক আদায়ের ব্যাপারে কঠিন মনোভাব গ্রহণ করার পর। বাংলা মুলুকে বাণিজ্য করা এই সময় এতই বেশী লাভজনক হয়ে উঠেছিল যে, ইংরেজ ও অন্যান্য বণিক সংস্থা ছাড়াও, ইংলণ্ডসহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নানা দেশের লোকেরা দলে দলে এদেশে বাণিজ্য করতে আসতে লাগলো এবং তারা সাগ্রহে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চহারে শুল্ক দিয়ে এদেশে ব্যবসা করতে লাগলো। ইংরেজদের ভাষায় এদেরকে বলা হতো, " ইন্টার লোপার্স" বা অবাঞ্ছিত প্রবেশকারী। অন্যান্য কোম্পানীর মতো এদের পেছনে স্বদেশের কোন সনদ বা ছাড়পত্র ছিল না। এরা স্ব-উদ্যোগে এসে নগদ নগদ শুল্ক দিতো ও ব্যবসা করতো। কালক্রমে কোম্পানী বা বণিক সংস্থা ছাড়াই ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুল্ক দিয়ে ব্যবসা করা লোকের সংখ্যা, অর্থাৎ 'ইন্টার লোপার্সদে'র সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেলো যে, ইংরেজ কোম্পানীকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে দেয়ার কোন গরজ বা যুক্তিই শাহান শাহ আওরঙ্গজেব দেখলেন

না। তদুপরি তিনি জানতেন, ইংরেজ বণিকেরাই বাংলা মুলুকে সব চেয়ে অধিক মুনাফা কামাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও শুল্ক দিতে অসম্মত হয়ে ইংরেজ কোম্পানী যদি এ মুলুক ত্যাগ করে, তাতে এ মুলুকের ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বার্থহানী হওয়ার কোন কারণই নেই। ফলে, বাদশাহ আওরঙ্গজেব ইংরেজ কোম্পানী দ্বারা আমাদানীকৃত মালের উপর শতকরা সোয়া তিন টাকা হারে শুল্ক আরোপ করে তা আদায় করার এক কড়া আদেশ বাংলার নবাবের কাছে পাঠালেন এবং নবাব বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে সে আদেশ কার্যকর করার জন্যে বাংলার সর্বত্র অনুরূপ কড়া নির্দেশ ছড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু সকলেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, এ নির্দেশ সর্বত্র প্রচার হওয়ার পরও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে কোন প্রকার চঞ্চলতা নেই। বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার পূর্ববৎ মনোভাব নিয়ে তারা নিশ্চিন্তে মালপত্র কিনতে লাগলো এবং তাদের নিজ দেশের মাল নিয়ে কোম্পানীর জাহাজ নিরুদ্বেগে বাংলার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

ফলে, আবদুল আজিজকেই সর্বাগ্রে সোচ্চার হতে হলো। তাদের ঐ নির্লিপ্ততার নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকার অবকাশ আবদুল আজিজের রইলো না। কারণ, হুগলী নদীই বাংলা মুলুকে মাল যাতায়াত করার প্রধান পথ। আবদুল আজিজের নির্দেশে হুগলীর ফৌজদারেরা সসৈন্যে ছুটে গিয়ে হুগলী নদীর প্রবেশ মুখে অবস্থান নিলেন এবং ইংরেজদের মাল বোঝাই জাহাজের বাংলা মুলুকে ঢোকার পথ রুদ্ধ করে দিলেন। একটার পর একটা করে ইংরেজদের মাল বোঝাই জাহাজ এসে বাধা প্রাপ্ত হয়ে সেখানে জমায়েত হতে লাগলো। তারা বাংলা মুলুকে ঢোকার পথ চাইলো। বাংলার আদায়কারীরা শুল্ক দাবী করলো। জবাবে তারা জানালো, শুল্ক দিয়ে ব্যবসা তারা করে না। তখন তাদের ফিরে যেতে বলা হলে তারা ফের জানালো, বাংলা মুলুকে অবস্থিত তাদের কর্তৃপক্ষেরাই নির্ধারণ করবে, তারা বাংলা মুলুকে ঢুকবে, না ফেরত যাবে। অতপর কোন করম বিচলিত না হয়ে তারা নোঙ্গর ফেলে চুপ্ চাপ্ ওখানেই রয়ে গেল।

নীরবতা ভঙ্গ করে এই মুহূর্তে ঝড়টা শুরু হওয়ার কথা। জাহাজের লোকেরা তলে তলে প্রস্তুত হতে লাগলো এবং তাদের পক্ষে মদদ আসার অপেক্ষা করতে লাগলো। বাংলার বাহিনীও ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু আকস্মিক এক কারণে উভয় পক্ষের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেল। উইলিয়াম হেজ এই মুহূর্তে একেবারেই এক স্বতন্ত্র আচরণ করে বসলো। কোন রকম গোলমালে না গিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে শুল্ক দিতে এগিয়ে এলো এবং বাংলার প্রশাসনের সাথে একটা অকপট সমঝোতায় এসে সে দুই কিস্তিতে মালের উপর হিসাব মতো শুল্ক প্রদান করলো।

উইলিয়াম হেজের এই সুমতি ও সদাচরণ দেখে আবদুল আজিজের সেপাই সেনারা শান্ত হলো। এখানে তো নয়ই, ঐ বিশজন সৈন্যের বিরুদ্ধে তোলোয়ার ধরার আর কোন অজুহাতই তাদের রইলো না। কিন্তু হেজের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হলো কোম্পানীর অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। কারণ, হেজের এই পরিবর্তন কোম্পানীর কোন পরিবর্তন প্রতিভূ ছিল না। এটা ছিল হেজের ব্যক্তিগত পরিবর্তন এবং এর পেছনে অন্য কারণ ছিল।

এ মুলুকে আসার পর ব্যবসায়ে কল্পনাতীত লাভ দেখে উইলিয়াম হেজ উপলব্ধি করলো, কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবসা করা অনেক বেশী লাভজনক। ব্যক্তিগত পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের অর্থাৎ 'ইন্টার লোপার্স'দের অল্প সময়েই প্রভূত অর্থ উপার্জন করতে দেখে সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়লো এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করার সাথে 'ইন্টার লোপার্স'দের সঙ্গে এক হয়ে উইলিয়াম হেজ নিজেও ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করলো। ব্যবসায়ে লাভ পেয়ে ইন্টারলোপার্সদের মতো সে নিজেও খোশ দীলে যথানিয়মে শুল্ক দিতে লাগলো। সেই সাথে সে আরো উপলব্ধি করলো, সকলেই যেখানে সাগ্রহে শুল্ক দিচ্ছে সেখানে শুল্ক না দিয়ে কোম্পানী আর এদেশে ব্যবসা করতে পারবে না। এত লাভের ব্যবসায় এ দেশের প্রশাসনকে ঐ সামান্য ক'টি টাকা শুল্ক না দেয়ার যুক্তিও মনে তার ধরলো না। ফলে, উইলিয়াম হেজ প্রাপ্য শুল্ক বিনা ওজরে পরিশোধ করলো।

কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল খারাপ। হেজের এই শুল্ক দেয়াতে এদেশে কোম্পানীর অন্যান্য কর্মকর্তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। তৎক্ষণাৎ তারা একখানাকে সাতখানা করে বানিয়ে স্বদেশে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলো। ইংলণ্ডে অবস্থিত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বুঝলো, বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার হক থেকে বাংলার প্রশাসন তাদের বঞ্চিত করেছে এবং জাহাজ আটকিয়ে জুলুম করে শুল্ক আদায় করেছে। তাদের যে এমন কোন হক নেই, বাংলায় অবস্থিত কোম্পানীর অসৎ কর্মচারীরা তাদের কাছে এটা মোটেই খোলাসা করেনি। এতে করে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং বাংলার প্রশাসনের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

একমাত্র এই এক কারণেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শক্তিপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো না। তাদের এই সিদ্ধান্তের পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল এবং অনেক অনেক বিষয় ও পরিস্থিতি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের বাধ্য ও উৎসাহিত করলো। ইংরেজেরা পেটের দায়ে সাত সাগরের ঢেউ পেরিয়ে এ মুলুকে এসেছে এবং এখানে অনেক ভাত দেখে ছলে বলে কৌশলে এখানে তাদের আধিপত্য কায়েম করার অসৎ ইরাদা তারা বরাবরই পোষণ করে

এসেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন দেশের সরকার ও বণিকদের তাড়া খাওয়ার পর এবং সবশেষে ওলন্দাজদের পিটনে ইন্দোনেশিয়া থেকে উৎখাত হওয়ার পর তারা দেখলো, একমাত্র এই হিন্দুস্তান ছাড়া তাদের আর দাঁড়াবার স্থান নেই এবং বাংলা মুলুকের মতো এত ভাত আর ব্যবসায়ে এত লাভ আর কোথাও নেই। ভুখা দেশের লোক তারা। লোহা লক্করের দোকানদার। ভাতের প্রশ্নে তারা ছিল বরাবরই দিশেহারা। তদুপরি ইউরোপের অন্যান্য জাতির হাতে মার খেয়ে তারা এখন একদমই কোণঠাশা। অস্তিত্বের লড়াইয়ে তারা এখন মরিয়া। এ দুনিয়ায় টিকে থাকার কারণেই বাংলা মুলুককে সবলে আঁকড়ে ধরতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো তারা। এ মুলুক থেকে সরে যাওয়া মানেই দুনিয়া থেকে তাদের অস্তিত্ব মুছে যাওয়া।

কিন্তু এক্ষণে তাদের টিকে থাকার পথে ব্যক্তিগত পর্যায়ের বণিকেরা (ইন্টারলোপার্সরা) অতিরিক্ত এক হুমকি হয়ে দাঁড়ালো। বাংলা মুলুকে তাদের বাণিজ্য ছিল একচেটিয়া। সেই সুবাদে বাংলা মুলুকে তাদের একচেটিয়া প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু এই ইন্টারলোপার্সরা এসে এদেশে তাদের সেই বাণিজ্যের ভিতটাই নড়বড়ে করে দিলো। একচেটিয়া তো দূরের কথা, এখানে তাদের বাণিজ্য টিকিয়ে রাখাই দায় হয়ে দাঁড়ালো। এতে করে ইংরেজ কোম্পানীর বল প্রয়োগের প্রয়োজন এদের বিরুদ্ধেও ছিল।

বাংলা মুলুকে অবস্থিত কোম্পানীর কর্মচারীদের শয়তানীও দীর্ঘদিন আগে থেকেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে উত্তেজিত করে তুলছিল। এদেশের সরকারের অত্যাচার ও জুলুম করে অর্থ আদায়ের অসংখ্য বানোয়াট কাহিনী তারা অনেকদিন আগে থেকেই তাদের দেশে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কানে দিয়ে আসছিল। কোম্পানীর অসৎ কর্মচারীরা এখানে প্রথম থেকেই বিপুল পরিমাণে কোম্পানীর তহবিল তসরুপ করতে থাকে এবং এই অর্থ ঘাটতি এদেশের প্রশাসনকে ঘুষ দিতে হচ্ছে বলে হিসাবে দেখাতে থাকে। এ ছাড়াও তাদের তামাম দুর্নীতির দায় এদেশের প্রশাসনের ঘাড়ে চাপাতে থাকে। এতে করে ঐ দূর দেশে অবস্থিত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই নিছক মিথ্যাকেই সত্য বলে মনে করে এদেশের প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল।

সবার উপর, পরিস্থিতিটাও তাদের বল প্রয়োগের অনুকূলে ছিল। ইংরেজেরা ভাগ্যান্বেষী জাতি। এদের নজর ছিল সবদিকেই সজাগ। তারা দেখলো, দিল্লীর সম্রাট দাক্ষিণাত্যের এক দীর্ঘ মেয়াদী ও প্রাণান্তকর লড়াইয়ে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে, নিজে তো তিনি হীনবল হয়ে পড়ছেনই, তার চেয়েও বড় কথা, এক্ষণে তাঁর বাংলার দিকে নজর দেয়ার কোনই ফুরসুৎ নেই। এই সময় বাংলার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করলে ওদিক থেকে কোন সাহায্যই আসবে না।

এই সমস্ত বিবেচনার সাথে বাংলার প্রশাসন জোর করে শুল্ক আদায় করছে, এই খবর পেয়েই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, আর গড়িমসির অবকাশ নেই, সৈন্য সাজাও। তারা ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সকে বোঝালো, এ জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় নেই। সরকারীভাবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিস্থিতি অনুধাবন করে রাজা জেম্‌স্ কোম্পানীকে যুদ্ধ ঘোষণার অনুমতি দিলেন এবং ইংলণ্ডের সৈন্য বাহিনী তাদের পেছনে যোগান দিলেন। সর্বোতভাবে প্রস্তুত হয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বাংলা মুলুকে তাদের লোকজনদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়ে দিল, অতপর আর এক পয়সাও শুল্ক কেউ দেবে না, শক্তি প্রয়োগ করার জন্যে প্রস্তুত হও, এখান থেকে অচিরেই সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধ জাহাজ তোমাদের পেছনে যাচ্ছে। উইলিয়াম হেজের আচরণের জন্যে তারা সেই সাথে মদ্রাজ কাউন্সিলকে নির্দেশ দিলো, হেজকে কোম্পানী থেকে বহিষ্কার করো এবং বাংলায় কোম্পানীর স্বাধীন দপ্তর বিলোপ করে আবার তাদের নিয়ন্ত্রণ তোমাদের নিজের হাতে নাও।

এই নির্দেশ পেয়ে মাদ্রাজ কাউন্সিলের সভাপতি গিফোর্ড, ফোর্ট সেন্ট জর্জ থেকে পুরো একটা বাহিনী নিয়ে নৌপথে হুগলীতে এসে হাজির হলো। একে সৈন্য আনাই যথেষ্ট ছিল, তার উপর আবার তখনই এক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায়, উঠবো উঠবো করে যে ঝড়টা এযাবত আটকে ছিল, পূর্ণ ঝড় না হলেও, তার একটা মহড়া সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গিফোর্ডের জাহাজ এসে কুঠিয়ালদের ঘাটে "শিপএ্যান" নামক কোম্পানীর নোঙ্গর করা, আর একটা জাহাজের কোল ঘেঁষে ভিড়তেই দরুম-দুরুম করে বন্দুকের উপর্যুপরি অনেকগুলো আওয়াজ হলো এবং সেই এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ার ফলে হুগলীর একজন পথচারী গুলিবিদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিহত হলো।

আর যায় কোথায় ? জাহাজ ভর্তি সৈন্য আসতে দেখেই প্রশাসক আবদুল আজিজের ফৌজ সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং তারা নিকটেই তৈয়ার হয়েছিল। এবার তারা মার মার রবে গিফোর্ডের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শুরু হলো লড়াই। গিফোর্ডের বাহিনী আক্রান্ত হতে দেখে "শিপএ্যান" এর আরোহীরাও এসে গিফোর্ডের বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে আবদুল আজিজের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে লাগলো। কিন্তু ফায়দা কিছুই হলো না। অল্পক্ষণ তুমুল লড়াই চলার পর গিফোর্ডের বাহিনী ও শিপএ্যানের লোকজন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং নিরুপায় হয়ে সবাই তারা হুগলীর কুঠির মধ্যে আশ্রয় নিলো। সঙ্গে সঙ্গে আবদুল আজিজের ফৌজ এসে কুঠি অবরোধ করে দাঁড়ালো এবং ইংরেজ সেপাইরা আত্মসমর্পণ না করলে "শিপএ্যান" ও "গিফোর্ডের" জাহাজ সহ গোটা কুঠিটাই ভস্মিভূত করে ফেলা হবে বলে হুঁশিয়ারী দিলো।

নিরুপায় হয়ে অবিলম্বে কুঠি থেকে বেরিয়ে এলো গিফোর্ড ও শিপএ্যানের কয়েকজন কর্মকর্তা। তারা নিজেরাই এসে আত্মসমর্পণ করলো এবং গিফোর্ড ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে শশব্যস্তে বললো—ও স্যার, দিস্ ইজ এ্যান এক্সিডেন্ট, পিওরলী এ্যান এ্যাক্সিডেন্ট্ ! ইহা সেরেফ একঠো দুর্ঘটনা আছে, কমিউনিকেশান গ্যাপ্ আইমিন, বুঝার ভুল আছে।

প্রশাসক আবদুল আজিজ রোষভরে বললেন—বুঝার ভুল ?

ঃ ইয়েস স্যার, ইয়েস-ইয়েস। হামি লোগ লড়াই করিটে আসে নাই, কোম্পানীর কাজ লইয়া আসিয়াছে। আঁট্টো রক্ষা করিটে হামার সেপাইরা লড়িল।

ঃ কোম্পানীর কাজ নিয়ে এসেছো তো গুলি ছুড়লে কেন ?

এবার "শিপএ্যানের"র প্রধান কর্মকর্তা ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—স্যালিউট্ জানাইটে হুজুর, অভিবাডন জানাইটে হামার জাহাজের লোকেরা গোলী ছোড়িয়াছে। এ স্যালিউট্ অফ ইলেভেন গানস্ ! আইমিন এগারো ফায়ারকা অভিবাডন। হামরা এগারো বার ফায়ার করিয়া হামাডের মাষ্টার গিফোর্ড সাহাবকো অভিবাডন জানাইয়াছে। গিফোর্ড সাহাব হামাডের বিগ বস্, আইমিন বহুট বড়া উপরওয়ালা আছে।

ঘটনাটা সত্যই হোক আর বানানোই হোক, 'শিপএ্যান' এর কর্মকর্তা অবলীলাক্রমে এই বিবৃতি দান করলো। সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদার আবদুল গনি প্রতিবাদ করে বললেন—কখ্খনো নয়। বন্দুকের আওয়াজ ঐ গিফোর্ডের জাহাজ থেকেই এসেছে। তার সেপাইদেরই বন্দুক ছুড়তে আমাদের লোকেরা দেখেছে।

জবাবে এ্যানের কর্মকর্তাটি ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—নেহি-নেহি হুজুর। টাহারা ভুল ডেখিয়াছে। হামাডের আডমী বন্দুক ছোড়িয়াছে।

আবদুল গনি বললেন—অসম্ভব ! এতগুলো লোক কি সবাই ভুল দেখলো ?

গিফোর্ড এবার সবিনয়ে বললো—জরুর টাহারা ভুল ডেখিটে পারে হুজুর। হামার শিপ্ আওর শিপএ্যান—ইয়ে ডোনো জাহাজ এক সাটে একডম ক্লোজ হইয়া আছে। বিলকুল পাশাপাশি। ইস্ লিয়ে টাহারা ভুল সমঝিয়ে লইটে পারে। হামার সেপাই এ্যাট্অল গোলী ছোড়ে নাই।

জোশের আধিক্যেই হোক, আর হুগলীর প্রশাসনকে ভয় দেখাতেই হোক, গিফোর্ডের সেপাইদের গুলি ছোড়াটা কোন অসম্ভব কথা ছিল না। কিন্তু আবদুল আজিজ এসব বিতর্কে না গিয়ে গিফোর্ডকে সরোষে প্রশ্ন করলেন—কোম্পানীর কাজে এসেছো তো সেপাই এনেছো কেন ? কোন্ সাহসে তুমি জাহাজ ভর্তি করে তোমার দেশের সেপাই নিয়ে এই দেশে ঢুকেছো ?

গিফোর্ড বুঝতে না চেয়ে বললো—এক্সকিউজ মী স্যার ! ইয়ে বাট্ হামার সমঝমে আসিল না।

আবদুল আজিজ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—সমঝমে আসিল না ? বার বার তোমরা পেয়েছো কি ? একটা স্বাধীন মুলুকে তুমি তোমার দেশের ফৌজ নিয়ে ঢুকে পড়েছো, তবু কিছুই বুঝলে না ? আমাদের দেশের ফৌজ নিয়ে আমি তোমাদের ইংলণ্ডে প্রবেশ করলে, তখনও কি কিছুই তোমাদের সমঝমে আসবে না ?

গিফোর্ডের টনক নড়লো। মদ্রাজ উপকূলের সর্বত্র সেপাই নিয়ে চলা ফেরা করে সে ধরেই নিয়েছিল যে, ফৌজ নিয়ে এই হিন্দুস্তানের সর্বস্থানে তারা চলা-চল করার হকদার। তাদের কেউ ঠেকাবে না বা সে সাহসও এখানে তেমন কারো নেই। জবাবে গিফোর্ড কাঁচুমাচু করে বললো—হাঁ-হাঁ। অফকোর্স ইয়ে এক বাট্ আছে। লেকেন হামি ভাবিয়া লইল, হামরা এ মুলুকে বাণিজ্ করিটেছে বাণিজ্ করার কামে নিরাপট্টার জন্যে হামরা হামাডের সেপাই লইয়া চলিটে পারিবে জরুর।

ঃ বটে ! এমন ধারণা কেমন করে হলো তোমার ?

ঃ হামার ভুল হইয়া গিয়াছে হুজুর। বাংলা মুলুকে কুয়ী ফরেন সোলজার ঢুকিটে পারিবে না। হামার টাহা জানা না আছে, বিলকুল জানা না আছে। হামাকে মাফ করিয়ে ডিন।

গিফোর্ড যে বিলকুল তা জানে না, ঘটনা তা নয়। এমনিতেই তারা বেপরোয়া, তার উপর অচিরেই তাদের যুদ্ধ জাহাজ এসে যাচ্ছে বলে এ সবের কোন তোয়াক্কাই সে রাখেনি। কিন্তু বেকায়দায় পড়লে নাকি বাঘেও ধান খায়, গিফোর্ডের হয়েছে এখন সেই অবস্থা। তার এত বড় একটা বাহিনী যে একটা স্থানীয় প্রশাসকের লোক-লস্কর আর পাইক-পেয়াদার হাতে এমনভাবে মার খাবে, তাদেরকে ঠেকা দিতে পারবে না, এটা সে ভাবেনি। বেকায়দায় পড়ে তাই সে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো এবং এ ভুল সে আর কখনো করবে না বলে পুনঃ পুনঃ ওয়াদা করতে লাগলো।

তার আকুতির প্রেক্ষিতে আবদুল আজিজ তাকে সক্রোধে জানালেন, কোম্পানীর যা কাজ তার আছে, জলদি জলদি শেষ করে তাকে অবিলম্বে ফৌজ নিয়ে এই মুলুক থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবং এই মধ্যবর্তী সময়ে তার সেপাইদের নিরস্ত্র করে জাহাজে পাঠাতে হবে। বিদেশী কোন ফৌজ বাংলার সীমানায় থাকবে না। এই সাথে আগেকার ঐ বিশজন সৈন্যদেরও তিনি গিফোর্ডের সাথে বিদেয় হওয়ার আদেশ জারী করলেন।

মর্মব্যথা মর্মে চেপে গিফোর্ড তা হাসি মুখে মেনে নিলো। সৈন্যদের নিরস্ত্র করে জাহাজে পাঠানোর পর কোম্পানীর নির্দেশ মোতাবেক সে এখানে

কোম্পানীর স্বাধীন দপ্তরের বিলুপ্তি ঘোষণা করলো এবং উইলিয়াম হেজকে সরিয়ে জব চার্ণককে এদেশে ইংরেজ কুঠিয়ালদের প্রতিনিধি বানালো। জলদি জলদি কাজ সেরে সে নিজের সৈন্য ও হেজের জন্যে আগত ঐ পূর্ববর্তী বিশজন ইংরেজ সৈন্য সহকারে মদ্রাজে ফিরে গেল।

অতপর কিছুদিন বিরতি। আবদুল আজিজের সামনে এক্ষণে আর তেমন কোন ঝুট ঝামেলা রইলো না। সাময়িকভাবে হলেও, ইংরেজ বণিকেরা খামুশ হয়ে গেল। কোথাও থেকে আর কোন বড় ধরনের গোলমালের খবর এলো না। প্রশাসনিক কাজেরও আপাততঃ অধিক চাপ ছিল না। আবদুল আজিজ অনেকটা অবসর হয়ে গেলেন।

অবসর মানেই আবার সেই দহন। শিরিবানুর প্রসঙ্গ আবার তাঁর সামনে মুখ্য হয়ে উঠলো। তিনি সেই দিকে নজর দিলেন। কিছু লোক সেই থেকেই খোঁজ খবরে ছিল। এ পর্যন্ত কেউ তারা তেমন কোন খবর করতে পারেনি। উল্টাপাল্টা ছেঁড়া ফাটা যে যা খবর এনেছে তা বিলকুলই উড়ো খবর এবং তা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবদুল আজিজ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, জীবন্ত দুই দুইটি মানুষ বাড়ী থেকে চলে গেলেন তো গেলেনই। ভাল হোক, মন্দ হোক, এতদিনেও কেউ কোন হদিস্ তাদের পাবে না, এ কেমন কথা? এমন কোন অশ্বারোহী সেপাই তাঁরা নন যে, রাতারাতি এদেশ থেকে অন্য দেশে চলে গেলেন, কেউ কোন পাত্তা করতে পারলো না? সেরেফ দুইজন জেনানা। সহায়-সম্বল সঙ্গী-সাথীহীন। এক রাতে কত দূরই বা যেতে পারেন তাঁরা? মরে গেলেও তো লাশ তাঁদের দেখবে কেউ?

এই রকম ভেবে ভেবে আবদুল আজিজ যখন দিশেহারা, সেই সময় তাঁর আব্বা আবদুল খালেক সাহেব হুগলীতে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তবিয়তের খবরাখবর নিয়ে দুই চারটি মামুলী কথার পর আবদুল খালেক সাহেব ধীর কণ্ঠে ভূমিকা করে বললেন—বাপজান, আমি নিজেই এলাম তোমাকে কিছু সান্ত্বনা দেয়ার ইরাদা নিয়ে। জিন্দেগীতে মানুষের অনেক উত্থান পতন ঘটে, তা নিয়ে তোমার মতো এলেমদার আর সমঝদার ইনসানের ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। যতবড় ধাক্কাই হোক, সেটা সামাল দিয়ে নিয়ে মানুষকে আবার শক্ত হয়ে নয়া জিন্দেগী শুরু করতে হয়।

আবদুল আজিজ শংকিত কণ্ঠে বললেন—একথা কেন বলছেন আব্বাজান? তবে কি—

আবদুল খালেক একইভাবে বললেন—হ্যাঁ বাপজান, আমি ঐ শিরিবানুদের কথাই বলছি। যথাসাধ্য খোঁজ খবর আমি করেছি। কোনদিকেই বাদ দেইনি। এই খোঁজখবর করার পর ফলাফল যা পেলাম, তাতে করে তাদের আশায়

আর আমাদের না থাকাই ভাল। সেরেফ দুইজন অসহায় জেনানা ঝোঁকের মাথায় এইভাবে পথে বেরুলে তারা যে বিরাণ হয়ে যাবে, এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই বাপজান। ও নিয়ে আর আমরা ভেবে করবো কি? কাজেই—

আবদুল আজিজ চমকে উঠে বললেন—বিরাণ হয়ে যাবে মানে?

ঃ মানে, খবর করে আমি যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে তারা বোধ হয় আর বেঁচে নেই বাপজান। অন্ততঃ এই আমার ধারণা।

আবদুল আজিজ চাপা কণ্ঠে আর্তনাদ করে বললেন—বাপজান!

ঃ আমি একেবারে নিশ্চিত নই। তবু এটা অবিশ্বাস করার ফাঁকও আমি পাচ্ছিনে।

আবদুল আজিজ আকুল কণ্ঠে বললেন—কি ঘটনা আব্বাজান! কি জানতে পেরেছেন আপনি?

ঃ জানলাম এক জেলের কাছে। শহর থেকে কিছুটা ফাঁকের এক গাঁয়ের জেলের মুখে শুনলাম। নদীতে মাছ ধরার কালে সে দেখেছে, ভোর রাত্রে শহরের দিক থেকে দুইজন মহিলা এসে নদীর ধারে দাঁড়ালো এবং চলমান এক ভাড়াটে নৌকা ধরে ভাটির দিকে চলে গেল। অন্ধকারের জন্যে সে তাদের চেহারা দেখতে পায়নি বা তাদের সাথে কোন পুরুষ মানুষ ছিল কিনা, তাও দেখতে পায়নি। সেরেফ ঐ দুইজন মহিলাকেই দেখেছে, আর এটা দেখে সে বিস্ময়বোধ করেছে।

ঃ তারপর?

ঃ খবরটা অনেকদিন পরে পেলাম। খবর শুনে তখনই নদীর ঐ ভাটির দিকে খোঁজ নিতে লোক পাঠালাম। তারা এসে জানালো, শিরিবানুরা আর বেঁচে নেই। তারা দুর্বৃত্তের হাতে মারা পড়েছে।

ঃ কি রকম?

ঃ নদীর কিছুটা ভাটিতে এক গাঁয়ের কিছুলোক নাকি ভোরের দিকে নদীতে কিছু হৈ চৈ ও মহিলা কণ্ঠের আওয়াজ শুনেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তা থেমে যাওয়ায়, কেউ ঘর থেকে বেরোয়নি। এর দিন দুইয়েক পরে নদীর আরো অনেক ভাটিতে দুইটি মহিলার লাশ ভাসতে অনেক লোক দেখেছে।

ঃ আব্বাজান!

ঃ আবার সেখানে দৌড়ালাম। যারা লাশ ভাসতে দেখেছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তারা বললো—সে তো অনেক দিনের কথা। তবে মহিলা দুইজনের একজন যে তরুণী এবং অত্যন্ত সুন্দরী এক তরুণী, এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। কার লাশ, কোথা থেকে এলো, তা আমরা কেউ জানিনে।

আবদুল আজিজ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—সেকি !

আবদুল খালেক সাহেব ভারী কণ্ঠে বললেন—ওরাই শিরিবানুরা কিনা, এ নিয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আমার থাকলেও, এটা অবিশ্বাস করার কোন কারণ পাইনি বাপজান। খোঁজ করতে তো কোন কিছু আর বাঁকী রাখিনি আমি ? দপ্তরের কাজ অনেকটা ফেলে রেখেই দিনরাত আমি ঐ নিয়েই আছি। ঐ লাশ শিরিবানুদের না হলে, তারা যাবে কোথায় ? এত সন্ধান করেও আর ছিঁটে ফোঁটা কোন হদিসই পাওয়া যাবে না, একি করে হয় ? তারা তো আর গায়েবী কিছু নয় যে মিলিয়ে গেছে ?

ঃ আব্বাজান !

আবদুল আজিজ কান্নার বেগ রোধ করতে লাগলেন। আবদুল খালেক সাহেব সস্নেহে বললেন—আফসোস্ করে আর লাভ নেই বাপজান। যা গেছে, তা গেছে। এ নিয়ে আর হাহুতাশ না করে নতুনভাবে জিন্দেগী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এখন। শিরিবানু তো তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, তাকে তোমার ভাল লেগেছিল এবং তাকে বিয়ে করার আশা পোষণ করেছিলে। তা যখন হলো না, তখন তোমার চিন্তা-ভাবনার মোড়টা তো ঘুরিয়ে নিতেই হবে বাপজান। একথা বোঝাতেই আমি এসেছি। জিন্দেগীর এখনও অর্ধেকটাই তুমি পেরোওনি। সামনে তোমার প্রশস্ত জীবন পড়ে আছে। এখানেই তো থেমে গেলে চলবে না।

আবদুল আজিজকে নানাভাবে সান্ত্বনা আর প্রবোধ দিয়ে আবদুল খালেক সাহেব ঢাকাতে ফিরে গেলেন। খবর শুনেই উমিদ আলী আওয়ারা হয়ে উঠলো। সে নিজের উদ্যোগেই ছুটির ব্যবস্থা করে নিয়ে সেই দিকে ছুটলো নানাভাবে খোঁজখবর করার পর উমিদ আলীও হতাশ হয়ে ফিরে এসে বললো—ঘটনা বিলকুল ঠিক দোস্ত্। শিরিবানু বহিনেরা ঠিকই আর এ দুনিয়ায় নেই।

বজ্রাহত হয়ে আবদুল আজিজ কয়েকদিন একটানা বিছানায় পড়ে রইলেন। অসুস্থ আছেন জানিয়ে তিনি আর কয়েকদিন দপ্তরেই গেলেন না। কিন্তু কর্তব্য বড় কঠোর। কর্তব্যের ডাক ক্রমে এতটাই জোরদার হয়ে উঠলো যে, আবদুল আজিজকে আবার তামাম দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে কর্তব্যের ডাকে মজবুতভাবে সাড়া দিতে হলো। কর্তব্যের মাঝে ডুব দিয়ে তিনি তাঁর মর্মব্যথা খামোশ করে দিলেন।

সাময়িকভাবে কয়েকদিন চুপ হয়ে গেলেও, ইংরেজ বণিকেরা আবার সোচ্চার হয়ে উঠলো, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত হয়ে এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ পেয়ে এবার

কুঠিয়ালরা সেরেফ সোচ্চারই হলো না, অত্যন্ত শক্তভাবে সক্রিয় হয়ে গেল। তাদের প্রতি নির্দেশ হলো, যেখানে পাও, ব্যক্তিগত পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের (ইন্টারলোপার্স্দের) যেন তেন অজুহাতে পেটাও। পিটিয়ে ঐ ব্যাটাদের বাংলা থেকে উৎখাত করো। বাংলার বাইরে, জলে স্থলে সমুদ্র পথে সর্বত্র, কোম্পানীর মালিকেরা ঐ ব্যাটাদের তাড়া করতে শুরু করেছে। তোমরাও ডাণ্ডা মেরে বাংলা থেকে বের করে দাও ব্যাটাদের। ওরা এখানে থাকলে, আমাদের ব্যবসা শিকেয় উঠবে।

শুরু হলো দেশব্যাপী হৈ চৈ। প্রতিদিন বিভিন্নস্থানে ইন্টারলোপার্স্রা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে তাদের উপর ইংরেজ বণিকদের অত্যাচারের অভিযোগ একের পর এক তুলে ধরতে লাগলো। হুগলী এলাকা ব্যবসায়ের কেন্দ্রীয় এলাকা হওয়ায় প্রশাসক আবদুল আজিজের দপ্তরে এই অভিযোগের হিড়িক চেপে গেল। বাধ্য হয়েই আবদুল আজিজকে এ ব্যাপারে শক্তভাবে জড়িয়ে পড়তে হলো। তিনি শুধু তাঁর ফৌজদারদের নিয়োগ করেই এই ঝাপ্টা সামাল দিতে পারলেন না। নিজেকেও সক্রিয়ভাবে ময়দানে নামতে হলো। এর প্রতিকারে নেমে তিনি দেখলেন, ইংরেজ বণিকেরা একেবারেই দুর্বিনীত হয়ে গেছে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপকে মোটেই তারা আমল দিতে চাচ্ছে না। অনেক স্থানে তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধেও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। সেই সাথে আবদুল আজিজ তাজ্জব হয়ে আরো লক্ষ্য করলেন, কোম্পানীর কর্মচারীর ছদ্মবেশে বাংলার বাইরে থেকে প্রতিদিনই কিছু কিছু করে ইংরেজ সেপাইরা বাংলার মধ্যে ঢুকে পড়ছে এবং ইংরেজদের বিভিন্ন কুঠি ও ঘাঁটিতে তারা অবস্থান নিতে শুরু করেছে। এটা লক্ষ্য করে আবদুল আজিজ শংকিত হয়ে উঠলেন। ইংরেজদের আসল মতলব তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, আর অপেক্ষা করার অবকাশ নেই। শক্ত হাতে লাঠি চালিয়ে এই বেনিয়াদের এখনই এদেশ থেকে বের করে না দিলে, অচিরেই তারা মহামুসিবত পয়দা করে এদেশের ভবিষ্যত উলটপালট করে দেবে। এ নিয়ে নবাবের সাথে দরবার করার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তিনি ঢাকার দিকে ছুটলেন।

ওদিকে কোম্পানীর যুদ্ধ জাহাজ এগিয়ে আসতে লাগলো। রাজা জেম্স্ এর অনুমতি ও সৈন্য সাহায্য নিয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করলো। ভাইস্ এ্যাডমিরাল নিকোলসনের অধীনে দশ দশটি যুদ্ধ জাহাজ বাংলার দিকে রওনা হলো। প্রত্যেকটি যুদ্ধ জাহাজে দশ বারোটি বন্দুক সহ ছয় শত সৈন্যের একটি করে বাহিনী রইলো। এর সাথে ফোর্ট সেন্ট্ জর্জ থেকে আরো চারশত সৈন্য সরবরাহ করার জন্যে মাদ্রাজ কাউন্সিলকে নির্দেশ দেয়া হলো। পূর্বাহ্নেই কিছু সৈন্য বাংলা মুলুকে ঢুকিয়ে দেয়ার নির্দেশসহ মাদ্রাজ কাউন্সিলকে আরো জানানো হলো যে, নিকোলসন সর্বাগ্রে আরাকানে যাবে

এবং বাংলা আক্রমণের আগে সে আরাকানের রাজার সাথে মিত্রতা করবে ও তার সহায়তা নেবে। মাদ্রাজ কাউন্সিল যেন ইতিমধ্যেই আরাকানের সাথে যোগাযোগ করে এবং বাংলার হিন্দু জমিদার ও হিন্দু প্রধানদের হাত করার ব্যবস্থা করে। নির্দেশ পেয়েই মাদ্রাজ কাউন্সিল জব চার্নককে সে কাজে প্রবৃত্ত করলো, আরাকানে লোক পাঠালো এবং পর্তুগীজদের নিকট থেকে সৈন্য সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো।

যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোর সাথে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বাংলা মুলুকগামী ইস্টারলোপার্সদের সমুদ্র বক্ষ থেকে উৎখাত করার কাজে প্রবৃত্ত হলো এবং বাংলাদেশ থেকেও এদের উৎখাত করার নির্দেশ বাংলায় তাদের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে কোম্পানীর কর্মচারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠলো এবং গোপনে ইংরেজ সৈন্য দেশের মধ্যে ঢুকে পড়া শুরু করলে, প্রশাসক আবদুল আজিজ ক্ষিপ্র বেগে ঢাকায় এসে হাজির হলেন।

হুগলীর প্রশাসক আবদুল আজিজ সাক্ষাৎ করতে এসেছেন এবং এক্ষুণি তিনি সাক্ষাৎ চান শুনে, নবাব শায়েস্তা খান সাহেব তখনই তাঁকে সাক্ষাৎ দিলেন। আবদুল আজিজ সালাম করে দাঁড়াতেই নবাব বাহাদুর সবিস্ময়ে বললেন—কি ব্যাপার ! তুমি আবার ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছো কেন ?

আবদুল আজিজ সবিনয়ে বললেন—গোস্তাকী মাফ হয় হুজুর। হুজুর কি ভেতরের খবর কিছুই জানেন না ?

ঃ ভেতরের খবর মানে ?

ঃ ইংরেজ বণিকদের আচরণের খবর ?

ঃ তা জানবো না কেন ? তারা যে বেপরওয়া হয়ে উঠেছে, সে খবর আমার কাছে আছে। তাদের মন মানসিকতার খবর প্রতিনিয়তই রাখছি আমি।

আবদুল আজিজ মরিয়া হয়ে এসেছিলেন। তিনি অনুযোগের সুরে বললেন—এরপরও কি বরদাস্ত করার আর কোন অপেক্ষা আমাদের আছে হুজুর ?

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ হুজুর একবার বলেছিলেন, সোনারের ঠুকঠাকের বদলে হুজুর একদিন কামারের ঘা মারবেন। সে সময় কি এখনও আসেনি মেহেরবান !

নবাব শায়েস্তা খান নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন—না।

আবদুল আজিজ বিপুল বিস্ময়ে বললেন—হুজুর !

ঃ এক্ষণেই আঘাত হানলে ঐ সোনারের ঠুকঠাকই হবে, কামারের ঘা হবে না।

ঃ আলমপনা !

ঃ আমি এখন ফেউ তাড়িয়ে লোক হাসাতে চাইনে। আমি বাঘ তাড়াতে চাই।

ঃ মেহেরবান !

ঃ এই বেনিয়াদের উৎপাত অনেক আগে থেকেই আছে, আর ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে আমরা তা বরদাস্ত করে যাচ্ছি, আগে এদের তাড়াইনি। এখন তাড়ানোর সময় এসেছে। কিন্তু এখন এদের তাড়াতে যাওয়া বাঘ রেখে ফেউ তাড়ানোর সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঘটাকে আগে আসতে দাও।

আবদুল আজিজ থতমত করে বললেন—কসুর মাফ হয়। কথাটা খোলাসা হলো না হুজুর।

ঃ আবদুল আজিজ, আমি তোমাকে একদিনই বলেছিলাম, সবাই ঘুমিয়ে থাকলেও তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, নবাব তোমাদের ঘুমিয়ে নেই। একথা কি ভুলে গেছো ? আমি শুধু ভেতরের খবরই রাখিনে, বাইরের খবরও রাখি। ঝড় আসছে, ঝড়টা আসুক।

ঃ আলমপনা !

ঃ সেরেফ এই কুঠিয়ালদের তাড়ানো একদিনের ব্যাপার। তোমাদের নির্দেশ দিলেই তোমরা কুঠিতে আগুন দিয়ে সহজেই এদের তাড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু তাই বলে তো এরা একদম শক্তিহীন নয়। এদের শক্তি এখন প্রায় দরওয়াজার কাছে এসে গেছে। মাদ্রাজে তো আছেই, এছাড়াও বঙ্গোপসাগরে ওদের যুদ্ধ জাহাজ পৌছে গেছে।

সচকিত হয়ে আবদুল আজিজ বললেন—হুজুর !

ঃ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ড থেকে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে। আমার গোয়েন্দা বিভাগের খবর, হপ্তা দুইয়েকের মধ্যেই তারা বাংলা মুলুকে আঘাত হানবে।

ঃ সেকি হুজুর !

ঃ সেই জন্যে তো বলছি, মা রেখে ছা তাড়িয়ে আর ফায়দা নেই। সেরেফ কুঠিয়ালদের তাড়ালেই জঞ্জাল সাফ হবে না। ওদের শক্তির সাথে মোকাবেলা করতেই হবে আমাদের। সুতরাং অযথা ছা তাড়াতে গিয়ে আর হয়রান হয়ে কাজ নেই। মা-ছা—এই দুটোকেই এক সাথে তাড়িয়ে দিলে, সেইটেই হবে কায়েমী কাজ। মা'টা লাঠি খেয়ে পঙ্গু হয়ে পালালে, আস্কারা দিয়ে ডেকে কেউ না আনলে, ছা'টা আর এ মুলুকে কোনদিনই ঢোকার সাহস পাবে না।

ঃ কিন্তু হুজুর, ভেতরে এই জঞ্জাল রেখে দুশমনদের মোকাবেলা করাটা কি খানিকটা শক্ত হয়ে যাবে না ?

ঃ না-উম্মিদ হচ্ছো কেন ? গোটা মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তির কথা ছেড়েই দিলাম, এই বাংলার শক্তিটাই বা এতটা কি কমজোর যে, ঐ সুদূর ইংলণ্ড থেকে কয়েক জাহাজ সেপাই এসেই এই গোটা একটা দেশ জয় করে নেবে ?

ঃ হুজুর !

ঃ ইতিহাস তো জানোই। একদিন এই চারপাশের তামাম মুলুক এক হয়ে এসেও এই মুলুকটার কাছে বেদম মার খেয়ে পালিয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকতে পারেনি। সেদিনের সেই বাহাদুর সুলতানগণ না থাকলেও, দেশটাতো আছে ? আমরাই বা এতটা কি কমজোর যে, সাত সমন্দুর ওপার থেকে কিছু লোক দৌড়ে এসেই আমাদের কাবু করে ফেলবে ?

আবদুল আজিজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কখ্খনো নয়। বাংলার সেই অতীত শক্তি আল্লাহর রহমে আজ আবার ফিরে এসেছে হুজুর। হুজুরের এই মনোভাবটা ঠিক থাকলে, আর হুজুরের হুকুম ও কিছুটা মদদ পেলে, ওরা যতজনই আসুক, আমরাই ইনশাআল্লাহ ওদের এ মুলুক থেকে তাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিতে যথেষ্ট।

ঃ তাহলে আর এতটা না-উম্মিদ হচ্ছো কেন ?

ঃ না-উম্মিদ হওয়ার প্রশ্ন নয় মেহেরবান। তবে—

ঃ তবে তোমাদের মতো যারা এ মুলুকের হাত-পা, তারা যদি এ মুলুককে দীল দিয়ে ভালবাসতে না পারে, অতীতের গাদ্দারদের মতো স্বার্থের মোহে গাদ্দারী করে বসে, তাহলে অবশ্য ফলাফলটা উল্টা হওয়াও বিচিত্র নয়।

আবদুল আজিজ আহত কণ্ঠে বললেন—সেকি হুজুর ! হঠাৎ এমন কথা হুজুর কেন বলছেন ?

কিছুটা অন্যমনোস্ক হয়ে উঠে নবাব বাহাদুর বললেন—তুমি এ জন্যে তকলিফ নিও না। তোমাদের উদ্দেশ্যে একথা আমি বলছিনে।

ঃ হুজুর।

ঃ এদেশটা নিয়ে যতটা গর্ব আমার দীলে আছে, ততটা ভয়ও আছে আবদুল আজিজ। এদেশ যে গাদ্দার প্রসব করতেও বড় পটু।

ঃ মেহেরবান !

ঃ অতীত ইতিহাসটা বড় উৎসাহজনক নয় তো, তাই এ মুলুকে কোন ঝড় ঝাপ্টা দেখলেই অতীতের ঐসব কথা ইয়াদে আসে আমার।

ঃ আলমপনা !

নবাব বাহাদুর সম্বিতে ফিরে এসে নড়ে চড়ে বললেন—এই দেখো, আমার একটা নিছক আবেগের কথা শুনে তুমি বোধ হয় তকলিফ বোধ করলে ! তোমার উপর কি অস্থির কোন অভাব আছে আমার ?

নবাব বাহাদুরের কণ্ঠে অনুশোচনা ফুটে উঠলো। আবদুল আজিজ শরমিন্দা হয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—জিনা হুজুর, জিনা। হুজুরের আফসোসের কথা বুঝতে পেরেছি আমি। এটা তো কোন অমূলক কথা নয়, বিলকুল হক কথা।

নবাব বাহাদুর খোশ দীলে বললেন—সাব্বাস ! তা কি যেন বলছিলে তুমি ? না-উম্মিদ তুমি নও, তবু যেন কি একটা সন্দেহ—

আবদুল আজিজ মাথা নীচু করলেন এবং স্মিতহাস্যে বললেন—সন্দেহ নয় হুজুর। হুজুর যে সত্যি সত্যিই ওদের বিরুদ্ধে এখনই রুখে দাঁড়াবেন, এনিয়ে কিছুটা দ্বিধা থেকে যায় তো, তাই—

ঃ কেন, দ্বিধা কেন ?

ঃ হুজুরের ধৈর্য অপরিসীম। আমাদের স্বল্প ধৈর্য নিয়ে হুজুরের ধৈর্যের সাথে আমরা তাল রাখতে পারিনে বলেই ভয় হয়, হুজুর বোধহয় আরো অপেক্ষা করবেন।

নবাব বাহাদুর হেসে বললেন—পাগল ! আর অপেক্ষা করা নয়। তুমি না এলেও দু'একদিনের মধ্যেই আমার নির্দেশ তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতো। অনেকের কাছে আমার নির্দেশ পৌঁছেও গেছে ইতিমধ্যে। ঐ ফেউ অর্থাৎ কুঠিয়ালদের পেছনে না দৌড়ায়ে, তোমরা তৈয়ার হয়ে যাও। বাহিনী গুছিয়ে নিয়ে তলোয়ারের বাঁটে হাত রেখে মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। বড় শক্ত লড়াই একদম নজদিক। অল্পতেই চঞ্চল হয়ে না উঠে ইংরেজ ফৌজদের ঢুকতে দাও খাঁচার মধ্যে। মওকার মধ্যে এসে গেলেই ঘিরে ধরবে চারদিক থেকে।

ঃ মেহেরবান !

ঃ তোমার ওখানেই লড়াইয়ের চাপ পড়বে জিয়াদা। হুগলীটাই ওদের লক্ষ্য হবে আগে। আমি সজাগ আছি তোমার পেছনে।

ঃ হুজুরের অশেষ মেহেরবানী।

ঃ এখন ঐ কুঠিয়ালদের তাড়াতে গেলেই, তোমরা ছিন্নভিন্ন ও এলোমেলো হয়ে যাবে। ও ভাবনা বাদ দিয়ে আসল লড়াইয়ের জন্যে অবস্থান নিয়ে ফেলো গিয়ে।

ঃ জি আচ্ছা মেহেরবান !

ঃ আমি তো পরিষ্কার হয়েছি তোমার কাছে ?

ঃ জি-জি, বিলকুল।

ঃ কখন হুগলীতে ওয়াপস্ যাবে ভাবছো ?

ঃ হুজুরের এযাজত পেলে আজকেই আর এখনই রওনা হতে চাই।

ঃ না, শরীরের উপর এত জুলুম করো না। আজকেই তুমি এসেছো। আগামী কাল সবেরে রওনা হও।

ঃ হুজুর !

ঃ চেহারাখানা করে ফেলোছো কি ? আগের চেয়ে আরো বেশী কাহিল হয়ে গেছো। কারণটা কি ঘটলো ? আহার-বিরাম, নিদ-ঘুম, মোটেই কি ঠিক মতো হচ্ছে না ?

ঃ জি-মানে—

ঃ তোমাদের নিয়ে বড়ই বিপদ। নিজের ভাল কিছুই তোমরা বুঝতে চাও না।

ঃ হুজুর।

ঃ লড়াইটা শেষ হোক। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে আমরা কামিয়াব হলে, তোমার পেছনে নিজেই আমি লাগবো।

ঃ জি ?

ঃ হয় তুমি বিয়ে শাদি করবে, নয় তোমাকে আমি তোমার আব্বা-আম্মার কাছেই ফিরিয়ে আনবো। এভাবে অযত্নে আর অতদবিরে তোমাকে মারা পড়তে দেয়া যায় না।

ঃ জিনা, অতদবির কিছু—

ঃ থাক, ওসব সাফাই আমি শুনতে চাইনে। আসলে এলেমদার হওয়াটাই এখন দেখছি একটা বিমার। এলেমদার হলেই কেউ আর শাদির কথা শুনতে পারে না।

ঃ মেহেরবান !

ঃ আমার ঘরেও সুন্দরী এক মেয়ে আছে বুঝলে ? আমার নিজের মেয়ে নয়, পালিত কন্যাই বলতে পারো। জব্বোর এলেমদার। কিন্তু তারও ঐ একই বিমার। শাদির কথা বললেই সে বেজার।

আবদুল আজিজ উদাস কণ্ঠে বললেন—জি ?

ঃ না মানে, এলেমদার হওয়ার কি কুফল তাই বলছি। কিতাবের বাইরে তোমাদের আর জীবন নেই। তা থাক ওসব। তুমি এখন এসো—

ঃ জি আচ্ছা হুজুর।

ঃ আর ঐ কথা, বেলা আর বেশী নেই। কাল সবেরে রওনা হবে।

ঃ জি হুজুর, তাই হবো।

১৪

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ও ঝড়ের আবর্তে পড়ার দরুন, ইংরেজদের মাত্র তিনটি যুদ্ধ জাহাজ বঙ্গোপসাগরের সীমানায় এসে পৌছলো। মাদ্রাজে এসেই নিকোলসন মত বদলিয়ে ফেললো। বাংলা মুলুকের সামর্থ সম্বন্ধে নানাবিধ কারণে তার আগে থেকেই তাচ্ছিল্যভাব ছিল। ফলে, চট্টগ্রামের দিকে না গিয়ে সে সরাসরি বাংলা মুলুক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। সেই মোতাবেক প্রয়োজনীয় রসদ নিজ জাহাজে তুলে নিয়ে আর পূর্ব নির্ধারিত

পরিমাণের অনেক বেশী ফৌজ সেন্ট জর্জ দুর্গ থেকে অপর দুই জাহাজে তুলে দিয়ে সে বাংলার দিকে রওনা হলো। লক্ষ্য তার হুগলী।

ঢাকা থেকে ফিরে এসে হুগলীর প্রশাসক আবদুল আজিজ বেগ তাঁর সেপাই সেনাদের গুছিয়ে নিলেন এবং প্রয়োজনীয় নসিহত দান করে তাদের আসন্ন লড়াইয়ের জন্যে তৈয়ার হতে বললেন। নিজ নিজ সেপাই নিয়ে তাঁর ফৌজদারেরা সেই মোতাবেক তৈয়ার হয়ে গেলেন। কয়েকটা দিন যেতেই ফৌজদার মির্জা মালিক ছুটে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—জনাব এইমাত্র খবর, ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজ হুগলী নদীর মুখে এসে পৌছেছে। হুকুম দিন, আমরাও ভাটিতে ছুটে গিয়ে ওখানেই ওদের গতি রোধ করে দেই।

আবদুল আজিজ বিব্রত কণ্ঠে বললেন—আহ্হা ! আমি আপনাদের কি বললাম আর কি আপনারা বুঝলেন ? আমাদের বাগের মধ্যে ওদের পুরোপুরি আসতে দিন।

মির্জা মালিক থতমত করে বললেন—তাতো বুঝেছি জনাব। কিন্তু আমি বলছিলাম, ওখানে বাধা দিলে কাজটা সহজ হতো।

আবদুল আজিজ বললেন—সহজ হয়ে ফায়দা কি হবে ? আপদটা তো থেকেই যাবে।

ঃ জনাব !

ঃ বাধাটা শক্ত হলে, তারা পিছিয়ে যাবে এবং দু'দিন পরে আবার আসবে। মুক্ত সাগরে গিয়ে তো ওদের বেশী এঁটে উঠতে পারবেন না। ওদের মারতে হবে এই খাঁচার মধ্যে তুলে।

ঃ জি, তা অবশ্য ঠিক।

ঃ ওখানে কতদিন পাহারা দিয়ে থাকবো আমরা ? এমনও হতে পারে, ওরা তখন ঘুরে গিয়ে অন্যপথে বাংলায় ঢোকার কোশেশ করবে। তার চেয়ে বরং চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকুন। ওরা আমাদের কব্জার মধ্যে আসুক। শুধুই তাড়ালে তো হবে না, ওদের একদম হাড্ডি ভেংগে তাড়িয়ে দিতে না পারলে, এ আপদ পুরোপুরি দূর হবে না।

ফৌজদার মির্জা মালিক সমঝে গিয়ে বললেন—জি-জি, ঠিক জনাব। এইটেই ঠিক।

ঃ যান। আপনারা মজবুতভাবে তৈয়ার হয়ে নিনগে। ওদের যুদ্ধ জাহাজ এসে হুগলীতে ভিড়লেও আপনারা তাল ঠুকে নীরব হয়ে থাকবেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ আপনারা এলোমেলোভাবে হামলা করে বসবেন না। হামলা করার সময় এলেই সে নির্দেশ সবাই আপনারা পাবেন।

মির্জা মালিক বিদায় নিলেন। আবদুল আজিজ বেরিয়ে এসে অন্যান্য ফৌজদারদের পূর্ব নির্দেশ পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের অবস্থান নিতে বললেন। নিজে তিনি সার্বিক নেতৃত্বে রইলেন। ফৌজ চালনার দায়িত্ব দিলেন ফৌজদার আবদুল গনির উপর। নিজের হাতে কিছু সেপাই রেখে বাদবাঁকী তামাম সেপাই ও ফৌজদারদের তিনি আবদুল গনি সাহেবের অধীনে ন্যস্ত করলেন।

নিকোলসন এগিয়ে আসতে লাগলো। আবদুল আজিজের চরেরা দুশমনদের গতিবিধির উপর সতর্ক নজর রেখে হরদম সে খবর আবদুল আজিজকে পৌছে দিতে লাগলো। নিকোলসনের জাহাজটিই আগে এসে হুগলীতে পৌছলো। অন্য দু'টি জাহাজ তার অনেকখানি পেছনে রইলো। কুঠিয়ালদের ঘাটে নোঙর করে নিকোলসন সেই দুইটি জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। আবদুল গনি সাহেব ফৌজ ও ফৌজদারদের নিয়ে অসীম ধৈর্য সহকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে এদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। উভয় পক্ষই নীরব। কে আগে হাত তোলে, এই অপেক্ষা।

কারো সরাসরি হাত তোলা নিয়ে কাউকে অধিক সময় অপেক্ষা করতে হলো না। লড়াইটা শুরু হলো অন্যভাবে। হুগলীর কুঠিতে অবস্থানরত সেই ছদ্মবেশে আগে আসা সেপাইদের কয়েকজন সওদা করতে বাজারে গেল এবং তাদের যুদ্ধ জাহাজ এসে পৌছার গরমে তারা দোকানদারদের দাম না দিয়ে বা কাউকে নামমাত্র দাম দিয়েই মালপত্র তুলে নিতে লাগলো। কয়েকজন দোকানদার এতে প্রতিবাদ করলে, ঐ ইংরেজ সেপাইরা গর্জে উঠে তাদের প্রহার করা শুরু করলো। এতে করে বাজারের তামাম দোকানদার ক্ষেপে গেল। তারা বাঁশ লাঠি হাতে নিয়ে ঐ ইংরেজ সেপাইদের ঘিরে ধরলো। সেপাইরা আটকা পড়ে গেল।

এই খবর কুঠিতে এসে পৌছা মাত্র একজন ইংরেজ ক্যাপটেন একদল সশস্ত্র সেপাই নিয়ে এসে বাজারের উপর চড়াও হলো এবং নির্বিচারে সবাইকে প্রহার করা সহ বাজারে আগুন ধরিয়ে দিলো। এতে করে আবদুল আজিজের সেপাইসেনার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ফৌজদার আবদুল গনি প্রশাসক আবদুল আজিজের নির্দেশ চাইলে আবদুল আজিজ বললেন—আক্রমণ করো—

সঙ্গে সঙ্গে একজন ফৌজদারকে সসৈন্যে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে ফৌজদার আবদুল গনি সাহেব "নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবার" আওয়াজ তুলে ইংরেজ কুঠির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিকোলসনও সংগে সংগে পাল্টা হামলা করলো। শুরু হলো লড়াই।

অল্পক্ষণেই সে লড়াই প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। নিকোলসন প্রথমে হুগলীর ফৌজকে থোড়াই জ্ঞান করলো। কিন্তু পরক্ষণেই বেকায়দায় পড়ে সে প্রাণপণে লড়তে লাগলো। কিন্তু ফৌজদার আবদুল গনি সাহেবের বিপুল উৎসাহে ও উদ্যমে পরিচালিত সেপাইদের দুর্বার হামলার মুখে ইংরেজেরা অল্পক্ষণেই তটস্থ হয়ে উঠলো এবং অবশেষে হীনবল হয়ে পিছু হটতে লাগলো। ফৌজদার আবদুল গনি সাহেবের সাথে মুখোমুখী লড়তে গিয়ে এ্যাড্‌মিরাল নিকোলসন দিশেহারা হয়ে গেল। আবদুল গনি সাহেবের দুরন্ত হামলায় নিকোলসনের প্রাণ বিপন্ন হয়ে উঠলে পিছু হটতে হটতে এক সময় নিকোলসন রণভংগ দিয়ে দৌড়ের উপর এসে জাহাজে উঠে পড়লো। পর্যুদস্ত হয়ে ইংরেজ সেপাইরাও পরে পরেই ছুটোছুটি করে এসে জাহাজে উঠতে লাগলো। হুগলীর সেপাইদের মুখে মুহুর্মুহু তকবির ধ্বনি উঠতে লাগলো। তারা ইংরেজদের তাড়িয়ে নিয়ে জাহাজের কাছে এলো এবং জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিল। এতে করে জাহাজের কিয়দংশ পুড়ে গেল। ওদিকে অন্যান্য ফৌজদারেরা ইংরেজদের কুঠিতে অগ্নি সংযোগ করলো এবং কুঠিয়ালদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। আতংকিত কুঠিয়ালরা এদিক ওদিক পালাতে শুরু করলো, কেউ কেউ আবার পড়িমরি জাহাজে এসে উঠলো। ঘাট থেকে জাহাজটি দ্রুত বেগে মাঝ নদীতে এনে ইংরেজ সেপাইরা মহাতংকের সাথে জাহাজের আগুন নেভাতে লাগলো। শেষ হলো প্রথম দফার লড়াই এবং এ দফায় আবদুল আজিজের ফৌজ অল্পায়াসেই ইংরেজদের পিছু হটিয়ে দিলো।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার শুরু হলো যুদ্ধ এবং এ দফায় যুদ্ধের মোড় পুরোপুরি ঘুরে গেল। ইংরেজদের অপর দুইটি যুদ্ধ জাহাজ ইতিমধ্যেই এসে নিকোলসনের সাথে মিলিত হলো এবং নিকোলসন আবার ফিরে এসে এই তিন জাহাজের সৈন্য নিয়ে ফৌজদার আবদুল গনির বাহিনীর উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই তিন জাহাজে ইংলণ্ডের সৈন্যের সাথে ছিল ফোর্ট সেন্ট জর্জ দুর্গের বিশাল এক বাহিনী যা একাই ছিল তামাম হুগলীর ফৌজের দেড়গুণ। সব মিলে ইংরেজ বাহিনী এবার এমন বিরাট আকার ধারণ করলো যে, হুগলীর ফৌজ তার কাছে পাহাড়ের সামনে টিলার মতো হয়ে গেল। আবদুল আজিজের ফৌজ একটা প্রশাসকের প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ফৌজ। ফৌজদারের উপরে তাঁর কোন সালারও ছিল না। তাঁর ফৌজ দেশ রক্ষার সামরিক বাহিনী নয়। সে বাহিনী নবাবের কাছে। এই সীমিত শক্তি নিয়ে ফৌজদার আবদুল গনি সেরেফ মনোবলের জোরেই পয়লা দফায় সাফল্যের সাথে নিকোলসনের মোকাবেলা করলেন। কিন্তু এবার তিনি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে গেলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াই শুরু হওয়ার পর

থেকেই হুগলীর ফৌজ কোণঠাসা হতে লাগলো এবং ইংরেজেরা ক্রমেই হুগলীর ফৌজকে বেকায়দায় ফেলতে লাগলো।

ইংরেজ বাহিনীর হামলা প্রতিহত করার জন্যে হুগলীর ফৌজ তবুও প্রাণপণে লড়তে লাগলো। কিন্তু দীর্ঘ সময় যাবত শতভাবে চেষ্টা করেও তারা এক কদম সামনে এগুতে পারলো না, বরং তারা কিছুটা পিছু হটতেই লাগলো। ফৌজদার আবদুল গনি বুঝলেন, এই প্রতিকূল লড়াই অধিক সময় চললে কিছুতেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবেন না। তাদের পরাজয় ও হুগলীর পতন অবশ্যম্ভাবী।

দিশেহারা হয়ে তিনি প্রশাসক আবদুল আজিজ বেগের কাছে ছুটে এলেন। আবদুল আজিজ বেগ তখন তাঁর নিজস্ব সেপাই নিয়ে হুগলীর ফৌজের ডান পার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে লড়ছিলেন। ফৌজদার আবদুল গনি সাহেব রুদ্ধশ্বাসে বললেন—পরিস্থিতি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয় জনাব। এভাবে আমরা অধিক সময় টিকে থাকতে পারবো না। শিগ্গির শিগ্গির নবাবের কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠান।

প্রশাসক আবদুল আজিজও জানতেন, এ যুদ্ধে তাদের পরাজয় আসন্ন এবং সেইটেই স্বাভাবিক। হুগলী তাদের প্রধান একটা লক্ষ্যের বিষয় হলেও ইংরেজেরা যে তাদের সর্বশক্তি এই হুগলীর উপরই প্রয়োগ করবে আর একটা দুশমন মুলুকের তামাম হামলার বিরুদ্ধে একাই তাঁকে লড়তে হবে। এটা তিনি কল্পনাও করেননি। এই লড়াইয়ে লড়াই করার কথা বাংলার বাহিনীর এবং গোটা বাংলার বাহিনীর কাছে এর দশগুণে অধিক দুশমনও কোন পরোয়ার বিষয় নয়। হুগলীর প্রশাসক লড়বেন সেই বাহিনীর একাংশ হয়ে। কিন্তু এক্ষণে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টা হয়ে গেছে। বিশাল এই ঝঞ্ঝায় একাই তিনি নিপতিত। ফৌজদার আবদুল গনির কথার প্রেক্ষিতে তিনি আফসোস্ করে বললেন—আমাদের নসীবে মার খাওয়া থাকলে, মার আমাদের খেতেই হবে ফৌজদার সাহেব ! এটা রোধ করা যাবে না। এখন আর ঢাকা থেকে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠানোর ফুরসুৎ নেই। সেখান থেকে সাহায্য পৌছার আগেই আমাদের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে।

আবদুল গনি হতাশ কণ্ঠে বললেন—জনাব !

আবদুল আজিজ বললেন—আমি বিশ্বাস করি বাংলার নবাব ঘুমিয়ে নেই। এদিকে নজর রাখার ওয়াদা করার পর, তিনি যদি ঘুমিয়ে থাকেন, সেটা আমাদের বদ নসীব ! সুতরাং নবাব কি করবেন, সেটা নবাব সাহেব করুন। আমাদের কাজ প্রাণপণে লড়ে যাওয়া আর আমাদের জীবদ্দশায় হুগলী শহরের

পতন ঘটতে না দেয়া। হুগলীর পতন ঘটলে সেটা আমাদের লাশ মারিয়েই ঘটবে।

নবোদ্যম সঞ্চয় করে ফৌজদার আবদুল গনি সাহেব দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—তাই হবে জনাব। অন্ততঃ আমার জান থাকতে হুগলী ঐ বেনিয়াদের হাতে যাবে না।

ঃ আল্লাহ আপনার সহায় হোন। যান, আমরা আর কিছু না পারি, শহীদ হওয়ার সওয়াব থেকে নিজেকে আমরা বঞ্চিত কখনও করবো না।

ঃ আমিন। হয়তো এই শেষ কথা বলা ! আল্লাহ হাফেজ—

ঃ আল্লাহ হাফেজ !

দৌড়ের উপর এসে ফৌজদার আবদুল গনি দৌড়ের উপর ফিরে গেলেন। সংগে সংগে পুনরায় আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো রণস্থল। আবদুল গনির প্রেরণায় হুগলীর ফৌজ পুনরায় নবোদ্যমে লড়তে লাগলো। ইংরেজ ফৌজের বিরুদ্ধে। ক্ষণিকের জন্যে লড়াই আবার প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। কিন্তু তবুও ফায়দা তেমন হলো না। আবদুল গনির সেপাইদের জান কোরবান করাটাই মুখ্য হয়ে উঠলো। একের পর এক পড়তে লাগলো আবদুল গনির তথা হুগলীর সেপাইরা আর ইংরেজরা জোর গতিতে সামনে এগুতে লাগলো। আবদুল আজিজ, আবদুল গনি, মির্জা মালিক, আবদুল কাদের—প্রমুখ হুগলীর তামাম কর্তাব্যক্তিরা মরিয়া হয়ে উঠলেন। সেপাইদের ব্যাপকহারে হতাহত হতে দেখে তাঁরা বুঝলেন, আর বিলম্ব নেই। পরাজয় এসে একদম তাদের বুকের উপর বসে গেছে। তাই শহীদ হওয়ার ইরাদা নিয়ে এবার তাঁরা সবাই দুশমনের কাতারের মধ্যে বেপরোয়া হয়ে ঢুকে পড়লেন এবং মউতের কথা ভুলে গিয়ে জান ছেড়ে লড়তে লাগলেন।

অকস্মাৎ "নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবার" ধ্বনি ইংরেজ বাহিনীর পেছন দিকে এমন বুলন্দভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠলে যে, লড়াইয়ের গোটা ময়দান কেঁপে গেল। সকলেই তৎক্ষণাৎ সবিস্ময়ে দেখলো, নবাবের বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী এসে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা কচুবন কাটার মতো ইংরেজদের পেছন দিকের কাতার কেটে সাফ করে এগিয়ে আসছে। সংগে সংগে আবার "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উঠলো হুগলীর ফৌজের মাঝেও। তাদের সাহস ও হিম্মত এবার আসমান ছুঁয়ে গেল।

ফলাফর পরিষ্কার। দুইদিকের বিপুল চাপে পড়ে, বিশেষ করে বিশাল অশ্বারোহী বাহিনীর মারাত্মক আঘাতে বিধ্বস্ত ইংরেজরা পুনরায় বিপুলভাবে আতংকগ্রস্ত হয়ে জাহাজের দিকে ছুটলো। কুঠির কুঠিয়ালরা শেষ পরিণাম বুঝতে পেরে ক্ষিপ্রহস্তে তাদের আসবাবপত্র গুটিয়ে নিয়ে জাহাজে এসে

উঠলো। অতপর বহু সৈন্য ডালি দিয়ে আতংকিত ইংরেজেরা তাদের যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে হুগলী নদীর ভাটির দিকে বিপুল বেগে পালিয়ে যেতে লাগলো।

শুরু হলো পিছু ধাওয়ার পালা। নবাবের বাহিনীর সাথে সামিল হলে আবদুল আজিজ ও তাঁর ফৌজদারেরা সসৈন্যে ইংরেজদের তাড়া করে তাদের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলেন। হুগলীর অবশিষ্ট সেপাই সৈন্য ও পাইক-পেয়াদা ইংরেজ কুঠিয়ালদের জনশূন্য কুঠির শেষ অংশটুকুও ভস্মিভূত করে হুগলীতে ইংরেজ কুঠির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিল।

এই লড়াইয়ে হুগলীরও অনেক ক্ষতি হলো। কিছু সৈন্য ক্ষয় ছাড়াও, হুগলীর ফৌজ কোণঠাশা হয়ে পিছু হঠার কালে ইংরেজরা হুগলীর বাজার ও অনেকগুলি ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

হুগলীর লড়াই শেষ হলেও, ইংরেজদের সাথে লড়াই এখানেই শেষ হলো না। পলায়মান ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজ হুগলী ছেড়ে সূতানটীতে আসতেই মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ দুর্গ থেকে আর একদল সৈন্য আসায় তারা আবার সূতানটীতে অবতরণ করলো এবং ক্ষণিকের জন্যে সূতানটী দখল করে অনেকগুলো লোক বসতি জ্বালিয়ে দিলো। হুগলীর ফৌজ ও নবাবের ফৌজ তড়িৎ গতিতে সেখানে এসে পুনরায় ইংরেজদের সাথে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলো। ইংরেজরা পুনরায় পরাস্ত হয়ে পালিয়ে নদীর আরো ভাটিতে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে এলো এবং তারা মেদিনীপুর এলাকার পূর্ব উপকূলে হিজলী দ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করলো।

এখানে এসে আটকে গেল নবাবের ও হুগলীর ফৌজ। হিজলী একটি দ্বীপ। চারদিকে নদীর পানি। অতিক্রম করার উপযুক্ত নৌযান না থাকায় তারা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারা হিজলীতে পৌছতে পারলো না। এই ফাঁকে ইংরেজরা দুর্গ গড়ে, পরিখা কেটে, হিজলীতে শক্তভাবে অবস্থান নিয়ে বসলো।

নবাব শায়েস্তা খান ইতিমধ্যেই বাংলার তামাম এলাকা থেকে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি উচ্ছেদ করার এবং ইংরেজদের এ মুলুক থেকে বিতাড়ন করার কঠোর আদেশ চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবার হিজলী থেকে ইংরেজদের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে নবাব তাঁর অন্যতম প্রধান সালার আবদুস সামাদ সাহেবকে বার হাজার সৈন্য সহ হিজলীতে প্রেরণ করলেন।

সেনাপতি আবদুস সামাদ এসে অপেক্ষমান হুগলীর ও নবাবের পূর্বপ্রেরীত ফৌজের সাথে সামিল হলেন এবং নদী পেরিয়ে হিজলীতে পৌছার পথ করতে লাগলেন। অবিলম্বে তিনি ছোট ছোট অসংখ্য নৌযান যোগাড় করলেন এবং সকলে একসাথে নৌযানগুলিতে উঠে পড়লেন। নৌযানে ও ফৌজে নদীর পানি

আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অতপর স্থলে জলে ইংরেজদের দুর্বার প্রতিরোধ ভেদ করে আবদসু সামাদ সসৈন্যে এসে হিজলীতে অবতরণ করলেন।

সালার আবদুস সামাদের ঐ সম্মিলিত বিশাল বাহিনী ক্ষুদ্র হিজলী দ্বীপে অবতরণ করার সাথে সাথে ইংরেজদের অবস্থান তছনছ হয়ে গেল। অনেক ইংরেজ সৈন্যের ঐ সদ্য তৈরী দুর্গ ও পরিখার মধ্যেই সমাধি রচনা হলো এবং বাদবাঁকীরা লড়াই করে আবদুস সামাদের ফৌজের হাতে জরাজীর্ণ হয়ে গেল। এ্যাডমিরাল নিকোলসনের ঐ তেজোদীপ্ত বাহিনী তৃণের মতো মথিত হয়ে যাওয়ায়, নিকোলসনের প্রাণে এমনই এক আতংক পয়দা হলো যে, বাংলার স্মৃতি তার অবশিষ্ট জিন্দেগীতে এক অবিস্মরণীয় বিভীষিকা হয়ে রয়ে গেল। অল্পক্ষণ লড়াই করেই দিশেহারা নিকোলসন তার বিধ্বস্ত বাহিনী নিয়ে পড়িমরি জাহাজে এসে উঠলো এবং আবদুস সামাদ তার পিছু ধাওয়া করলে ভীত সন্ত্রস্ত নিকোলসন কিছু সৈন্য তীরে রেখেই জাহাজ ভাসিয়ে দিলো। তীরবর্তী ইংরেজ সৈন্যের পেছনে "ধরধর" রবে বাংলার ফৌজকে ছুটে আসতে দেখেই নিরুপায় হয়ে ঐ ইংরেজ সেপাইরা নদীতে ঝাঁপ দিলো এবং প্রাণপণে সাঁতার কেটে অদূরবর্তী জাহাজে এসে উঠতে লাগলো। এই প্রক্রিয়ায় কেউ কেউ বা জাহাজে উঠার আগেই পানিতে তলিয়ে গেল।

আবদুস সামাদের ধাওয়া করা অব্যাহত রইলো। বিপর্যস্ত যুদ্ধ জাহাজ প্রাণপণে চালিয়ে নিকোলসন নদী ছেড়ে সমুদ্রে এসে পড়লো এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বাংলার নৌবাহিনীর উপস্থিতি দেখে তার আতংক আরো অধিক বৃদ্ধি পেলো। অতপর একটানা ছুটে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে নিকোলসনের যুদ্ধ জাহাজগুলি মহাসাগরের সীমানায় মাদ্রাজের দিকে চলে গেল।

নবাব শায়েস্তা খানের মহারোষে পড়ে বাংলা মুলুকের আনাচে কানাচে আর যা কিছু ইংরেজ কুঠিয়াল আর বণিকেরা ছিল, আতংকগ্রস্ত হয়ে তারাও বিভিন্ন পথে পালিয়ে গেল এবং তাদের কুঠিঘাটি সমস্তই ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। বাংলা মুলুকের বুকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ইংরেজ বণিক, ইংরেজ কুঠি ও কুঠিয়ালদের এক্ষণে আর কোনই নাম নিশানা রইলো না।

ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজ বিতাড়িত করে নবাবের ও হুগলীর তামাম ফৌজ বিজয় গৌরবে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে ফিরে যেতে লাগলো। সকলের দীলেই অফুরন্ত উল্লাস ও সীমাহীন আনন্দ। সকলের দীলেই ইংরেজদের দুর্যোগ থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে পারার এক অপরিসীম তৃপ্তি।

হুগলীর ফৌজও বিজয়দীপ্ত পদক্ষেপে হুগলীতে ফিরে এলো। পরস্পরের কাছে পরস্পরের শুভেচ্ছা বিনিময় ও বিদায় গ্রহণ করে পরমানন্দে সকলে নিজ নিজ গৃহের পথ ধরলেন। ফৌজদার-সেপাই সবাইকে হাসিমুখে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে প্রশাসক আবদুল আজিজ বেগও তাঁর মকানের দিকে অগ্রসর হলেন। সকলের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগে সংগে আবদুল আজিজের মুখের হাসি তামামই মিলিয়ে গেল। মুষড়ে গেল দীল তাঁর। সকলেই গৃহে ফিরে উষ্ণ অভ্যর্থনা, সাদর সম্ভাষণ ও রণ বিধ্বস্ত দেহের তৃপ্তি ভেজা পরিচর্যা পাবেন। কিন্তু আবদুল আজিজ পাবেন কি ? তিনি পাবেন নিঃসীম এক শূন্যতা ও ক্লান্তিজনিত যন্ত্রণার একান্তই এক অসহায় অনুভূতি !

দীর্ঘ সময় ধরে রণলিপ্ত থাকার দরুন আর পাঁচজনের মতো আবদুল আজিজও অতিশয় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দেহে তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো ক্ষত। চেহারা উস্কোখুস্কো। লেবাস উচ্ছৃঙ্খল এবং তা ছিটে ফোঁটা রক্তের দাগে রঞ্জিত। রণ বিধ্বস্ত শরীর আর নৈরাশ্যের পীড়নে নির্জীব অন্তর টেনে নিয়ে আবদুল আজিজ ধীরে ধীরে খাস মকানের দরজায় এসে পৌছলেন। এর পর টলতে টলতে ফটক পেরিয়ে অন্দর মহলে পা দিতেই ঝুপ্ করে তার গলায় এসে পড়লো ভারী একটা তরতাজা ফুলের মালা। চমকে উঠে চোখ তুলেই তিনি দেখলেন, নেকাব ঢাকা এক মহিলা তাঁর একান্তই পাশ ঘেঁষে দণ্ডায়মানা। আর একটু খেয়াল করতেই দেখলেন, সে মহিলার পরণে তাঁর দেয়া সেই মূল্যবান ঈদ উপহার ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভূত দেখারও অধিক পরিমাণ চমকে গিয়ে বললেন—কে ?

—আমি শিরিবানু ছোট সাহেব। খোশ আমদেদ !

এমনই এক সীমাহীন বিস্ময়ে আবদুল আজিজ নিমজ্জিত হয়ে গেলেন যে, আর তিনি না পারলেন কথা বলতে, না পারলেন পা তুলতে। ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো কেবলই তিনি টলতে লাগলেন। আবদুল আজিজের আব্বা আবদুল খালেক সাহেব অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পতোন্মুখ দেখে তিনি দৌড়ে এসে আবদুল আজিজকে ধরলেন।

আবদুল আজিজের এ বিস্ময় একান্তই স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি মৃত, যার মৃত্যুর খবর অনেক আগেই নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তির এই আকস্মিক উপস্থিতি, এক অপরিসীম বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি ? অসহায়া এক প্রৌঢ়ার হাত ধরে তুলনাহীন রূপ লাবণ্যে বিকশিত এক যুবতীর রজনীর অন্ধকারে অজানা পথে যাত্রা করার স্বাভাবিক যে পরিণাম, তার এই নিদারুণ বৈপরীত্য

নিঃসন্দেহে অপর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। মৃত্যুর কবলে না পড়লেও, দুর্যোগপিষ্ট লতার মতো তার আজ নেতিয়ে পড়ে থাকার কথা। বসন্তের গুলবাগিচার মতো এমন শোভা ও সৌরভ তার মধ্যে থাকার কথা নয়। অথচ শিরিবানুর কণ্ঠে সেই পূর্বেরই চমক, আচরণে সেই পূর্বেরই চপলতা ! আগেরই সেই অনুপম প্রগল্‌ভতা নিয়ে পুষ্প মাল্যের মাধ্যমে সে বিজয়ী বাহাদুরকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছে !

এটি কেমন করে সম্ভব ? স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনায় এ প্রশ্নের জবাব নেই। তবে গভীর চিন্তায় গেলে, এ সত্য কেউ উড়িয়ে দিতে পারে না যে, অনেক অসম্ভবও এ দুনিয়ায় সম্ভব। গায়েবী ঐ একজনের খেলা এমন বিচিত্র যা রক্তমাংসের মানুষের কল্পনার অতীত। মোখ্‌তাছার কথা, রাখে আল্লাহ, মারে কে ?

আবদুল আজিজের আম্মা কামরুন নাহার বেগমের ঐ ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে মদিনা বিবি ও শিরিবানু সুবহে সাদিকের আগেই ঘর থেকে বেরুলেন। রাত্রির অন্ধকার তখনও জমাট বাঁধা। কিন্তু বিলম্ব হলে আটকা পড়ে যাবেন ভয়ে মা-মেয়ে বেপরোয়া হয়ে ঐ ওয়াক্তেই নীরবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে পথে নামলেন। নিস্তব্ধ রজনী। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। কোন্‌দিকে যাবেন তাঁরা, তাও তাঁদের জানা নেই। যেতে হবে, এইটুকুই সাকুল্যে তাঁদের জানা। তাই লোক বসতি এড়িয়ে যেদিকে ফাঁকা পেলেন, তাঁরা কেবল সেই দিকেই হাঁটতে লাগলেন। সদর পথে না হেঁটে বিপথ ও বনজঙ্গল পেরিয়ে কিছুক্ষণ পরে তাঁরা যেখানে এসে পৌছলেন, সেটি একটি খেয়াঘাট। ঘাটিয়াল ঘাটে নেই, খেয়াতরী তীরে নেই, পারাপারের যাত্রীরাও কেউ এখনও ঘাটে এসে পৌছেনি। নির্জন ঘাটের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে খড়ের একটি ছোট্ট চালাঘর। এই চালার নীচে বসেই ঘাটের মালিক পারের কড়ি আদায় করে।

উদ্ভ্রান্ত দুই মা-মেয়ে ইতিমধ্যেই ভয়-তরাশে ঘেমে কম্পিত ও শ্রান্ত হয়ে এসে এই চালার নীচে ক্ষণিকের জন্যে বসলেন। বসে বসে কোন্‌দিকে যাবেন তাঁরা, এই চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু ক্ষণকাল না কাটতেই অকস্মাৎ বজ্রপাত ! "ঐযে ঐযে ওখানে, হ্যাঁ ওরাই, ধর ধর"—আওয়াজ দিয়ে কয়েকজন দুর্বৃত্ত এসে ঘিরে ধরলো তাঁদের এবং শিরিবানুকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো।

সাধারণ মানুষের চেয়ে খন্নাস্‌দের চিন্তাশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বিশেষ করে, সে চিন্তা যদি বদচিন্তা হয়। যে খন্নাস লোকটির সাথে কামরুন নাহার বেগম শিরিবানুর শাদি দিতে গিয়েছিলেন, ষড়যন্ত্র আঁটার পর কামরুন নাহার বেগম ঘুমে মগ্ন থাকলেও সেই খন্নাসটি ঘুমায়নি। সে বিশেষভাবে জানে যে, তার মতো একজন দুরাচারকে শিরিবানুর মতো একজন বিদুষী ও রূপবতী মেয়ে

জান গেলেও শাদি করতে চাইবে না। শাদি করার যে চক্রান্তটি পাকিয়ে নিয়েছে তারা, এটা ঘুণাক্ষরেও শিরিবানুদের কানে গেলে, তাদের পালিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। একটা রাতের ঘুমের মায়া না কাটালে, ঐ বসরাই গোলাপের সৌরভ লাভ তার কপালে নাও ঘটতে পারে। তাই সে ঘুমোয়নি। দলবল গুছিয়ে নিয়ে এসে শিরিবানুদের পাহারায় সে অদূরেই ছিল। কিঞ্চিৎ বে-খেয়ালের কারণে তৎক্ষণাৎ নজরে না পড়লেও, শিরিবানুদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সে একটু পরেই জেনে ফেলে এবং তালাশ করতে করতে এই খেয়াঘাটে চলে আসে।

এই দুর্বৃত্তেরা এসে "ঐযে ধর ধর" বলে শিরিবানুকে ধরার চেষ্টা করলে মদিনা বিবি শিরিবানুকে আঁকড়ে নিয়ে রইলেন এবং দূর্বৃত্তেরা বল প্রয়োগ করলে মা-মেয়ে উভয়েই আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগলেন।

এই সময় নদীর এই তীর ঘেঁষে একটি সম্ভ্রান্ত বজরা ধীর গতিতে যাচ্ছিল। বজরাটি এই সময় একদম এই ঘটনাস্থলে এসেছিল। অন্ধকারের কারণে ও উত্তেজনা বশতঃ এটা এদের কারো নজরে পড়েনি। নারী কণ্ঠের আর্তনাদ শুনে বজরার মালিক গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—পাত্তা লাগাও—

সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোজন সশস্ত্র সৈনিক হুংকার দিয়ে বজরা থেকে লাফিয়ে পড়লো। একবারে বুকের উপর বহু কণ্ঠের হুংকার শুনেই দুর্বৃত্তেরা আঁতকে উঠলো এবং শিরিবানুদের ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারে দৌড় দিলো। সৈনিকেরাও তাদের পেছনে ধাওয়া করলো। কিন্তু নিকটবর্তী এক বনের মধ্যে ঐ অন্ধকারে কোথায় তারা পালালো, সৈনিকেরা হদিস করতে পারলো না। তারা আবার ঘটনা স্থলে ফিরে এলো। মা-মেয়ে তখনও উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে থেকে থর থর করে কাঁপছিল। তা দেখে সৈনিকদের একজন উচ্চ কণ্ঠে বললো—হুজুর, বদমায়েশগুলো পালিয়ে গেছে।

বজরার ভেতর থেকে আওয়াজ এলো—এরা কারা ? যারা চীৎকার করলে ?

ঃ দুইজন জেনানা হুজুর।

ঃ দুইজন জেনানা ? মর্দানা কেউ নেই ? তাকে এখানে ভেজো—

ঃ জিনা হুজুর, আর কাউকে তো দেখছিনে।

ঃ নেই ?

ঃ জিনা। কোন কাউকেই আশে পাশে দেখছিনে।

ঃ সেকি !

ঃ কিছুটা ভাল জেনানা বলেই মনে হচ্ছে হুজুর। ভয়ে একদম কুঁকড়ে গেছে। সওয়াল করবো হুজুর ?

বজরার মালিক বিব্রত কণ্ঠে বললেন—কি মুসিবত ! সেরেফ দুইজন জেনানা ?

ঃ জি হুজুর।

ঃ দাঁড়াও তাহলে আমি সওয়াল করছি—

বজরা থেকে নেমে এলেন মূল্যবান লেবাসের এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর পেছনে মশাল হাতে নেমে এলো আর এক ব্যক্তি। সে মশাল হাতে ভদ্রলোকটির পেছনে অনেকটা ফাঁকে দাঁড়িয়ে রইলো। মশালের আলোতে ভদ্রলোকটি দেখলেন দুই মহিলার মুখেই নেকাব আঁটা। কিঞ্চিৎ দূরে থেকে তিনি মহিলাদ্বয়কে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কে আপনারা ?

মা-মেয়ে কেউই তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারলেন না। কণ্ঠে জোর দিয়ে ভদ্রলোক ফের বললেন—আপনাদের সাথে কোন পুরুষ মানুষ নেই ?

মানুষ চেনা না গেলেও মশালের আলোতে ভদ্রলোকটির লেবাস ও চেহারা তাঁরা আন্দাজ করতে পারলেন। জৌলুশদার লেবাস আর লোকটি বৃদ্ধ দেখে মা-মেয়ের মনে কিছুটা সাহস এলো। জবাবে মদিনা বিবি ভয়ে ভয়ে বললেন—জিনা জনাব। আমরা সেরেফ একা।

ঃ তাজ্জব ! আপনারা সেরেফ দুইজন জেনানা তাহলে এই রাত্রিকালে এখানে কেন ?

ঃ মুসিবতে পড়ে এসেছি জনাব। নিরুপায় হয়ে এসেছি।

ঃ মানে ? আপনাদের অভিভাবক কে আছেন ? মকান কোথায় আপনাদের ?

ঃ আমাদের কেউ নেই জনাব। মকানও নেই।

ঃ সেকি ! মকান নেই তো থাকেন কোথায় ?

ঃ এক দূর সম্পর্কের রিস্তেদারের আশ্রয়ে এতদিন ছিলাম জনাব। তাদের মকানে কাজকাম করে খেতাম। কিন্তু নসীব নারাজ। দিনে দিনে তাদের অত্যাচার এতই বেড়ে গেল যে, আর সহ্য করতে না পেরে এই রাত্রিকালেই আমরা পালিয়ে এসেছি।

ঃ কেন, অত্যাচার কেন ?

ঃ সে অনেক কথা জনাব। মূল কারণ আমার এই মেয়ে। তার সর্বগ্রাসী রূপ। এক গাদা রূপ নিয়ে এসে হতভাগী জীবন আমাদের বিপন্ন করে তুলেছে।

ভদ্রলোকটি থেমে গেলেন। একটু নীরব থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁ, বুঝেছি। তা এখন যাবেন কোথায় আপনারা ?

ঃ যাবার জায়গা নেই জনাব।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ কোথায় যাবো স্থির করতে না পেরে এখানে এসে বসেছিলাম। কোথায় যাবো এখনো আমরা জানিনে।

ঃ বলেন কি !

ঃ যদিও বড় গুনাহ, তবু এই দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মরা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন যাওয়ার জায়গা নেই জনাব।

ঃ তওবা-তওবা। ওকথা বলতে নেই।

ঃ না বলে কি করবো জনাব ! আল্লাহ তায়ালার রহমে জনাবেরা না হয় এই একবার আমাদের বাঁচালেন। কিন্তু এরপরে আবার বাঁচাবে কে! দিনের আলো ফুটে উঠলেই, যত আব্রু করেই চলি না কেন, এই হতভাগীর রূপটাও ফুটে উঠবে। তখন কি আর আমাদের মুসিবতের সীমা থাকবে জনাব ? পালিয়ে না এসেও বাঁচলাম না, পালিয়ে এসেও বাঁচার কোন পথ সামনে দেখছিনে। কি যে এখন করবো—

মদিনা বিবি কেঁদে ফেললেন। শিরিবানুও ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকটি চকিতে একটু চিন্তা করলেন। এরপর ধীর কণ্ঠে বললেন—আপনারা কাজকাম করে খাচ্ছিলেন ?

কান্না জড়িত কণ্ঠে মদিনা বিবি বললেন—জি জনাব।

ঃ কি কাজ করছিলেন ?

ঃ ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ।

ঃ আমি আপনাদের নিয়ে গেলে আপনারা আমার সাথে যাবেন ?

ঃ জনাবের সাথে ?

ঃ হ্যাঁ। আমি আপনাদের কাজকামের একটা ব্যবস্থা করে দেবো।

মদিনা বিবি ইতস্ততঃ করে বললেন—কিন্তু—

ঃ ভয় পাচ্ছেন ?

ঃ জি হাঁ। মানে আমার এই মেয়েটাকে নিয়েই—

আগন্তুক এবার ঈষৎ হেসে বললেন—ভয় নেই। নবাব শায়েস্তা খানের হেরেমে কোন আউরাতের দিকে নজর তুলে তাকায় এমন সাহস কোন পুরুষের নেই।

মা-মেয়ে উভয়েই চমকে উঠে বললেন—হুজুর !

আগন্তুক কিছুটা আফসোস্ করে বললেন—আমিই এ মুলুকের সেই বদনসীব নবাব শায়েস্তা খান যার মুলুকে জেনানাদের হেফাজতি এখনও সুনিশ্চিত হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে মা-মেয়ে উভয়েই ছুটে এসে নবাবের কদম বুঁচি করলেন। নবাব ফের বললেন—প্রশাসনের এক কাজে দূর এলাকায় গিয়েছিলাম। এখন ঘরে ফিরছি। আপনাদের অন্য কোন আপত্তি বা অসুবিধা না থাকলে আপনারা আমার সাথে আসতে পারেন। আপনাদের একটা ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

মদিনা বিবি আপ্লুত কণ্ঠে বললেন—আলমপনা ! মেহেরবান ! আপত্তির প্রশ্নই কিছু নেই মেহেরবান ! এযে আমাদের কতবড় খোশ কিসমতি ! কিন্তু আমাদের মতো এতিম আর অসহায়দের প্রতি এতটা মেহেরবানী কি সত্যিই হুজুর করবেন ?

নবাব বাহাদুর বললেন—এতিম আর অসহায়দের হেফাজত করাই তো নবাবের অন্যতম প্রধান কাজ। আসুন—

শিরিবানুদের এনে নবাব বাহাদুর তাঁর মহলের প্রধান পরিচারিকাকে ডেকে বললেন—এঁদের কয়দিন তোমার হাওলায় রাখো আর এঁরা কোন্ কাজের যোগ্য তা যাচাই করে দেখো। সম্ভব হলে এঁদের আমি এই মহলেই কোনখানে কাজ দিতে চাই।

এরপর নবাব বাহাদুর কিছুদিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে রইলেন। এঁদের কথা প্রায় তিনি ভুলেই গেলেন। একদিন খেয়াল হতেই তিনি পরিচারিকাটিকে তলব দিলেন। পরিচারিকাটি হাজির হলে নবাব তাকে প্রশ্ন করলেন—তোমার হাওলায় যে মহিলা দুটিকে দিয়েছিলাম, তাঁরা কোথায় ?

পরিচারিকাটি খোশদীলে জবাব দিলো—ছোটি আম্মির কাছে হুজুর।

নবাব বাহাদুর বললেন—মানে ? ছোট বৌমার কাছে ?

ঃ জি হুজুর। একদিন পরেই আমার হাওলা থেকে ছোটি আম্মি তাঁদের নিয়ে গেছেন আর তাঁদের সব ব্যবস্থা করেছেন।

ঃ সব ব্যবস্থা !

ঃ এই মহলে তাঁদের থাকা খাওয়ার তামাম আনযাম করে দিয়েছেন।

ঃ বলো কি ! তোমার ছোটি আম্মি কি তাহলে তার নিজের কাজে নিয়োগ করেছেন তাঁদের ?

ঃ জি মেহেরবান। বড় মহিলাটিকে কোন কাজ এখনো দেননি। তবে তাঁর মেয়েটির কাছে ছোটি আম্মি এলেম শিক্ষা করছেন।

নবাব সাহেব হেসে বললেন—এলেম শিক্ষা করছেন নয়, তাহলে এলেম শিক্ষা দিচ্ছেন। বেশ-বেশ। তোমাদের ছোটি আম্মি এ একটি ভাল কাজ করছেন।

ঃ জি ?

ঃ ঐ মা-মেয়ে উভয়ের আচরণে ওদের কিছুটা শরীফ আউরাত বলেই মনে হয়েছে আমার। তার উপর আবার ওর আম্মার মুখেই শুনেছিলাম, মেয়েটির সুরাতও নাকি উমদা। এর সাথে সে যদি কিছুটা এলেম পায়, তাহলে তাদের

কায়েমীভাবে একটা সুব্যবস্থা করে দেয়া সহজ হবে আমার। তোমার ছোটি আম্মি সত্যিই একটা সওয়াবের কাজ করছেন।

পরিচারিকাটি ভড়কে গিয়ে বললেন—না মানে, আমি বলছিলাম হুজুর—

ঃ এতে আর কোন বলাবলি নেই। এতিমদের সাহায্য করা উত্তম কাজ। তাঁদের প্রতি সদয় হয়ে তোমাদের ছোটি আম্মি মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমি খুব খুশী হয়েছি। তাঁকে আর একটু মনোযোগ দিয়ে ঐ মেয়েটাকে এলেম শিক্ষা দিতে বলো।

পরিচারিকাটি বিপদে পড়লো। সে ঢোকচিপে বললো—না মেহেরবান। ছোটি আম্মিই ঐ মেয়েটির কাছে এলেম শিক্ষা করছেন।

নবাব বাহাদুর নাখোশ হলেন। তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বললেন—দেখো, যা বুঝো না তা নিয়ে কথা বলা বেয়াদবী। আমি ওটা পছন্দ করিনে।

ঃ আলমপনা !

ঃ তোমার ছোটি আম্মি এলেম শিক্ষা করবেন মানে ? তিনি কতবড় এলেমদার তা জানো ? আমাদের এই মহলে তাঁর মতো এলেমদার আউরাত আর একটিও নেই। ঐ একটা এতিম মেয়ে তাঁকে কি এলেম শিক্ষা দেবে ?

পরিচারিকাটি মরিয়া হয়ে বললো—তাই তিনি দিচ্ছেন হুজুর। ঐ মেয়েটির কাছেই ছোটি আম্মি এলেম শিক্ষা করছেন।

নবাব শায়েস্তা খান হতবাক হয়ে গেলেন। ক্ষণিক নীরব থেকে তিনি রোষভরে বললেন—তুমি যা বলছো, তার অর্থ আর পরিণাম কি কিছু বোঝো ? এলেম শিক্ষা করা আর এলেম শিক্ষা দেয়া—এই দুইয়ের মধ্যে ফারাগটা কি জানো ?

পরিচারিকাটি শেষ চেষ্টা করে বললো—জি মেহেরবান। তা জানি বলেই বলছি।

নবাব বাহাদুর ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন—হুঁশিয়ার ! তোমার কথা যদি সত্যি না হয়, তাহলে এর বিস্তর খেশারত তোমাকে দিতে হবে।

আর কোন কথা না বলে পরিচারিকাটি নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো। নবাব শায়েস্তা খান পুনরায় হুমকি দিয়ে বললেন—কি ? ডাকবো আমি তোমার ছোটি আম্মিকে ? এই বেয়াদবীর ফলাফলটা কি হাতে হাতেই দিয়ে দেবো তোমাকে ?

পরিচারিকাটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো—হুজুরের যা মেহেরবানী। আমি আর কিছু বলতে চাইনে।

নবাব বাহাদুর তৎক্ষণাৎ তার পুত্র বধুকে তলব দিতে গিয়ে আবার থেমে গেলেন। তাঁর খেয়াল হলো, মামুলী একটা পরিচারিকা, ভয়ে যে তাঁর সামনে

কথা বলতেই পারে না, সে কিছু না বুঝেই এতটা জিদ ধরবে, এটা কি করে সম্ভব ? কি আছে এর ভেতরে ? তিনি কণ্ঠস্বর কিছুটা নরম করে বললেন—ভাল করে ভেবে দেখো। তোমার ভুল হলে আমি তোমাকে ক্ষমা করতেও তৈয়ার আছি।

পরিচারিকাটি কেঁদে ফেললো। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে বললো—আমি কিছু জানিনে হুজুর। আমার কসুর মাফ করে দিন। ছোটি আম্মি এ নিয়ে সেই কবে থেকে হুজুরের সাথে কথা বলার কোশেশ করছেন। হুজুর খুব ব্যস্ত আছেন দেখে তিনি কথা বলতে পারেননি। তিনি আমাকে সব কথা বলেছেন বলেই বললাম। আমার কসুর হয়েছে আলমপনা। একথা আমি আর কখনো বলবো না।

পরিচারিকা চোখের পানি মুছতে লাগলো। নবাব বাহাদুর নিজেই এবার ভড়কে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকার পর পরিচারিকাটিকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আহা কাঁদছো কেন ? ঘটনাটা আমাকে বুঝে নিতে দাও। তোমার ছোটি আম্মি কি কথা আমার সাথে বলার কোশেশ করলেন ?

পরিচারিকাটি কথা না বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলই চোখের পানি ফেলতে লাগলো। নবাব আবার ভরসা দিয়ে বললেন—ভয় নেই। তোমার ছোটি আম্মি তোমাকে কি বলেছেন, সব কথা খুলে বলো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার কোন কসুরই আর আমি ধরবো না।

কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে পরিচারিকাটি ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—ঐ মেয়েটির কথাই বললেন আমাকে। হুজুর তাঁদের আমার কাছে হাওলা করে দেয়ায় তিনি তাজ্জব হয়েছেন।

ঃ কেন, তাজ্জব হলেন কেন ?

ঃ মেয়েটির রূপ আর গুণ দেখে। এই মহলে ওঁদের আনার আগে হুজুর এসবের কোন খবরই নিয়েছেন কিনা, এই কারণে।

ঃ সেকি ! মেয়েটি তাহলে সত্যিই খুব সুন্দরী আর এলেমদার ?

ঃ জি হুজুর। রূপ তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি, তাঁর এলেম সম্বন্ধে ছোটি আম্মি তাই বললেন।

ঃ তাজ্জব। মেয়েটি যে সুন্দরী তা আমি শুনেছিলাম। কিন্তু আমি তো আর চোখ লাগিয়ে দেখতে যাইনি যে জানবো, কতটা সে সুন্দরী ? আর ঐ হুটপিটের মধ্যে তার এলেমের খবর করারই বা ফুরসুৎ আমার ছিল কোথায় ?

ঃ মেহেরবান !

ঃ আচ্ছা তুমি যাও, আমি দেখছি।

এরপর খবর করে নবাব যা জানলেন, তাতে তিনি একেবারেই লাজবাব হয়ে গেলেন। তিনি জানলেন, শিরিবানু নামের এই মেয়েটি সেরেফ রূপসীই নয়, এই নবাব মহলের আর কোন আউরাতেরই রূপ তার সমকক্ষ কিনা, তা নিরূপণ করা শক্ত। আর এলেম যে তার কতখানি, নবাব নিজে যথেষ্ট এলেমদার হওয়া সত্ত্বেও তা তিনি পরিমাপ করতে পারলেন না। শুধু বুঝলেন এতবড় এলেমদার তাঁর মহলে তো নয়ই, এই গোটা শহরে যারা আছেন, তাঁদের সংখ্যা নখে গোনার উপরে কখনো যাবে না।

নবাব এবার তাঁদের পেছনে লাগলেন। তাঁরা কে, এত এলেম কোথায় পেলো শিরিবানু, কেন তাঁদের এই হালত—এসব কথা জানার জন্যে নবাব তাঁদের ধরে বসলেন। জবাবে শিরিবানু রেখে ঢেকে যা জানালো, তাহলো—তারা সাধারণ মানুষ, রূপটা আল্লাহর দান, এলেমটা কিছু লোকের রহমে সে চেষ্টা করে শিখেছে আর তার উস্তাদ নিজ আগ্রহে ও বিনে মাহিনায় তাকে শিখিয়েছেন এবং অভিভাবক আর বিষয়-বৈভব কিছুই না থাকায় তাদের এই পরিণতি হয়েছে। কিন্তু এসব কথা বলে শিরিবানু নবাবকে পুরোপুরি তৃপ্ত করতে পারলো না। নবাব আরো অনেক রকম সওয়াল করলেন। কিন্তু এর অধিক আর তেমন কিছু না পেয়ে নবাবও শেষ পর্যন্ত থেমে গেলেন। তবে তিনি বুঝলেন, এর ভেতরে হয়তো এমন কিছু কথা আছে, যা তারা প্রকাশ করতে নারাজ। কারো ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কারো গোপন কথা শোনার মানুষ নবাব বাহাদুরও নন। তিনি আর সে চেষ্টা করলেন না।

তারপর থেকেই এ মহলে নবাবজাদীর মর্যাদার হকদার হলো শিরিবানু। রূপ ও গুণের সাথে তার আচরণ ও আদব-আখলাকে নবাব শায়েস্তা খান সাহেব এতটাই প্রীত হলেন যে, শিরিবানুকে তিনি তাঁর কন্যার আসনে বসালেন। অতপর অবসরে ও ক্লান্তিতে তিনি শিরিবানুকে কাছে ডেকে নিতে লাগলেন এবং কাব্য-সাহিত্য, বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে নিবিড় ও সরস আলোচনা করে ক্লান্তি বিমোচন করতে লাগলেন। এ ছাড়া, শিরিবানু যখন গুলিস্তা-বোঁস্তা, দেওয়ান, রুবাইয়াত ও মসনবী অনর্গল মুখে মুখে আউড়িয়ে নবাবকে শোনাতেন, নবাব বাহাদুর এতই মোহিত হয়ে যেতেন যে, চাইলে তিনি সেই মুহূর্তে শিরিবানুকে দেয়ার জন্যে আসমানের তারার দিকেও হাত বাড়াতেন।

বেশ কিছুদিন এই হালে কাটার পর নবাব সাহেব খেয়াল করলেন, অতপর আর এই হালে চলে না। শিরিবানুর ঢের বয়স হয়েছে। তার শাদির ব্যবস্থা করতে হয়। এ কাজটি না করলে এদের প্রতি তাঁর কর্তব্য কিছুই করা হবে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এসেই তিনি থমকে গেলেন। তাঁর সামনে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো শিরিবানুর উপযুক্ত বর পাওয়ার সমস্যা। পদস্থ লোক অনেকেই হাতে আছেন তাঁর। কিন্তু পদের সাথে শিরিবানুর অর্ধেকটা এলেমও তাঁদের

কারো নেই। তাঁদের অনেকের মধ্যেই নেই শিরিবানুর ঐ অনুপম দীলের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়ার গুণাবলী। এসব কথা ভাবতেই হঠাৎ একবার তাঁর মনের কোণে উঁকি দিলো আবদুল আজিজের মুখ। কিন্তু শাদিতে আবদুল আজিজের অনীহার কথা মনে পড়তেই, তখনই তিনি ও প্রসঙ্গ বাদ দিলেন। ও নিয়ে আর ভাবলেন না।

নবাব বাহাদুর পুনরায় থমকে গেলেন শিরিবানুর কাছে শাদির প্রসঙ্গ তুলে। এ প্রসঙ্গে শিরিবানু নবাবের পায়ে মাথা কুটে জানালো, নবাব তাকে কোতল করার ইচ্ছে করলেও আপত্তি তার নেই, কিন্তু এখানে সে মরিয়া। শাদির জন্যে চাপ দিলে, যেভাবে তারা পালিয়েছিল একবার, ঐভাবেই ফের পালানো ছাড়া আর তার কোন উপায় থাকবে না। কেন ? এ প্রশ্নের জবাবও শিরিবানু ঐ একইভাবে এড়িয়ে গেলো।

দেখে শুনে নবাব বাহাদুর হাল ছাড়লেন এখানেও। কারণ ঐ একটাই। কারো গোপন কথা কেউ স্বইচ্ছায় না বললে, নবাব সেখানে জিদ ধরতে নারাজ। তবে তাঁর সেই পূর্বের সন্দেহটা আরো দৃঢ়মূল হলো যে, এদের ভেতরে কিছু আছে, যা এরা প্রকাশ করতে চায় না। সেই সাথে তাঁর আরো একটা ধারণা হলো যে, অধিক এলেমদার হওয়াটাই বোধহয় একটা বিমার আর আবদুল আজিজও এই বিমারের বিমারী।

শিরিবানু ইচ্ছে করেই মনের কথা গোপন করলো। আবদুল আজিজের উপর তার অভিমান ও ক্ষোভ এখনও কিছুমাত্র কমেনি। এতটা যে উপেক্ষা করে রইলো তাকে, পত্রের বিনিময়ে একখানা পত্র দেয়ার আগ্রহও যে ব্যক্তির হলো না, সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করার মতো বা তার জের পুনরায় টানার মতো কোন মানসিক পরিবর্তন এখনও তার ঘটেনি।

কিন্তু মন বড় আজব চিজ। কখন আর কিসে যে পরিবর্তন ঘটে মনের, মনের মালিকও সে খবর রাখে না। শিরিবানুর মনেও সেই পরিবর্তন এলো। আবদুল আজিজের হালতের কথা মুখে মুখে শুনে শুনে আর আবদুল আজিজ যে সেই থেকেই দিউয়ানা, গোপন সূত্রে এ খবর যোগাড় করে শিরিবানুর অভিমান পানসে হয়ে গেল। আবদুল আজিজ যখন ঐ শেষবার নবাবের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন অত্যন্ত কষ্টবহুল কৌশলে তাঁর চেহারা দর্শন করেই শিরিবানু ডুকরে উঠলো। তার অভিমানের তামাম গিট সড়সড় করে খুলে গেল।

এখন কিভাবে সে একথা নবাবের কাছে তুলবে, এই চিন্তায় শিরিবানু অস্থির হয়ে গেল। একদিকে শরম আর অন্যদিকে সাধাসাধি করা সত্ত্বেও

নবাবকে তা না বলার গোস্তাকী—এই উভয়বিধ বাধা তার সামনে পাহাড় হয়ে দাঁড়ালো। এ দু'টোকে সবলে সরিয়ে ফেলে নবাবের কাছে কথাটা তুলবো তুলবো করতে করতেই শুরু হলো ইংরেজদের সাথে লড়াই। নবাব বাহাদুর যারপর নেই ব্যস্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে রইলেন। শিরিবানু আর কোন মওকা পেলো না।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। কয়েকদিন পর শিরিবানু হঠাৎ যখন শুনলো, হুগলীতে এক প্রলয়ংকরী লড়াই সংঘটিত হয়ে গেছে, ইংরেজরা সেখানে কারবালার কাণ্ড ঘটিয়েছে, সেপাইদের হতাহতের লেখা জোখা নেই, সালার-ফৌজদার-প্রশাসক কেউ রেহাই পাননি, শিরিবানু তখন একদম উন্মাদিনী হয়ে গেল। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তখনই সে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো এবং ঝড়ের বেগেই নবাবের খাস কামরায় ঢুকলো। সারাদিন একটানা পরিশ্রমের পর বৃদ্ধ নবাব বাহাদুর তখন কিছুটা বিরামের আনযাম করছিলেন। শিরিবানুকে এ সময় ঐভাবে ছুটে আসতে দেখে এবং তার চোখে মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে নবাব বাহাদুর তাজ্জব কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার আম্মি ? তুমি এমনভাবে ছুটে এলে যে ? তোমার চোখে মুখে কিসের এত আতংক ?

কোন রকম ভূমিকায় না গিয়ে শিরিবানু ব্যস্ত কণ্ঠে সরাসরি প্রশ্ন করলো—হুগলীতে নাকি প্রচণ্ড এক লড়াই হয়ে গেছে হুজুর ?

পুনরায় বিস্মিত হয়ে নবাব বাহাদুর বললেন—হ্যাঁ, হয়েছেই তো !

ঃ অনেক নাকি লোক লস্কর মারা গেছে ?

ঃ গেছেই তো কিছু কিছু। উভয় পক্ষের অনেক লোকই হতাহত হয়েছে।

ঃ ফৌজদার-প্রশাসক—এঁদের খবর কি মেহেরবান ? এঁদের কারো প্রাণহানী ঘটেনি তো ?

ঃ না, তাঁদের কারো প্রাণহানী হয়নি। তবে অনেকেই অনেকটা আহত হয়েছেন।

পুনরায় চমকে উঠে শিরিবানু রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন—প্রশাসক সাহেব ? মানে হুগলীর ঐ নয়া প্রশাসক ? তাঁর হালত কি মেহেরবান ?

ঃ কে ? আবদুল আজিজ ?

ঃ জি-জি। তাঁর খবর কি হুজুর ? তাঁর তো কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ? মানে কোন রকম জখম-টখম ?

নবাবের বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। জবাবে তিনি বললেন—না, আবদুল আজিজের তেমন কিছু হয়নি। সে ভালই আছে।

শিরিবানু তবুও ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—ঠিক তো হুজুর ? কোন আঘাত-টাঘাত তো লাগেনি তাঁকে ?

নবাবের বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তিনি এবার প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—তার মানে ? আবদুল আজিজকে চেনো তুমি ?

কোন সংকোচ করার অবস্থা শিরিবানুর তখন ছিল না। সে সংগে সংগেই জবাব দিলো—জি হুজুর, চিনি।

ঃ পরিচয় আছে ?

ঃ জি আছে।

ঃ তোমাদের কি সে রিস্তেদার ? মানে, তার সাথে কি তোমাদের কোন আত্মীয়তা আছে ?

অল্প একটু থেমে গিয়েই শিরিবানু ফের বললো—জি, দূর দিয়ে তা কিছুটা আছে হুজুর।

ঃ তাজ্জব ! কি সম্পর্ক তার সাথে তোমার ?

ঃ অনেকখানি দূর দিয়ে তিনি আমার ভাই হুজুর। আমি তাঁকে ছোট সাহেব বলি।

ঃ ছোট সাহেব কেন ?

ঃ বচপন কাল থেকেই ঐভাবে ডেকে ডেকে তাঁকে আর ভাই বলতে পারিনে।

ঃ বচপন কাল থেকে ! মানে, বাল্যকাল থেকেই ঐভাবে ডেকেছো তাকে ?

ঃ জি মেহেরবান। ছোটকাল থেকেই আমরা একসাথে মানুষ তো, আর বরাবর এক সাথে থেকেছি।

ঃ এক সাথেই থেকেছো ? কতদিন আগে পর্যন্ত এক সাথে ছিলে ?

শরম এসে আস্তে আস্তে শিরিবানুর উপর ভর করতে লাগলো। এবার সে কিছুটা কুণ্ঠার সাথে বললো—হুজুরের মহলে আসার অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি তাঁর কাছেই ছিলাম।

নবাব বাহাদুর চমকে উঠে বললেন—হুগলীতে ছিলে তাহলে ?

ঃ জি হুজুর।

ঃ তার ঐ হুগলীর বাসায় ?

ঃ জি।

ঃ কি তাজ্জব ! তোমার এত এলেম শিক্ষার ব্যবস্থা কি তাহলে—

ঃ জি মেহেরবান। তিনিই করেছিলেন।

নবাব শায়েস্তা খান এবার নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁউ !

ঃ হুজুর।

ঃ তাকে ভালবাসো ?

শিরিবানু নীরব। নবাব বাহাদুর শক্ত কণ্ঠে বললেন—জবাব দাও—

শিরিবানু ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—জি।

ঃ একথা তাহলে এতদিন বলোনি কেন ?

ঃ শরমে।

ঃ সেরেফ শরমে ?

ঃ দুঃখেও মেহেরবান।

ঃ কি সে দুঃখ ?

ঃ সে অনেক কথা।

ঃ সেই অনেক কথাই তো এতদিন শুনতে আমি চেয়েছি। বলো, কি সে অনেক কথা ?

ঃ আলমপনা !

নবাব শায়েস্তা খান এবার হুকুমের সুরে বললেন—আজ তোমাকে বলতেই হবে সব কথা। বসো ওখানে। ওখানে বসে বলো—

শিরিবানুও তা বলতেই চায়। নিকটেই একটা আসনে বসে একটু দম নেয়ার পর শিরিবানু আস্তে আস্তে তাদের তামাম কাহিনী নবাবকে বলে শুনালো। সব কথা শুনার পর নবাব শায়েস্তা খান সাহেব অনেকক্ষণ দম ধরে বসে থাকলেন। এরপর স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আচ্ছা ! এই তোমাদের ব্যাপার ?

ঃ হুজুর।

ঃ এই কারবার ফেঁদে নিয়ে বসে আছো তোমরা ?

ঃ আলমপনা।

ঃ তাইতো শাদিতে তোমার এত অনীহা আর আবদুল আজিজ আওয়ারা !

শিরিবানু নতমস্তকে বসে রইলো। নবাব বাহাদুর ফের হাসি মুখে বললেন—আমার আগেই একটা ধারণা ছিল যে, কোন একটা জটিলতা জরুর তোমাদের মধ্যে আছে। বেশ-বেশ। আমি খুব খুশী হয়েছি।

ঃ মেহেরবান !

ঃ এই রকম একটা জুটিই আমি মনে মনে কল্পনা করে এসেছি। কেন যেন আমার মনে হয়েছে, আবদুল আজিজের সাথে তোমার যদি শাদি হতো, তাহলে বেশ ভাল হতো। আল্লাহ তায়ালা করুণা করে আমার ইচ্ছেই কবুল করেছেন দেখছি।

শিরিবানুর চোখে মুখে খুশীর আলো ফুটে উঠলো। সে নতমস্তকে আবেগ ভরে বললো—হুজুর বড়ই মহানুভব !

ঃ অমনি অমনি নয়। আবদুল আজিজ যে আমার একটা মস্তবড় গর্ব। সে অনেকটা বেটার মতো আমার।

ঃ মেহেরবান !

ঃ যাও। কোন পেরেশানী দীলে আর রেখো না। লড়াই প্রায় শেষ হয়েই এসেছে। আমি অচিরেই এটা দেখছি।

শিরিবানু জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইলেন। নবাব আবার হেসে বললেন—ভাবছো কেন ? তোমাদের একটা সুব্যবস্থা করার ওয়াদা করেই তো তোমাদের এখানে এনেছি। যা করার আমিই সব করবো।

আনন্দে ও আবেগে শিরিবানু তৎক্ষণাৎ কদম বুঁচি করতে গিয়ে নবাবের পায়ে চোখের পানি ফেললো। তার মাথায় হাত রেখে নবাব শায়েস্তা খান সস্নেহে বললেন—পাগ্‌লী বেটি !

দিন কয়েকের মধ্যেই লড়াই নিয়ে উৎকণ্ঠা একেবারেই থেমে গেল। নবাব বাহাদুর এবার আবদুল আজিজের আব্বা আবদুল খালেক সাহেবকে তলব দিয়ে পাঠালেন। আবদুল খালেক সাহেব এসে হাজির হলে তিনি প্রথমে তাঁকে একচোট খুবই ধমকালেন। এরপর তামাম কথা খুলে বলে বললেন—যান, শিরিবানুদের নিয়ে আপনি এখনই হুগলী চলে যান।

আবদুল খালেক সাহেবও আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হয়ে গেলেন। বিগলিত কণ্ঠে তিনি বললেন—হুজুর দরাজদীল। একি আমার খোশ কিস্‌মতি !

নবাব ফের বললেন—হিজলী থেকেও ঐ বেনিয়াদের উৎখাত করেছে আমাদের জোয়ানরা। অল্প কিছু সেপাই জখম হওয়া ছাড়া বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি। আবদুল আজিজও সহিসালামতেই আছে, এ খবর আমি পেয়েছি। সে এখন হুগলীতে ফিরে আসবে। তার হুগলীতে পৌছার আগেই আপনারা সেখানে গিয়ে এন্তেজারে থাকুন।

ঃ জি আচ্ছা মেহেরবান।

ঃ বড় তকলিফ যাচ্ছে বেচারার উপর দিয়ে। রণশ্রান্ত হয়ে ফিরে এসে সে আপনাদের দেখলে খুবই তৃপ্তি পাবে। তার এখন সেবাশুশ্রূষার বড্ড প্রয়োজন।

পরের দিন শিরিবানু ও তার আম্মাকে নিয়ে আবদুল আজিজের আব্বা-আম্মা—উভয়েই হুগলীতে রওনা হলেন। বিগত দুর্ব্যহারের জন্যে আবদুল আজিজের আম্মা ইতিমধ্যে অত্যন্ত পেরেশান ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে হাহুতাশ করছিলেন। এবার তিনি মদিনা বিবির হাত ধরে

আন্তরিকভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এবং মদিনা বিবি তাঁকে ক্ষমা করলে তবে তিনি সত্যিকারের স্বস্তি ফিরে পেলেন।

হুগলীতে তাঁরা পৌছলে উমিদ আলী ও রওশন আরা বেগমের আনন্দের সীমা পরিসীমা রইলো না। তামাম খবর শুনে তাঁরা এন্তার আল্লাহ তায়ালার শোকরগুজারী করতে লাগলেন। অতপর রওশন আরা বেগমের পরামর্শ ক্রমেই শিরিবানু পুষ্পমালা হাতে নিয়ে আবদুল আজিজকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্যে তৈরী হয়ে রইলো এবং আবদুল আজিজ অন্দরে পা দিলে তাঁর গলায় পুষ্পমাল্য দিয়ে শিরিবানু তাঁকে খোশ আমদেদ জানালো।

পতনোন্মুখ আবদুল আজিজকে ফটক থেকে ধরে নিয়ে এসে আবদুল খালেক সাহেব তাঁকে সস্নেহে বসালেন। সবাই মিলে তার পরিচর্যা করার সাথে সাথে সবাই মিলে তামাম ঘটনা আবদুল আজিজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনালেন। সব কথা শুনার পর আবদুল আজিজের একবার খেয়াল হলো, উমিদ আলীর মতো তিনিও গায়ে একবার চিমটি কেটে দেখেন, নিছক খোয়াব দেখছেন তিনি, না সবই এসব বাস্তব ?

সুদীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অনাড়ম্বর ও তাৎক্ষণিকভাবে আবদুল আজিজ ও শিরিবানুর শাদি মোবারক সুসম্পন্ন হয়ে গেল। বাসররাত্রি উদ্‌যাপনের জন্যে যখন হরষিত নবদম্পতি আবদুল আজিজের খাস কামরায় প্রবেশ করলো, তখন চারদিকে ঢেলে পড়ছে চাঁদের আলো। বাংলার দুর্যোগ মুক্তির মতো আকাশ ছিল মেঘমুক্ত। সময়টা ছিল খুশীর। রাত পূর্ণিমার।

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

নাম ঃ
শফীউদ্দীন সরদার

জন্ম ঃ
ইং ১৯৩৫ সনে নাটোর জেলার নাটোর থানার হাটবিলা গ্রামে।

বর্তমান ঠিকানা ঃ
গুকুলপট্টি, পোঃ+জেলা—নাটোর, ফোন—২৯০।

শিক্ষা ঃ
ইং ১৯৫০ সনে মেট্রিকুলেশন। অতপর-আই. এ.; বি. এ. (অনার্স); এম. এ. (ইতিহাস); এম. এ. (ইংরেজী); বি. এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন-এড (লন্ডন)।

কর্মজীবন ঃ
প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

সখ ঃ
প্রাক্তন মঞ্চাভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও রেডিও বাংলাদেশের নাট্যকার, শিল্পী ও নাটক প্রযোজক।

সাহিত্য ঃ

উপন্যাস (ঐতিহাসিক)
১। বখতিয়ারের তলোয়ার—প্রকাশিত
২। গৌড় থেকে সোনার গাঁ—প্রকাশিত
৩। যায় বেলা অবেলায়—যন্ত্রস্থ
৪। বিদ্রোহী জাতক—প্রকাশিত
৫। বার পাইকার দুর্গ —প্রকাশিত
৬। রাজবিহঙ্গ—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত
৭। শেষ প্রহরী—যন্ত্রস্থ
৮। প্রেম ও পূর্ণিমা—প্রকাশিত
৯। বিপন্ন প্রহর—যন্ত্রস্থ
১০। সূর্যাস্ত—অপ্রকাশিত

উপন্যাস (সামাজিক)
১। শীত বসন্তের গীত—প্রকাশিত
২। অপূর্ব অপেরা—প্রকাশিত
৩। চলন বিলের পদাবলী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত

নাটক
১। গাজী মন্ডলের দল—প্রকাশিত
২। সূর্যগ্রহণ—প্রকাশিত
৩। বনমানুষের বাসা—প্রকাশিত
৪। রূপনগরের বন্দী—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত
৫। ছবি—পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত
৬। মাটির সাথে মিতালী—প্রকাশিত
৭। জীবন সঙ্গীত—প্রকাশিত
৮। দীপ অনির্বাণ—প্রকাশিত
৯। কাঁকড়া কেত্তন—প্রকাশিত

রম্য রচনা
১। ঘাসকাটা গল্প—প্রকাশিত
২। চার চান্দের কেচ্ছা—যন্ত্রস্থ

রূপকথা
১। সুলতানার দেহরক্ষী—অপ্রকাশিত

কবিতা
১। সার্বজনীন কাব্য (কবিতাগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত)

03-23 11:54 PM

মরহুম জনাব শফিউদ্দিন সরদার সাহেবের লিখা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলারই সফট কপি (পিডিএফ ফরম্যাট) কিছু মহতী মানুষের বদৌলতে ইন্টারনেটে, কয়েকটি ব্লগ সাইট, গ্রুপ সহ বিভিন্ন মাধ্যমে পাওয়া যায়। চাকুরীজীবী অথবা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত মানুষদের পক্ষে বই হাতে নিয়ে পড়ার সময় বাহির করা অনেক দূরহ একটা কাজ। তাদের জন্য, যে কোন বইয়ের পিডিএফ ফরম্যাট অত্যন্ত উপকারী।

মরহুম জনাব শফিউদ্দিন সরদার সাহেবের বইয়ের পাঠক অসংখ্য। কেউ হার্ড কপি আবার কেউ সফট কপি পড়তে ভালোবাসেন। অনেক মানুষের ব্যস্ততার দরুন সফট কপির চাহিদা বেশি,, আর, এ চাহিদার যোগানদাতারাও আছেন প্রচুর।

তারপরও, কিছু বই পিডিএফ আকারে সবার নাগালের মধ্যে আসে নি। আমি নিজে প্রায় তিন-চার দিন একনাগাড়ে খোঁজাখুঁজি করেও ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে দুইটি বইয়ের পিডিএফ ফরম্যাট পাই নি।

তাই শেষ পর্যন্ত এক শুভাকাঙ্ক্ষীর মাধ্যমে বই দুটি সংগ্রহ করি। তার মধ্যে একটি এই। ★ প্রেম ও পূর্ণিমা ★। চিন্তা করলাম, আমি তো বইগুলা পেয়ে গেলাম,, কিন্তু বই হাতে নিয়ে পড়ার সময় কই। তাছাড়া আরেকটা বিষয়ও মাথায় এলো,,, আমার মত আরো অনেক আছেন,,, যাদের সংগ্রহে বইগুলো নেই। এমনকি ইন্টারনেটে এগুলোর পিডিএফ কপি ও পাচ্ছেন না,, অনেককেই এগুলোর খোঁজ করতে দেখেছি।

পরিশেষে নিজের ও অন্যান্য অনেকের কথা চিন্তা করে বইগুলো নিজেই পিডিএফ আকারে রুপান্তরিত করার কাজে হাত দিলাম। এটা শেষ করলাম। ইনশাআল্লাহ সত্বর আরেকটা শুরু করব।

এতদিন নিজে পিডিএফ ফরম্যাটে বই পড়েছি। কিন্তু এই প্রথম পিডিএফ তৈরী করলাম।

আনাড়ী হাতের কাজ,,, ভুলত্রুটি অনেক আছে,, এগুলোকে সবাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। এই কাজটা যদি কারো উপকারে আসে,, তা হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

বি:দ্র: এ কাজে বইয়ের মূল কোন কিছুই পরিবর্তন করি নি। শুধু মাত্র হার্ড কপিটাকে সফট কপিতে রুপান্তরিত করেছি,,, আশা রাখতে পারি,, এতে লেখকের গ্রন্থস্বত্বের কোন ক্ষতি হয় নি।।।